প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

আমার আত্মচরিতের বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আমাদের দেশে রসায়নবিদ্যার চর্চা এবং রাসায়নিক গোষ্ঠী গঠনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী অভিজ্ঞতামূলক সমসাময়িক অর্থনীতি, শিক্ষাপদ্ধতি ও তাহার সংস্কার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক সমালোচনা এই পুস্তকের বিষয়বস্তু হইয়াছে।

বাঙালী আজ জীবনমরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত। একটা সমগ্র জাতি মাত্র কেরানী বা মসীজীবী হইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না ; বাঙালী এতদিন সেই ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়া আসিয়াছে এবং তাহারই ফলে আজ সে সকল প্রকার জীবনোপায় ও কর্মক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত। বৈদেশিকগণের ত কথাই নাই, ভারতের অন্যান্য প্রদেশস্থ লোকের সহিতও জীবন-সংগ্রামে আমরা প্রত্যহ হটিয়া যাইতেছি। বাঙালী যে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা আর কবির খেদোক্তি নহে, রূঢ় নিদারুণ সত্য। জাতির ভবিষ্যৎ যে আন্ধকারবৃত, তাহা বুঝিতে দূরদৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে না। 'বৈষ্ণবী মায়া' ত্যাগ করিয়া দৃঢ়হস্তে বাঁচিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

বাল্যকাল হইতেই আমি অর্থ-নৈতিক সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি এবং পরবর্তী জীবনে শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার ন্যায় উহা আমার জীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেবল সমস্যার আলোচনা করিয়াই আমি ক্ষান্ত হই নাই, আংশিকভাবে কর্মক্ষেত্রে উহার সমাধান করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। সেই চেষ্টার ইতিহাস আত্মচরিতে দিয়াছি।

এই পুস্তকখানিকে জনসাধারণের বিশেষতঃ গৃহলক্ষ্মীদের অধিগম্য করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। নিঃশেষিতপ্রায় ইংরাজী সংস্করণের মূল্য পাঁচ টাকা নির্ধারিত হইয়াছিল। বাংলা সংস্করণের কলেবর ইংরাজী পুস্তকের তুলনায় কিঞ্চিৎ বৃহত্তর হইলেও ইহার মূল্য পাঁচ টাকার স্থলে মাত্র আড়াই টাকা করা হইল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার এই পুস্তকের ভাষান্তর কার্যে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রচারবিভাগের শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. এ. মুদ্রাঙ্কন-কার্যের ভার লইয়া আমার শ্রমের যথেষ্ট লাঘব করিয়াছেন।

১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য-আমার

আজ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়াই আমার কথা। আমার স্মৃতিতে আসীন আচার্যদেব বালপ্রকৃতি, মধুরভাষী, শীর্ণদেহ, জ্ঞানতপস্বী, দেশপ্রেমিক এবং ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল।

আজও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বেকার কথা যেদিন তাঁহার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে গুরুশিষ্যের সেই পরিচয় দিনের পর দিন ঘনীভূত নিবিড়তর ও সার্থক হইয়াছে। স্নেহমুগ্ধ মনে আজ সেই সকল দিনগুলি স্মরণ করিতেছি।

তাঁহার ক্লাশে যখনই শিক্ষালাভ করিতে যাইতাম, অনুভব করিতাম চারিদিকে নতুন হাওয়া বহিতেছে। শিশুর মতন খোলা-মন লইয়া গুরুদেব আমাদের সকলকেই অতি আপনার জন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিবার, আলাপ-আলোচনা করিবার, তর্ক করিবার, জানিয়া লইবার অবাধ স্বাধীনতা আমাদের ছিল। তিনি প্রণম্য, তিনি প্রাচীন, অসীম তাঁহার জ্ঞান কিন্তু তিনি আমাদের অতি নিকট বন্ধুসম ছিলেন। তাঁহার মধুর হাসি—তাঁহার অকপট ব্যবহার, তাঁহার নিরাড়ম্বর বাসগৃহ, তাঁহার শুচিস্নিগ্ধ বেশ, তাঁহার নিরলস, কর্মব্যস্ত জীবন, তাঁহার উৎসাহ যেন জাদুমন্ত্র বলে আমাদের জীবনধারাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার অপরিমিত স্নেহের প্রভাবে ও সত্যদৃষ্টিতে এবং পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানে আমরা আমাদের ভাবী জীবনপথের সিগ্‌ন্যাল দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার বড় দুঃখ ছিল। তিনি বলিতেন পরীক্ষকের পেন্সিল মার্কার মানদণ্ডে এই শিক্ষার পরিমাপ হয়। তাই কোনও প্রকার গবেষণার রসধারায় আমাদের মানসক্ষেত্র উর্বর হয় না। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রভেদ লজ্জাজনক।

মানুষের সকল শিক্ষার মূলে আছে সংযমের সাধনা। আচার্যদেব নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়া এবং মানিয়া চলিতেন। সেইজন্যই তাঁহার চিররুগ্ন দেহ তাঁহার কাজের অন্তরায় হয় নাই। নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাওয়ার আজুহাতে আলস্যভাবে দিনাতিপাত তিনি করেন নাই। আত্মশাসনব্রতে নিজেকে কঠোরভাবে নিয়োগ করিয়া বছরের পর বছর এই শীর্ণদেহখানিকে অপরিবর্তিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কর্মযোগীরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জীবনকে ধরাবাঁধা একটা প্রাত্যহিক ছকের মধ্যে আনিয়া তিনি যে কর্মবহুল জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা অতীব বিস্ময়কর। এক বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "ভারতের মুক্তি হয়তো প্রফুল্লচন্দ্রের জীবদ্দশায় হবে না—এই ক্ষীণকায় মানুষটির জীবন দেশের কাজে নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু অমর হয়ে থাকবে তাঁর ত্যাগের দান।"

অতি তরুণ বয়সেই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে প্রকৃতির সহিত সত্য পরিচয় না থাকিলে জীবনে অশিক্ষার তমসা দূরীভূত হয় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন আমাদের অধিকাংশ পরাভবের মূলে আছে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কর্মশক্তির অকিঞ্চিৎকরতা। তাই তিনি কেবলমাত্র সাহিত্য ও ইতিহাস সাধনায় অনুরক্ত না থাকিয়া বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কর্মশক্তির প্রভাবে দেশের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা দূর করিতে এবং সমস্ত দেশব্যাপী তন্দ্রাচ্ছন্ন যুবশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি ইউরোপের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সমিতিতে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেন। এই সকল প্রবন্ধে আচার্যদেবের মৌলিকত্ব, অসাধারণ

মননশক্তি ও মনীষার ব্যঞ্জনা থাকিত। মারকিউরিয়াস নাইট্রাইট বা পারদ সংক্রান্ত একাদশটি মিশ্রধাতুর আবিষ্কার করিয়া তিনি রাসায়নিক জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। রাসায়নিক জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁহার দান বিশ্ববিশ্রুত। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার তাঁহার তুলনাহীন সৃষ্টি। অগণিত শিক্ষার্থীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই এই গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার এই অভিযানে আচার্যদেব ছিলেন সর্বাধিনায়ক। কিন্তু তিনি প্রায়ই বলিতেন "সর্বত্র জয় অনুসন্ধান করিবে কিন্তু পুত্র এবং শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সুখী হইবে।" এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে সেই আসনে অভিনন্দন জানাই যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন—কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন—যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে। বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করে বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন। কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর গূঢ়স্থিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। আচার্যদেব আধুনিক ভারতীয় রাসায়নাগারের স্রষ্টা। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সায়েন্স কলেজ রসায়নাগারে তিনি মৌনব্রতাবলম্বী, অধ্যবসায়শীল সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক। প্রোফেসার মিলভ্যান লেভীর মনে এই রসায়নাগার এই লীলাময় শিক্ষাঘর যেখান হইতে নবভারতের তরুণ রাসায়নিকেরা রূপ লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। আচার্যদেবের গবেষণা ভারতকে বিশ্বের বিজ্ঞানক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে।

তখন দেশের দারুণ দুর্দিন। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকারে দেশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আচার্যদেব দেখিতে পাইলেন বাংলার এই যুবক সম্প্রদায় অভিমানী, সংগ্রামবিমুখ, পরিশ্রমকাতর এবং পরমুখাপেক্ষী। তাহাদের জীবনের এই অসহায় অবস্থা প্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্রের চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। বাঙালীর প্রধান অবলম্বন চাকুরি। কিন্তু চাকুরি কোথায় ? বাঙালী যুবককে চাকুরির ভিখারী না হইয়া কর্মঠ ও স্বাবলম্বী হইবার আহ্বান তিনি জানাইলেন। সকলপ্রকার বিলাস বর্জন করিয়া সংযম ও অধ্যবসায়ের বলে তাহারা নব নব জ্ঞানের সম্পদ জয় করিয়া লইতে পারিবে। আচার্যদেব তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, প্রেম এবং আত্মবিশ্বাস লইয়া সহস্র জীবনের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইলেন। তাঁহার চিররুগ্ন দেহ এই কাজের গতিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। পথে পিছাইয়া পড়িবার মত ক্লান্তি তাঁহার ছিল না।

অতি সামান্য মূলধন সম্বল করিয়া তিনি এক ঔষধ তৈয়ারির কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাঙালী যুবকগণকে ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী হইবার জন্য নানা ব্যবসায় ও নব নব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পথ করিয়া দিলেন। দারিদ্র্যের পাশবশক্তির বিরুদ্ধে এই নূতন ধরনের যুদ্ধের আহ্বানে বাংলার যুবকেরা আন্তরিকভাবে সাড়া দিল এবং কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল। আচার্যদেবের চেষ্টায় বাংলার শিল্পক্ষেত্রে নূতন করিয়া প্রাণ সঞ্চার হইল। এই শীর্ণকায় মানুষটি কারখানার উন্নতিকল্পে সমস্ত শক্তি ও ইচ্ছা কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। এই কারখানাটি পরে একটি লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করেন। ইহা বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। এই কারখানা হইতে প্রতিদান যাহা পাইয়াছেন তাহা হয় কারখানার শ্রমিকদের জন্য ব্যয়িত হইত নয় অন্য এক তহবিলে জমা হইত, যাহা নিঃশেষে আর্তের সেবায় লাগিয়া যাইত।

বাংলার সমাজজীবন ও রাজনীতিক্ষেত্র হইতেও তিনি দূরে সরিয়া থাকেন নাই। সমাজের অনাচার, অত্যাচার, দুর্বলতা, কাপুরুষতা তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিত। তিনি তাঁহার গভীর

অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে, বুদ্ধি দিয়া, জ্ঞান দিয়া, সহযোগিতা প্রবর্তক হৃদ্যতার মধ্য দিয়া মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন বাংলার সমাজজীবনে এক নূতন চেতনা আনিয়া দিলেন। যুবককাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বাংলার অতীত ও বর্তমান সমাজচেতনাকে তাঁহার রচনার মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। এই সাহিত্য তাঁহার দরদী মনের দীর্ঘ তথ্যপূর্ণ ইতিহাস। তাঁহার স্বদেশপ্রেমের আর একটি নিদর্শন ভারতীয় রাসায়নিক শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করা। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁহার রচিত এই বিস্মৃত অতীতের গৌরবময় সংস্কৃতির কাহিনী দেশের ভবিষ্যৎ চিত্তকে সঞ্জীবনীর রসধারায় অভিষিক্ত করিবে। পরাধীনতার জ্বালা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। স্বরাজের স্বপ্ন তিনি দেখিতেন—স্বরাজ পাইবার জন্য তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন। বাংলার যুবশক্তি দেশকে মুক্ত করিবার জন্য যে বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল তাহাতে আচার্য রায়ের সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা কম নহে। আচার্য রায়ের আবসম্থল সায়াল কলেজ হইতে গোপনে শৈলেন ঘোষের আমেরিকা যাত্রা ইহার একটি দৃষ্টান্ত।

উপনিষদে কথিত আছে যিনি এক তিনি বলেন, "আমি বহু হইব।" সৃষ্টির মূলেই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও নিজের চিত্তকে বহুমানবের দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। দেখিয়াছি বিজ্ঞানের মায়া কাটাইয়া তিনি রাজপথে বাহির হইয়াছেন ভিক্ষার ঝুলি লইয়া। দুর্যোগে, সঙ্কটে, ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে আর্তের পরিত্রাণের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে টানিয়া লইয়াছিলেন এই জনসেবার কাজে। ধনীরা দিয়াছে প্রচুর অর্থ। সহস্র সহস্র গৃহ হইতে আসিয়াছে মুষ্টিভিক্ষা ও রাশি রাশি বস্ত্র। দলে দলে যুবকেরা স্বেচ্ছাসেবকরূপে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে খুলনা, দামোদর, উত্তরবঙ্গ ও বিহারে অন্নবস্ত্র ও ঔষধ বিতরণের জন্য। আচার্যদেবের আগমন দুর্গতদের দিয়াছে শান্তির প্রলেপন, দিয়াছে এ সুন্দর ভুবনে বাঁচিয়া থাকিবার আশা।

স্বার্থ বলিতে তাঁহার অবচেতন মনেও কিছু ছিল না। দেশের দরিদ্রনারায়ণের পরিত্রাণের জন্য তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া লইয়া এই সর্বত্যাগী বৃদ্ধ, কর্মবীর মহাপুরুষ জীবনসন্ধ্যায় কালের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করিয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরিয়া দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন দেশসেবায় জনহিতকর কার্যে নিজেদের উৎসর্গীকৃত করিতে। দরিদ্র, সূচতা, অস্পৃশ্যতা ও পরাধীনতার অভিশাপে অসাড় হইয়াছিল দেশের লক্ষ লক্ষ মন। তিনি সেই অসাড় মনকে জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহার অভিনব চিন্তাশক্তির ধারায়। তাঁহার অতিপ্রাণশক্তির প্রাচুর্যে দেশের পঙ্গু কর্মক্ষেত্রগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

মর্তের বন্ধনমুক্ত আচার্যদেবের জীবনগীতা হইতে বাংলার যুবকেরা যুগে যুগে উদ্যমশীল জীবনের আদর্শ গ্রহণ করিয়া অনুপ্রাণিত হইতে পারিবে এবং বাংলার শিল্পক্ষেত্রগুলি নিত্য নবতর প্রেরণা লাভ করিতে পারিবে। আচার্যদেবের ত্যাগের অনির্বাণ দীপ্তিতে আমাদের এই মাটির মা এই বাংলাদেশ ভাস্বর হইয়া আছে।*

ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট
অফ টেকনলজি, খড়্গপুর

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

---

*'লোকসেবক' হইতে মুদ্রিত

বিনীত নিবেদন

একজন মানুষ নিজের জীবন-কথা লিখেছেন। তিনি আর কেউ নন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর সেই 'আত্মচরিত' বিষয়ে ভূমিকা সংযোজন করার কল্পনাও স্পর্ধার সামিল। অল্প দু'চার কথায় মানুষটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করব ভেবে কলম ধরেছি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রফুল্লচন্দ্রের ৭০ তম জন্মজয়ন্তীতে বলেছিলেন—"আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবল মাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকেও দিয়েছেন, ...।

১৮৬১ সাল। একই বছরে দু'জনের দেখা পেলাম আমরা। রবীন্দ্রনাথ আর প্রফুল্লচন্দ্র। ফলে পঞ্চাশ, একশো, একশো পঁচিশ বছরে রবীন্দ্রনাথ যেই দীপ্তি ও বিস্তৃতি নিয়ে আলোচিত হয়েছেন, প্রফুল্লচন্দ্রের বেলায় সেরকমটা হয়ে ওঠেনি।

দ্বিধাহীন ভাবে আমি মনে করি, প্রফুল্লচন্দ্রের প্রকৃত পরিচিতি এখনও আমাদের বৌদ্ধিক মানসে গড়ে ওঠেনি।

কোন্ প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের কাছে পরিচিত ? রসায়ন বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র। সমাজসেবী প্রফুল্লচন্দ্র। শিল্পোদ্যোগী প্রফুল্লচন্দ্র। এই পরিচয় মোটেই উপেক্ষা করবার নয়। বিজ্ঞান ঐতিহাসিক প্রফুল্লচন্দ্র এখনও আমাদের অনেকে'র কাছেই পুরোপুরি অজ্ঞাত। এক একটা প্রাচীন বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ সভ্যতার পতন কেন হয়েছে—স্পষ্ট ভাষায় পৃথিবীতে প্রথম ব্যক্ত করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র। খোলাখুলি বলেছেন, 'বিজ্ঞানের অধঃপতন বিজ্ঞানের নিজস্ব সূত্রে নিহিত থাকে না, থাকে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক সূত্রে'।

বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায় ভেদভুক্ত সমাজে উজ্জ্বল এক প্রতিবাদ ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। ধর্মান্ধতা কুসংস্কার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে আজীবন নিজের স্বচ্ছ অভিমত রেখেছেন। গভীরমনস্ক পাঠকের কাছে তাঁর 'আত্ম-চরিত' থেকেই দু'চার লাইন তুলে ধরছি।

'আমার পিতা এক শতাব্দীরও পূর্বে ১৮২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মৌলবীর নিকট পারসী ভাষা শিখিয়াছিলেন। তখনকার দিনে 'পারসী'ই আদালতের ভাষা ছিল। পিতা পারসী বেশ ভাল জানিতেন, সঙ্গে সঙ্গে একটু আরবীও শিখিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় বলিতেন যে যদিও তিনি সনাতন হিন্দু বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তবু কবি হাফিজের 'দেওয়ানা' তাঁহার মনের গতিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। তিনি গোপনে মৌলবী-দত্ত সুস্বাদু মুরগীর মাংস পর্যন্ত খাইতেন।'

.....'তখন নতুন জলের কল কেবল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং শহরবাসীরা পরিষ্কৃত জল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গোঁড়া হিন্দুরা অপবিত্রবোধে ওই জল ব্যবহার করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছে।'

'হিন্দু মহাসভা'র অষ্টম সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। বন্ধু আশুতোষের সন্তান 'শ্যামাপ্রসাদ' তাঁরও স্নেহের পাত্র। শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত করতে সেদিন পিছ-পা হননি প্রফুল্লচন্দ্র। পুরো লিখিত

বক্তৃতাটি পড়লে অকল্পনীয় বলেই মনে হয় আমাদের। এমন বক্তৃতা দিতে পারলেন তিনি 'হিন্দু মহাসভা'র সমাবেশে। রাজনীতির স্বার্থান্বেষীরা কেমন করে দুই সম্প্রদায়ের বিভেদ বাঁচিয়ে রেখেছে, বললেন তিনি। 'শুধু হিন্দু সংস্কৃতি' কিম্বা 'শুধু মুসলমান সংস্কৃতি' বলে তাঁর মতে কিছু হয় না। অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন তিনি, এক অঞ্চলে যা হিন্দুরীতি, অন্য অঞ্চলে তাই-ই মুসলমান রীতি।

১৯২৩ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আমন্ত্রিত প্রফুল্লচন্দ্র। বলছেন তিনি সেখানে, '.....আমি বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও কলাবিভাগে মুসলিমদের অবদান বিষয়ে কম-বেশি জানি। মধ্যযুগের অন্ধকার দূর করতে এই অবদানের কোন তুলনা হয় না। .....যদিও আমি মুসলমান নই। আমার এশীয় হৃদয় গর্বে ভরে ওঠে যখন দেখি ইসলাম কী প্রচুর-পরিমাণে জ্ঞান ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে।'

আত্মচরিত শুধু তাঁর আত্মকথা বা আত্মজীবনী নয়, গ্রন্থখানি আচার্যের সময়কার ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের একখানি মূল্যবান আকরগ্রন্থ।

বাঙ্গালী কি আত্মবিস্মৃত জাতি ? হয়তো সত্যি। হয়তো সত্যি নয়। শৈব্যা প্রকাশনের কর্ণধার ডঃ রবীন বলের 'আত্মচরিত' মুদ্রণের সিদ্ধান্ত আমাদেরকে আত্ম-'অবমাননায়' প্ররোচিত করতে ইচ্ছে করে না। আমার মতো অনেক রসায়নজীবীর কাছে তিনি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবেন। তাঁর কাছেই আমরা জেনেছি, শ্রীকমল দে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আত্মচরিত গ্রন্থখানি দিয়ে পুনর্মুদ্রণে সহায়তা করেছেন। প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়েছেন প্রয়াত গুরুপ্রসাদ রায়চৌধুরী এবং সঙ্গত সহযোগিতা করেছেন আর. কে. বি.কে., আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনী'র সম্পাদক শ্রীবিভাবসু ঘোষ। এঁরা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

শ্যামল চক্রবর্তী
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

আত্মকথা

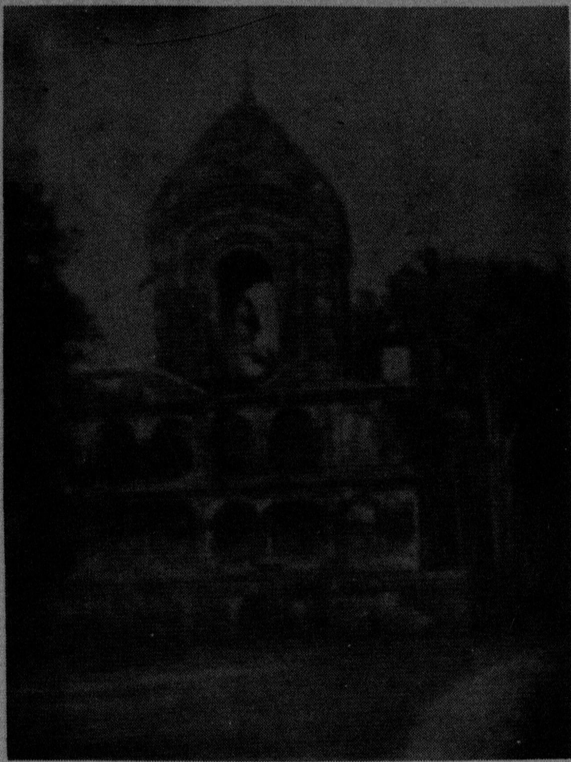
দ্বিতীয় খণ্ড

শিক্ষা, শিল্পবাণিজ্য, অর্থনীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় কথা

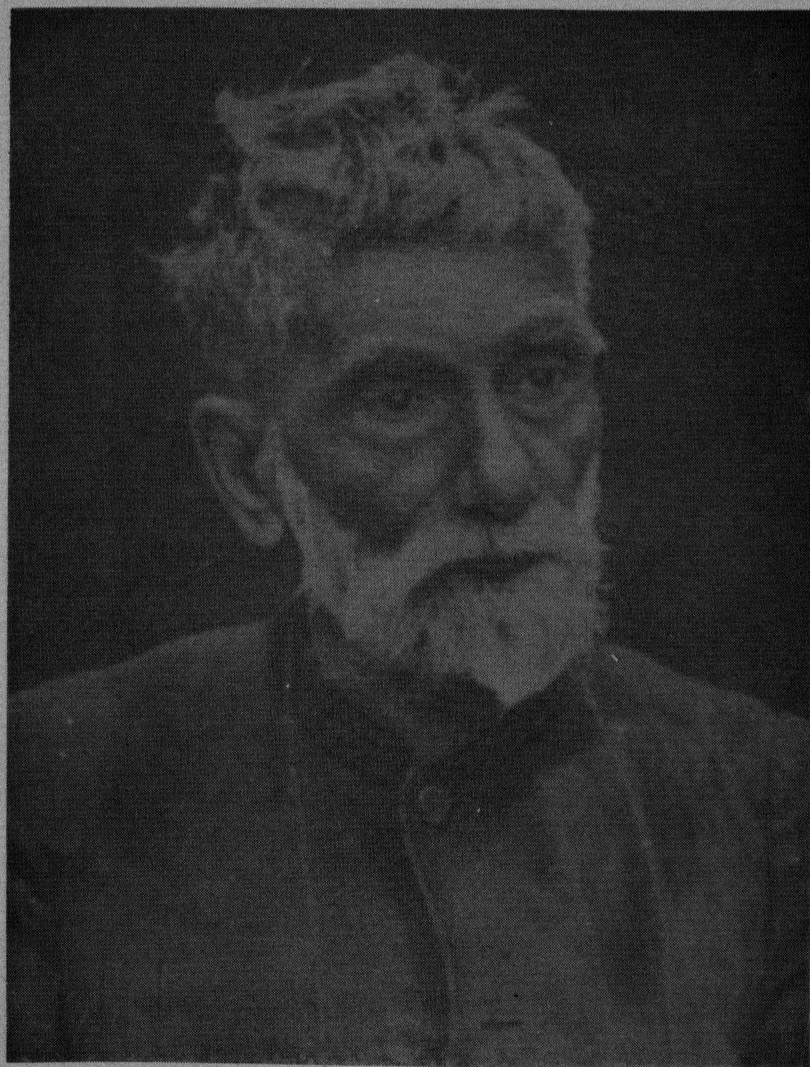
আত্মচরিত

প্রথম খণ্ড

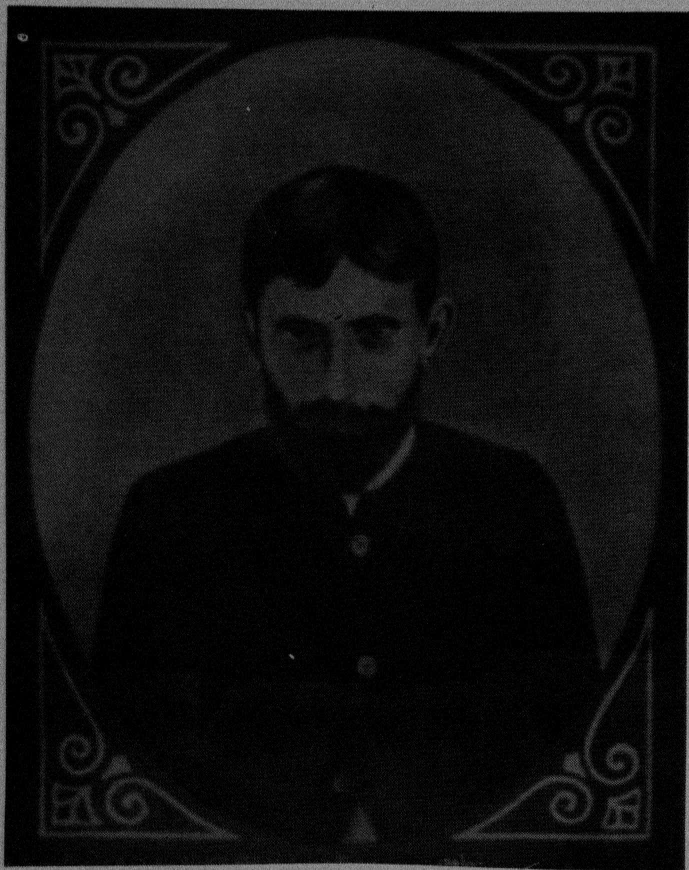
আত্মকথা



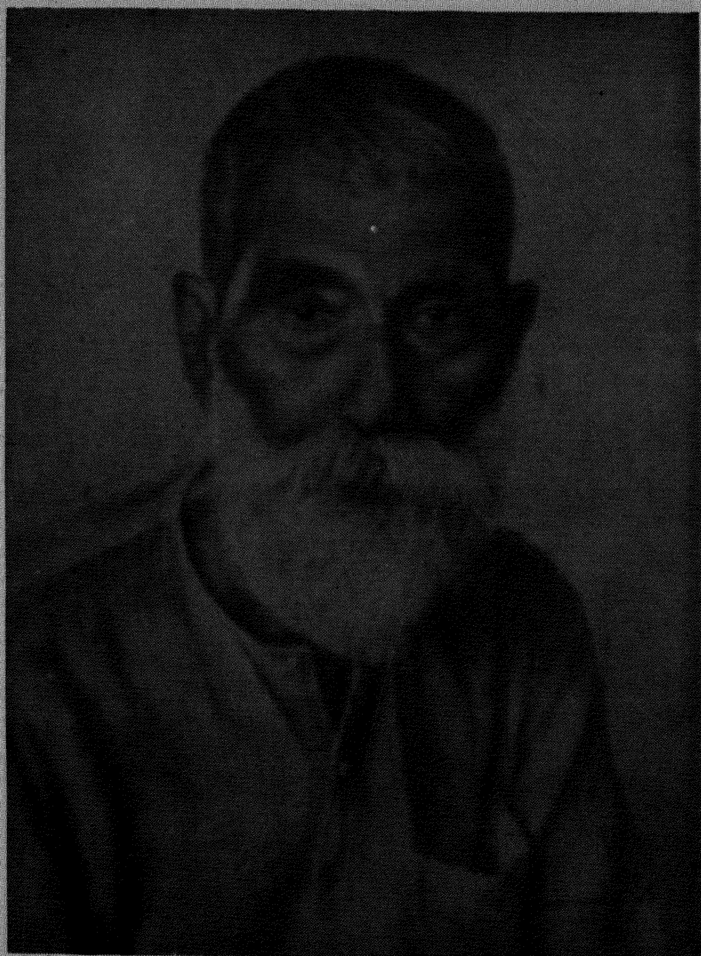
রাড়ুলীর মন্দির



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র



যৌবনে প্রফুল্লচন্দ্র



বৃদ্ধবয়সে প্রফুল্লচন্দ্র



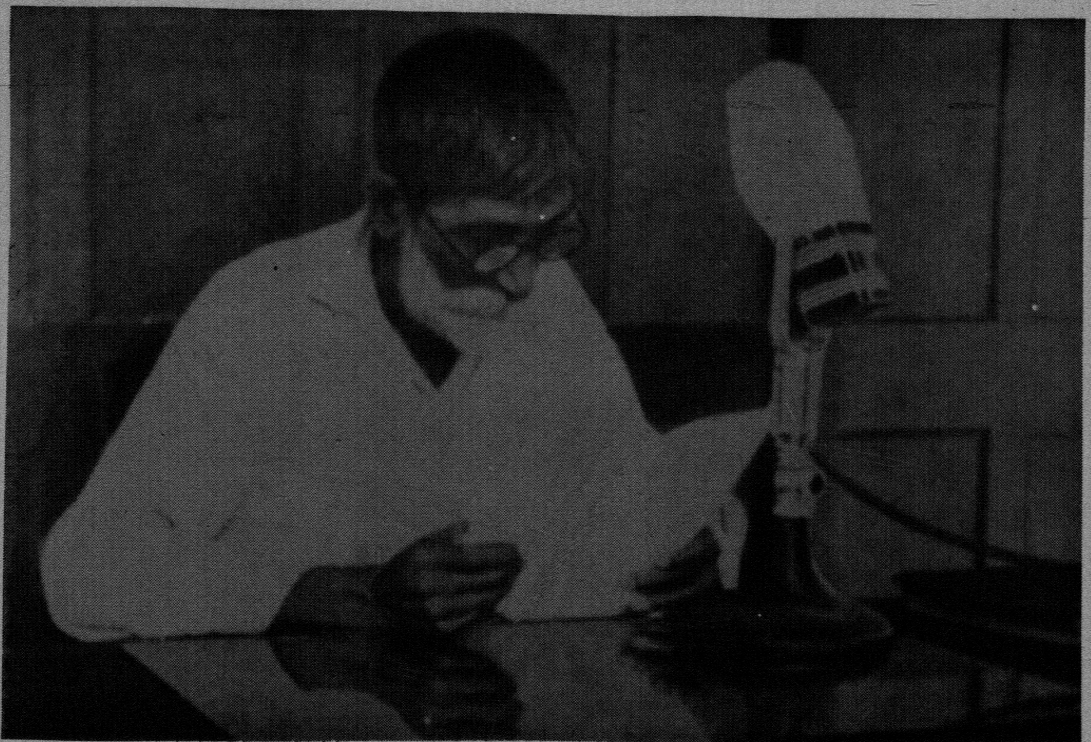
পৈত্রিক বাটীর ভিতরের চত্বর



ভদ্রাসন বাটীর বাহিরের চত্বর



বহির্বাটীর চত্বর ও চণ্ডীমণ্ডপ



অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

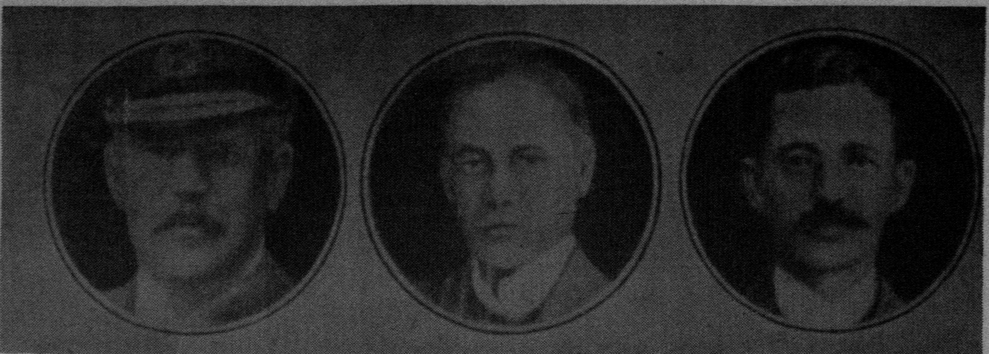


ঢাকার কনভোকেশন, ১৯৩৬ স্যার যদুনাথ সরকার, ডাক্তার শরৎচন্দ্র, চ্যান্সেলার, আচার্য রায় ও মিঃ রহমান

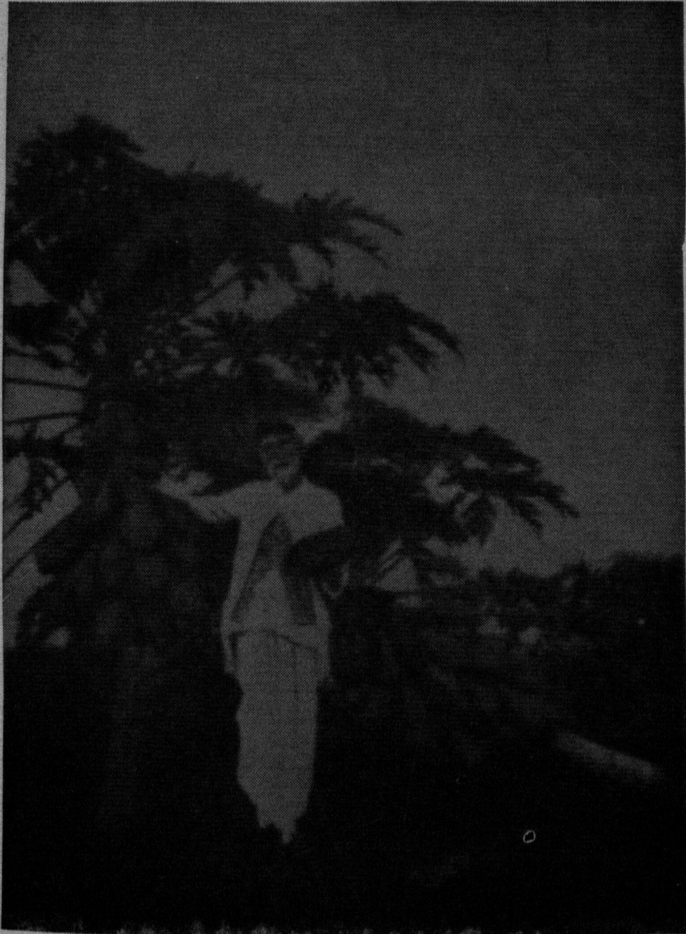


প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—মীরাট

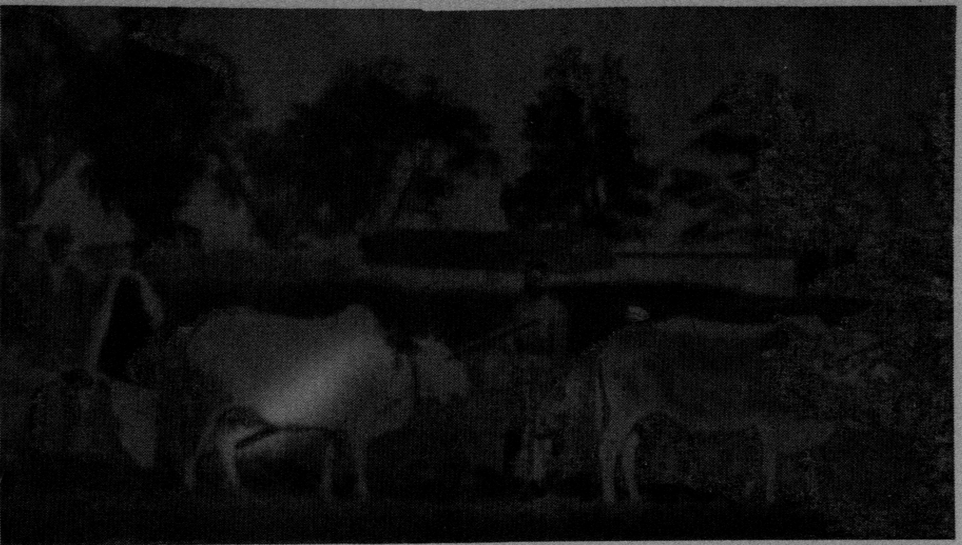




পৃথিবীর ছয়জন মানব হিতৈষীর মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রও একজন



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালোরের কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন একটি
সাড়ে সাত পাউন্ড ওজনের পেঁপে ধরিয়া আছেন



ফরিদপুর কৃষিশালায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র হলচালনা করিতেছেন

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম—পৈতৃক বাসস্থান—বংশ-পরিচয়—বাল্যজীবন

১৮৬১ সালের ২রা অগস্ট আমি জন্মগ্রহণ করি। এই বৎসরটি রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে স্মরণীয়, কেননা ঐ বৎসরেই ক্রুক্‌স 'থ্যালিয়ম' আবিষ্কার করেন। আমার জন্মস্থান যশোহর জেলার রাড়ুলি গ্রাম (বর্তমান খুলনা জেলায়)। এই গ্রামটি কপোতাক্ষী নদীতীরে অবস্থিত। কপোতাক্ষী ৪০ মাইল আঁকাবাঁকা ভাবে ঘুরিয়া কবিবর মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ীতে পৌঁছিয়াছে। এই নদীরই আরও উজানে বিখ্যাত সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষের জন্মস্থান পলুয়া মাগুরা গ্রাম—পরে যাহা 'অমৃতবাজার' নামে পরিচিত হইয়াছে। রাড়ুলির উত্তরদিকে সংলগ্ন কাটিপাড়া গ্রাম, এই গ্রামেরই অধিবাসী ও জমিদার ঘোষবংশের কন্যা কবি মধুসূদন দত্তের মাতা।(১) এই দুই গ্রাম অনেক সময়ে একসঙ্গে রাড়ুলি-কাটিপাড়া নামে অভিহিত হয়।

আমার পিতা এক শতাব্দীরও পূর্বে ১৮২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মৌলবীর নিকট পারসী ভাষা শিখিয়াছিলেন। তখনকার দিনে 'পারসী'ই আদালতের ভাষা ছিল। পিতা পারসী ভাষা বেশ ভাল জানিতেন, সঙ্গে সঙ্গে একটু আরবীও শিখিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় বলিতেন যে, যদিও তিনি সনাতন হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তবু কবি হাফিজের 'দেওয়ানা' তাঁহার মনের গতিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। তিনি গোপনে মৌলবী-দত্ত সুস্বাদু মুরগীর মাংস পর্যন্ত খাইতেন। বলা বাহুল্য, যদি পরিবারের কেহ এই ব্যাপার জানিতে পারিতেন, তবে তাঁহারা পিতৃদেবের আচরণে স্তম্ভিত ও মর্মাহত হইতেন সন্দেহ নাই। বাড়ীতে লেখাপড়া শেষ করিয়া আমার পিতা ১৮৪৬ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। ঐ কলেজে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষার জন্য পড়িবার সময়, প্রসিদ্ধ শিক্ষক দেবচরিত্র রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্র হইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। ঐ সময়ে ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আমার পিতা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার ছাত্র না হইলেও, তাঁহার ভাব ও চরিত্রের প্রভাবে কিয়ৎ পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বাংলায় শিক্ষা প্রচারের অগ্রদূত এই ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন কৃত "ব্রিটিশ কবিগণের জীবনী" (Lives of British Poets) শীর্ষক গ্রন্থখানি

---

(১) মধুসূদনের মাতা জাহ্নবী দাসী কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা।

এখনও আমার নিকট আছে। এই গ্রন্থ বহুবার আমি পড়িয়াছি এবং এখানিকে আমি অমূল্য পৈতৃক সম্পদরূপে গণ্য করি।

আমার পিতা যদি পারিবারিক কারণে হঠাৎ বাড়ী চলিয়া আসিতে বাধ্য না হইতেন, তাহা হইলে তিনি যথাসময়ে কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিতে পারিতেন।(২) আমার পিতা শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়া কলেজ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কেননা, আমার ঠাকুরদাদার তিনি একমাত্র পুত্র ছিলেন (আমার পিতৃব্যের সকলেই অকালে পরলোকগমন করেন)। ঠাকুরদাদা যশোহর আদালতে সেরেস্তাদারের কাজ করিতেন (তখনকার দিনে এই সেরেস্তাদারের কাজে বেশ অর্থাগম হইত); সুতরাং বাড়ীতে পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশুনা করিবার কেহ রহিল না। আর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, মধুসূদন দত্ত এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলে তৎকালীন হিন্দুসমাজে এক আতঙ্কের সাড়া পড়িয়া যায়। ঠাকুরদাদার ভয় হইল যে, হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা যে সব বিজাতীয় ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত, সেই সব গ্রহণ করিয়া আমার পিতাও হয়ত পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিবেন।

এইখানে আমি আমাদের বংশের ইতিহাস এবং পারিপার্শ্বিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু পরিচয় দিব। 'বোধখানার' রায়চৌধুরী বংশ চিরদিনই ঐশ্বর্যশালী, উৎসাহী এবং কর্মকুশল বলিয়া পরিচিত। এই বংশের অনেকে নবাব সরকারে উচ্চপদ লাভ করেন এবং যশোহরের নূতন আবাদী অঞ্চলে অনেক ভূসম্পত্তি ও জায়গির পান।(৩)

১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে মুসলমান পীরগণ প্রথম ধর্মপ্রচারকসুলভ উৎসাহ লইয়া এই যশোহর অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের পতাকা বহন করিয়াছিলেন এবং তথায় লোক-বসতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের ইতস্ততঃ বহু গ্রামের নামই তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, যথা—ইসলামকাটি, মামুদকাটি,(৪) হোসেনপুর, হাসানাবাদ (হোসেন-আবাদ) ইত্যাদি। ইসলামের এই অগ্রদূতগণের মধ্যে খাঞ্জা আলির নাম সর্বপ্রধান। ইনিই প্রায় ১৪৫০ খৃঃ—বাগেরহাটের নিকটে বিখ্যাত "ষাট গম্বুজ" নির্মাণ করেন। রাড়ুলির প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে আর একটি মসজিদও এই মুসলমান-পীরের নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে আবাদ করিবার সময়, কতকগুলি লোক জঙ্গল পরিষ্কার করিতে করিতে কপোতাক্ষী নদীতীরে, চাঁদখালির প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে, একটি

---

(২) তখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই।

(৩) যে সব পাঠক এ সম্বন্ধে আরও বেশী জানিতে চাহেন, তাঁহারা সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' পড়িতে পারেন।

(৪) কাটি (কাষ্ঠখণ্ড)—সুন্দরবনে জঙ্গল কাটিয়া যে সব স্থানে বসতি হইয়াছে, সেখানকার অনেক গ্রামের নামের শেষেই এই শব্দ আছে।

ওয়েস্টল্যান্ডের 'Report on the District of Jessore' ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। হাণ্টার যথার্থই বলিয়াছেন,—বাঙালী জমিদার এই কথা বলিয়া গর্ব করিতে ভালবাসেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষ উত্তর অঞ্চল হইতে আসিয়া জঙ্গল কাটিয়া গ্রামে বসতি করেন। যে পুকুর কাটাইয়া, জমি চাষ করিয়া বসতি করে সেই এখনও গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য।

প্রাচীন মসজিদ মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত দেখে; সেইজন্য তাহারা গ্রামের নাম রাখে "মসজিদকুঁড়"। এই মসজিদটি দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহা "ষাট গম্বুজ"এর নির্মাতারই কীর্তি।

আমার কোন পূর্বপুরুষ জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে বা তাহার কিছু পরে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামে তাঁহার জায়গির ছিল। আমার প্রপিতামহ মানিকলাল রায় নদীয়া ও যশোহরের কালেক্টরের দেওয়ানের উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম আমলে দেওয়ান, নাজির, সেরেস্তাদার-গণই ব্রিটিশ কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট ও জজদের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন।

বাংলার নবাবদের আমলে এবং ওয়ারেন হেস্টিংস এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল পর্যন্ত রাজকার্যে উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা জঘন্য অনাচার যেভাবে চলিয়াছিল, তাহার ফলেই বোধ হয় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র প্রবর্তক লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতবাসীদিগকে সমস্ত সরকারী উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। এই পন্থা অবলম্বন করিবার স্বপক্ষে বাহ্যতঃ সঙ্গত কারণও যে তাঁহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ (পরে রাজা নবকৃষ্ণ) রবার্ট ক্লাইভের মুন্সী ছিলেন এবং মাসিক ষাট টাকা মাত্র বেতন পাইতেন। কিন্তু তিনি নিজের মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তখনকার দিনের নয় লক্ষ টাকা এখনকার অর্ধকোটি টাকার সমান। ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান, পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিং প্রভূত বিত্ত সঞ্চয় করেন এবং প্রাচীন জমিদারদের উৎখাত করিয়া বড় বড় জমিদারি দখল করেন। কান্ত মুদী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহার কাসিমবাজারের ক্ষুদ্র দোকানে ওয়ারেন হেস্টিংসকে আশ্রয় দেন। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলার শাসক হন, তখন তাঁহার আশ্রয়দাতাকে ভুলেন নাই। হেস্টিংস তাঁহার পুরাতন উপকারী বন্ধুকে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং অনেক জমিদারি তাঁহাকে পুরস্কার দেন। এই সমস্ত জমিদারি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অসম্ভব দাবি মিটাইতে না পারিয়া হতভাগ্য পুরাতন মালিকদের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। এখানে গঙ্গাগোবিন্দ সিং এবং নসীপুরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেবী সিংহের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। বার্কের Impeachment of Warren Hastings গ্রন্থের পাঠকদের নিকট তাহা সুপরিচিত।

কর্নওয়ালিসের আমল অন্য অনেক বিষয়ে ভাল হইলেও, উচ্চপদ হইতে ভারত-বাসীদিগকে বহিষ্কার তাহার একটি কলঙ্ক। পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমি কর্নওয়ালিসের 'এই নীতির সাফাই গাহিতেছি।(৫) আমার উদ্দেশ্য মোটেই তাহা নয়। বস্তুতঃ রোগ অপেক্ষা ঔষধই

---

(৫) এ বিষয়ে মার্শম্যান ও স্যার হেনরী স্ট্র্যাচীর উক্তি উল্লেখযোগ্য :

"লর্ড কর্নওয়ালিসের আমল হইতে আমাদের শাসনে এক দুরপনেয় কলঙ্কের মসী লিপ্ত হইয়া আছে; আমাদের সাম্রাজ্যের যত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, দেশের মধ্যে যাহারা প্রভাব প্রতিপত্তি-শালী তাহাদের আশা ভরসায় ততই ছাই পড়িতেছে; আমাদের শাসন ব্যবস্থায় তাহাদের

মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। ব্রিটিশ সিভিলিয়ান কর্মচারীরা এদেশের লোকের ভাষা, আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রথা কিছুই জানিতেন না। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের অধীন অসাধু ভারতীয় কর্মচারীদের হাতের পুতুল হইয়া দাঁড়াইলেন। আর ঐ সমস্ত ভারতীয় কর্মচারীরা যদি এরূপ লোভনীয় অবস্থায় সুযোগ না লইতেন, তাহা হইলেই বরং অস্বাভাবিক হইত। অজন্মার জন্য কোন জমিদার খাজনা দিতে পারিল না, তাহার জমিদারি "সূর্যাস্ত আইনে" এক হাতুড়ির ঘায়েই নিলাম হইয়া যাইবে এবং এক মুহূর্তেই সে কপর্দকশূন্য পথের ভিখারী হইবে। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সে কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিল, তিনি তাহাকে ইচ্ছা করিলে রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু এই কালেক্টর আবার প্রায়ই দেওয়ান বা সেরেস্তাদারের পরামর্শেই চালিত হইতেন। সুতরাং সেরেস্তাদার বা দেওয়ানকে যে পরিমাণ উৎকোচ দ্বারা প্রসন্ন করা হইত, সেই পরিমাণেই তিনি জমিদারদের পক্ষ সমর্থন করিতেন। ফৌজদারী মোকদ্দমাতেও পেস্কারের পরামর্শ বা ইঙ্গিতেই জজসাহেব অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হইতেন। তখন জুরী প্রথা ছিল না, সুতরাং এই সব অধস্তন কর্মচারীদের হাতে কতদূর ক্ষমতা ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। অসহায় জজেরা পেস্কারদের হাতের পুতুল হইতেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

এক শতাব্দী পূর্বে আমার প্রপিতামহ মানিকলাল রায় কৃষ্ণনগরের কালেক্টরের এবং পরে যশোহরের কালেক্টরের দেওয়ান(৬) ছিলেন। এই পদে তিনি যে প্রভূত ধন

উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনও স্থান নাই। আপন দেশে তাহারা দুর্গতির হীনতম স্তরে অবস্থান করিতেছে।"

"একটা সমগ্র জাতির এরূপ অপাংক্তেয় অবস্থার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখা যায় না। যে গল জাতি সীজারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল তাহাদেরই বংশধরগণ রোমের রাষ্ট্রসভায় সদস্যপদ লাভ করিয়াছিল। যে রাজপুত বীরগণ বাবরের মোগলশক্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায় করিয়াছিল তাহাদেরই পুত্রপৌত্রাদি আকবরের আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সেনাপতির পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন এবং প্রভুর হিতে বঙ্গোপসাগর ও অক্সাস নদীর তীরে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। এমন কি, মুসলমান সুবাদারগণের ষড়যন্ত্রে যখন আকবর বিপন্ন, তখন এই রাজপুতগণই অবিচলিত নিষ্ঠা ও রাজভক্তি সহকারে তাঁহার সিংহাসন নিরাপদ রাখিয়াছিল, কিন্তু ভারতের যে অংশেই আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানেই দেশবাসীদের পক্ষে উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতা, যশ, অর্থ, সম্মান বা যে কোন প্রকার উন্নতির পথ চিররুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহারই পাশাপাশি দেশীয় নৃপতিগণের সভায় ছিল যোগ্যতা ও গুণের প্রচুর সমাদর—সুতরাং তুলনায় এই বৈষম্য বড়ই বিসদৃশ লাগিত।"—মার্শম্যানের ভারতেতিহাস।

"কিন্তু ইউরোপীয়ান কর্মচারীদিগকে আমরা প্রলোভনের বহু ঊর্ধ্বে রাখিয়াছি। যে সকল দেশীয় কর্মচারীর পূর্বপুরুষগণ, উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পদে থাকিয়া দশজনের উপর কর্তৃত্ব করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিশ ত্রিশ টাকা বেতনে সামান্য কেরানীর কাজে নিযুক্ত করিয়াছি। ইহার পর আমরা বলিয়া বেড়াই যে, ভারতীয়েরা অসাধু ও ঘুষখোর এবং একমাত্র ইউরোপীয় কর্মচারিগণই তাহাদের প্রভু হইবার যোগ্য।"—স্যার হেনরী স্ট্যাচী।

(৬) 'দেওয়ান' শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর নিমক চৌকীর দেওয়ান ছিলেন। মিঃ ডিগ্‌বী রাজা রামমোহন রায়ের "কেন উপনিষৎ ও বেদান্তসারের" ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"তিনি (রামমোহন) পরে যে জেলায় রাজস্ব সংগ্রহের দেওয়ান বা প্রধান দেশীয় কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই জেলায় আমি পাঁচ বৎসর (১৮০৯-১৪) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসের কালেক্টর ছিলাম।"—মিস্ কোলেট কৃত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী ও পত্রাবলী, ১৯০০ খৃঃ, ১০-১১ পৃঃ।

"সেকালে সেট্‌লমেন্টের কাজে বিশ্বস্ত দেশীয় সেরেস্তাদারদিগকেই সাধারণতঃ কালেক্টরেরা

সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বাল্যকালে তাঁহার সঞ্চিত ধনের অদ্ভুত গল্প শুনিতাম। তিনি মাঝে মাঝে মাটির হাঁড়ি ভরিয়া কোম্পানির সিক্কা টাকা বাড়ীতে পাঠাইতেন। বিশ্বস্ত বাহকেরা বাঁশের দুইধারে ভার ঝুলাইয়া অর্থাৎ বাঁকে করিয়া এই সমস্ত টাকা লইয়া যাইত। সেকালে নদীয়া-যশোহর গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডে ডাকাতের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। সুতরাং ডাকাতদের সন্দেহ দূর করিবার জন্য মাটির হাড়ির নিচে টাকা ভর্তি করিয়া উপরে বাতাসা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইত।

আমার পিতামহ আনন্দলাল রায় যশোহরের সেরেস্তাদার ছিলেন এবং প্রচুর ধন উপার্জন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি যশোহরেই অকস্মাৎ সন্ন্যাস-রোগে মারা যান। আমার পিতা সংবাদ পাইয়া রাড়ুলি গ্রাম হইতে তাড়াতাড়ি যশোহরে যান, কিন্তু তিনি পৌঁছিবার পূর্বেই পিতামহের মৃত্যু হয়, সুতরাং পিতাকে কোন কথাই বলিয়া যাইতে পারেন নাই।

আমার প্রপিতামহ বিপুল ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি যে ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন, তাহা তাঁহার ঐশ্বর্যের কিয়দংশ মাত্র। তাঁহার অবশিষ্ট ঐশ্বর্য কিরূপে হস্তচ্যুত হইল সে সম্বন্ধে নানা কাহিনী আছে। আমি যখন শিশু, তখন আমাদের পরিবারের বৃদ্ধা আত্মীয়াদের নিকট গল্প শুনিয়াছি যে, আমার প্রপিতামহ একদিন পাশা খেলিতেছিলেন, এমন সময় তিনি একখানি পত্র পাইলেন; তিনি ক্ষণকালের জন্য পাশা খেলা হইতে বিরত হইলেন, পত্রখানি আগাগোড়া পড়িলেন, তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখভাবের কোন পরিবর্তন হইল না, পূর্ববৎ পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হইলেন। বোধ হয়, যে ব্যাঙ্কে তিনি টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, সেই ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছিল।(৭) কিন্তু প্রপিতামহ চতুর লোক ছিলেন। সুতরাং, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার সমস্ত ধন একস্থানে গচ্ছিত রাখেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি প্রাচীন প্রথামত তাঁহার অর্থ মাটির নিচে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন, অথবা ঘরের মেজেতে বা দেয়ালে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আমার বাল্যকালে ঘরের দেয়ালে এইরূপ একটি শূন্য গুহা আমি দেখিয়াছি।(৮) আমাদের বংশে প্রবাদ আছে যে, আমার পিতামহ প্রপিতামহের

প্রধান এজেন্ট নিযুক্ত করিতেন এবং কালেক্টরেরা এই সব সেরেস্তাদারদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত দ্বারা বহুল পরিমাণে চালিত হইতেন।" শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস, ১২ পৃঃ।

'মডার্ন রিভিউ', ১৯১০, মে, ৫৭২ পৃঃ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৭) এই ব্যাঙ্কের নাম পামার এণ্ড কোং, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। ১৮২৯ সালে ঐ ব্যাঙ্ক ফেল পড়াতে বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় সর্বস্বান্ত হন।

(৮) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ইংলণ্ডেও টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখা কষ্টকর ছিল, সুতরাং লোকে সাধারণতঃ অর্থ মাটির নিচে বা ঘরের মেজেতে লুকাইয়া রাখিত। কথিত আছে যে, কবি পোপের পিতা তাঁহার প্রায় একশত বিশহাজার পাউণ্ড নিজের বাড়ীতে এই ভাবে লুকাইয়া রাখেন।.........তৃতীয় উইলিয়মের শাসনের প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই স্বর্ণ ও রৌপ্য গোপনীয় সিন্দুকে প্রভৃতিতে লুকাইয়া রাখিত।—মেকলে, ইংলণ্ডের ইতিহাস।

বাংলা, বিহার এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের যে সব অংশে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করে নাই, সেখানকার লোকেরা এখনও অর্থ ঐভাবে লুক্কায়িত রাখে।

সুসভ্য ফ্রান্সে কৃষকেরা এখনও উলের মোজাতে করিয়া ঘরের মেঝেতে অথবা মাটির নিচে

যাইতেও লাগিল। সুতরাং নৌকার ব্যবসা প্রায় বন্ধ হইল, বহুসংখ্যক মাঝি বেকার হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মালবাহী কুলি, দড়িওয়ালা, হোটেল ও রেস্তোরাঁর মালিক প্রভৃতিরও কাজ গেল। অবস্থা অতি শোচনীয় ; চীনের সহস্র সহস্র লোকের দৈনিক জীবিকার উপায় হরণ করিয়া মুষ্টিমেয় আমেরিকাদেশীয় জাহাজওয়ালা লাভবান্ হয় এবং এইরূপে তাহারা বহু শতাব্দী হইতে প্রচলিত বৃত্তি ও ব্যবসায়-গুলিকে ধ্বংস করে।" —*China : A Nation in Evolution—Monroe.*

ভারতেও ধনতান্ত্রিকতা—বিশেষতঃ ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিকতা—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, ভারতীয় প্রাচীন কুটীর-শিল্পগুলি ধ্বংস করিয়াছে, কিন্তু তৎপরিবর্তে কর্ম-চ্যুত নিরন্ন লোকদের কোন নূতন জীবিকার পথ প্রদর্শন করে নাই।" একটি সহজ দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বুঝা যাইবে।

এতাবৎকাল বাংলার গ্রামের বহু অনাথা বিধবা ধান ভানিয়া কোন মতে জীবিকা অর্জন করিত, নিজেদের শিশুসন্তানগুলির ভরণপোষণ করিত। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার কৃপায় বাংলার নানা স্থানে অসংখ্য চাউলের কল দ্রুত গতিতে চলিতেছে। এক একটি চাউলের কল শত শত অনাথা বিধবার অন্ন কাড়িয়া লইতেছে। এইরূপে জনকয়েক ধনিক সহস্র সহস্র দরিদ্র ভগিনীর জীবিকা হরণ করিয়া নিজেরা ফাঁপিয়া উঠিতেছে। এই কারণেই ভারতের জনসাধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধী সকল সময়েই কলের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন।

"কলের প্রতি—ধনতন্ত্রের প্রতি গান্ধীর প্রবল ঘৃণা আছে। ধনতন্ত্রের ফলে যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় কৃষক ও শিল্পীর জীবিকার উপায় নষ্ট হইয়াছে, গান্ধীর ঘৃণা তাহারই প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

* * *

"গান্ধী সর্বত্র কলের অপব্যবহারই দেখিতে পান, বর্তমান যুগের কলকারখানা জনকয়েক ধনিকের স্বার্থের জন্য সহস্র সহস্র লোককে কিরূপে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে, তাহাই তাঁহার চোখে পড়ে। ধনিকের এই শোষণনীতির ফলেই গান্ধীর মনে কলকারখানার প্রতি ঘৃণার ভাব জন্মিয়াছে। কলের অপব্যবহারের বিরুদ্ধেই গান্ধীর অভিযান। গান্ধী বলেন—"শুধুমাত্র কলের প্রতি আমার কোন ক্রোধ নাই, —কিন্তু কলের দ্বারা বহু শ্রম বাঁচিয়া যায় এই অস্বাভাবিক ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধেই আমার আক্রমণ। মানুষ কলের দ্বারা শ্রম বাঁচায়, কিন্তু অন্যদিকে তাহার ফলে সহস্র সহস্র লোক কর্মচ্যুত হয়, এবং অনাহারে মরে। আমি কেবল মানবসমাজের একাংশের জন্য কাজ ও জীবিকা চাই না, সমগ্র মানব-সমাজের জন্যই চাই। আমি সমগ্র সমাজের ক্ষতি করিয়া মুষ্টিমেয় লোকের ঐশ্বর্য চাই না। বর্তমানে যন্ত্রের সহায়তায় মুষ্টিমেয় লোক জনসাধারণকে শোষণ করিতেছে। এই মুষ্টিমেয় লোকের কর্মের প্রেরণা মানবপ্রীতি নয়, লোভ ও লালসা। এই অবস্থাকে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়া আক্রমণ করিতেছি।......যন্ত্র মানুষকে পঙ্গু ও অক্ষম করিবে না, ইহাই আমি চাই। এমন একদিন আসিবে, যখন যন্ত্র কেবলমাত্র ঐশ্বর্য সংগ্রহের উপায় রূপে গণ্য হইবে না। তখন কর্মী ও শ্রমিকদের এরূপ দুর্দশা থাকিবে না এবং

যন্ত্রও মানুষের পক্ষে দুঃখজনক না হইয়া আশীর্বাদস্বরূপ হইবে। আমি অবস্থার এরূপ পরিবর্তন সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছি যে, ঐশ্বর্যের জন্য উন্মত্ত প্রতিযোগিতা দূর হইবে এবং শ্রমিকেরা কেবল যে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবে তাহা নয়, তাহাদের কাজও তাহাদের পক্ষে দাসত্বের বোঝার মত হইবে না। এই অবস্থায় কলকব্জা কেবল রাষ্ট্রের পক্ষে নয়, যাহারা ঐ সব কলকব্জা চালাইবে, তাহাদের পক্ষেও সত্যকার প্রয়োজনে লাগিবে।" (*Lenin and Gandhi* by **Rene Fillöp Miller.**)

গান্ধীর অভিমত যে ভ্রান্ত এ কথা কে বলিতে পারে? নিউইয়র্কের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ওয়েসলি-ও-হাওয়ার্ড ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, শুনুন—

"মানুষ আধুনিক শহরগুলি গড়িয়া তুলিয়াছে; নিউইয়র্ক, লণ্ডন, শিকাগো, প্যারী, বার্লিন, ভিয়েনা, বুয়েনস-আয়ার্স—এগুলি সভ্যতার এক একটা বড় চক্র—মানব-পরমাণু এখানে চলিতেছে, ঘুরিতেছে, ছুটিতেছে, আসিতেছে, যাইতেছে, অদৃশ্য হইতেছে। সে আকাশস্পর্শী বড় বড় হর্ম্য নির্মাণ করিয়াছে,—যেগুলির মাথা মেঘে যাইয়া ঠেকিয়াছে। বাজচিল যতদূর উড়িতে পারে, তাহার চেয়েও ৭০০ ফুট উপরে এই সব হর্ম্যের চূড়া, এবং সেখানে মানুষ বাস করে, নিঃশ্বাস ফেলে, বংশবৃদ্ধি করে; এবং এই সমস্ত শহরের নিচে যে বড় বড় রাস্তা তৈরি হইয়াছে, এগুলি প্রশস্ত, আলোকিত, পাথর বাঁধানো। পিপীলিকার সারির মত সহস্র সহস্র প্রাণী এই সব পাতালপুরীর রাস্তা দিয়া তাহাদের গন্তব্য স্থানে যাতায়াত করে।

"মানুষ তাহাদের আধুনিক শহরে চওড়া, খোলা 'বালুভার', সুন্দর, স্বাস্থ্যকর যাতায়াতের পথ নির্মাণ করে। তাহারা আবার অন্ধকার, সংকীর্ণ, পার্বত্য গহ্বরের মত গলিও তৈরি করে এবং তাহার মধ্য দিয়া বন্যার মত সহস্র সহস্র মানুষের স্রোত চলে। তাহারা বড় বড় উদ্যান নির্মাণ করে, মর্মর মূর্তি বসায়, পশুশালা তৈরি করে, হাসপাতাল স্থাপন করে। অন্যদিকে আবার স্যাঁতসেঁতে জনবহুল বস্তি, অন্ধকারময় ঘর, অস্বাস্থ্যকর পল্লী, অনাথালয়, পাগলা গারদ, জেলখানা—ইহাও তাহাদের কীর্তি! এই সব বস্তির স্বল্পালোক কক্ষে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহারা কখন নীল আকাশ দেখে না, মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিতে পায় না, এবং যাহারা কখনও শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখে নাই, বা শান্তিপূর্ণ বনভূমিতে ভ্রমণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে না এরূপ প্রসূতিরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহারই নাম সভ্যতা!!

পাতালপুরী

"মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাতালপুরীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই পাতালপুরী কলকারখানার আবর্জনা, মানবজগতের আবর্জনা, সমাজের পরগাছা। এই পাতালপুরীতে ছেলেরা চুরি করিতে শিখে, মেয়েরা রাস্তায় বিচরণ করিতে শিখে। এখানে মদ্যপ বন্ধু, দুশ্চরিত্র, পতিত, গণিকা, গাঁটকাটা, নিঃস্ব, বেকার, ভবঘুরেদের আড্ডা।

যাহারা রাত্রির অন্ধকারে শ্বাপদের মত বিচরণ করে, সকালের আলোতে অদৃশ্য হয়; যাহারা শতচ্ছিন্ন, কীটদষ্ট, দুর্গন্ধময় কাপড়চোপড় পরিয়াই ঘুমায়; জঞ্জাল, আবর্জনা, অভাব, দারিদ্র্য, অনাহার, দুর্দশা ও ব্যাধির মধ্যে বাস করে—এই পাতালপুরী তাহাদেরই বিহার-কেন্দ্র।

"এই দুঃখময় পুরীতে, সমাজের বিধি-ব্যবস্থা দয়া ও সহানুভূতির বাহিরে শিশুদের গলা টিপিয়া মারা হয়, জরাজীর্ণ বৃদ্ধেরা পথে পরিত্যক্ত হয়, দুর্বল নিপীড়িত হয়, বিকৃত মস্তিষ্কদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন হয়। তরুণেরা কলুষিত হয়। এই জনবহুল দরিদ্র বস্তিতে স্ত্রীলোকদের আঁতুড়ঘরেই প্রতারক ও গুন্ডারা জুয়া খেলে, হল্লা করে। একদিকে মুমূর্ষুরা বাঁচিবার জন্য আঁকুপাঁকু করে, অন্যদিকে চোরেরা নেশা খাইয়া মারামারি করে। শিশুরা খেলা করে, কলরব করে; অন্যদিকে গণিকারা মদ খায়, মাতলামি করে। এই পাতালপুরীতে শ্রেণিভেদ নাই, জাতিভেদ নাই। সকলেই এক ভাষায় কথা বলে,—নর্দমা ও আস্তাকুঁড়ের ভাষা। চীনাম্যান, শ্বেতাঙ্গিনী, তরুণ-তরুণী, নিগ্রো, জিপ্‌সী, জাপানী, মেক্সিকোবাসী, নাবিক, ভবঘুরে, পলাতক, নৈরাজ্যবাদী, বন্দুকধারী ডাকাত, ভিক্ষুক, গাঁটকাটা জুয়াচোর, গুপ্ত ব্যবসায়ী—সকলেই এখানে বন্ধু।

"সুতরাং দেখা যাইতেছে, যান্ত্রিক সভ্যতা ও 'র‍্যাশনালিজেশান্' (৩) উভয় মিলিয়া পৃথিবীকে দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে। যথা,—যুক্তরাষ্ট্রের গবর্নমেণ্টের সম্মুখে বিষম সমস্যা, তাহার বাজেটে ২০ কোটি ডলার ঘাট্‌তি। ১৯৩০ সালে অক্টোবর মাসে যত মোটরযান তৈরি হইয়াছে, এবৎসর (১৯৩১) অক্টোবর মাসে তাহা অপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ কম হইয়াছে, এবং এ বৎসরের প্রথম দশ মাসে ১৯৩০ সালের তুলনায় শতকরা ২৯ ভাগ কম হইয়াছে। নভেম্বর মাসে শতকরা ৮০ ভাগ কম মোটর যান তৈরি হইয়াছে। ২৯টি কারখানার মধ্যে ১০টি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি-বাণিজ্য বহুলপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, ১৯২৯ সালে জানুআরি হইতে অগস্ট পর্যন্ত উহার মূল্যের পরিমাণ ছিল ৬৮ কোটি ১০ লক্ষ পাউন্ড, ১৯৩০ সালে ঐ সময়ে হইয়াছিল ৫১ কোটি ৯০ লক্ষ পাউন্ড, এবৎসর হইয়াছে মাত্র ৩২ কোটি ৬০ লক্ষ পাউন্ড। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা এক কোটিরও বেশী।

"ধনতন্ত্রের উন্মত্ততা কতদূর চরমে উঠিয়াছে, তাহার নিদর্শন,—দেশে প্রচুর কাঁচা মাল থাকিতেও মানুষ দুর্দশা ভোগ করিতেছে, না খাইয়া মরিতেছে। গম গুদামে পচিতেছে। চিনি নষ্ট করিয়া ফেলা হইতেছে। কফি সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে, ভুট্টা পোড়ানো হইতেছে, তুলা পোড়ানো হইতেছে। কিন্তু এই অতি-প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ খাইতে পাইতেছে না, তাহার জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক জিনিস মিলিতেছে না। এই বিবৃতি বাস্তব ঘটনার হুবহু চিত্র। স্থানীয় সংবাদপত্র

---

(৩) 'র‍্যাশনালিজেশানের' উদ্দেশ্য বিদেশী শিল্প-ব্যবসায়ীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ কোন দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে সঙ্ঘবদ্ধ করা।

(Deutsche Allgemeine Zeitung) সম্প্রতি 'পৃথিবীতে ১ কোটি ১২ লক্ষ টন অতিরিক্ত গম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, আমেরিকাতে গম বাষ্পীয় যন্ত্রে পোড়ানো হইতেছে। ব্রাজিল সবচেয়ে বেশী কফি উৎপন্ন করে,—সেই দেশে এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৫,৯৮,৭৫,২০০ কিলো কফি নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে।"—লিবার্টির বার্লিনের সংবাদদাতা, ৭ই জানুআরি, ১৯৩২।

ধনতান্ত্রিকতা ও কলকারখানার পরিণাম অতি-উৎপাদনের আর একটা কুফল হয়। অতিরিক্ত মজুদ পণ্য বিক্রয়ের জন্য সিনেমা, বায়স্কোপ প্রভৃতির সহযোগে বিরাট ভাবে প্রচার করিবার প্রয়োজন হয়,—সরলপ্রকৃতির কৃষকদের মনে নানারূপ বিকৃত রুচি, কুচিন্তা ও হীন লালসার ভাব জাগ্রত করা হয়। এই প্রকার দুর্নীতিপূর্ণ মিথ্যা প্রচারকার্য দ্বারা লোকের অপরিসীম ক্ষতি হয়। জনসাধারণের মধ্যে চা'এর প্রচলন করিবার জন্য যেসব কৌশলপূর্ণ প্রচার করা হয় এবং তাহার ফলে যে ঘোর অনিষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কিছুদিন হইল, ইউরোপে চা'এর বাজার সস্তা হওয়াতে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রচলনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা হইতেছে। তাহাদের মধ্যে ৫।৬ কোটি লোক যে অসীম দুর্গতির মধ্যে বাস করে, পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, অনাহারে থাকে, তাহাতে কি? ধনতন্ত্র নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে কোন হীন উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত এবং হতভাগ্য দরিদ্রদের নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া তাহারা ফাঁদে ফেলে। চা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক, ইহা ফুসফুসের রোগ নিবারণ করে—ইত্যাদি নানারূপ অলীক যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। পাঁচ বৎসর পূর্বে জার্মানী ভ্রমণকালে আমি একটি বৃহৎ রাসায়নিক কারখানায় গিয়াছিলাম। সেখানে প্রভূত পরিমাণে কোকেন তৈরি হইতেছে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আরও কয়েকটি কারখানায় এইভাবে কোকেন তৈরি হয়, জাপানেও কোকেন তৈরি হইয়া থাকে। এইসব কোকেনের সবটাই ঔষধার্থে প্রয়োজন হয় না। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ কিছুদিন হইল গোপনে কোকেন চালানি নিবারণের জন্য প্রশংসনীয় চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পৃথিবীর নানাদেশে গোপনে কোকেন চালানির ব্যবসা চলিতেছে। ধনতন্ত্র নির্দয়, নিষ্ঠুর, সে কেবল নিজের পকেট ভর্তি করিতে জানে।(৪)

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির পত্নী মিসেস হার্ডি নিজেও একজন সুলেখিকা। আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"অনেকের নিকট সভ্যতার অর্থ ধনৈশ্বর্য। যাহাদের মোটরগাড়ী আছে, টেলিফোন আছে, যাহারা প্রতি রাত্রে বেতারবার্তা শোনে, সেই সমস্ত লোকই তাহাদের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা বেশী সভ্য। যাহারা নানাপ্রকারের যান্ত্রিক আবিষ্কারকে নিজে-

---

(৪) "কৃত্রিম উপায়ে মানুষের অভাব ও প্রয়োজন সৃষ্টি করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করা হয় এবং এইভাবে বেকার সমস্যাকে স্থায়ী করা হয়।......জনসাধারণকে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক শিল্পজাত ক্রয় করাইবার জন্য নানাভাবে প্রচারকার্য চলিয়া থাকে এবং সেজন্য যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করিতে হয়"—Demant. স্যার এ. স্লেটার এবং আরও অনেকে পণ্য বিক্রয়ের জন্য "কৃত্রিম উপায়ে মানুষের মনে নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করা" সম্বন্ধে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—The Causes of War.

দের আমোদ প্রমোদের কাজে লাগাইতে পারে,—অধিকাংশ লোক তাহাদিগকেই সভ্য মনে করে।

"যদি কোন ব্যক্তি এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কলকব্জার সাহায্য গ্রহণ না করে, তবে তাহার পক্ষে উহা আত্মত্যাগের পরিচয় হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও, বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে—এই সব কলকব্জা মানুষের প্রকৃত উন্নতির পক্ষে বাধাস্বরূপ। এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষের জীবন কলকব্জার দাস হইয়া পড়িতে পারে, ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ।

"এই বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় আমার মন স্বভাবতঃই গান্ধীর উপদেশের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় সংস্কারক—কেহ কেহ তাঁহাকে বিপ্লববাদীও বলিয়া থাকেন। এই যান্ত্রিক যুগের ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁহার অসীম বিরাগ, কেননা মানুষের প্রকৃত সুখ ও উন্নতির পক্ষে তিনি এ সমস্তকে বাধাস্বরূপই মনে করেন। তাঁহার উপদেশ এই যে, সরল স্বাভাবিক জীবনই মানুষের আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে। যীশু খৃষ্টের "সার্মন অন্ দি মাউন্ট"-এ কথিত উপদেশের সঙ্গে ইহার বহুল সাদৃশ্য আছে।

"এক্ষেত্রে তিনি একাকী নহেন। আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান চিন্তা-নায়কের মুখে শুনিয়াছি যে, মানব সভ্যতার রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় প্রাচীন সহজ সরল জীবনযাত্রা প্রণালীতে প্রত্যাবর্তন করা। তিনি ইংরাজ। এই দুইজন ব্যক্তির (মহাত্মা গান্ধী ও ইংরাজ মনীষী) চরিত্র ও জীবনপ্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন—তৎসত্ত্বেও তাঁহাদের আদর্শ এক—চিন্তায়, কার্যে ও লক্ষ্যে সব দিক দিয়া নিঃস্বার্থ পবিত্র জীবন। খৃষ্টধর্ম-প্রবর্তক এইরূপ আদর্শই প্রচার করিয়াছিলেন।"

জাপানও পাশ্চাত্যদেশকে অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ফলে সে ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফর্মোজা ও কোরিয়া তাহার কবলিত হইয়াছে, এখন মাঞ্চুরিয়ার উপর তাহার শ্যেনদৃষ্টি পড়িয়াছে। তবুও, জগদ্ব্যাপী আর্থিক দুর্দশা তাহাকেও আক্রমণ করিয়াছে এবং সেও ইহার প্রভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছে।

'ইংলিশম্যানের' টোকিওস্থিত সংবাদদাতা ১৯৩১ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখে লিখিয়াছেন,—

"৪০ বৎসর পূর্বে জাপান কাজের অভাব বোধ করিত না, অতীত কাল হইতে সেখানে এমনই একটি সুন্দর সরল সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। লোকে আলু খাইয়া সানন্দে জীবনযাপন করিত, ছুটির দিনে কখন কখন ভাত খাইত, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার যান্ত্রিক হাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা ক্রমেই সেই প্রাচীন সভ্যতা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। এখন তাহারা কাজ করে, তাহাদিগকে কাজ করিতেই হইবে, অন্যথা না খাইয়া মরিতে হইবে। এমনই ঘটিয়া থাকে।"

এই অধ্যায় মুদ্রিত হইবার পূর্বে নরম্যান অ্যাঞ্জেল ও হ্যারল্ড রাইট কর্তৃক লিখিত "গবর্নমেণ্ট কি বেকার সমস্যার প্রতিকার করিতে পারেন?"—নামক গ্রন্থখানির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। উক্ত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমি এই অধ্যায় শেষ করিব :—

"ভারমণ্টের কোন পার্বত্য অঞ্চলে গেলে দেখা যাইবে যে, একটি বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বাড়ী ইমারত প্রভৃতি খালি পড়িয়া রহিয়াছে, মালিকেরা ঐ সব পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে,—সামান্য কিছু বাকী খাজনা দিলেই উহা এখন পাওয়া যাইতে পারে। নিউ ইংলণ্ড ও কানাডার সমুদ্রোপকূলেও এইরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু এই কৃষিক্ষেত্র, বাড়ী ইমারত প্রভৃতির আয়েই পূর্বে একটি বৃহৎ পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে চলিয়া যাইত। ঐ পরিবারে পিতামাতা, তেরটি সন্তান, দুইজন গরীব আত্মীয় ছিল। তাহারা কৃষিকার্যের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির তুলনায় আদিম যুগের ছিল বলিলেই হয়। আমরা এখন বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তি, হারভেস্টর, ট্রাক্টর, সেপারেটর প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করি,—তাহারা ব্যবহার করিত মানুষের পেশী, বলদ, কাস্তে কোদালি প্রভৃতি। তবু তাহারা ভাল খাদ্য খাইত, ভাল পোশাক পরিত, ভাল গৃহে আরামে থাকিত। তাহাদের কোন শারীরিক অভাব ছিল না। কৃষিক্ষেত্র সুদূর অঞ্চলে অবস্থিত, এবং এখনকার যানবাহনের কোন ব্যবস্থা না থাকিলেও, স্ব-সম্পূর্ণ ছিল।

"এই বিংশ শতাব্দীর লোকেদের উন্নততর যন্ত্রপাতি, প্রাকৃতিক শক্তির উপর অধিকতর অধিকার, এবং বহু গুণে অধিক উৎপাদিকা শক্তি থাকা সত্ত্বেও, জীবিকা অর্জন করিতে তাহারা সক্ষম নহে কেন? তাহাদের অন্য অনেক বিষয়ে বেশী সুবিধা থাকিতে পারে, কিন্তু আদিম যুগের যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী ভারমণ্ট কৃষকদের তুলনায় এ ক্ষেত্রে তাহারা পশ্চাৎপদ।

"প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এখন আর পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ব্যবহারকারী এক ব্যক্তি নহে। পণ্য উৎপাদনকারী এখন জানে না বাজারে কি জিনিস প্রয়োজন হয়, এবং কি জিনিস প্রয়োজন হইবে। কি জিনিসের চাহিদা আছে, কি জিনিস সরবরাহ করিতে হইবে, কি কাজ করিতে হইলে, কত কর্মী প্রয়োজন হইবে,—ঐ সব বিষয় ভারমণ্টবাসীদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল। কিন্তু এখন বহু-বিস্তৃত শ্রমবিভাগের ফলে, উহা আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। ভারমণ্টে যখন গম ও ভুট্টা উৎপাদন করা হইত; তখন কৃষকপরিবার জানিত যে, তাহাদের শ্রম বৃথা যাইবে না, কেননা ঐগুলি প্রধানতঃ তাহাদের ব্যবহারেই লাগিবে, নিজেদের নিকটেই তাহারা লাভের মূল্যে উহা বিক্রয় করিতে পারিবে। কিন্তু ডাকোটাতে যখন দশ বৎসরের সঞ্চিত মূলধন লইয়া দুই তিন হাজার একর জমিতে গম উৎপাদন করা হয়,—বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে বহু-ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়, তখন প্যারী, মস্কো বা বুয়েনস-আয়ার্সের কোন ঘটনায়—ফসলের দাম এত নামিয়া যাইতে পারে যে, উৎপাদনের ব্যয়ও তাহাতে উঠে না। ফসলের উপযুক্ত মূল্য পাইতে হইলে যে সব ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহা বিংশ শতাব্দীর কৃষকদের আয়ত্তের বাহিরে।"

ইহা দুঃখজনক, কিন্তু ইহা সত্য এবং অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যাইতেছে। একজন প্রসিদ্ধ আমেরিকাবাসী লেখক বলিয়াছেন (১৯১৮):—"আমরা শিল্পোন্নতির জন্য নানারূপ বৈজ্ঞানিক উপাদান, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু তাহার মূল্যস্বরূপ মানুষের দুঃখ ও বেকার-সমস্যা আমদানি করিতেছি।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৬০ ও তৎপরবর্তী কালে বাংলার গ্রামের আর্থিক অবস্থা

"এই ধরনের অনুসন্ধানকার্য শহরে করা যায় না। পুঁথিপত্র কাগজে এ সব সংবাদ পাওয়া যায় না। দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া এ সব তথ্য জানিতে হইবে অথবা অজ্ঞই থাকিতে হইবে; দশ হাজার গ্রন্থে পরিবৃত হইয়াও কোন ফল হইবে না।" **Arthur Young's *Travels*.**

আর্থিক ক্ষেত্রে বাংলা দেশ কিরূপে বিজিত হইল, তাহা বুঝিতে হইলে, ১৮৬০ খৃঃ এবং পরবর্তী কালে বাংলাদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানা প্রয়োজন।

চাউল বাংলার প্রধান খাদ্য। নিরক্ষর শ্রমিকেরাও বেশী মজুরি দাবি করিতে হইলে বাজারে চাউলের দরের কথা উল্লেখ করেঃ "বাবু, চালের সের এক আনা, দিন দুই আনায় চার জন লোককে খাইতে দেই কিরূপে?" আমার বাল্যকালে মজুরদের মাসিক বেতন ছিল ৩।।০ টাকা কি ৪৲ টাকা, চাউলের মণ ছিল দেড় টাকা।(১) আমাদের জেলায় মজুরেরা বেশীর ভাগ মুসলমান। তাহাদের সাধারণতঃ দুই এক বিঘা জমি থাকিত, তাহাতে ধান, শাকসবজি প্রভৃতি হইত। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ছাগল, মুরগী প্রভৃতি পালন করিয়া কিছু কিছু আয় বৃদ্ধি করিত। পয়সায় কুড়িটা ভাল বেগুন পাওয়া যাইত। এক আনায় এক পুঁজি (নয়টা) গলদা চিংড়ি, টাকায় ১২টা মুরগী পাওয়া যাইত। বাজারে দুধের দর ছিল টাকায় ৩২ সের। প্রত্যেক গৃহস্থেরই গোশালা এবং ঢেঁকিশালা থাকিত; ধানের তুষ, ক্ষুদ, কুঁড়া সবই কাজে লাগিত।

বিভিন্ন রকমের ডাল গৃহস্থদের জমিতেই হইত, অথবা এক বৎসরের উপযোগী ডাল কিনিয়া বড় বড় মাটির হাঁড়িতে রাখা হইত। প্রত্যেক গৃহস্থই এক বৎসরের খোরাকী ধান গোলায় মজুত রাখিত, তা ছাড়া অজন্মার আশঙ্কায়, আরও এক বৎসরের জন্য অতিরিক্ত ধান জমা থাকিত।

ভাল সুগন্ধি ঘৃত—আট আনা সেরে পাওয়া যাইত। বর্তমানে কলিকাতা অঞ্চল হইতে যে কলের তেল চালান হয়, গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাহার পরিচয় ছিল না। গ্রামের ঘানিতে সরিষার তেল হইত, এবং প্রত্যেক গ্রামেই উহা প্রচুর পরিমাণে মিলিত। এই খাঁটি সরিষার তেল বাঙালীর খাদ্যের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। কলুরাই তখন বংশানুক্রমে সরিষার তেলের ব্যবস্থা করিত। সরিষার তেলের দর ছিল তিন আনা সের। তেলের খইল গরুর খাদ্য এবং জমির সাররূপে ব্যবহৃত হইত।

গো-পালন হিন্দুর ধর্মের একটা অঙ্গ ছিল। আমার এখনও মনে

---

(১) নবাবী আমল—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মা নিজে গরুর খাওয়ার তদারক করিতেন। নানা জাতির গরু আমাদের বাড়ীতে ছিল। আমাদের বাড়ীর নিয়ম ছিল যে, ছেলেমেয়েরা পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রধানতঃ দুধ খাইয়া থাকিবে। ধনী ভদ্র গৃহস্থেরা এবং তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েরা পর্যন্ত সকালবেলা গোয়ালঘর পরিষ্কার করা অপমানের কাজ মনে করিতেন না। গোয়ালঘরের ঝাঁটালি গোবর ইত্যাদি জমিতে ভাল সারের কাজ করিত। তুষ, জাউ, কলার খোসা প্রভৃতি গরুদের খাওয়ানো হইত। প্রত্যেক গ্রাম্য পঞ্চায়েতের গোচর জমি(২) ছিল,—সেখানে নির্বিবাদে গরু চরিয়া খাইত। ধান কাটা ও মলা হইলে প্রচুর খড় পাওয়া যাইত এবং তাহা গরুর খাদ্যের জন্য গাদা দিয়া রাখা হইত। গ্রীষ্মকালে ঘাস দুর্লভ হইলে, এই খড় খুব কাজে লাগিত। এক কথায়, প্রত্যেক পরিবারই কিয়ৎপরিমাণে আত্মনির্ভর ছিল।

এখনকার মত সাবানের এত প্রচলন ছিল না, বড়লোকেরাই কেবল ইহা ব্যবহার করিতেন। কাপড় কাচা প্রভৃতির জন্য সাজিমাটির খুব প্রচলন ছিল। গরীব গৃহস্থেরা কলাপাতার ক্ষারের সঙ্গে চুন মিশাইয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া কাপড় ধুইত। ঢাকাতে এক প্রকারেব গোলা সাবান হইত। পর্টুগীজেরা ঢাকায় ১৬শ শতাব্দীতে বসতি করে, তাহাদের নিকট হইতেই সম্ভবতঃ লোকে এই সাবান তৈরি করার কৌশল শিখিয়াছিল। বাংলা ও হিন্দী 'সাবান' শব্দ খুব সম্ভব পর্টুগীজ 'Savon' হইতে আসিয়াছে।

বাংলার নৌ-বাণিজ্য তখন কোষ, বালাম, সোদপুরী প্রভৃতি নানাপ্রকারের দেশী নৌকা যোগে হইত। যাত্রীবাহী নৌকা স্বতন্ত্র রকমের ছিল। বজরাতে বড়লোকেরা যাইতেন, সাধারণ লোকে 'পান্‌সী' 'তাপুরী' প্রভৃতিতে চড়িত। প্রত্যেক গ্রামেই এরূপ শত শত নৌকা থাকিত। বন্দর ও গঞ্জে ঘাটে নৌকার ভিড় লাগিয়া থাকিত এবং সে দৃশ্য বড় সুন্দর দেখাইত। কলিকাতা হইতে গ্রামে এই সব নৌকাতে যাতায়াতের সময় বড় আনন্দ বোধ হইত। স্রোতের মুখে নৌকাগুলি যখন সারি বাঁধিয়া দাঁড় টানিয়া যাইত অথবা উজানে পাল তুলিয়া ছুটিত, তখন বড়ই মনোহর দেখাইত। এখন এসব অতীতের কথা বলিলেই হয়। ব্রিটিশ কোম্পানিসমূহের স্টীমার বাংলার নদীপথ আক্রমণ করিয়া এই বিপর্যয় ঘটাইয়াছে।

বেভারিজ তাঁহার 'বাখরগঞ্জ' গ্রন্থে ১৮৭৬ সালে এদেশের নদীবাহী নৌকা ও তাহাদের নির্মাণ-প্রণালীর নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"এই জেলায় নৌকা-নির্মাণ একটি চমৎকার শিল্প। মেন্দিগঞ্জ থানার এলাকায় দেবাইখালি ও শ্যামপুর গ্রামে উৎকৃষ্ট 'কোষ' নৌকা তৈরি হয়। আগরপুরের নিকট

---

(২) পূর্বাবস্থার তুলনায় বাংলায় গোজাতির কিরূপ অবনতি এবং দুধের অভাব ঘটিয়াছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত বিবরণী উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"বাংলার অধিকাংশ জেলায় গোচর জমি বলিয়া কিছু নাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন জমিদারেরা প্রায় সমস্ত কর্ষণযোগ্য জমিই প্রজাদের নিকট বিলি করিয়াছেন এবং এগুলিতে চাষ হইতেছে।......অধিকাংশ গ্রামে গরুগুলিকে ক্ষেতে, আমবাগানে অথবা পুকুরের ধারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেখানে তাহারা কোন রকমে চরিয়া খায়। গরুর খাদ্যশস্য বাংলাদেশে চাষ করা হয় না বলিলেই হয়।" মোমেন,—কৃষি কমিশনে সাক্ষ্য।

ঝণ্টেশ্বরে, এবং পিরোজপুর থানার এলাকায় বর্ষাকাটী গ্রামে ভাল পান্‌সি নৌকা তৈরি হয়। শেষোক্ত স্থানে উৎকৃষ্ট মালবাহী নৌকাও তৈরি হয়। সুন্দরবনে মগেরা কেরুয়া গাছের গুঁড়ি হইতে ডিঙি তৈরি করে; শুদরী কাঠের ডিঙি সর্বত্রই হয়; ঝালকাঠি, কালিগঞ্জ, বাখরগঞ্জ, ফলাগড় প্রভৃতি স্থানও নৌকা তৈরির জন্য বিখ্যাত।"

এইরূপে নৌকা তৈরির কাজ করিয়া বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করিত।

আমার বাল্যকালে কোন বাড়ীতে আমি চরকা কাটিতে দেখি নাই। ম্যানচেস্টারের কাপড় তখনই সুদূর গ্রাম পর্যন্ত পেঁাছিয়াছিল এবং জোলা ও তাঁতীরা তাহাদের মৌলিক বৃত্তি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিলাতী কাপড় বিক্রি করিয়া কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিত, এবং অনেকে বাধ্য হইয়া কৃষিকার্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার ফলে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িয়াছিল।

তখনকার দিনে গ্রাম্য কর্মকার একটা প্রধান কাজ করিত।(৩) তাহার দোকানে সন্ধ্যাবেলা আড্ডা বসিত এবং গ্রামের রাজনীতি আলোচনা হইত। কর্মকার লাঙ্গল, কোদাল, দা, দরজার কব্জা, বড় কাঁটা, তালা প্রভৃতি তৈরি করিত। বাহির হইতে আমদানী লৌহপিণ্ড ও লোহার পাত হইতেই এ সব অবশ্য তৈরি হইত। নাটা-গোড়িয়া (কলিকাতার নিকট), ডোমজুড়, মাকড়দহ, বড়গাছিয়া (হাওড়া) প্রভৃতি স্থানে লোহার তালা-চাবি তৈরি হইত। কিন্তু জার্মানী হইতে আমদানী সস্তা জিনিসের প্রতিযোগিতায় এই দেশীয় শিল্প লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। শেফিল্ডের ছুরি, কাঁচি প্রভৃতিও এদেশে ছাইয়া ফেলিতেছে। ক্ষুর, ছুরি প্রভৃতি সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী।

চাউলের পরেই গুড় ও চিনি যশোহরের সর্বাপেক্ষা প্রধান শিল্প ছিল। খেজুর রস হইতেই প্রধানতঃ গুড় ও চিনি হইত। বর্তমানে জাভা হইতে আমদানী সস্তা চিনির প্রতিযোগিতায় এদেশের চিনি শিল্প লোপ পাইতে বসিয়াছে। কিন্তু এক সময়ে এই চিনি শিল্প যশোহরে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ওয়েস্টল্যাণ্ডের "যশোহর" নামক গ্রন্থে (১৮৭১) তাহার চমৎকার বর্ণনা আছে।

"যশোহর জেলার সর্বত্রই চিনি তৈরি হয় বটে কিন্তু জেলার পশ্চিম অংশে নিম্ন-লিখিত স্থানগুলিতেই চিনি তৈরির বড় কেন্দ্র ঃ—কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, ত্রিমোহিনী, কেশবপুর, যশোহর ও খাজুরা এই সব স্থানে চিনি তৈরি হয় ও তথা হইতে বাহিরে রপ্তানি হয়। কলিকাতা ও নলচিটি এই দুই স্থানেই প্রধানতঃ চিনি রপ্তানি হয়। নলচিটি বাখরগঞ্জ জেলার একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। পূর্বাঞ্চলের প্রায়

(৩) লালবিহারী দে তাঁহার Bengal Peasant Life. গ্রন্থে গ্রাম্য কর্মকারের নিম্নলিখিত-রূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"কুবের ও তাহার পুত্র নন্দ সমস্ত দিন কার্যে নিরত থাকে, এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বে তাহারা বিশ্রাম নেয় না। দিনেরবেলায় তাহাদের নিকটে যাহারা কাজের জন্য আসে, তাহারা অবশ্য সন্ধ্যার পর থাকে না। কিন্তু বন্ধুবান্ধবেরা ঐ সময় আলাপ করিতে আসে। কিন্তু বন্ধুরা থাকুক আর না থাকুক, পিতা ও পুত্র তাহাদের কাজে কখনো অমনোযোগী হয় না। পিতা ও পুত্র উভয়েই আগুনে পোড়া একখণ্ড লাল লোহা লইয়া হাতুড়ি দিয়া পিটিতে থাকে এবং চারি-দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে থাকে।"

সমস্ত জেলার সঙ্গে ইহার কারবার আছে। এখানে 'দলুয়া' চিনির খুব চাহিদা এবং কোটচাঁদপুর ব্যতীত যশোহর জেলার অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন অধিকাংশ 'দলুয়া' নলচিটি ও তাহার নিকটবর্তী ঝালকাটিতে রপ্তানি হয়। কোটচাঁদপুর ব্যতীতও ঐ দুই স্থানে 'দলুয়া' চালান হয় বটে, কিন্তু সেখানকার বেশীর ভাগ 'দলুয়া' কলিকাতাতেই চালান হয়। কলিকাতায় দুই প্রকার চিনির চাহিদা আছে। প্রথমতঃ, কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্য 'দলুয়া' চিনি। দ্বিতীয়তঃ, উৎকৃষ্ট পাকা (সাফ) চিনি, ঐগুলি কলিকাতা হইতে ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানে চালান হয়। এই পাকা বা সাফ চিনি যশোহর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে কেশবপুর ও অন্যান্য স্থানে তৈরি হয়, এবং 'দলুয়া' চিনি প্রধানতঃ কোটচাঁদপুরে হয়।"

১৮০০ শত খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে কিরূপে চিনি তৈরি হইত, তাহার একটি সুন্দর বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"গ্রেট ব্রিটেনে চিনির দাম হঠাৎ বাড়িয়া যায়, উহার কারণ, প্রথমতঃ ওয়েস্ট ইন্ডিসে ফসল জন্মে না, এবং দ্বিতীয়তঃ ইউরোপের সর্বত্র চিনির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এইভাবে চিনির মূল্যবৃদ্ধি ব্রিটিশ জাতি বিপদরূপে গণ্য করিল। তাহাদের দৃষ্টি তখন বাংলার উপরে পড়িল এবং তাহারা নিরাশ হইল না। অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা হইতে ব্রিটেনে চিনি রপ্তানি হইল। বাংলা হইতে ইউরোপে কয়েক বৎসর পূর্বেই চিনি রপ্তানি সুরু হইয়াছিল। এখনও উহা রপ্তানি হইতেছে এবং এই রপ্তানির পরিমাণ প্রতি বৎসর বাড়িয়া যাইবে ও ইউরোপের বাজারে মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ওয়েস্ট ইন্ডিসও এই লাভের কিয়দংশ পাইবে।

"বেনারস হইতে রংপুর, আসামের প্রান্ত হইতে কটক পর্যন্ত, বাংলা ও তৎসংলগ্ন প্রদেশে প্রায় সকল জেলায় আখের চাষ হয়। বেনারস, বিহার, রংপুর, বীরভূম, বর্ধমান এবং মেদিনীপুরেই আখের চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রভূত পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয়। যত চাহিদাই হোক না কেন, বাংলা দেশ তদনুরূপ চিনি যোগাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। বাংলার প্রয়োজনীয় সমস্ত চিনি বাংলা দেশেই তৈরি হয় এবং উৎসাহ পাইলে বাংলা ইউরোপকেও চিনি যোগাইতে পারে।

"বাংলায় খুব সস্তায় চিনি তৈরি হয়। বাংলায় যে মোটা চিনি বা দলুয়া তৈরি হয়, তাহার ব্যয় বেশী নহে—হন্দর প্রতি পাঁচ শিলিং-এর বেশী নয়। উহা হইতে কিছু অধিক ব্যয়ে চিনি তৈরি করা যাইতে পারে। ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিসে তাহার তুলনায় ছয় গুণ ব্যয় পড়ে। দুই দেশের অবস্থার কথা তুলনা করিলে এরূপ ব্যয়ের তারতম্য আশ্চর্যের বিষয় বোধ হইবে না। বাংলা দেশে কৃষিকার্য অতি সরল স্বল্প-ব্যয়-সাধ্য প্রণালীতে চলে। অন্যান্য বাণিজ্য-প্রধান দেশ হইতে ভারতে জীবনযাত্রার ব্যয় অতি অল্প। বাংলা দেশে আবার ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশ হইতে অল্প। বাঙালী কৃষকের আহার্য ও বেশভূষায় ব্যয় অতি সামান্য, শ্রমের মূল্যও সেই জন্য খুব কম। চাষের যন্ত্রপাতি সস্তা। গো-মহিষাদি পশুও সস্তায় পাওয়া যায়। শিল্পজাত তৈরির জন্য কোন বহুব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতির দরকার হয় না। কৃষকেরা

খড়ের ঘরে থাকে, তাহার যন্ত্রপাতি উপকরণের মধ্যে, একটিমাত্র সহজ যাঁতা, কয়েকটি মাটির পাত্র। সংক্ষেপে, তাহার সামান্য মূলধনেরই প্রয়োজন হয় এবং উৎপন্ন আখ ও গুড় হইতেই তাহার পরিশ্রমের মূল্য উঠিয়া যায় এবং কিছু লাভও হয়।" কোলব্রুক— Remarks on the Husbandry and Internal Commerce of Bengal, pp. 78—79.

এই কথাগুলি প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল এবং যে বাংলাদেশ এক কালে সমস্ত পৃথিবীর বাজারে চিনি যোগাইত তাহাকেই এখন চিনির জন্য জাভার উপর নির্ভর করিতে হয়। উন্নত বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালীর ফলে কিউবা ও জাভা এখন অত্যন্ত সস্তায় চিনি রপ্তানি করিয়া পৃথিবীর বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। বর্তমানে (১৯২৮—২৯) জাভা হইতে ভারতে বৎসরে প্রায় ১৫।১৬ কোটি টাকার চিনি আমদানি হয় এবং এই চিনির অধিকাংশ বাংলা দেশই ক্রয় করে। বর্তমান সময়ে চিনি এদেশেই প্রধানতঃ প্রস্তুত হইতেছে, অতিরিক্ত শুল্ক বসাইয়া জাভার চিনি একেবারে বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বাংলার কোন লাভ নাই। এই চিনি বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে আমদানি হয়, সুতরাং বাংলার টাকা বাংলার বাহিরে যায়।

পাট এখন বাংলার, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের, প্রধান ফসল। কিন্তু ১৮৬০ সালের কোঠায় পাট যশোহরে অল্পপরিমাণ উৎপন্ন হইত এবং তাহা গৃহস্থের দড়ি, বস্তা প্রভৃতি তৈরি করার কাজে লাগিত। এই সব জিনিস হাতেই সুতা কাটিয়া তৈরি হইত। ভদ্র পরিবারের পুরুষরাও অবসর সময়ে পাটের সুতা বোনা, দড়ি তৈরি প্রভৃতির কাজ করিত। বাজারে পাটের দর ছিল ১।০ মণ। কিন্তু পাটের চাষ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়াতে বাংলার আর্থিক অবস্থার ঘোর পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

উত্তর বঙ্গের রংপুর প্রভৃতি জেলায় "পাটের সুতা কাটা ও বোনা খুব প্রচলিত ছিল। উহা হইতে গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী বিছানার চাদর, পর্দা, গরীব লোকদের পরিচ্ছদ প্রভৃতি তৈরি হইত। ১৮৪০ সালের কোঠায়, কলিকাতা হইতে উত্তর আমেরিকা ও বোম্বাই বন্দরে তুলার গাঁইট বাঁধিবার জন্য চট রপ্তানি হইত ; কিন্তু চিনি ও অন্যান্য জিনিস রপ্তানি করিবার জন্য বস্তা তৈরির কাজেই পাট বেশী লাগিত।"

ডাঃ ফরবেশ রয়েল তাঁহার "Fibrous Plants of India" (১৮৫৫ খৃঃ প্রকাশিত) নামক গ্রন্থে হেনলি নামক জনৈক কলিকাতার বণিকের নিকট হইতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, পাট শিল্প বাংলার অন্যতম প্রধান শিল্প হইয়া উঠিয়াছিল এবং এখানকার হাতে বোনা চট ও বস্তা পৃথিবীর দেশদেশান্তরে রপ্তানি হইত।

"পাট হইতে যে সমস্ত জিনিস তৈরি হইত, তাহার মধ্যে চট ও চটের বস্তাই প্রধান। নিম্নবঙ্গের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রধান গার্হস্থ্য শিল্প। সমাজের প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক গৃহস্থই এই শিল্পে নিযুক্ত থাকিত। পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা সকলেই এই কাজ করিত। নৌকার মাঝি, কৃষক,

বেহারা, পরিবারের ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই অবসর সময়—এই শিল্পে নিযুক্ত করিত। বস্তুতঃ, প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থই অবসর সময় টাকু হাতে পাটের সুতা কাটিত। কেবল মুসলমান গৃহস্থেরা তুলার সুতা কাটিত। এই পাটের সুতা কাটা ও চট বোনা হিন্দু বিধবাদের একটা প্রধান কাজ ছিল। এই হিন্দু বিধবারা অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, বিনম্র, চিরসহিষ্ণু; আইন তাহাদিগকে চিতার আগুন হইতে রক্ষা করিয়াছে বটে, কিন্তু সমাজ তাহাদিগকে অবশিষ্ট কালের জন্য অভিশপ্ত সন্ন্যাসিনী জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছে। যে গৃহে একদিন সে হয়ত কর্ত্রী ছিল, সেই গৃহেই এখন সে ক্রীতদাসী। এই পাট শিল্পের কল্যাণেই তাহাদিগকে পরের গলগ্রহ হইতে হইতেছে না। ইহা তাহাদের অন্ন-সংস্থানের প্রধান উপায়। পাট শিল্পজাত যে বাংলায় এত অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হয়, এই সমস্ত অবস্থাই তাহার প্রধান কারণ এবং মূল্য সুলভ হওয়াতেই বাংলার পাট শিল্পজাত সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।" Wallace : *The Romance of Jute.*

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, হাতে তৈরী পাট শিল্প বাংলার কৃষক ও গৃহস্থদের একটি প্রধান গৌণ শিল্প ছিল। ১৮৫০—৫১ সালে কলিকাতা হইতে ২১,৫৯,৭৮২ টাকার চট ও বস্তা রপ্তানি হইয়াছিল।

বাংলার পাট এখন চাউলের পরেই প্রধান কৃষিজাত পণ্য। কিন্তু বাঙালীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যর্থতা ও অক্ষমতার দরুন, পাট হইতে যে প্রভূত লাভ হয়, তাহার বেশীর ভাগই ইউরোপীয়, আর্মানী বা মাড়োয়ারী বণিকদের উদরে যায়।(৪)

প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ একজন বিদেশী পাঠক হয়ত মনে করিতে পারে, ব্যবসায়ীদের এই বিপুল লাভের টাকাটা বাঙালীরাই পায়। কিন্তু তাহা সত্য নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পাটের কল কোম্পানিগুলির অধিকাংশ অংশীদার ভারতবাসী। তাহারা ভারতবাসী বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী নয়। অবশ্য, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, পাট বিক্রয়ের টাকার একটা প্রধান অংশ কৃষকেরাও পায়। যে সব জমিতে পূর্বে কেবল ধান চাষ হইত, সেই সব জমিতে—বিশেষভাবে ত্রিপুরা, ময়মনসিং, ঢাকা, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায়—এখন পাট উৎপন্ন হয়। যেখানে যত জমি পাওয়া যায়, তাহা এই পাটচাষের কাজে লাগানো হইতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, গোচারণ তথা দুগ্ধ সরবরাহের পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর হইতেছে।

বাংলার কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উপর পাট যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা পানাণ্ডিকরের Wealth and Welfare of the Bengal Delta নামক গ্রন্থে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে বিষয়টি নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা হইতে সহজেই বুঝা যায়।

---

(৪) অনুসন্ধানে জানা যায় যে, পাটের মূল্য হইতে প্রায় ১২½ কোটি টাকা এই সব ব্যবসায়ীদের হাতে যায়।

"বাংলায় পাটচাষের বৃদ্ধি এবং পৃথিবীর বাজারে পাটের চাহিদা বাংলার লোকদের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর হইত, যদি তাহারা বুদ্ধিমান্ ও হিসাবী হইত এবং এই লাভের টাকা হইতে দেনা শোধ, জমির উন্নতি, পথঘাটের উন্নতি এবং জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নত করিতে পারিত। তাহাদের জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য সামান্য কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ টাকাই মামলামোকদ্দমায়, নানারূপ বিলাসব্যসনে এবং বাহির হইতে মজুর আমদানি করিয়া তাহাদের খরচা বাবত তাহারা অপব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে। কৃষকেরা বিলাসী ভদ্রলোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আলস্যে সময় কাটাইতে শিখিয়াছে। তাহারা আর নিজে মাটির কাজ করে না, ধান ও পাট কাটে না, জলে পাট ডুবায় না, ক্ষেত হইতে শস্য বাড়ীতে লইয়া যায় না ; এই সমস্ত কাজের জন্য তাহারা বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে আগত মজুরদের নিয়োগ করিতেছে। ইহার ফলে মজুরের চাহিদা ও মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাষের খরচাও বাড়িয়া গিয়াছে। এইভাবে কৃষকদের লাভের একটা মোটা অংশ একদিকে উকিল মোক্তার, অন্যদিকে হিন্দুস্থানী মজুরদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা হওয়ার দরুন কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু কৃষকেরা একবার যে মজুর খাটাইবার অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা আর ছাড়িতে পারিতেছে না(৫), এখনও তাহারা বাহিরের মজুর সমভাবেই খাটাইতেছে। যদি এইভাবে চাষের খরচা না বাড়িয়া যাইত, তবে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও চাষীদের যথেষ্ট লাভ থাকিত।"

পাঁচ বৎসরের হিসাব ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাংলাদেশে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ মণ। বাংলাদেশের লোকসংখ্যাও প্রায় ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ। সুতরাং মাথাপিছু গড়ে বার্ষিক এক মণ পাট উৎপন্ন হয় ; প্রতি মণ পাটের মূল্য প্রায় আট টাকা।(৬) স্যার ডি. এম. হ্যামিলটন ১৯১৮ সালে কলিকাতায় একটি বক্তৃতা করেন, এই প্রসঙ্গে তাহা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলেন :—"আমার কয়েকটি পাটকলের অংশ আছে, সেই হিসাবে আমি পাট উৎপন্নকারী কৃষকদের মুখের দিকে চাহিতে লজ্জা বোধ করি। আমরা শতকরা ১০০ ভাগ লাভ করিব। আর ঐ কৃষকেরা কোনরূপ ব্যাঙ্কের সুব্যবস্থার অভাবে, দুর্দিনে না খাইয়া মরিবে, ইহা ব্রিটিশ বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়ের আদর্শসম্মত নহে। ডাণ্ডির মহাজনদের বিবেকের অভাবই ইহাতে সূচিত হইতেছে। কিন্তু পাট উৎপাদনকারী কৃষকেরা আজ যে দুর্গতি ভোগ করিতেছে, ভারতের জনসাধারণ দিনের পর দিন জীবনের আরম্ভ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সেই দুর্গতি ভোগ করে। এই অবস্থা আর বেশীদিন সহ্য করা যাইতে পারে না, এবং এতদিন যে সহ্য করা হইয়াছে, ইহা ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে সুনাম নহে। ভারতের অধিবাসীরা এইভাবে চির অভাবগ্রস্ত হইয়া ও ঋণের পাথর গলায় বাঁধিয়া, দেহ ও আত্মা কোন কিছুর উন্নতি করিতে পারিবে, এরূপ চিন্তা করাই মূর্খতা।"

---

(৫) Cf. Renan—*Habits of Idleness.*

(৬) বর্তমানে (জুন, ১৯৩২) গ্রাম অঞ্চলে পাট ২॥ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে।

১৯২৫—২৬ সালে পাটের মূল্য খুব বেশী চড়িয়া গিয়াছিল, তাহার পর দুই বৎসর পাটের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া গিয়াছে। ফলে পাটচাষীদের অত্যন্ত দুর্গতি হইয়াছে। পাট চাষ অনেক স্থলে ধান চাষের স্থল অধিকার করিয়াছে। সুতরাং পূর্ব বঙ্গের চাষীরা তাহাদের খাদ্যশস্য খরিদ করিবার জন্য শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা হইতে ৩৭৷৷০ টাকা সুদে ঋণ করিতে বাধ্য হয়। দুর্দিনের জন্য যে সঞ্চয় করিতে হয়, এ শিক্ষা কখনও তাহাদের হয় নাই।(৭) পূর্বে হঠাৎ পাটের দর চড়িয়া ধনাগম হওয়াতে পূর্ববঙ্গের কৃষকদের মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হইয়াছে। ফলে টিন, বাইসাইকেল, গ্রামোফোন, নানারূপ বস্ত্রজাত, জামার কাপড় প্রভৃতিতে ভর্তি হইয়া উঠিতেছে। গ্রামবাসী কৃষকেরা এই সব খেলনা, পুতুল, শখের জিনিস কিনিবার জন্য যেন উন্মত্ত। জাপানী বা কৃত্রিম রেশমের চাদর প্রতি খণ্ডের মূল্য ৭৲ টাকা ; এদেশের সাধারণ ভদ্রলোকেরাও এগুলি ব্যয়সাধ্য বিলাসদ্রব্য বলিয়া কিনিতে ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু এগুলি বাংলার বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে এবং গ্রাম্য কৃষকেরা কিনিতেছে। ছেলেরা যেমন নূতন কোন রঙীন জিনিস দেখিলেই তাহা কিনিতে চায়, আমাদের কৃষকদের অবস্থাও সেইরূপ। সুদূর পল্লীতেও জার্মানীর তৈরী বৈদ্যুতিক 'টর্চ' খুব বিক্রয় হইতেছে। তাহারা এগুলি ব্যবহার করিতে জানে না, ফলে ভিতরকার ব্যাটারী একটু খারাপ হইলেই উহা ফেলিয়া দেয়।

এদেশের কৃষকেরা অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাহাদের দৃষ্টি অতি সংকীর্ণ, এক হিসাবে তাহারা "কালকার ভাবনা কাল হইবে"—যীশু খৃষ্টের এই উপদেশ-বাণী পালন করে। তাহারা ভবিষ্যতের জন্য কোন সংস্থান করে না। ঘরে যতক্ষণ চাল মজুদ থাকে, ততক্ষণ সেগুলি না উড়াইয়া দেওয়া পর্যন্ত তাহাদের মনে যেন শান্তি হয় না। মনোহর বিলাতী জিনিস দেখিলেই তাহাদের কিনিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। বেপারীরা সর্বদাই তাহাদের কানের কাছে টাকা বাজাইতে থাকে, সুতরাং তাহারা তাহাদের কৃষিজাত বিক্রয় করিয়া ফেলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। অনেক সময় এই সব শখের বিলাতী জিনিস কিনিবার জন্য তাহারা তাহাদের গোলার ধান প্রভৃতিও বিক্রয় করিয়া ফেলে। পূর্বে কৃষকেরা চলতি বৎসরের খোরাকি তো গোলায় মজুদ রাখিতই, অজন্মা প্রভৃতির আশঙ্কায় আরও এক বৎসরের জন্য শস্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিত। বর্তমানে, কৃষকদের মধ্যে শতকরা পাঁচ জনও বৎসরের খাদ্যশস্য মজুদ রাখে কি না সন্দেহ, রাখিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। অবশিষ্ট শতকরা ৯৫ জনই ঋণজালে জড়িত। জমিদার ও মহাজনের কাছে তাহারা চিরঋণী হইয়া আছে।

আমি বাংলার ষাট বৎসর পূর্বেকার গ্রাম্য জীবনের যে বর্ণনা করিলাম, বর্তমান অবস্থার কথা বর্ণনা না করিলে, তাহা সম্পূর্ণ হইবে না। জাতীয় আন্দোলনের ফলে

---

(৭) "সাধারণতঃ, রায়তদের যখন সুযোগ ও সুবিধা থাকে, তখনও তাহারা অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯২৫ সালে পাটের দর চড়া ছিল, এবং রায়তেরা ইচ্ছা করিলে ঋণ শোধ করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা সে সুযোগ গ্রহণ করে নাই, সমস্ত টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছিল।" কৃষি কমিশনের রিপোর্ট,—ভারতীয় পাটকল সমিতির সাক্ষ্য।

উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার অনেক স্থলেই গত কয়েক বৎসর আমি ভ্রমণ করিয়াছি ; খুলনা, রাজসাহী ও বগুড়ার দুর্ভিক্ষ ও বন্যা সাহায্য কার্যের জন্যও অনেক স্থলে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং বাংলার আর্থিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার আমার যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছে।

পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় নদীতেই ডাক স্টীমার চলে, সুন্দরবন ও আসাম ডেসপ্যাচ ডাক, যাত্রী ও মাল প্রভৃতি বহন করিয়া থাকে। অনেক স্থলে ইহার সঙ্গে রেলওয়ে সার্ভিসও আছে। পূর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল হইতে নৌকা-যোগে কলিকাতায় আসিতে হইলে প্রায় পনর দিন সময় লাগিত। মালবাহী নৌকায় আসিলে আরও বেশী দিন লাগিত। কিন্তু এখন এই সব স্থানে সহজে ও অল্প সময়ে যাতায়াত করা যায়। কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামে ২৪ ঘণ্টায় ও ঢাকায় ১৪।১৫ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। কোন অর্থনীতির ছাত্র, যে বাংলার আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রার খবর রাখে না, সে উল্লাসের সঙ্গে বলিবে যে, ইহার ফলে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে, জাতির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্তু ইহার অন্তরালে যে দারিদ্র্য ও দুর্দশার ইতিহাস আছে, তাহা সে চিন্তা করে না।

বস্তুতঃ, আমাদের শাসকেরা নানা তথ্য সহকারে লোকের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির কথা সর্বদাই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। অর্থনীতিবিদেরা তাঁহাদের সেই পুরাতন বুলি আওড়াইয়া বলেন যে, দ্রুতগামী যানবাহনের ফলে রপ্তানিবাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, অতএব লোকের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদের হিসাব মত অতিরিক্ত কৃষিজাত বিক্রয় করিয়া কৃষকদের এখন বেশ লাভ হয়।

ইহার উত্তরস্বরূপ আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডার্লিং-এর অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। ডার্লিং বলেন,—"যাহা সহজে পাওয়া যায়, তাহা সহজেই নষ্ট হয়। সুতরাং কৃষকদের নব-লব্ধ ঐশ্বর্যের অনেকখানিই তাহাদের হাত গলিয়া অন্যের পকেটে যায়। ত্রিশ বৎসরে কৃষকদের ঋণের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছে এবং এখনও বৃদ্ধি পাইতেছে।"—*The Punjab Peasant*, p. 283.

কৃষকদের আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও, তাহাদের দারিদ্র্য ক্রমেই কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তৎসম্বন্ধে মেমনও বলিয়াছেন,—

"ইহা খাঁটি সত্য কথা যে, ৫০ বৎসর পূর্বে যদিও যশোহরের কৃষকদের ভাল বাড়ী ছিল না, ভাল পোশাক ছিল না, তবু তাহারা দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইত ; তাহাদের আয় অল্প ছিল বটে, কিন্তু ব্যয়ও সামান্য ছিল। তাহারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিত, এবং নগদ টাকার জন্য তাহারা ব্যস্ত হইত না, অথবা এখনকার মত সস্তা বিলাসদ্রব্য কিনিত না। তাহাদের আয়বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা নামে মাত্র, ইহা সত্যকার আয় নহে ; কেননা তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনই অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের জন্য ব্যতীত মোটেই ধান বিক্রয় করিতে পারে না, সুতরাং শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার দরুন তাহাদের কোনই লাভ হয় না। পক্ষান্তরে তাহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ উচ্চতর হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ও

বাড়িয়াছে এবং তাহাদের আয় হইতে সর্বপ্রকার অভাব পূরণ না হওয়াতে, ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।" (কৃষি কমিশনের রিপোর্ট, ৩২৮ পৃঃ)

মিঃ ডার্লিং-এর হিসাব অনুসারে ভারতের কৃষকদের মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ৬০০ শত কোটি টাকা। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুসারে (১৯৩০—৩১) কেবলমাত্র বাংলাদেশের গ্রামবাসী কৃষকদের ঋণের পরিমাণ ৯৩ কোটি টাকা। উক্ত রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিবার যোগ্য ঃ—

"মহাজনদের সুদের হার শতকরা ৫৷৷০ টাকা হইতে শতকরা ৩০০ টাকা পর্যন্ত। ঋণের পরিমাণ, বন্ধকীর প্রকৃতি, ঋণ দেওয়ার জন্য মূলধন সুলভ কি না ইত্যাদি বিষয়ের উপর সুদের হার নির্ভর করে। অধিকাংশ ঋণের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ হয়, এবং ৬ মাস পরে চক্রবৃদ্ধি হয়, কোন কোন স্থলে ৩ মাস পরেই চক্রবৃদ্ধি হয়। এই প্রদেশের (বাংলার) প্রত্যেক জেলায় মহাজনী ব্যবসা বহুলভাবে প্রচলিত। ইহার মূলে নানা কারণ আছে, যথা,—খাতকদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থা,—মূলধন যোগাইবার মত অন্য কোন লোকের অভাব, মহাজনদের মূলধনের স্বল্পতা, সমবায় সমিতি ও লোন অফিসসমূহে প্রয়োজন মত টাকা ধার দিবার অক্ষমতা, খাতকদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা, ইত্যাদি।"

উন্নত প্রণালীর যানবাহনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। ইহা যে দরিদ্র কৃষকসম্প্রদায়ের পক্ষে অবিমিশ্র কল্যাণকর হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড বলেন ঃ—

"রেলওয়েগুলি অবস্থা আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে, দুর্ভিক্ষের এলাকা বৃদ্ধি করিয়াছে।......এক একটি ফার্ম গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সূর্যের মত সমস্ত শুষিয়া নেয়, পড়িয়া থাকে নীরস মরুভূমি। ফসলের দুই এক সপ্তাহ পরেই, ভারতের উদ্বৃত্ত গম ও চাল কারবারীদের হাতে চলিয়া যায় এবং পর বৎসর যদি অনাবৃষ্টি হয়, তবে কৃষক না খাইয়া মরে।" *Awakening of India,* p. 165.

মিঃ হোরেস বেল এক সময়ে স্টেট রেলওয়েসমূহের জন্য ভারত গবর্নমেন্টের কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ১৯০১ সালে সোসাইটি অব আর্টসে পঠিত একটি প্রবন্ধে তিনি ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। ১৮৭৮ সালে স্যার জর্জ ক্যাম্বেলও বলেন,—

"চলাচলের ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে খাদ্যশস্যাদি সমস্ত রপ্তানি হইয়া যাইতেছে, এবং শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার পুরাতন অভ্যাস লোপ পাইয়াছে। এই অভ্যাসই পূর্বে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচস্বরূপ ছিল।"

বিশ বৎসর পরে ১৮৯৮ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশনও এই মত সমর্থন করিয়াছেন, রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার এবং চলাচলের উন্নততর ব্যবস্থা শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি হ্রাস করিয়াছে। অজন্মার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায়স্বরূপ এই প্রথা পূর্বে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল।"

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে রেলওয়ে দ্বারা ভারতে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয় নাই। বস্তুতঃ, আনুষঙ্গিক আত্মরক্ষার উপায় ব্যতীত, রেলওয়ের দ্বারা অবিমিশ্র কল্যাণ হয় না। কিন্তু এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা তোতাপাখীর মত ক্রমাগত আবৃত্তি করিয়া থাকেন যে, রেলওয়ে ভারত হইতে দুর্ভিক্ষ দূরীভূত করিয়াছে।(১)

মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড যথার্থই বলিয়াছেন যে, রেলওয়ে দুর্ভিক্ষের এলাকা বৃদ্ধি করিয়াছে। আর একটা কথা। পূর্বে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য রায়ত ও গ্রামবাসীরা বিবাদ-বিসংবাদে গ্রামের মাতব্বরদের সালিসীতেই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু এখন তাহারা রেল, মোটরবাস ও দ্রুতগামী স্টীমারে জেলা ও মহকুমা শহরে মামলামোকদ্দমা করিতে ছুটে, বাংলাদেশে বহুসংখ্যক লাইট রেলওয়ে ও তৎসংসৃষ্ট স্টীমার সার্ভিস মামলাবাজদের অর্থে পুষ্ট হইতেছে। সুতরাং চলাচলের উন্নত ব্যবস্থা রায়তদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে বৈকি!!

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, পূর্বে আমাদের গ্রাম্য জীবনে যে উৎসাহ ও জীবনের স্পন্দন ছিল, তাহা এখন লোপ পাইয়াছে। পক্ষী ও মৎস্যদের মধ্যে জীবনের যে সহজ সরল আনন্দ দেখা যায়, পূর্বে আমাদের গ্রামবাসীদের মধ্যেও সেইরূপ আনন্দের প্রাচুর্য ছিল। তরুণেরা জাতীয় ক্রীড়াকৌতুকে যোগদান করিত। জন্মাষ্টমী উৎসবে কুস্তি, মল্লক্রীড়া প্রভৃতি হইত, কুস্তিগীরেরা তাহাতে যোগ দিত। অমৃতবাজার পত্রিকা সেই অতীত গ্রাম্য জীবনের একটি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"ম্যালেরিয়া, কলেরা ও কালাজ্বর গ্রামকে তখন ধ্বংস করিত না। দারিদ্র্য (যাহার কারণ সুবিদিত) তখন লোককে কঙ্কালসার, নিরানন্দ করিয়া তুলিত না। বিদেশী ভাষায় লিখিত পুস্তকের চাপে এবং অসঙ্গত পরীক্ষাপ্রণালীর ফলে, তরুণ বয়স্কেরা শিশুকাল হইতে এইভাবে নিষ্পেষিত হইত না। প্রত্যেক গ্রামে আখড়া ছিল এবং সেখানে লোকে নিয়মিত ভাবে কুস্তি, লাঠিখেলা, অসিক্রীড়া ও ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করিত ; অন্যান্য শারীরিক ব্যায়ামও শিখিত। বৎসরে অন্ততঃ দুইবার—দুর্গাপূজা ও মহরমের সময়,—বড় রকমে খেলাধূলা ও ব্যায়াম প্রদর্শনী হইত। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সানন্দে এই উৎসবে দর্শকরূপে যোগদান করিত। আমাদের বড়লোকেরা এখন মোটরগাড়ী ও কুকুরের জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া আনন্দলাভ করেন। কিন্তু সেকালে স্বতন্ত্র প্রথা ছিল। বড়লোকেরা পালোয়ান ও কালোয়াতদের পোষণ করা কর্তব্যজ্ঞান করিতেন। সুতরাং পূর্বকালে ধনীদের বাসভূমি যে সঙ্গীত ও মল্লবিদ্যার কেন্দ্রস্থান ছিল, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। লোকে কালোয়াত ও পালোয়ানদের ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত।

---

(১) কিন্তু সরকারী বিবরণ অনুসারে—রেলওয়ে দেশ হইতে দুর্ভিক্ষ দূর করিয়াছে। যথা,—"পূর্বে যে সব প্রেতমূর্তি ভারতীয় কৃষকদের পশ্চাদনুসরণ করিত, এখন তাহার একটি সৌভাগ্যক্রমে পরাস্ত হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ এখন আর পূর্বেকার মত ভয়াবহ নহে—রেলওয়ে, খাল এবং ভারত গবর্নমেণ্টের সতর্কতা, নানারূপ কার্যকরী উপায়ের ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।"—কোটম্যান, ইণ্ডিয়া ১৯২৬—২৭।

"বর্তমানে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। পঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র পালোয়ানদের সংখ্যা অতি সামান্য। লোকে তাহাদের বড় একটা খাতিরও করে না। বাংলাদেশের অবস্থা আরও শোচনীয়। এখানে লোকের ধারণা যে, পালোয়ানেরা গুণ্ডা, এবং দরোয়ানশ্রেণীর লোকেরাই ডন-বৈঠক-কুস্তি প্রভৃতি করিয়া থাকে। সুতরাং বাংলার লোকেরা এরূপ অক্ষম ও দুর্বল হইবে এবং যাহারা জোর করিয়া তাহাদের ধনপ্রাণের উপর চড়াও করিবে, তাহাদেরই পদতলে পড়িবে, ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে।"

বাংলার গ্রামবাসী ধীবরদের মধ্যে, দুই একখানি করিয়া "মালকাঠ" থাকিত(১০)। তাহারা মাটি হইতে এগুলিকে ঊর্ধ্বে তুলিবার জন্য সকলকে বল পরীক্ষায় আহ্বান করিত। প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ দুই একখানি "মালকাঠ" থাকিত। বসন্তাগমে এবং চড়ক উৎসবে যাত্রার(১১) দল গঠিত হইত এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে যাহার একটু জ্ঞান থাকিত, সেই ঐসব দলে ভর্তি হইতে পারিত। জাতিধর্মের ভেদ লোকে এ সময় ভুলিয়া যাইত। আমার বেশ স্মরণ আছে,—নিরক্ষর মুসলমান কৃষকদেরও এইসব যাত্রার দলে লওয়া হইত। আমার পিতা ভাল বেহালা বাজাইতে পারিতেন। এই সময়ে তিনি গ্রামের ভাল ভাল গায়কদের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার বিচারে যাহাদের গান ভাল উৎরাইত, তাহারা তাঁহার বৈঠকখানায় সসম্মানে স্থান পাইত, এবং সেখানে বসিয়া নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিত। এখনও সেই বেহালা, সেতার প্রভৃতির সুর যেন আমার কানে ভাসিয়া আসিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতে বাংলা-দেশে "বার মাসে তের পার্বণ" হইত এবং সর্বপ্রধান জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজার কথা আমার এখনও মনে আছে ; দুর্গাপূজা যতই নিকটবর্তী হইত, ততই লোকের মনে কি আনন্দের স্পন্দন হইত! প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন তৈরি হইত এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে বিশেষভাবে আমাদের প্রজাদের মধ্যে, উহা অকাতরে বিতরণ করা হইত ; নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভূরিভোজন করান হইত। রাত্রে যাত্রা অভিনয় হইত—তখন পর্যন্ত সুদূর গ্রামে থিয়েটারের আবির্ভাব হয় নাই। দশ বার দিন আমোদপ্রমোদে মাতিয়া উঠিতাম, তারপর বিসর্জনান্তে বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ফিরিতাম। কপোতাক্ষ নদীর তীরে যাঁহার জন্মভূমি সেই কবি (মাইকেল মধুসূদন দত্ত) এই পূর্বস্মৃতি হইতেই লিখিয়াছিলেন,—

'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।' হায়, কাল আমাদের মনের কি ঘোর পরি-বর্তনই সাধন করিয়াছে!

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত আমিও অনুভব করি—"এমন এক সময় ছিল, যখন মাঠ, বন, নদী, পৃথিবীর সমস্ত সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যই আমার স্বর্গীয় আলোকে প্রতিভাত হইত। স্বপ্নের মাধুর্য ও গৌরবে তাহা যেন মণ্ডিত বোধ হইত। কিন্তু

(১০) মল্লকাষ্ঠ—বড় একটি গাছের গুঁড়ির খণ্ড বিশেষ।

(১১) যাত্রা সম্বন্ধে পাঠক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তিকা (লণ্ডন, ১৮৮২) দেখিতে পারেন।

এখন আর অতীতের সে ভাব নাই। দিনে বা রাত্রে যখনই যে দিকে চাই, যে দৃশ্য পূর্বে একদিন দেখিয়াছি, এখন আর তাহা দেখিতে পাই না।

*   *   *

"হায়, সেই স্বপ্নময় দৃশ্য কোথায় গেল? অতীতের সেই মাধুর্য ও গৌরব কোথায় অন্তর্হিত হইল?"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বাংলার তিনটি জেলার আর্থিক অবস্থা

বাংলায় ২৮টি জেলা আছে। তাহার প্রত্যেকটি জেলার আর্থিক বর্ণনা করিতে গেলে, পাঠকদের পক্ষে তাহা প্রীতিকর হইবে না। সেই কারণে আমি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের তিনটি জেলা বাছিয়া লইয়াছি—যথা—পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া, পূর্ব-বঙ্গে ফরিদপুর এবং উত্তরবঙ্গে রংপুর।

(১) ব্রিটিশ আমলে বাঁকুড়া—বাংলার একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জেলা

হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বে, নিয়মিতভাবে পুষ্করিণী ও খাল কাটা হইত, বড় বড় বাঁধ দিয়া গ্রীষ্মকালের জন্য জল ধরিয়া রাখা হইত। কিন্তু বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলার স্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এই প্রথা লোপ পাইতে লাগিল। পলাশীর যুদ্ধের ৪০ বৎসর পরে কোলব্রুক লিখিয়াছিলেন,—"বাঁধ, পুকুর, জলপথ প্রভৃতির উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, ঐগুলির অবনতিই হইতেছে।" ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঁকুড়ার অবস্থার আলোচনা করিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে।

১৭৬৯—৭০ সালের দুর্ভিক্ষে ('ছিয়াত্তরের মন্বন্তর') বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া গিয়াছিল। বাঁকুড়া ও তাহার সংলগ্ন বীরভূমের উপর ইহার আক্রমণ প্রবল ভাবেই হইয়াছিল। তৎপূর্বে মারাঠা অভিযানের ফলে এই অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষের শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। "বাংলার প্রাচীন পরিবার সমূহ, যাহারা মোগলআমলে অর্ধ স্বাধীন ছিল, এবং ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট পরে যাহাদিগকে জমিদার বা জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাদের অবস্থাই অধিকতর শোচনীয় হইল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার প্রাচীন বনিয়াদী সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।(১) কিন্তু তৎসত্ত্বেও জমিদার ও জোতদারদের নিকট হইতে পাই পয়সা পর্যন্ত হিসাব করিয়া নিঃশেষে খাজনা আদায় করা হইল। লর্ড কর্নওয়ালিস এইরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিয়া ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বলেন,—"জমি চাষ করা হয় নাই। বাংলায় কোম্পানির সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।"(২)

ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বীরভূমের রাজা সাবালক হওয়ায় এক বৎসরের

---

(১) Hunter—Annals of Rural Bengal.

(২) "অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঐ সম্প্রদায় দ্রুত ধ্বংস পাইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে তাহাদের রাজ্য জনশূন্য হইয়াছিল, এবং ইংরাজেরা এই সব করদ নৃপতিকে জমিদার রূপে গণ্য করিয়া তাহাদিগকে অধিকতর দায়গ্রস্ত এবং ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করিল।"—Hunter.

মধ্যেই বাকী খাজনার দায়ে কারারুদ্ধ হন এবং বিষ্ণুপুরের সম্ভ্রান্ত রাজা, বহু বৎসর কষ্টভোগ করিবার পর কারামুক্ত হন ও অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান।

এইখানেই শেষ নয়। বিষ্ণুপুরের রাজার বংশধরেরা ক্রমে ক্রমে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হইয়া যান এবং যে বিশাল রাজ্যের উপরে তাঁহারা এক কালে প্রভুত্ব করিতেন, তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া নূতন জমিদারদের হস্তে যাইয়া পড়ে। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজা ইহার একটি বৃহৎ অংশ ক্রয় করেন। ১৮১৯ সালের ৮নং রেগুলেশান, বিশেষভাবে বর্ধমানরাজের স্বার্থরক্ষার জন্যই প্রবর্তিত হয় এবং এই রেগুলেশানের বলে বর্ধমানের মহারাজা চিরস্থায়ী খাজনা বন্দোবস্তে ৩৪১টি পত্তনী তালুক ইজারা দেন। পত্তনিদারেরা আবার দরপত্তনিদারদের ইজারা দেয়। এইরূপে যে প্রথা প্রবর্তিত হয়, তাহার ফলে বাঁকুড়ার অধিবাসীরা, এবং কিয়ৎ-পরিমাণে অন্যান্য জেলার লোকেরাও বহু দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছে।

বিষ্ণুপুরের রাজা বিষ্ণুপুরেই থাকিতেন এবং প্রজাদের শাসন করিতেন। তিনি হাজার হাজার বাঁধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ষাকালে এই সব বাঁধে জল ভর্তি হইয়া থাকিত এবং গ্রীষ্মকালে জলাভাবের সময়ে তাহা কাজে লাগিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সর্বাপেক্ষা বড় প্রবাসী ভূস্বামী হইয়া উঠিলেন। জগতে এরূপ অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত দেখা যায় নাই। প্রসিদ্ধ 'সূর্যাস্ত আইনের' বলে—রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। কোম্পানির অধীনে আবার জমিদারেরা ছিলেন, তাঁহারাও জোতদারদের নিকট খাজনা আদায় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রবাদ আছে, যাহা সকলের কাজ তাহা কাহারও কাজ নয়,—'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'। সুতরাং যে জলসেচ-প্রণালী বহু যত্নে, কৌশলে ও দূরদর্শিতার সহিত প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইল।

মিঃ গুরুসদয় দত্ত বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টররূপে কতকগুলি সমবায় সমিতি গঠন করিয়া ঐ জেলার কতকগুলি পুরাতন বাঁধ সংস্কার করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"পশ্চিমবঙ্গে পুকুর, বাঁধ প্রভৃতি জলসেচ-প্রণালীর ধ্বংসের সহিত তাহার পল্লী-ধ্বংসের কাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গের যে কোন জেলায় গেলে দেখা যাইবে, অনাবৃষ্টির পরিণাম হইতে আত্মরক্ষার জন্য জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে, সেকালের জমিদারেরা অসাধারণ দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত—অসংখ্য বাঁধ ও পুকুর কাটিয়াছিলেন। এই বাঁধ ও পুকুর নির্মাণের জন্য বাঁকুড়াই বিখ্যাত ছিল,—একদিকে মল্লভূমির জমিদারেরা, অন্যদিকে বিষ্ণুপুরের রাজারা এই কার্যে বিশেষ রূপে উদ্যোগী ছিলেন। আবার ইঁহাদেরই বংশধরদের অদূরদর্শিতা, সঙ্কীর্ণতা, ও আত্মহত্যাকর নীতির ফলে এই সব অসংখ্য বাঁধ ও পুকুর—যাহার উপর সমগ্র জেলার স্বাস্থ্য নির্ভর করিত—ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হইয়া গেল। ছোট ছোট খাল দ্বারা বড় বড় বাঁধগুলি পুষ্ট হইত এবং এই সব বড় বড় বাঁধ হইতে চতুর্দিকের জমিতে জলসেচন করা হইত। এই সব বাঁধে কেবল জমিতেই জলসেচন করা হইত না, মানুষ ও পশুর পানীয় জলের জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইত।

"পরবর্তী বংশধরেরা তাহাদের স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্যের উৎসস্বরূপ এই সব বাঁধ ও পুকুরকে উপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের অকর্মণ্যতা ও ঔদাসীন্যের ফলে বৎসরের পর বৎসর পলি পড়িয়া এই সব জলাধার ভরাট হইতে লাগিল, অবশেষে ঐগুলি সম্পূর্ণ শুষ্ক ভূমি অথবা ছোট ছোট ডোবাতে পরিণত হইল। চারিপাশের উচ্চ বাঁধগুলি পতিত জমি হইয়া দাঁড়াইল।"

অন্য এক স্থানে মিঃ দত্ত লিখিয়াছেন,—"ইহার ফলে বাঁকুড়া আজ মরা পুকুরের দেশ। বহু বাঁধ একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কতকগুলির সামান্য চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। কোন কোনটি পঙ্কিল জলপূর্ণ সামান্য ডোবাতে পরিণত হইয়াছে। এক বাঁকুড়া জেলাতেই প্রায় ৩০।৪০ হাজার বাঁধ, পুকুর প্রভৃতি ছিল; উপেক্ষা, অকর্মণ্যতা ও ঔদাসীন্যের ফলে ঐগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; এবং বাঁকুড়া জেলাতে আজ যে দারিদ্র্য, ব্যাধি, অজন্মা, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠব্যাধি প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহা ঐ প্রাচীন জল সরবরাহের ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া যাইবার প্রত্যক্ষ ফল।"

বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গবর্নমেণ্টকে নির্দিষ্ট রাজস্বের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, এবং জলসেচের সুব্যবস্থার ফলে জমির যদি উন্নতি হয়, তাহা হইলেও এই রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই জলসেচ ব্যবস্থার প্রতি শাসকগণের এমন ঔদাসীন্য। আমাদের গবর্নমেণ্টের উদার শাসন-প্রণালীতে লোকের শ্রী ও কল্যাণের মূল্য কিছুই নাই বলিলে হয়। ইহার তুলনায় সিন্ধুদেশের শুষ্ক মরুভূমির জন্য গবর্নমেণ্টের অতিমাত্র কর্মোৎসাহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সুক্কুর বাঁধের স্কীমে বহুবিস্তৃত স্থানে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং উহার জন্য ব্যয় পড়িবে প্রায় ২০।২৫ কোটি টাকা। অবশ্য, স্কীমের ফলে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের (গমের) পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু এই স্কীমের মূলে আর একটি উদ্দেশ্য আছে। সুক্কুর বাঁধের ফলে যে জমির উন্নতি হইবে, সেখানে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ ভাল হইবে। ল্যাঙ্কাশায়ার, তুলার জন্য আর আমেরিকার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চায় না। এই কারণে একদিকে সুদানের উপর তাহাদের বজ্রমুষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে, অন্যদিকে ভারতের করদাতাদের কষ্টলব্ধ অর্থ বেপরোয়াভাবে ব্যয় করা হইতেছে। এখানেও সাম্রাজ্যনীতিই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

একথা কেহই বলিবে না যে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট দুষ্টবুদ্ধির প্রেরণায় ইচ্ছা করিয়া এই উর্বরা জেলার (বাঁকুড়ার) ধ্বংস সাধন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যই যে ইহার জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ দত্ত ব্যাধির মূল নির্ণয় করিতে গিয়া অর্ধপথে থামিয়া গিয়াছেন। একজন 'ব্যুরোক্রাট' হিসাবে স্বভাবতঃই তিনি একার্যে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদের অর্থনৈতিক দুর্গতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সর্বত্রই জড়িত; 'শ্বেত-জাতির দায়িত্ব' আমদানি হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সুন্দর বাঁকুড়া জেলা নিশ্চিতরূপে ধ্বংসের পথে গিয়াছে। প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবদূতের পঞ্চসঞ্চালনে যেমন চারিদিক শুকাইয়া যায়, ইহাও তেমনি শোচনীয় ব্যাপার। কার্যকারণ সম্বন্ধ এক্ষেত্রে স্পষ্ট-রূপেই প্রমাণ করা যাইতে পারে।

আমেরিকাতে সমবায়-প্রণালী যে আশ্চর্যরূপ সুফল প্রসব করিয়াছে, মিঃ দত্ত তাহার একটি চমৎকার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। যথা :—

"আমেরিকায় কৃষিকার্যে সমবায়-প্রণালীর কার্যকারিতা বর্ণনা করিতে গিয়া হ্যারল্ড পাওয়েল বলিয়াছেন যে, ১৯১৯ সালে আমেরিকার সমগ্র কর্ষণযোগ্য ভূমির ১ কোটি ৪০ লক্ষ একর) প্রায় এক-তৃতীয়াংশেই সমবায়-প্রণালীতে কাজ হইয়াছিল। 'আমার বিশ্বাস আমেরিকার জলসেচ-ব্যবস্থায় সমবায়-প্রণালী যেভাবে প্রচলিত হইয়াছে, এমন আর কিছুতে নহে।' আমেরিকার এই সমবায়-প্রণালী পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের পক্ষে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমেরিকার সমবায়-প্রণালী জলহীন মরুভূমিবৎ উটা প্রদেশের উন্নতিকল্পেই প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের বর্তমান অবস্থার চেয়ে উটা প্রদেশ তখন অধিকতর জলাভাব-গ্রস্ত ছিল।

"সমবায় প্রণালীই উটা প্রদেশের উন্নতির মূল কারণ একথা বলা যাইতে পারে। এই প্রণালীতে জলসেচ ব্যবস্থা এখানে যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে উহা অন্যান্য শিল্পেও অবলম্বিত হয়। ইহার প্রমাণ, আমেরিকাতে অসংখ্য সর ও মাখনের ব্যবসা, ফলের ব্যবসা, স্টোর প্রভৃতি সমবায়-প্রণালীতে চলিতেছে।"

মিঃ দত্ত বাঁকুড়ার অধিবাসীদিগকে মর্মস্পর্শী ভাষায় উটার অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি ব্যাধির মূল কারণ দেখাইতে পারেন নাই ; এই জায়গায় তিনি পুরাদস্তুর সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন যে, উটার অধিবাসীরা অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতীয়, তাহাদের মধ্যে বহুকাল হইতে স্বায়ত্ত-শাসন এবং আত্মনির্ভরতার নীতি প্রচলিত আছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভাবও তাহাদের মধ্যে সুদৃঢ়। পক্ষান্তরে ভারতবাসীদের মধ্যে যাহা কিছু স্বায়ত্তশাসনের ভাব ছিল, তাহা বিদেশী শাসনের আমলে প্রাচীন গ্রাম্য পঞ্চায়েত ধ্বংস হইবার সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আধুনিক অসংখ্য জোতদারি (বা পত্তনিদারি) ও দরজোতদারির ব্যবস্থাই বাঁকুড়ার দুর্ভাগ্য ও বিপত্তির কারণ, ইহা আমি দেখিয়াছি। এই অংশ লিখিত হইবার পর আমি স্যার উইলিয়াম উইলকক্সের বহি পাঠ করিয়াছি। তিনিও বাংলাদেশের এই দুর্গতির মূল নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"আপনাদের ভূমি-রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, মূলতঃ কৃষকদের মঙ্গলের জন্যই প্রবর্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার ফল অনিষ্টকর হইয়াছে ; আপনাদের বংশপরম্পরাগত সহযোগিতার শক্তি উহাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, জলসেচ-ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়াছে এবং ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইয়াছে· **The Restoration of the Ancient Irrigation of Bengal, p. 24.**

এই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আরও বলিয়াছেন :—

"বাংলাদেশ এত কাল ধরিয়া সমগ্র ভারতের সাধারণ তহবিলে লক্ষ লক্ষ টাকা

যোগাইয়াছে; কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ—বাংলার এই দুই অংশই এই দেড়শত বৎসর ধরিয়া, গবর্নমেণ্টের রাজধানী থাকা সত্ত্বেও অধিকতর দারিদ্র্যপীড়িত ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। ভারতে একটা প্রবাদ আছে—'প্রদীপের নীচেই অন্ধকার'; এক্ষেত্রে তাহা বিশেষ ভাবে খাটে।"

এদেশে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা এবং অধিবাসীদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে প্রচুর জল সরবরাহের উপযোগিতা মুসলমান শাসকেরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আর একজন ইংরাজ লেখক তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, ১৪শ শতাব্দীর পাঠান শাসকেরা ইংরাজ আমলের বণিকরাজগণের অপেক্ষা অধিকতর দূরদর্শী, উদারনীতিক লোকহিতপ্রবণ, এবং প্রজাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিল? বণিক-রাজগণ, আত্মপ্রশংসাতেই তৃপ্ত, প্রজাদের উন্নতিকর কোন ব্যবস্থার প্রতি তাঁহারা উদাসীন, এমন কি তৎসম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাবই পোষণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের চোখের সম্মুখে যে অপূর্ব সভ্যতা ও শিল্পৈশ্বর্য ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেজন্য তাঁহারা বিন্দুমাত্র লজ্জা অনুভব করেন নাই। সেই প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতি-চিহ্ন এখনো বর্তমান রহিয়াছে। কিরূপে তাহা জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া শুষ্ক মরুভূমিবৎ স্থানসমূহকেও পৃথিবীর অন্যতম উর্বর ও ঐশ্বর্যশালী প্রদেশে পরিণত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এখনও আছে।......

"যাঁহারা নিরপেক্ষ ও ধীরভাবে ভারতের বর্তমান জনহিতকর কার্যাবলী পরীক্ষা করিবেন, তাঁহারাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে পাঠান ফিরোজের ৩৯ বৎসরের শাসনকাল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক শতাব্দী ব্যাপী শাসনকাল অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর ছিল। এই এক শতাব্দীকাল বলিতে গেলে ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ অপব্যয় স্বরূপ হইয়াছে।"—১৯২৯, ১৫ই জুনের 'ওয়েলফেয়ারে', বি. ডি. বসু কর্তৃক উদ্ধৃত।

একখানি সরকারী দলিলে লিখিত আছে ঃ—

"সুলতান অত্যন্ত জলাভাব দেখিয়া মহানুভবতার সঙ্গে হিসার ফিরোজা এবং ফতেবাদ শহরে জলসরবরাহের ব্যবস্থা করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি যমুনা ও শতদ্রু এই দুই নদী হইতে দুইটি জলপ্রবাহ শহরে আনিলেন। যমুনাগত জল-প্রবাহের নাম রাজিওয়া, অন্যটির আলগখানি। এই দুইটি জলপ্রবাহই কর্নালের নিকট দিয়া আসিয়াছিল এবং ৮০ ক্রোশ চলিবার পর একটি খাল দিয়া হিসার শহরে জল যোগাইয়াছিল।...ইহার পূর্বে চৈত্রের ফসল নষ্ট হইত, কেননা জল ব্যতীত গম জন্মিতে পারে না। খাল কাটিবার পর, ফসল ভাল হইতে লাগিল।...আরও বহু জলপ্রবাহ এই শহরে আনিবার ব্যবস্থা হইল এবং ফলে এই অঞ্চলের ৮০।৯০ ক্রোশ ব্যাপী স্থান কর্ষণযোগ্য হইয়া উঠিল।(৩)

(৩) "লম্বার্ডি প্রদেশে গ্রীষ্মকালে নিম্ন আল্‌প্‌স পর্বতের বাহিরে জলাভাব ঘটে, কিন্তু মধ্য যুগ হইতে এখানে এমন চমৎকার জলসেচের ব্যবস্থা আছে, যাহা ইউরোপের কুত্রাপি নাই। সুতরাং এখানে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।"

"রোটক খালের উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছিল। ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হিসার ফিরোজা (ফিরোজাবাদ) হইতে দিল্লী শহর পর্যন্ত জলসেচের জন্য একটি খাল খনন করা হয়। আলিমর্দান খাঁ আড়াই শত বৎসর পূর্বে তৈরি এই খালের সাহায্য যতদূর সম্ভব লইয়াছিলেন এবং তাহা হইতে নূতন খাল কাটিয়াছিলেন।"—Rohtak District Gazetteer, 1884, p. 3.

এই সমস্ত কথা এখন উপন্যাস বলিয়াই মনে হয়। আমাদের সভ্য গবর্নমেণ্ট কুপার্স হিল কলেজে এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সুশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারদের গর্ব করিয়া থাকেন,—কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১৪শ শতাব্দীর মুসলমান শাসকদের নিকট হইতে তাঁহাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে।

জলসেচের এই অবস্থা! কিন্তু এই অভিশপ্ত জেলার (বাঁকুড়ার) দুঃখ-দুর্দশা, আরও নানাকারণে এখন চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। রেশমের গুটী হইতে সুতা-কাটা এবং বস্ত্রবয়ন এই জেলার একটি প্রধান শিল্প ছিল। সহস্র সহস্র লোক এই বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। পিতল ও কাঁসার শিল্পের দ্বারাও বহু সহস্র লোকের (কাঁসারীদের) অন্ন-সংস্থান হইত। কিন্তু এই দুই শিল্পই এখন ধ্বংসোন্মুখ।

রেশমবস্ত্রের শিল্পই বোধহয় বাঁকুড়ার সর্বাপেক্ষা প্রধান শিল্প। শত শত পরিবার ইহার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুর, সোনামুখী এবং বীরসিংহের তাঁতীরা, লাল, হলদে, নীল, বেগুনি, সবুজ রঙের রেশমের শাড়ী এবং বিবাহের জন্য রেশমের 'জোড়' তৈরি করিয়া থাকে। স্থানীয় মহাজনেরা এই সব রেশমের কাপড় ভারতের নানা স্থানে রপ্তানি করিয়া থাকে। এদেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিবাহ উপলক্ষে এই সব রেশমের শাড়ী ও জোড় বহুলপরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বেও, প্রত্যেক তাঁতীপরিবার তাঁতপিছু দৈনিক দুই টাকা হইতে তিন টাকা পর্যন্ত রোজগার করিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনী হইবার কয়েক মাস পর হইতেই বিষ্ণুপুরের রেশমের কাপড়ের মূল্য হ্রাস হইতে থাকে। রেশমের সুতা, জরী প্রভৃতি কাঁচা মালের মূল্য পূর্ববৎই থাকে। রেশমের কাপড়ের মূল্য কমিতে কমিতে এতদূর নামিয়া আসিয়াছে যে, তাঁতীরা অনেকস্থলে বাধ্য হইয়া কাপড় বোনা ছাড়িয়া দিয়াছে।

"দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ বা গবর্নমেণ্ট এ পর্যন্ত এই দুরবস্থার কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। বিষ্ণুপুর শিল্পপ্রধান শহর। এ স্থানের অধিকাংশ লোক তন্তুবায়, কর্মকার বা শাঁখারী। এই তাঁতীদের এবং কামারদের অত্যন্ত দুর্দশা হইয়াছে।

"পিতল শিল্পের বাজার অত্যন্ত মন্দা। বিদেশ হইতে অ্যালুমিনিয়াম ও এনামেলের বাসন আমদানির ফলে এই শিল্পের অবনতি হইয়াছে ; এই শিল্পের পুনরুদ্ধারের আশা নাই।

"প্রাচীন বিষ্ণুপুর শহরের দুইটি প্রধান শিল্প এইভাবে নষ্ট হওয়াতে, এই স্থানের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে এবং শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা

বিষ্ণুপুর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। বিষ্ণুপুর শহরের শতকরা ৭০ জন লোক এজন্য দুর্গতিগ্রস্ত হইয়াছে।"(৪)

(২) ফরিদপুর—বাংলায় খাদ্যাভাব

আমি উপরে যে জেলার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছি, তাহা বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে শুষ্ক ও জলহীন, এবং অনেক সময়ে বৃষ্টিও ঐ অঞ্চলে ভাল হয় না। পক্ষান্তরে অন্য একটি জেলার কথা বলিব, যাহা গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত এবং প্রকৃতি যাহার উপর সদয়। এখানে বর্ষার সময়ে জমির উপর পলিমাটি পড়িয়া তাহার উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। আরও একটি কারণে, এই জেলার কথা বলিতেছি ; আমি কয়েকবার এই জেলায় ভ্রমণ করিয়াছি, এবং লোকের প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। একটা প্রধান কথা মনে রাখিতে হইবে,—বাংলার সর্বত্র কৃষিজাত দ্রব্যই আয়ের একমাত্র পথ,—১৮৭০ সালের কোঠা পর্যন্ত যে সমস্ত আনুষঙ্গিক বৃত্তি সহস্র সহস্র লোক অবলম্বন করিয়া বাঁচিত, তাহা সর্বত্রই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বয়নশিল্প দ্রুত লোপ পাইতেছে,—পূর্বে নদীতে মাল ও যাত্রী বহনের জন্য যে সব বড় বড় নৌকা চলিত, বিদেশী কোম্পানির জাহাজ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। যে সব তাঁতী, জোলা ও মাঝি-মাল্লাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহারা সকলে এখন কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। ফলে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িয়াছে।(৫)

অধুনাতন রিপোর্ট হইতে, জেলার (ফরিদপুর) উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের একটা তালিকা দেওয়া হইল ঃ—

ফরিদপুরের কৃষিজাত পণ্য(৬)

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ (একর)	প্রতি একরে উৎপন্ন মণ	সে	ছ	মোট উৎপন্ন (মণ)	প্রতি মণের দর টা	আঃ	পাঃ	মোট মূল্য
আশু ধান	২,৩৯,৩০০	১০	৩০	০	২৫,৭২,৪৭৫	৬	১৩	০	১,৭৫,২৪,৯৮৫
আমন ধান	৭,৫৯,৯০০	১২	২০	০	৯৪,৯৮,৭৫০	৭	৪	০	৬,৮৮,৬৫,৯৩৭

---

(৪) অমৃতবাজার পত্রিকা—৫ই জুলাই, ১৯২৮ তারিখে প্রকাশিত পত্র দ্রষ্টব্য।

(৫) "বয়নশিল্প বাংলার একটা বড় শিল্প ছিল, বিদেশী কাপড়ের আমদানি ঐ শিল্প নষ্ট হইবার অন্যতম কারণ"।—Jack : *The Economic Life of a Bengal District.*

"এই জেলায় পদ্মা, মেঘনা, মধুমতী প্রভৃতি বড় বড় নদীতে স্টীমার চলাচল করে, জেলার অভ্যন্তরে আরও অনেক নদীতে স্টীমার যায়।"—O' Malley ; *Faridpore* (1925).

"মাছ ধরিয়া প্রায় ৪৭ হাজার লোক জীবিকা নির্বাহ করে,—যাহারা মাছ ধরে ও যাহারা উহা বিক্রয় করে, তাহারা সকলেই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।......জেলার প্রধান ব্যবসা—কৃষিজাত পণ্য লইয়া।" O' Malley.

(৬) ১৯২৪-২৫ হইতে ১৯২৮-২৯ এই পাঁচ বৎসরের বাজার-দরের গড় হইতে এই হিসাব সংকলিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে ফরিদপুর কৃষি-ফার্মের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি।

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ (একর)	প্রতি একরে উৎপন্ন মণ	সে	ছ	মোট উৎপন্ন (মণ)	প্রতি মণের দর টা	আঃ	পাঃ	মোট মূল্য
বোরো ধান	১৪,৪০০	১৪	০	০	২,০১,৬০০	৪	০	০	৮,০৬,৪০০
গম	২,৭০০	৮	৩০	০	২৩,৬২৫	৪	১৪	০	১,১৫,১৭১
যব	১১,৭০০	১০	৩০	০	১,২৫,৭৭৫	৩	৬	০	৪,২৪,৪৯০
ছোলা	৩,৫০০	৯	৩০	০	৩৪,১২৫	৪	৮	০	১,৫৩,৫৬২
ডাল	১,০১,২০০	১০	৩০	০	১০,৮৭,৯০০	৪	০	০	৪৩,৫১,৬০০
তিসি	৬,০০০	৫	৩০	০	৩৪,৫০০	৭	০	০	২,৪১,৫০০
তিল	১১,২০০	৬	০	০	৬৭,২০০	৬	০	০	৪,০৩,২০০
সরিষা	২৪,৬০০	৬	০	০	১,৪৭,৬০০	৭	২	০	১০,৫১,৬৫০
মসলা	২৮,৩০০				প্রতি একর	২৫	০	০	৭,০৭,৫০০
গুড়	৭,৪০০	৩৭	০	০	২,৭৩,৮০০	৯	৭	০	২৫,৮৩,৯৮৭
পাট	২,১১,৭০০	১৬	১০	১০	৩৪,২২,২৬২	৯	৬	০	৩,২০,৮৩,৭১৩
তামাক	৪,৪০০	৬	০	০	২৬,৪০০	১৮	০	০	৪,৯০,০৫০
ফল ও শাক সবজি	৬২,২০০				প্রতি একর	১৫	০	০	৯,৩৩,০০০
								মোট টাকা	১৩,০৭,৩৬,৭৪৫

উপরে লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, ফরিদপুরের লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৫৭৲ হইতে ৫৮৲ টাকা,—(ফরিদপুরের লোকসংখ্যা ২২½ লক্ষ)। জ্যাক ও ও'মালী সকলশ্রেণীর লোকের হিসাব ধরিয়া বার্ষিক আয় মাথাপিছু গড়ে ৫২৲ টাকা, ঋণ ১১৲ টাকা এবং কর ২৷০ আনা ঠিক করিয়াছেন।(৭) জ্যাক বলেন, যে সব লোক শিল্পকার্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৮ জনের বেশী হইবে না, এবং এই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেও এক-তৃতীয়াংশ লোককেও 'কারিগর' বলা যায় না। অধিকাংশ শ্রমিক কুলির কাজ অথবা রাস্তা বা পুকুরে মাটি কাটার কাজ করে। তাহারা ভাল উপায় করে, কাজের মরসুমে দৈনিক এক টাকা অথবা মাসিক গড়ে ১৫৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা পর্যন্ত রোজগার করে। কিন্তু এই কাজের মরসুম বৎসরে দুইমাস থাকে কি না সন্দেহ। কেবল ফসল বোনা ও কাটার সময়ে মজুরের প্রয়োজন হয়। একথা সত্য যে, কতকগুলি ভদ্রলোক কেরানী বা উকিলও কিছু পয়সা উপার্জন করে, কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ গ্রামের অধিবাসী নহে। পক্ষান্তরে, বড় বড় জমিদারির মালিকেরা, তাঁহাদের জমিদারিতে বাস করেন না এবং তাঁহাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রাম হইতে শোষণ করিয়া কলিকাতায় চালান হয়।(৮) ইহাও

(৭) ১৯২৪-২৯ এই পাঁচ বৎসর পাটের দর খুব চড়িয়াছিল, সুতরাং জ্যাকের হিসাবের চেয়ে আমার প্রদত্ত হিসাবে আর বেশি ধরা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে (১৯৩২) পাট, চাউল এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য খুব কম, গত দশ বৎসরের মধ্যে এরূপ হয় না। এবং যদি বর্তমান বাজার-দর অনুসারে হিসাব করা যায়, তবে মাথাপিছু গড় আয় আরও কমিয়া যাইবে, এমন কি অর্ধেক হইবে।

(৮) সমস্ত বড় জমিদারিই কলিকাতাবাসী জমিদারদের অধিকৃত। নিম্নে কতকগুলি বড় জমিদারির তালিকা দেওয়া হইল :—তেলিহাটী আমিরাবাদ—৭২,০০০ একর; হাভেলী—৬০,৯০০ একর; কোটালীপাড়া—৩৪,৬০০ একর; ইদিলপুর—৩৩,২০০ একর। (২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

বিবেচ্য যে, প্রধান খাদ্যশস্য সম্বন্ধে ফরিদপুর জেলা আত্মনির্ভরক্ষম নহে। কেবলমাত্র ইহাই তত বেশী চিন্তার কারণ নহে। বস্তুতঃ, পাট-উৎপাদনকারী জেলাগুলির পক্ষে ইহাকে সুলক্ষণও বলা যাইতে পারে,—কেননা তাহারা তাহাদের বাড়তি টাকা দিয়া বাখরগঞ্জ, খুলনা প্রভৃতি জেলা হইতে চাউল কিনিতে পারে। কিন্তু যদি আমরা সমগ্র বাংলার মোট উৎপন্ন চাউলের হিসাব করি, তাহা হইলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কেননা যে বাংলা ভারতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী প্রদেশ বলিয়া পরিচিত, সেখানে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ সমগ্র লোকসংখ্যার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বাংলাদেশে মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ২৭,৭৩,৭৬,৭০২ মণ। দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে মাথাপিছু বার্ষিক ৭ মণ চাউল প্রয়োজন হয়। বাংলার লোকসংখ্যা ৪,৫৭,৯১,৬৮৯। সুতরাং বাংলার পক্ষে বার্ষিক ৩২,০৫,৪১,৮২৩ মণ চাউলের প্রয়োজন। অতএব বাংলাদেশে মোট ৪,৩১,৬৫,১২১ মণ চাউল কম পড়ে —অর্থাৎ মাথাপিছু বার্ষিক প্রায় এক মণ—অর্থাৎ মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ ‡ সের।(১)

বাংলার একটি অন্যতম উর্বর জেলার অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় এত কম, একথা আশ্চর্য মনে হইতে পারে। ইহার কারণ, লোকবসতির ঘনতা ; এখানে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা গড়ে ৯৪৯ জন। হাওড়া (প্রতি বর্গমাইলে ১,৮৮২ জন), ঢাকা (প্রতি বর্গ মাইলে ১,১৪৮ জন) এবং ত্রিপুরার (৯৭২ জন) পরই ফরিদপুর বাংলাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লোকবসতিপূর্ণ স্থান। এবং যদি কেবলমাত্র কর্ষণযোগ্য জমির হিসাব ধরা যায়, তবে ফরিদপুরের লোকবসতি প্রতি বর্গমাইলে ১,২০২

---

(১) এই সব তথ্য কৃষিবিভাগ হইতে প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে গৃহীত। প্রত্যেক জেলার উৎপন্ন ধান্যের হিসাব ধরিয়া মোট উৎপন্নের পরিমাণ ঠিক করা হইয়াছে। এই সব তথ্য হইতে লতিফের মন্তব্য সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়—"বাংলাদেশে মোট উৎপন্ন চাউল, সমগ্র অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না।" (Economic Aspect of the Indian Rice Export Trade, 1923.) লতিফের হিসব মতে, ভারতের অধিবাসীদের জন্য মোট ৩ কোটি ৩৫.১ লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন হয় ৩ কোটি ২০.২ লক্ষ টন চাউল। সুতরাং ১৫.৫ লক্ষ টন চাউলের ঘাটতি পড়ে। "অতএব দেখা যাইতেছে যে, বর্মা চাউল আমদানি না হইলে পরিণাম অতি শোচনীয় হইত।"

পানান্ডিকর বলেন—"দেখা গিয়াছে যে, পুরুষের পক্ষে দৈনিক আধ সের এবং স্ত্রীলোক বা বালকবালিকাদের পক্ষে তার চেয়ে কিছু কম চাউল হইলেই অনাহারে মৃত্যু নিবারণ করা যায়।... কিন্তু এই পরিমাণ চাউল কোন পরিবারের লোকদের শরীরের পুষ্টি ও বলের পক্ষে যথেষ্ট নহে।"

ব্যানার্জী (Fiscal Policy in India) বলেন,—"স্বাভাবিক অবস্থায় দেশে যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা সমস্ত অভাব মিটাইয়া বিদেশে রপ্তানি করিবার মত কিছু উদ্বৃত্ত থাকে কিনা সন্দেহ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, ভারতে যে মোট খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয, তাহা ভারতবাসীদের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে এবং যদি প্রত্যেক লোককেই উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য দেওয়া যাইত, তবে ভারতকে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইত, সে উহা রপ্তানি করিতে পারিত না।"

"ভারতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টন, কিন্তু ভারতের পক্ষে ৮ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। সুতরাং তাহার খাদ্যশস্য শতকরা ৪০ ভাগ কম পড়ে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতবাসীরা পর্যাপ্ত খাদ্য পায় না।"—C. N. Zutshi, *Modern Review*, Sept., 1927.

সুতরাং এ বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা ও চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মত এই যে—কেবল বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়ে।

হইয়া দাঁড়ায়। মিঃ টমসন ১৯২১ সালে বাংলার আদমসুমারির সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি বলেন যে, এই জেলার অবস্থা শীঘ্রই এমন দাঁড়াইবে যে, জমির উপর আর বেশী চাপ দেওয়ার উপায় থাকিবে না, অর্থাৎ কৃষিযোগ্য জমি আর পাওয়া যাইবে না। "পাশ্চাত্য দেশসমূহে কৃষিজীবীদের মধ্যে লোকবসতির পরিমাণ সাধারণতঃ প্রতি বর্গমাইলে ২৫০ জন। তদতিরিক্ত লোক শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু গঙ্গার এই ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে লোক-বসতির পরিমাণ তাহা অপেক্ষা তিন চার গুণ।......ইহা ছাড়া, এই অঞ্চলকে কেবল যে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে বাড়তি লোকই পোষণ করিতে হয়, তাহা নহে, বাহির হইতে যে সব লোক আমদানি হয়, তাহাদিগকেও পোষণ করিতে হয়, এবং এই শ্রেণীর বাহিরের লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার-উড়িষ্যায় লোকবসতির পরিমাণ বেশী এবং সেখানকার আর্থিক অবস্থাও ভাল নহে। সেই কারণে ঐ দুই প্রদেশ হইতে বাংলাদেশে ক্রমাগত লোক আমদানি হইতেছে। ১৯০১—১১ এবং ১৯১১—২১, এই দুই দশকে গড়ে ৫ লক্ষ করিয়া লোক ঐ সব অঞ্চল হইতে বাংলায় আমদানি হইয়াছে।" (পানান্ডিকর)

জমির উপর চাপ ক্রমেই বাড়িতেছে। ইহার ফলে জমি অতিরিক্ত রকমে ভাগ হইয়া যাইতেছে। বাংলার অধিকাংশ জেলায় কৃষকের জমির আয়তন গড়ে ২·২ একর। হিন্দু আইন অনুসারে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সমান ভাগে জমি বণ্টন হয়, মুসলমান আইন অনুসারে জমি বিভাগ আরও বেশি হয়। ইহার ফলে জমি ক্রমাগত ভাগ হইতে হইতে আয়তন আধ একর পর্যন্ত হইয়া দাঁড়ায়। তুলনার সুবিধার জন্য, অন্যান্য কয়েকটি দেশে কৃষকের জমির আয়তন নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

ইংলন্ড	...	৬২·০ একর
জার্মানী	...	২১·৫ „
ফ্রান্স	...	২০·২৫ „
ডেনমার্ক	...	৪০·০ „
বেলজিয়াম	...	১৪·৫ „
হল্যান্ড	...	২৬·০ „
যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা)	...	১৪৮·০ „
জাপান	...	৩·০ „
চীন	...	৩·২৫ „

(৩) রংপুরের আর্থিক অবস্থা

তাজহাট এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মৈত্র ১৯১৯ সালের রংপুর জেলার শিল্পসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রস্তুত করেন। এই রিপোর্টের স্থূল মর্ম এই যে, জেলার অধিকাংশ শিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ফলে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িয়াছে। রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে এই শোচনীয় অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে ঃ—

"রংপুরের সমস্ত শিল্পই হাতের কাজ। ইহার প্রায় সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল চট বোনা ও গুড় তৈরির কাজ কিছু কিছু আছে। স্থানীয় লোকেরাই এই সব শিল্পজাত ক্রয় করিত এবং নিকটবর্তী হাটেই উহা বিক্রয় হইত। সস্তা দামের বিদেশী পণ্য আমদানি হওয়াতে, ঐ সব শিল্পজাত আর বিক্রয় হয় না, সুতরাং শিল্পীদিগকে নিজ নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এখনও অবসর সময়ে তাহারা এই সব শিল্পকার্য কিছু কিছু করে, তবে বেশীর ভাগ ফরমায়েসী জিনিসই তৈরি করিয়া থাকে। রংপুরের সতরঞ্চ বাংলার সর্বত্র বিখ্যাত ছিল। কিন্তু দেশের সর্বত্র রেলপথে যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের নিকৃষ্ট ও সস্তা সতরঞ্চ, রংপুরের সতরঞ্চকে লোপ করিয়া দিয়াছে।

"চট শিল্প ঃ—জেলার স্ত্রীলোকেরাই পূর্বে চট বুনিত, এখনও তাহারাই বুনিয়া থাকে। তাহারা নিজেরাই পাট হইতে সুতা কাটে এবং তদ্দ্বারা চট বুনে। পূর্বে এই চটের খুব চাহিদা ছিল। কৃষকদের মধ্যে জীবিকার আদর্শ যখন খুব নিচু ছিল, তখন তাহারা শীতকালে রাত্রে এই চট গায়ে দিয়াই শীতনিবারণ করিত। দুই তিন খানি একত্রে সেলাই করিলে লেপের কাজ হইত। কিন্তু এখন সস্তা বিদেশী কম্বল চটের স্থান অধিকার করিয়াছে।

"এণ্ডি শিল্প ঃ—এই শিল্প দ্রুত লোপ পাইতেছে।

"তুলা বয়ন শিল্প ঃ—এই শিল্প প্রায় লোপ পাইয়াছে।

"কাঁসা শিল্প ঃ—এই শিল্প প্রধানতঃ জেলার পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ইহাও প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

"চিনি ও গুড় শিল্প ঃ—বহু বৎসর পূর্বে রংপুর বাংলার অন্যতম প্রধান গুড় উৎপাদনকারী জেলা ছিল। চিনির কারখানার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই সব কারখানায় কখনও কল ব্যবহৃত হইত না। চিনি এখন অল্প পরিমাণে তৈরি হয় এবং পূজাপার্বণ প্রভৃতিতে ঐ চিনি ব্যবহৃত হয়। বিদেশী হইতে আমদানী সস্তা চিনি রংপুরের চিনি শিল্পকে লোপ করিয়া দিয়াছে।

"রংপুরের লোকসংখ্যা ২৩ লক্ষ এবং ইহা কৃষিপ্রধান জেলা। মিঃ জে. এন. গুপ্ত এম. এ., আই. সি. এস. কমিশনারের হিসাব মতে এই জেলার কৃষিজাত সম্পদের মূল্য প্রায় ৯½ কোটি টাকা। সুতরাং এখানকার অধিবাসীদের বার্ষিক আয় মাথা-পিছু প্রায় ৪০৲ টাকা, মাসে ৩।৵০ এবং দৈনিক প্রায় ৭ পয়সা। জমির উপর চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই চাপ কমাইবার জন্য শিল্পের উন্নতি ও প্রসার বিশেষ প্রয়োজন। অন্যথা জমি লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ, মামলা-মোকদ্দমা সর্বদা হইতে থাকিবে।"

বাংলাদেশে বৈদেশিক শাসন প্রত্যেক কুটীর-শিল্পকে লোপ করিবার জন্য যথা-সাধ্য করিয়াছে, কেননা 'হোম' হইতে কলের তৈরি জিনিস এদেশে আমদানি করিতে হইবে।—পক্ষান্তরে, জাপান কুটীর-শিল্পের উন্নতি করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে।

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, সভ্য বৈদেশিক শাসনে 'বৈজ্ঞানিক উন্নতি'

এবং সর্বত্র রেল ও স্টীমারে যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতেও কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড রাষ্ট্রনীতিকের দূরদৃষ্টি লইয়া এই অবস্থা যথার্থরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্য প্রাচ্যদেশে বিষম ভ্রম করিতেছে।"—অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর গ্রন্থ হইতে ধার-করা মতামত একটি সরল প্রাচীনপন্থী জাতির ঘাড়ে চাপাইলে, ফল শোচনীয় হয়। আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

কামধেনু বঙ্গদেশ

রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্য বাংলার ধন শোষণ

"প্রথম হইতেই বাংলা ভারতের কামধেনু-স্বরূপ ছিল এবং অন্যান্য সকল প্রদেশ বাংলা হইতেই *অর্থ শোষণ করিত।"—উইলিয়ম হাণ্টার।*

(১) বাংলা সকলের মহাজন

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মোগলসম্রাটদের ঐশ্বর্যের যুগেও বাংলা দেশ তাহার নিজের শাসন-ব্যয় যোগাইতে পারিত না। বাংলার সামরিক ব্যয় অন্যান্য সুবা হইতে সংগ্রহ করিতে হইত। আওরঙ্গজেব রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্যে মুর্শিদকুলি খাঁর যোগ্যতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বাংলাদেশের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর সুবন্দোবস্তের ফলে শীঘ্রই বাংলার রাজস্ব এক কোটি টাকায় দাঁড়াইল। দাক্ষিণাত্যে সামরিক অভিযান করিবার নিমিত্ত আওরঙ্গজেবের তখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং মুর্শিদকুলি খাঁ এই অর্থ যোগাইয়া সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। বাংলার নামমাত্র সুবেদার সুলতান আজিম ওসান দিল্লী যাইবার সময়ে পথিমধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ শুনিলেন (১৭০৭)। বাংলা হইতে সংগৃহীত রাজস্ব প্রায় এক কোটি টাকা তাঁহার হস্তগত হইল। খুব সম্ভব এই টাকা দিল্লীর সম্রাটকে দেয় বাংলার বার্ষিক রাজস্ব।(১)

ম্যাণ্ডেভিল ১৭৫০ খৃীঃ লিখেন যে, সম্রাটের রাজস্ব দিবার জন্য বাংলার সমস্ত রৌপ্য শোষণ করিতে হইত। ইহা দিল্লীতে যাইত, কিন্তু সেখান হইতে আর ফেরত আসিত না। সুতরাং এই শোষণের পর মুর্শিদাবাদের ধনভাণ্ডারে কিছুই থাকিত না এবং বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালান বা বাজার-হাট করাই কঠিন হইত। পরবর্তী জাহাজে বিদেশ হইতে রৌপ্যের আমদানি না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলিত।(২)

---

(১) ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্টের মতে বাংলার বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে (১৭২২) ছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। শাসন-ব্যয় বাদ দিয়া নিট রাজস্ব এক কোটি টাকার বেশি হইত। অ্যাস্কোলির হিসাবে বাংলার রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৪২,৮৮,২৮৬ টাকা।

(২) ম্যাণ্ডেভিল কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই যে, দিল্লীতে যে টাকা যাইত, তাহা কোন-না-কোন প্রকারে প্রদেশসমূহে ফিরিয়া আসিত। কাটরু, তাঁহার General History of the Mugu Empire নামক গ্রন্থে অবস্থাটা ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন—"এই বিপুল অর্থের পরিমাণ বিস্ময়কর বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই অর্থ মোগল রাজকোষে গেলেও, তাহা পুনর্বার বাহির হইয়া প্রদেশসমূহে অল্পবিস্তর যাইত। সাম্রাজ্যের অর্ধাংশ সম্রাটের সাহায্যের উপর নির্ভর করিত। এতদ্ব্যতীত যেসব অসংখ্য কৃষক সম্রাটের জন্য পরিশ্রম করিত, তাহারা

১৭৪০—৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা বাংলাদেশ হইতে যে ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং চৌথ আদায় করিয়াছিল, তাহার পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা হইবে। সৈয়র মুতাখেরিনের মতে, প্রথম মারাঠা অভিযানের সময়ে মুর্শিদাবাদ শহরের চারিদিকে প্রাচীর ছিল না। সেই সময়ে মীর হবিব একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আলিবর্দী খাঁর আগমনের পূর্বেই মুর্শিদাবাদ শহর আক্রমণ করেন এবং জগৎশেঠের বাড়ী হইতে দুই কোটি টাকার আর্কট মুদ্রা লইয়া যান। কিন্তু এই বিপুল অর্থ লুণ্ঠনের ফলেও জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের কিছুমাত্র সম্পদ ক্ষয় হয় না। তাঁহারা পূর্বের মতই সরকারকে এক এক বার এক কোটি টাকার হুণ্ডি বা 'দর্শনী' দিতে থাকিতেন।

বাংলার ইতিহাসের যুগসন্ধি পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে, লুণ্ঠন, শোষণ প্রভৃতি আকস্মিক বা সাময়িক ছিল এবং লোকে তাহার কুফল হইতে শীঘ্রই সারিয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু বর্তমানে এই প্রদেশ ক্রমাগত যেভাবে শোষিত হইতেছে, তাহা উহাকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়াছে। উহা হইতে উদ্ধার লাভের তাহার উপায় নাই। পলাশীর যুদ্ধের পর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা আসিয়া পড়িল এবং রোমের প্রিটোরিয়ান গার্ডদের মত তাঁহারাও মুর্শিদাবাদের মসনদ নিলামে সর্বোচ্চ দরে বিক্রয় করিলেন। হাউস অব্ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির তৃতীয় রিপোর্ট অনুসারে (১৭৭৩) দেখা যায় যে, ১৭৫৭—১৭৬৫ সাল পর্যন্ত বাংলার "ওয়ারউইকেরা" বাংলার মসনদে নূতন নূতন নবাবকে বসাইয়া ৫।৬ কোটি টাকার কম উপার্জন করেন নাই। এই বিপুল অর্থের অধিকাংশই কোন-না-কোন আকারে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল।(৩)

কিন্তু পরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার তুলনায় ইহা অতি সামান্য অনিষ্ট করিয়াছে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর নামমাত্রে পর্যবসিত সম্রাটের নিকট হইতে দেওয়ানি পাইয়া, কোম্পানি—আইনতঃ ও কার্যতঃ—বাংলার শাসনকর্তা হইয়া বসিলেন। বাংলার মোট রাজস্ব হইতে মোগল সম্রাটের কর (২৬ লক্ষ টাকা), নবাবের ভাতা এবং আদায়-খরচা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা মূলধনরূপে খাটানো হইত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ষ্টক-হোল্ডারগণ এমন কি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টও বাংলার রাজস্বের ভাগ দাবি করিতে লাগিলেন। এই উদ্বৃত্ত অর্থের অধিকাংশ দ্বারাই পণ্য ক্রয় করিয়া রপ্তানি করা হইতে লাগিল, কিন্তু তাহার পরিবর্তে বাংলার কিছুই লাভ হইত না।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দেও, "রাজস্ব আদায় করা কালেক্টরের প্রধান কর্তব্য ছিল এবং উহার সাফল্যের উপরই তাঁহার সুনাম নির্ভর করিত, তাঁহার শাসনের আমলে প্রজাদের অবস্থা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল

সম্রাটের অর্থেই জীবিকানির্বাহ করিত; শহরের যেসব শিল্পী সম্রাটের জন্য কাজ করিত, তাহারা রাজকোষ হইতেই পারিশ্রমিক পাইত।"

"বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা লণ্ডনে বিলাতের জন্য ব্যয় হওয়া এবং মুর্শিদাবাদে বিলাসের জন্য ব্যয় হওয়া—এ দুইয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে।"— —Torrens : *Empire in Asia.*

(৩) সিংহ—Economic Annals.

না" (হাণ্টার)। বীরভূম ও বিষ্ণুপুর এই দুই জেলার নিট রাজস্ব এক লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশি হইত, এবং গবর্নমেণ্টের শাসন-ব্যয় ৫ হাজার পাউণ্ডের বেশি হইত না। অবশিষ্ট ৯৫ হাজার পাউণ্ডের কিয়দংশ কলিকাতা বা অন্যান্য স্থানের তোষা-খানায় পাঠানো হইত এবং কিয়দংশ জেলায় জেলায় কোম্পানির কারবার চালাইবার জন্য ব্যয় করা হইত।

রাজস্বের উদ্বৃত্তাংশ মূলধনরূপে (ইনভেস্টমেণ্ট) খাটানোর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্যাপারটা কি এবং তাহার পরিণামই বা কিরূপ হইয়াছিল তাহা হাউস অব কমন্স-এর সিলেক্ট কমিটির ৯ম রিপোর্টে (১৭৮৩) বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ—

"বাংলার রাজস্বের কিয়দংশ বিলাতে রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করিবার জন্য পৃথকভাবে রাখা হইত এবং ইহাকেই 'ইনভেস্টমেণ্ট' বলিত। এই 'ইনভেস্টমেণ্ট'-এর পরিমাণের উপরে কোম্পানির প্রধান কর্মচারীদের যোগ্যতা নির্ভর করিত। ভারতের দারিদ্র্যের ইহাই ছিল প্রধান কারণ, অথচ ইহাকেই তাহার ঐশ্বর্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করা হইত। অসংখ্য বাণিজ্যপোত ভারতের মূল্যবান পণ্যসম্ভারে পূর্ণ হইয়া প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে আসিত এবং জনসাধারণের চোখের সম্মুখে ঐ ঐশ্বর্যের দৃশ্য প্রদর্শিত হইত। লোকে মনে করিত, যে দেশ হইতে এমন সব মূল্যবান্ পণ্য-সম্ভার রপ্তানি হইয়া আসিতে পারে, তাহা না জানি কতই ঐশ্বর্যশালী ও সেখান-কার অধিবাসীরা কত সুখী! এই রপ্তানী পণ্যের দ্বারা এরূপও মনে হইতে পারিত যে, প্রতিদানে ইংলণ্ড হইতেও পণ্য সম্ভার ভারতে রপ্তানি হয় এবং সেখানকার ব্যবসায়ীদের মূলধন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যসম্ভার নয়, ভারতের পক্ষ হইতে প্রভু ইংলণ্ডকে দেয় বার্ষিক কর মাত্র, এবং তাহাই লোকের মনে ঐশ্বর্যের মিথ্যা মায়া সৃষ্টি করিত।"

বাংলার ঐশ্বর্য সরাসরি বিলাতে যাইত অথবা অন্য উপায়ে পরোক্ষভাবে বিলাতে পৌঁছিত,—উহার ফল বাংলার পক্ষে একই প্রকার। হাণ্টার বলেন ঃ—

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসাদার হিসাবে প্রতি বৎসর প্রায় ২½ লক্ষ পাউণ্ড বাংলা হইতে চীনে লইত ; মাদ্রাজ তাহার মূলধনের জন্য বাংলা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিত ; এবং বোম্বাই তাহার শাসন-ব্যয় যোগাইতে পারিত না, বাংলা হইতেই ঐ ব্যয় যোগাইতে হইত। কাউন্সিল সর্বদা এই অভিযোগ করিতেন যে, একদিকে অন্তর্বাণিজ্য চালাইবার মত মুদ্রা দেশে থাকিত না, অন্যদিকে দেশ হইতে ক্রমাগত অজস্র রৌপ্য বাহিরে রপ্তানি হইত।"

১৭৮০ খ্রীঃ প্রধান সেনাপতি স্যার আয়ার কুট সপারিষদ গবর্নর জেনারেলকে নিম্নলিখিত পত্র লিখেন ঃ—

"মাদ্রাজের ধনভাণ্ডার শূন্য, অথচ ফোর্ট সেণ্ট জর্জের ব্যয়ের জন্য মাসিক ৭ লক্ষ টাকার বেশী আশু প্রয়োজন। ইহার প্রত্যেক কড়ি বাংলা হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, অন্য কোন স্থান হইতে এক পয়সাও পাইবার সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি না।"

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতি বিলাতের 'ইণ্ডিয়া হাউসে' লিখেন,—

"রাজ্যের অধিবাসী ও সৈন্য সকলকেই প্রধানতঃ বাংলার অর্থেই পোষণ করিতে হইতেছে।"

হাণ্টার লিখিয়াছেন—"মারাঠা যুদ্ধ চালাইবার জন্য কলিকাতার ধনভাণ্ডার শূন্য করা হইয়াছিল।......১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে কোম্পানির ধনভাণ্ডার শোষিত হইয়াছিল।"

লর্ড ওয়েলেস্‌লি মারাঠাদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত মারাঠা শক্তি ধ্বংস হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের ব্যয় বাংলাকেই যোগাইতে হইয়াছিল। স্মরণাতীত কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাই ছিল ভারতের মহাজন।

(২) পলাশী শোষণ

এই অধ্যায়ের প্রথমে দিল্লী কর্তৃক বাংলার ধনশোষণের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই শোষণের সহিত 'পলাশী শোষণ' রূপে যাহা পরিচিত, তাহার যথেষ্ট প্রভেদ আছে ; যে আর্থিক শোষণের ফলে বাংলার ধন ক্রমাগত ইংলণ্ডে চলিয়া যাইতেছে, তাহারই নাম 'পলাশী শোষণ'।

"১৭০৮ খ্রীঃ—১৭৫৬ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলায় ইংরাজ কোম্পানির আমদানী পণ্যের শতকরা ৭৪ ভাগই ছিল স্বর্ণ এবং ইহার পরিমাণ ছিল ৬৪,০৬,০২৩ পাউণ্ড। ইংরাজ কোম্পানির কথা ছাড়িয়া দিলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়ই বেশ উন্নতিশীল ছিল। হিন্দু, আর্মানী এবং মুসলমান বণিকেরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং আরব, তুরস্ক ও পারস্যের সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে ব্যবসা চালাইত।" (সিংহ)

ইহার পর, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এডমাণ্ড বার্ক, ফক্সের 'ইণ্ট ইণ্ডিয়া বিলের' আলোচনাকালে, একটি স্মরণীয় বক্তৃতা করেন। 'পলাশী শোষণের' ফলে ভারতের (কার্যতঃ বাংলার) ধন কিরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই বক্তৃতায় তিনি তাহার জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত করেন :—

"এশিয়ার বিজেতাদের হিংস্রতা শীঘ্রই শান্ত হইত, কেননা তাহারা বিজিত দেশেরই অধিবাসী হইয়া পড়িত। এই দেশের উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে তাহাদের ভাগ্যসূত্র গ্রথিত হইত। পিতারা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আশা সঞ্চয় করিত, সন্তানেরাও পূর্বপুরুষগণের স্মৃতি বহন করিত। তাহাদের অদৃষ্ট সেই দেশের সঙ্গেই জড়িত হইত এবং উহা যাহাতে বাসযোগ্য বরণীয় দেশ হয়, সেজন্য তাহারা চেষ্টার ত্রুটি করিত না। দারিদ্র্য, ধ্বংস ও রিক্ততা—মানুষের পক্ষে প্রীতিকর নয় এবং সমগ্র জাতির অভিশাপের মধ্যে জীবনযাপন করিতে পারে, এরূপ লোক বিরল। তাতার শাসকেরা যদি লোভ বা হিংসার বশবর্তী হইয়া অত্যাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতি করিত, তাহা হইলে তাহার কুফলও তাহাদের ভোগ করিতে হইত। অত্যাচার উপদ্রব করিয়া ধন সঞ্চয় করিলেও তাহা তাহাদের পারিবারিক সম্পত্তিই হইত এবং তাহাদেরই মুক্তহস্তে ব্যয় করিবার ফলে অথবা অন্য কাহারও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ঐ

ধন প্রজাদের হাতেই পুনরায় ফিরিয়া যাইত। শাসকদের স্বেচ্ছাচার, সর্বদা অশান্তি প্রভৃতি সত্ত্বেও, দেশের ধন উৎপাদনের উৎস শুকাইয়া যাইত না, সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতির উন্নতিই দেখা যাইত। লোভ ও কার্পণ্যও একদিক দিয়া জাতীয় সম্পদকে রক্ষা করিত ও তাহাকে কাজে খাটাইত। কৃষক ও শিল্পীদের ঋণের জন্য উচ্চ হারে সুদ দিতে হইত, কিন্তু তাহার ফলে মহাজনদের ঐশ্বর্য-ই বর্ধিত হইত এবং কৃষক ও শিল্পীরা পুনর্বার ঐ ভাণ্ডার হইতে ঋণ করিতে পারিত। তাহাদিগকে উচ্চ মূল্যে মূলধন সংগ্রহ করিতে হইত, কিন্তু উহার প্রাপ্তির সম্বন্ধে তাহাদের মনে কোন সংশয় থাকিত না এবং এই সকলের ফলে দেশের আর্থিক অবস্থাও মোটের উপর উন্নত হইত।

"কিন্তু ইংরাজ গবর্নমেণ্টের আমলে ঐ সমস্তই উল্টাইয়া গিয়াছে। তাতার অভিযান অনিষ্টকর ছিল বটে, কিন্তু আমাদের 'রক্ষণাবেক্ষণই' ভারতকে ধ্বংস করিতেছে। তাহাদের শত্রুতা ভারতের ক্ষতি করিয়াছিল আর আমাদের বন্ধুতা তাহার ক্ষতি করিতেছে। ভারতে আমাদের বিজয়—এই ২০ বৎসর পরেও (আমি বলিতে পারি ১৭৫ বৎসর পরেও—গ্রন্থকার) সেই প্রথম দিনের মতই বর্বরভাবাপন্ন আছে। ভারতবাসীরা পক্ককেশ প্রবীণ ইংরাজদের কদাচিৎ দেখিয়া থাকে; তরুণ যুবক বা বালকেরা ভারতবাসীদের শাসন করে; ভারতবাসীদের সঙ্গে তাহারা সামাজিকভাবে মিশে না, তাহাদের প্রতি কোন সহানুভূতির ভাবও উহাদের নাই। ঐ সব ইংরাজ যুবক ইংলণ্ডে থাকিলে যেভাবে বাস করিত, ভারতেও সেইভাবে বাস করে। ভারতবাসীদের সঙ্গে যেটুকু তাহারা মিশে, সে কেবল রাতারাতি বড়মানুষ হইবার জন্য। তাহারা যুবকসুলভ দুর্নিবার লোভ ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া এক দলের পর আর এক দল ভারতে যায়, এবং ভারতবাসীরা এই সব সামরিক অভিযানকারী ও সুবিধাবাদীদের দিকে হতাশনেত্রে চাহিয়া থাকে। একদিকে ভারতের ধন যতই ক্ষয় হইতেছে, অন্যদিকে এই সব যুবকদের লোভ ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইংরাজদের লাভের প্রত্যেকটি টাকা, ভারতের সম্পদকে ক্ষয় করিতেছে।"

কোম্পানির কর্মচারীরা ভারত হইতে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিত এবং বিলাতে ফিরিয়া অসদুপায়ে লব্ধ সেই ঐশ্বর্যে নবাবি করিত। তাহারা যতদূর সম্ভব জাঁক-জমক ও বিলাসিতার মধ্যে বাস করিত। সমসাময়িক ইংরাজী সাহিত্যে এই সব 'নবাব'দের বিলাস-ব্যসনের প্রতি তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপ আছে।

> "Rich in the gems of India's gaudy zone,
> And plunder, piled from kingdoms not their own,
> * * *
> Could stamp disgrace on man's polluted name,
> And barter, with their gold, eternal shame."

১৭৫৭ খ্রীঃ হইতে ১৭৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারত হইতে যে ধন ইংলণ্ডে শোষিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের কম নহে। ইহাই 'পলাশী

শোষণ' নামে পরিচিত। বাংলার লোকের পক্ষে এই ব্যয়ের বোঝা যে অত্যন্ত দুর্বহ ও কষ্টকর হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। টাকার শক্তি বর্তমানের চেয়ে তখন পাঁচ গুণ ছিল, সেই জন্য এখনকার চেয়ে সে যুগে ঐ শোষণের ফলে দুঃখ ও দুর্দশা আরও বেশী হইবার কথা।(৪)

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ পার্লামেণ্টারী কমিটির সম্মুখে তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন ঃ—

"মুর্শিদাবাদ শহর লণ্ডন শহরের মতই বিশাল, জনবহুল ও ঐশ্বর্যশালী। প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত শহরে এমন সব প্রভূত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের সঙ্গে লণ্ডনের কোন ধনী ব্যক্তির তুলনা হইতে পারে না।"

কিন্তু ২৫ বৎসরের মধ্যেই ঐ মুর্শিদাবাদ শহরের অবস্থা 'গজভুক্ত কপিত্থবৎ' হইয়াছিল। 'পলাশী শোষণের' ফলে উহার সর্বত্র ধ্বংসের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

ডিন ইন্‌জে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে বলিয়াছেন ঃ—

"বাংলাদেশের ধনলুণ্ঠনের ফলেই প্রথম প্রেরণা আসিল। ক্লাইভের পলাশী বিজয়ের পর ৩০ বৎসর ধরিয়া বাংলা হইতে ইংলণ্ডে ঐশ্বর্যের স্রোত বহিয়া আসিয়াছিল। অসদুপায়ে লব্ধ এই অর্থ ইংলণ্ডের শিল্প-বাণিজ্য গঠনে শক্তি যোগাইয়াছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পরে ফ্রান্সের নিকট হইতে লুণ্ঠিত 'পাঁচ মিলিয়ার্ড' অর্থ জার্মানীর শিল্প-বাণিজ্য গঠনে এইভাবেই সহায়তা করিয়াছিল।"—Outspoken Essays, p. 91.

১৮৮৬ সালে উত্তর ব্রহ্ম বিজয়ের ফলও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। ২০ বৎসর পর্যন্ত এই দেশ তাহার শাসন-ব্যয় যোগাইতে পারিত না এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে সেজন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইত। কিন্তু উত্তর ব্রহ্মবিজয়ের পূর্বেও দক্ষিণ বা নিম্ন ব্রহ্মও তাহার শাসন-ব্যয় যোগাইতে পারিত না। গোখেল বলেন যে, প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মদেশ ভারতের শ্বেতহস্তীস্বরূপ ছিল এবং "ইহার ফলে বর্তমানে (২৭শে মার্চ, ১৯১১) ভারতের নিকট ব্রহ্মদেশের ঋণ প্রায় ৬২ কোটি টাকা।" কিন্তু এই বিপুল অর্থের প্রধান অংশই বাংলাকে বহন করিতে হইয়াছিল। ইহার কারণ কেবল লবণের উপর শুল্কবৃদ্ধি নয়, ভারত গবর্নমেণ্টের রাজকোষে বাংলাই সবচেয়ে বেশী টাকা দেয়। এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে, ব্রহ্ম বিজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রজাত বিক্রয়ের বাজার তৈরি করা এবং ব্রহ্মের ঐশ্বর্যশালী বনভূমি, রত্নখনি ও তৈলের খনি। এই সমস্ত দিকে শোষণকার্য প্রবল উৎসাহে চলিতেছে। এইরূপে ভারতের দরিদ্র প্রজারা ব্রহ্মবিজয় এবং তাহার শাসন-ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ যোগাইয়াছে, আর ব্রিটিশ ধনী ও ব্যবসায়ীরা উহার ফলে ঐশ্বর্যশালী হইয়াছে। কিছুদিন হইল, ব্রিটিশ শোষণকারীরা ব্রহ্মকে ভারত হইতে পৃথক করিবার জন্য

(৪) Sinha—Economic Annals.

এক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে। কতকগুলি নির্বোধ অদূরদর্শী ব্রহ্মবাসী গোটা-কয়েক সরকারী চাকরির প্রলোভনে তাহাদের আন্দোলনে যোগ দিয়াছে।*

(৩) মেষ্টনী ব্যবস্থার কল্যাণে বাংলার ধন শোষণ

মেষ্টনী ব্যবস্থায় বাংলাদেশ তাহার রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশ হইতেই বঞ্চিত হইতেছে, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব জাতিগঠনমূলক কার্যের জন্য অবশিষ্ট থাকিতেছে। এই ব্যবস্থায়, বাংলাদেশের রাজস্বের প্রধান প্রধান দফাগুলি—বাণিজ্য-শুল্ক, আয়কর, রেলওয়ে প্রভৃতি—তাহার হাতছাড়া হইয়াছে। বাণিজ্যশুল্কের আয় ১৯২১—২২ সালে ৩৪ কোটি টাকা ছিল, ১৯২৯—৩০ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৫০ কোটি টাকায়। আর রাজস্বের যে সমস্ত দফা সর্বাপেক্ষা অসন্তোষজনক এবং যাহাতে আয় বাড়িবারও বিশেষ সম্ভাবনা নাই, সেইগুলিই মন্ত্রীদের অধীনস্থ তথাকথিত 'হস্তান্তরিত' বিভাগগুলির জন্য রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে দেশে মাদক ব্যবহার এবং মামলামোকদ্দমা বৃদ্ধির সহিত সংসৃষ্ট আবগারী শুল্ক ও কোর্ট ফি প্রভৃতির দরুন নিন্দা ও গ্লানি দেশীয় মন্ত্রীদেরই বহন করিতে হইতেছে।

ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে, পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতেই, বাংলা ভারতের কামধেনুস্বরূপ ছিল এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ জয়ের জন্য সামরিক ব্যয় যোগাইয়া আসিয়াছে। নূতন শাসনসংস্কারের আমলে, মেষ্টনী ব্যবস্থার ফলে বাংলারই সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে এবং ইহার অর্থ নির্মমভাবে শোষণ করা হইতেছে। আমি আরও দেখাইয়াছি যে, বাংলার আর্থিক দারিদ্র্য পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। মেষ্টনী ব্যবস্থা, অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়াছে মাত্র।

বাংলার ভূতপূর্ব লেঃ গবর্নর স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি ১৮৯৬ সালে ইম্পিরিয়াল বাজেট আলোচনার সময় বলেন,—"এই প্রদেশরূপী মেষকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার লোমগুলি নির্মূল করিয়া কাটিয়া লওয়া হইতেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় রোমোদ্গম না হয়, ততক্ষণ সে শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে।" (অবশ্য, রোমোদ্গম হইলেই পুনরায় উহা কাটিয়া লওয়া হয়।)

সুতরাং বাংলাদেশ ইম্পিরিয়াল গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে ক্রমাগত অবিচার সহ্য করিয়া আসিতেছে।

বাংলা ভারতের প্রধান পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী ও জন-বহুল, অথচ এই প্রদেশকেই সর্বাপেক্ষা কম টাকা দেওয়া হইতেছে। ফলে তাহার জাতিগঠনমূলক বিভাগগুলি সর্বদা অভাবগ্রস্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিক্ষার কথাই ধরা

---

* এই পুস্তক যখন (১৯৩৭) ছাপা হইতেছে, তাহার পূর্বেই ব্রহ্ম-বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে।

যাক। ১৯২৪—২৫ সালের সরকারী রিপোর্টের হিসাব হইতে বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার ব্যয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রদেশ	সরকারী সাহায্য	ছাত্রবেতন
মাদ্রাজ	১,৭১,৩৮,৫৪৮	৮৪,৩২,৯৯১
বোম্বাই	১,৮৪,৪৭,১৬৫	৬০,১৩,৯৬৯
বাংলা	১,৩৩,৮২,৯৬২	১,৪৬,৩৬,১২৬
যুক্তপ্রদেশ	১,৭২,২৮,৪৯০	৪২,১৪,৩৫৪
পঞ্জাব	১,১৮,৩৪,৩৬৪	৫২,৮৭,৪৪৪

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা বিভাগ, শিল্প ও কৃষি, এই পাঁচটি 'জাতি-গঠনমূলক' বিভাগের হিসাব করিয়া আমরা নিম্নলিখিত তথ্যে উপনীত হইয়াছি। ইহা হইতে বাংলার আর্থিক দুর্দশা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে।

১৯২৮—২৯

জাতি-গঠনমূলক কার্যের জন্য বাংলার জন প্রতি ব্যয়

প্রদেশ	মোট ব্যয়	জন প্রতি ব্যয়
মাদ্রাজ	৪·২৫ কোটি টাকা	১·০০ টাকা
বোম্বাই	৩·০৭ „	১·৫৯ „
বাংলা	২·৭৩ „	০·৫৮ „
যুক্তপ্রদেশ	২·৯৮ „	০·৫৮ „
পঞ্জাব	২·৯০ „	১·৪০ „
বিহার-উড়িষ্যা	১·৪৭ „	০·৪২ „
মধ্যপ্রদেশ	১·০৮ „	০·৭৭ „
আসাম	০·৫৮ „	০·৭৬ „

মোটামুটি বলা যায়, পঞ্জাব ও বোম্বাই বাংলার চেয়ে জন প্রতি শতকরা ১৬৬ ও ১৩৩ টাকা ব্যয় করে, মাদ্রাজ শতকরা ৬৬ টাকা এবং আসাম শতকরা ২৫ টাকা বাংলার চেয়ে বেশী ব্যয় করে। একমাত্র বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ জাতি-গঠনমূলক কার্যে জন প্রতি বাংলার চেয়ে কম ব্যয় করে।(৫)

ইহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মেষ্টনী ব্যবস্থা আইন দ্বারা সমর্থিত লুণ্ঠন মাত্র এবং ঘোর অবিচারমূলক। সমস্ত পাট রপ্তানী শুল্কের টাকা বাংলার

(৫) পূর্বে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, শিক্ষাব্যাপারে গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে বাংলা পঞ্জাবের চেয়ে সামান্য কিছু বেশী সাহায্য পায়, যদিও পঞ্জাবের লোকসংখ্যা বাংলার অর্ধেক। অন্যান্য তিনটি প্রধান প্রদেশ হইতে বাংলা কম সাহায্য পাইয়া থাকে। একমাত্র বাংলায়ই, সরকারী সাহায্যের চেয়ে বেশী টাকা ছাত্রবেতন হইতে যোগাইয়া থাকে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পাওয়া উচিত। শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর মতে, ১৯২৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারত গবর্নমেণ্ট এই শুল্ক বাবত মোট ৩৪ কোটি টাকা হস্তগত করিয়াছেন; আর বাংলার জাতি-গঠনমূলক বিভাগগুলি শোচনীয় অভাব সহ্য করিতেছে।

বাংলার আর্থিক অবস্থার মূলে আর একটি গলদ রহিয়াছে; অন্যান্য অনেক প্রদেশে সেচ বিভাগের উন্নতির জন্য যথেষ্ট মূলধন ন্যস্ত করা এবং তাহা হইতে প্রচুর আয়ও হইতেছে; কিন্তু বাংলাদেশে এই বাবত বিশেষ কোন আয় হয় না। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার সেচবিভাগের আয় কিরূপ, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে:—

১৯২৮—২৯

বিভিন্ন প্রদেশের সেচ-বিভাগের আয়

প্রদেশ	আয়		সেচ-বিভাগের জন্য ঋণের সুদ
মাদ্রাজ	১·৮৩	কোটি টাকা	০·৫৩
বোম্বাই	০·৬৫	"	০·৫৫
বাংলা	০·০১	"	০·১৮
যুক্তপ্রদেশ	০·৮৪	"	০·৮৮
পঞ্জাব	৩·৭৪	"	১·২০
বিহার-উড়িষ্যা	০·২০	"	০·২০

বাংলার প্রতি এই আর্থিক অবিচারের মূল কারণ মাদ্রাজ গবর্নমেণ্টের সদস্য মিঃ ফরবেস নির্লজ্জভাবে স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৬১ সালে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন:—

"বাংলার লেঃ গবর্নর মিঃ গ্র্যাণ্ট বলিয়াছেন, জনহিতকর কার্যের জন্য বাংলাকে উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হয় না। কিন্তু তিনি একটি কথা বিবেচনা করেন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকার ফলে গবর্নমেণ্ট ঐ প্রদেশের জন্য অর্থ ব্যয় করিবার জন্য উৎসাহ বোধ করেন না, কেননা তাহাতে তাঁহাদের কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। অবশ্য, যে পরোক্ষলাভের সম্ভাবনা আছে, তাহার জন্যও অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে। কিন্তু যেসব প্রদেশে অর্থ ব্যয় করিলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই প্রকারেই লাভের সম্ভাবনা আছে, গবর্নমেণ্ট যদি কেবল সেই সব প্রদেশের জন্যই অর্থ ব্যয় করেন, তবে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।"—জে. এন. গুপ্ত কর্তৃক **Financial Injustice to Bengal** নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত।

আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনের জন্য যথেষ্ট অর্থসম্পদ থাকিলেও, বাংলাকে অর্থ-কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। অন্য কথা ছাড়িয়া দিলেও, কেবলমাত্র পাট শুল্কের আয়ই (বার্ষিক প্রায় ৪½ কোটি টাকা) বাংলাকে আর্থিক ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে

পারিত। নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, বাংলা ইম্পিরিয়াল গবর্নমেন্টের ভাণ্ডারে সর্বাপেক্ষা বেশী টাকা দিতেছে :—

প্রদেশ	শতকরা কত ভাগ রাজস্ব দিতেছে	
	১৯২১—২২	১৯২৫—২৬
বাংলা	৩৬·০	৪৫·০
যুক্তপ্রদেশ	৬·০	১·৬
মাদ্রাজ	১২·৩	৯·৬
বিহার-উড়িষ্যা	০·৭	০·৭
পঞ্জাব	৪·০	১·৫
বোম্বাই	৩৯·০	৪০·০
মধ্যপ্রদেশ	১·৫	১·০
আসাম	০·৫	০·৬
	মোট—১০০·০	১০০·০

(জে. এন গুপ্তের গ্রন্থ হইতে)

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, ভারত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, বিস্তার ও রক্ষাকার্য, বাংলার ভাণ্ডার হইতে ক্রমাগত অর্থ শোষণ করিয়াই সাধিত হইয়াছে। টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ, মারাঠা ও শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইতে এই বাংলারই রক্ত শোষণ করা হইয়াছে এবং ইহার ন্যায়সঙ্গত অভাব-অভিযোগ উপেক্ষা করা হইয়াছে ; এবং মেস্টনী ব্যবস্থায় এই রক্ত-শোষণকার্য এখনও পরমোৎসাহে চলিতেছে।(৬)

সাম্রাজ্যবাদরূপী মোলক দেবতার নিকট বাংলাকে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত "রব রয় নীতি" অনুসারে বলি প্রদান করা হইয়াছে।

"কেন? যেহেতু সেই প্রাচীন নিয়মই তাহাদের পক্ষে এক মাত্র নীতি—যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারা কাড়িয়া লইবে, এবং যাহারা পারে আত্মরক্ষা করিবে।"

---

(৬) যুক্তরাষ্ট্র অর্থ কমিটির সিদ্ধান্ত (সদ্য প্রকাশিত, জুন, ১৯৩২) হইতে দেখা যাইতেছে, বাংলা সেন্ট্রাল গবর্নমেন্টের নিকট হইতে আগামী শাসন-সংস্কারেও বিশেষ কোন সাহায্যের আশা করিতে পারে না। বাংলার অবস্থা যথা পূর্বং রহিয়াছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বাংলা ভারতের কামধেনু (পূর্বানুবৃত্তি)

বাঙালীদের অক্ষমতা এবং অবাঙালী কর্তৃক বাংলার আর্থিক বিজয়

(১) ব্যর্থতার কারণ—অক্ষমতা

ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, যে দুইটি প্রধান গুণের প্রয়োজন, তাহা বাঙালীর চরিত্রে নাই ; সে দুইটি গুণ ব্যবসায়বুদ্ধি এবং নূতন কর্মপ্রচেষ্টায় অনুরাগ। বাঙালী ভাবুক ও আদর্শবাদী, সেই তুলনায় বাস্তববাদী নয়,—এই কারণে ব্যবসায়ক্ষেত্রে সে পশ্চাৎপদ। ১৭৫৩ সালে ঢাকার বস্ত্র-ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে টেলর যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে এ সম্বন্ধে অনেক রহস্য জানিতে পারা যায়। আলিবর্দীর শাসনকালে বাঙালী ছাড়া আর যেসব জাতির লোক বাংলাদেশে বাণিজ্য করিত, এই বিবরণ হইতে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। যথা, —(১) তুরানীগণ (অক্‌সাস্‌ নদীর পরপারে তুরান দেশ হইতে আগত বণিকগণ) ; (২) পাঠানগণ—ইহারা প্রধানতঃ উত্তর ভারতে বাণিজ্য করিত ; (৩) আর্মানীগণ—ইহারা বসোরা, মোচা এবং জেড্ডায় বাণিজ্য করিত ; (৪) মোগলগণ—ইহারা অংশতঃ ভারতে এবং অংশতঃ বসোরা, মোচা ও জেড্ডায় বাণিজ্য করিত ; (৫) হিন্দুগণ—ভারতে বাণিজ্য করিত ; (৬) ইংরাজ কোম্পানি ; (৭) ফরাসী কোম্পানি ; (৮) ওলন্দাজ কোম্পানি।(১) বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি ইউরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে পণ্য রপ্তানি করিত। আর্মানীগণ সমুদ্র-বাণিজ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিত। সিরাজদ্দৌলার পতনের পর মীর জাফরের সঙ্গে ইংরাজদের যে সন্ধি হয়, তাহাতে একটা শর্ত ছিল 'কলিকাতার অনিষ্ট হওয়াতে যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে' তাহাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই শর্তে ক্ষতিগ্রস্ত ইংরাজদের ৫০ লক্ষ টাকা এবং আর্মানীদের জন্য ৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল।(২) ১৬শ শতাব্দীতে সমুদ্র-বাণিজ্যের পরিমাণ সামান্য ছিল না। কেননা তৎসাময়িক বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মালদহের সেখ ভিক তিন

---

(১) J. C. Sinha—Economic Annals.

(২) Stewart's History of Bengal. (১৮১৩) পরিশিষ্ট।

"আর্মানীরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করিত। তাহারা তাহাদের দূরবর্তী তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্য দেশ হইতে বাণিজ্যের লোভেই ভারতে আসিয়াছিল। ভারত হইতে তাহারা মসলা, মসলিন এবং মূল্যবান রত্নাদি লইয়া ইউরোপে বাণিজ্য করিত। ইউরোপীয় বণিক, ভ্রমণকারী এবং ভাগ্যান্বেষীদের আগমনের পূর্বে হইতেই আর্মানীরা ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল।"—Indian Historical Records Commission, Vol. iii, p. 198.

হাজার মালদহী কাপড় পারস্য উপসাগর দিয়া রাশিয়াতে পাঠাইয়াছিলেন। হেস্টিংসের সময়ে বাংলার বহির্বাণিজ্য প্রায় সমস্ত ইউরোপীয়দের হাতে ছিল।(৩)

ঢাকার বস্ত্রব্যবসায়ের উপরোক্ত বিবরণের পঞ্চম দফায় লিখিত হইয়াছে যে, হিন্দুরা স্বদেশের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিত। কিন্তু মোট ২৮½ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্রের মধ্যে, তাহারা মাত্র ২ লক্ষ টাকার বস্ত্র লইয়া কারবার করিত। অর্থাৎ চৌদ্দ ভাগের এক ভাগেরও কম বাণিজ্য হিন্দুদের ভাগে পড়িত। এই হিন্দুরাও আবার বাংলার লোক ছিল না।

সকলেই জানেন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ব্যাঙ্কের কারবার ঘনিষ্ঠরূপে সংসৃষ্ট। ইউরোপ মধ্যযুগে, বিশেষতঃ ১৫শ, ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দীতে, ভিনিস, আমস্টার্ডম, হামবার্গ, লণ্ডন প্রভৃতি শহরে—যেখানেই সমুদ্র-বাণিজ্যের প্রসার ছিল, সেখানেই 'রিয়াল্টো' বা একশেঞ্জ ব্যাঙ্ক থাকিত এবং ব্যবসায়ীরা ঐ সব স্থলে ভিড় জমাইত।

বাঙালীরা ব্যবসায়ে উদাসীন ছিল বলিয়া উত্তর ভারতের লোকেরা তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাংলার সমস্ত ব্যাঙ্কের কারবার হস্তগত করিয়াছিল। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানীগণ মুর্শিদাবাদের নিকটে ব্যাঙ্কিং এজেন্সিসমূহ স্থাপন করিয়াছিল।

যথা,"—ইউরোপীয় প্রথায় ব্যাঙ্কের কাজ ভারতে আধুনিক কালে প্রচলিত হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা আসিবার বহু পূর্বে সুপরিচালিত স্বদেশী ব্যাঙ্কসমূহ ছিল। প্রত্যেক রাজদরবারেই রাজ ব্যাঙ্কার বা শেঠী থাকিত, অনেক সময় ইহাদের মন্ত্রীর ক্ষমতা দেওয়া হইত।"—(৪)

অন্যত্র,—"এই সব হিন্দুদের আর্থিক ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, কেননা, এই প্রদেশের বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে বড় বড় বণিকদের হাতে ছিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে উমিচাঁদ ও জগৎ শেঠদের ন্যায় উত্তর ভারত হইতে আগত। কোজা ওয়াজিদ ও আগা ম্যানুয়েলের ন্যায় অল্পসংখ্যক আর্মানীরাও ছিল।"(৫) —S. C. Hill : *Bengal in 1756—1757, Ch. I, Intro.*

সম্রাট ফরুকসিয়ারের সময়ে জগৎ শেঠেরা সাফল্য ও ঐশ্বর্যের উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিলেন। মানিকচাঁদ নামক একজন জৈন বণিক এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মানিকচাঁদের ১৭৩২ সালে মৃত্যু হয়, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার কারবারের ভার ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেচাঁদের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। ১৭১৩ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ

---

(৩) "সমুদ্র-বাণিজ্যের দুইটি বিভাগ ব্যতীত অন্য সমস্ত বিভাগে ইউরোপীয়েরা বাঙালীদিগকে স্থানচ্যুত করিয়াছিল। এই দুইটি বিভাগ মালদ্বীপ ও আসাম। ইহার কারণ, মালদ্বীপের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর এবং আসামে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য খুব বেশী ছিল।" A. Raynal : A Philosophical and Political History of the settlements and Trade of the Europeans in the East and West India, vol. i, p. 144 (Ed-Lond. 1783).

(৪) Sinha—*Early European Banking in India.*

(৫) কোজা ওয়াজিদ আর্মানী ছিলেন না। ঐ বইয়েরই ৩০৪ পৃষ্ঠার লিখিত আছে—"নবাব মূর বণিক (মুসলমান) কোজা ওয়াজিদকে তাঁহার এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন।"

বাংলার শাসক নিযুক্ত হইলে ফতেচাঁদ সরকারী ব্যাঙ্কার নিযুক্ত হন। তাঁহাকে "জগৎশেঠ" এই উপাধি দেওয়া হয়। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফতেচাঁদ তাঁহার পৌত্রদ্বয় শেঠ মহাতাপ রায় ও মহারাজা স্বরূপচাঁদের হস্তে কারবারের ভার অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন। এই দুই জন শেঠকে বাংলার রাষ্ট্র-বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট দেখিতে পাই। ইংরাজ লিখিত ইতিহাসে ফতেচাঁদের দুই পৌত্রের নাম পৃথকভাবে উল্লিখিত হয় নাই, তাঁহাদের উভয়কে "জগৎ শেঠ" অথবা "শেঠ" মাত্র এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মুর্শিদাবাদে এই জগৎ শেঠের গদির প্রভাব অসামান্য ছিল।

"জগৎ শেঠ এক হিসাবে বাংলার নবাবের ব্যাঙ্কার,—রাজস্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তাঁহার ভাণ্ডারে প্রেরিত হয় এবং গবর্নমেণ্ট প্রয়োজনমত জগৎ শেঠের উপরে চেক দেন,—যেমনভাবে বণিকেরা ব্যাঙ্কের উপরে চেক দেন। আমি যতদূর জানি, শেঠেরা এই ব্যবসায়ে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন।"

মহাতাপচাঁদের আমলে জগৎ শেঠের গদি ঐশ্বর্যের চরম শিখরে উঠে। নবাব আলিবর্দী খাঁ জগৎ শেঠকে প্রভূত সম্মান করিতেন এবং ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নবাবের সৈন্যদল যখন ইংরাজ বণিক ও আর্মানী বণিকদের মধ্যে বিবাদের ফলে কাসিমবাজারে ইংরাজদের কুঠি ঘেরাও করে, সেই সময়ে ইংরাজেরা জগৎ শেঠদের মারফৎ ১২ লক্ষ টাকা দিয়া নবাবকে সন্তুষ্ট করে। ইউরোপীয়দের পরিচালিত ব্যাঙ্ক তখনও এদেশে স্থাপিত হয় নাই এবং ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকেরা শেঠদের নিকট হইতে টাকা ধার করিতেন। "তাঁহাদের (শেঠদের) এমন বিপুল ঐশ্বর্য ছিল যে, হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের মত ব্যাঙ্কার আর কখনও দেখা যায় নাই এবং তাঁহাদের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে, সমগ্র ভারতে এমন কোন বণিক বা ব্যাঙ্কার ছিল না। ইহাও নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের সময়ে বাংলাদেশে যে সব ব্যাঙ্কার ছিল, তাহারা তাঁহাদেরই শাখা অথবা পরিবারের লোক।" অবশ্য, সে সময়ে আরও ব্যাঙ্কার ছিল, যদিও তাহারা জগৎ শেঠদের মত ঐশ্বর্যশালী ছিল না। কোম্পানির শাসনের প্রথম আমলে, মফঃস্বল হইতে মুর্শিদাবাদে, পরবর্তী কালে কলিকাতাতে—এই সব ব্যাঙ্কারদের মারফতই ভূমি-রাজস্ব প্রেরণ করা হইত। ১৭৮০ সাল হইতে জগৎ শেঠদের গদির অবনতি হইতে থাকে এবং ১৭৮২ সালে গোপাল দাস এবং হরিকিষণ দাস তাঁহাদের স্থানে গবর্নমেণ্টের ব্যাঙ্কার নিযুক্ত হন।

এই সময়ের প্রতিপত্তিশালী ব্যাঙ্কারদের মধ্যে রামচাঁদ সা এবং গোপালচরণ সা ও রামকিষণ ও লক্ষ্মীনারায়ণের নাম শোনা যায়। আরও দেখা যায় যে, কলিকাতার প্রধান ব্যাঙ্কিং ফার্ম নন্দীরাম বৈদ্যনাথের গোমস্তা রামজীরাম ১৭৮৭ সালে কারেন্সী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলেন যে, তাঁহাদের ফার্মের প্রধান কারবার হুণ্ডী লইয়া ছিল এবং এই হুণ্ডী যোগে বিবিধ স্থান হইতে রাজস্ব প্রেরিত হইত। ১৭৮৮ সালে শাগোপাল দাস এবং মনোহর দাস(৬) এবং কলিকাতার

(৬) বড়বাজারের 'মনোহর দাসের চক' খুব সম্ভব ইঁহারই নাম হইতে হইয়াছে।

অন্যান্য ২৪ জন কুঠিয়াল (দেশীয় ব্যাঙ্কার), মোহরের উপর বাট্টা হ্রাস করিবার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপক পত্র লিখেন। Economic Annals of Bengal-এর গ্রন্থকার এইভাবে বিষয়টি উপসংহার করিয়াছেন—"কুঠিয়ালদের নাম ও অন্যান্য লোকের স্বাক্ষর হইতে দেখা যায় যে, তাহারা সকলেই অবাঙালী ছিল। কলিকাতার বাঙালীদের তখন কোন ব্যাঙ্ক ছিল না। বাঙালী ব্যাঙ্কারেরা বোধ হয় পোদ্দার মাত্র ছিল।"

বাংলা দেশ ও উত্তর ভারতে দেশীয় ব্যাঙ্কের কারবার কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রেলওয়ে হইবার পূর্বে, প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্বে, আমার পিতামহ গয়া ও কাশীতে তীর্থ করিতে যান। সে সময়ে গরুর গাড়ী বা নৌকাতে যাইতে হইত, এবং সঙ্গে বেশী নগদ টাকা লওয়া নিরাপদ ছিল না। আমার পিতামহ বড়বাজারের একটি ব্যাঙ্কের গদিতে টাকা জমা রাখেন এবং সেখান হইতে উত্তর ভারতের ব্যাঙ্কসমূহের উপর তাঁহাকে হুন্ডী দেওয়া হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট। ১২৫ বৎসর পূর্বে, রামমোহন রায় যখন রংপুরে সেরেস্তাদার ছিলেন, তখন তিনি ধর্ম-সম্বন্ধীয় সমস্যা আলোচনার জন্য সন্ধ্যাকালে সভা করিতেন। ঐ সব সভায় মাড়োয়ারী বণিকেরা যোগ দিত।(৭)

আসাম ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইবার পূর্বেই মাড়োয়ারীরা ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি-স্থান সদিয়া পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছিল। তার পর এক শতাব্দীরও বেশী অতীত হইয়াছে এবং বর্তমানে মাড়োয়ারীরা আসামের সর্বত্র নিজেদের ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিস্তার করিয়াছে। তাহারা ইউরোপীয় চা-বাগানগুলিতেও মূলধন যোগাইতেছে, যদিও আসামীদের তাহারা টাকা দেয় না।(৮)

দার্জিলিং, কালিম্পং,—(৯) সিকিম ও ভূটান সীমান্তে, মাড়োয়ারীরা পশম, মৃগনাভি, ঘি, এলাচি প্রভৃতির রপ্তানি ব্যবসা করে এবং লবণ, বস্ত্রজাত প্রভৃতি আমদানি করে। এই সব ব্যবসায়ে তাহাদের কয়েক কোটি টাকা খাটে, এবং এক্ষেত্রে

---

(৭) "প্রাপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, রংপুরে থাকিবার সময়েই রামমোহন বন্ধুবর্গদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন,—পৌত্তলিকতা তাঁহাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল। রংপুরে তখন জনবহুল শহর এবং একটি ব্যবসাকেন্দ্র ছিল—বহু জৈন ধর্মাবলম্বী মাড়োয়ারী বণিক এখানে থাকিতেন; এই সব মাড়োয়ারীদের মধ্যে কেহ কেহ রামমোহনের সভায় যোগ দিতেন। মিঃ লিওনার্ড বলেন যে, তাঁহাদের জন্য রামমোহনকে 'কল্পসূত্র' ও অন্যান্য জৈন-ধর্মের গ্রন্থ পড়িতে হইয়াছিল।"—*Life and Letters of Ram Mohan Ray, London* (1900) by Miss Collect.

(৮) গেট সাহেবের "আসাম" গ্রন্থে আছে,—"১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে আমরা দেখিতে পাই অধ্যবসায়ী মাড়োয়ারী বণিকেরা আসামে তাহাদের ব্যবসায় চালাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সদিয়া পর্যন্ত যাইয়াও কারবার করিতেন। এই সময়ে গোয়ালপাড়া হইতে কলিকাতা আসিতে ২৫।৩০ দিন লাগিত এবং কলিকাতা হইতে গোয়ালপাড়া যাইতে ৮০ দিনেরও বেশী লাগিত।"

(৯) কালিম্পংকে তিব্বতের "অন্তর্বন্দর" বলা হয়, কেননা তিব্বতের সমস্ত আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য এই স্থানের ভিতর দিয়াই হয়। কালিম্পংএ অবশ্য কয়েকজন বাঙালী আছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই সরকারী অফিসার, কেরানী প্রভৃতি।

তাহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙালীরা এই ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে নিজেদের দোষে হটিয়া গিয়াছে। মাড়োয়ারীরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও পল্লীর আর্থিক অবস্থার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। কর্মাটার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে একটি হাট বা বাজার আছে। এখানকার সমস্ত আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য মাড়োয়ারীদের হাতে। কর্মাটার হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে 'কারো' নামক একটি স্থানে একবার আমি গিয়াছিলাম। এখানেও ২।১টি মাড়োয়ারী বণিক সমস্ত ব্যবসায় দখল করিয়া বসিয়া আছে, দেখিলাম। নিকটবর্তী অঞ্চলের দরিদ্র কৃষকদের টাকা ধার দিয়াও তাহারা বেশ দু'পয়সা উপার্জন করিতেছে।

বাংলাদেশেও অবস্থা ঠিক ঐরূপ। উত্তরবঙ্গে বগুড়ার নিকটে তালোরাতে একজন মাড়োয়ারীই প্রধান চাউল ব্যবসায়ী। সে একটি চাউলের কল স্থাপন করিয়াছে। টাকা লগ্নীর কারবার করিয়াও সে প্রভূত উপার্জন করে। খুলনার দক্ষিণাংশে কপোতাক্ষী তীরে বড়দল গ্রাম। এখানে প্রতি সপ্তাহে হাট বসে এবং বহুল পরিমাণে আমদানি-রপ্তানির কাজ হয়। কিন্তু এখানকার সমস্ত বড় বড় গদিই মাড়োয়ারীদের। বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর তসরবস্ত্রের কেন্দ্র। কয়েক বৎসর পূর্বেও বাঙালীদের হাতে কাপড়ের ব্যবসা ছিল: কিন্তু উদ্যোগী মাড়োয়ারীরা এখন বাঙালীদের এই ব্যবসা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহের রেশম কাপড়ের ব্যবসাও মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া ব্যবসায়ীদের দাদনের টাকায় চলিতেছে। তাহারাই প্রধানতঃ এই রেশমের বস্ত্রজাত রপ্তানি করে।

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু বাংলার কৃষিজাত—চাল, পাট, তৈল-বীজ, ডাল প্রভৃতির ব্যবসায় মাড়োয়ারীদের হস্তগত। তাহারা চামড়ার ব্যবসাও অধিকার করিত, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী বলিয়া এ কার্য তাহারা করে না। বাংলার আমদানী পণ্যজাত প্রধানতঃ মাড়োয়ারীদের হাতে। তাহারা—আমদানিকারক বড় বড় ইউ-রোপীয় সওদাগরদের 'বেনিয়ান' তো বটেই, তাহা ছাড়া, এই সম্পর্কে যত কিছু ছোট, বড়, 'মধ্যবর্তী' ব্যবসায়ীর কাজ তাহারাই করিয়া থাকে। কালক্রমে এখন (১৯৩৭) মাড়োয়ারীগণ বৃহৎ চর্মশালা (tannery) খুলিয়াছেন।

অবশ্য, স্বীকার করিতে হইবে যে, আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কীয় 'মধ্যবর্তী' ব্যবসায়ের কাজে বহু বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানও নিযুক্ত আছে। তবে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদের এই ব্যবসায়ে কোন অংশ নাই। হিন্দুদের মধ্যে প্রধানতঃ তিলি, সাহা, কাপালী জাতির লোকেরাই এই সব কাজ করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকে এখন জমিদার ও মহাজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাদের ব্যবসা-বুদ্ধি ক্রমে লোপ পাইতেছে। যদিও তাহারা, উচ্চবর্ণীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে নাই, তবু অধ্যবসায়ী অবাঙালীদের দ্বারা পৈতৃক ব্যবসায় হইতে চ্যুত হইতেছে। মুসলমান যুবক ব্যবসায়-ক্ষেত্রের এই প্রতিযোগিতায় আরও পশ্চাৎপদ। মুসলমান ব্যাপারী ও আড়তদার আছে বটে, কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই অশিক্ষিত নিম্নস্তরের লোক। হিন্দুদের

গোচর্মের ব্যবসায়ের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঘৃণার ভাব আছে, সুতরাং এই ব্যবসায় মুসলমানদেরই একচেটিয়া।(১০) কিন্তু রপ্তানিকারক প্রায় সকলেই ইউরোপীয়।

(২) বহুমুখী কর্মতৎপরতা ও অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনের অভাবই বাঙালীর ব্যর্থতার কারণ

ব্যবসায়ে বাঙালীদের অসহায় ভাব ও অক্ষমতা নিম্নলিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট হইবে। বরিশাল ও নোয়াখালী জেলায় সুপারির চাষ আছে, কিন্তু উৎপাদনকারীরা অলসের মত বসিয়া থাকে; এবং সুপারির বিস্তৃত ব্যবসায় মগ, চীনা, এবং গুজরাটীদের হাতে; তাহারা ইহাতে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে।(১১)

বরিশালে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কয়েকটি স্থানে সীমাবদ্ধ যথা, বানরীপাড়া, বাটাজোড়, গইলা, গাভা ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ভূসম্পত্তি কিছু নাই। তাহারা অধিকাংশই চাকরিজীবী। যদি তাহাদের শক্তি ও অধ্যবসায় থাকিত, তবে এই সুপারির ব্যবসায় হস্তগত করিতে পারিত এবং বৎসরে স্বীয় জেলার ১০।১৫ লক্ষ টাকা ঘরে রাখিতে পারিত। এই উপায়ে তাহাদের নিজেদের গ্রামেই বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত, চাকুরির জন্য বিদেশে গৃহহীন ভবঘুরের মত বেড়াইত না।

ভারতে বাহির হইতেও (সিঙ্গাপুর দিয়া) বৎসরে প্রায় ২½ কোটি টাকার সুপারি আমদানি হয়। যদি কলেজে শিক্ষিত যুবকেরা বৈজ্ঞানিক কৃষির দ্বারা উন্নত প্রণালীতে সুপারির চাষ বাড়াইত, তাহা হইলে আরও কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করিতে পারিত। মিঃ জ্যাক ক্ষোভের সঙ্গে বলিয়াছেন,—"এই জেলার অধিবাসীদের ব্যবসায়বুদ্ধি অতি সামান্যই আছে।......এই জেলার লোকদের আর্থিক দুর্গতির একটা প্রধান কারণ, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সদর মহকুমা প্রভৃতি স্থানে সংখ্যায় বেশী, সুতরাং চাকরি পাওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন এবং ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে বেকার-

---

(১০) মুসলমান চামড়ার ব্যবসায়ীদের মধ্যেও অধিকাংশ অবাঙালী মুসলমান।

(১১) "রেঙ্গুন ও কলিকাতায় সুপারি রপ্তানির ব্যবসা সমস্তই বর্মী, চীনা এবং বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদের হাতে। তাহাদের সকলেরই এজেন্ট পাতারহাটে আছে এবং তাহাদের বেতন মাসিক হাজার টাকা হইতে তদূর্ধ্ব। তাহারা সপরিবারে বাস করে এবং রপ্তানির মরসুমে স্থানটি বর্মা শহরের মত বোধ হয়। স্টীমারঘাটের অনতিদূরে এই সব ব্যবসায়ীদের এলাকা। সেখানে শত শত মণ সুপারি প্রত্যহ শুকনো হইতেছে এবং বস্তাবন্দী করিয়া রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করা হইতেছে। পূর্ববঙ্গে পাটের ব্যবসায়ের ন্যায় এই সুপারির ব্যবসায়ও একটি প্রধান ব্যবসায়, কেননা ইহাতে বৎসরে প্রায় ৩০।৪০ লক্ষ টাকার কারবার হয়। কিন্তু কৃষকদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই ব্যবসায়ের সমস্ত লাভই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের হাতেই যায়।"—**The Bengal Co-operative Journal No. 3, January, 1927.**

লেখক সুপারি ব্যবসায়ের মূল্য কম করিয়া ধরিয়াছেন। জ্যাক তাঁহার "বাখরগঞ্জ" গ্রন্থে এই ব্যবসায়ের মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা হিসাব করিয়াছেন।

বাঙালীদের ঔদাসীন্য ও অক্ষমতার প্রসঙ্গে শিমুগার (মহীশূরের) আরাধ্য লিঙ্গায়েতদের কর্মতৎপরতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি আমি ভদ্রাবতী (শিমুগার একটি তালুক) লোহার কারখানা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম।

আমি দেখিলাম, যদিও লিঙ্গায়েতরা সামাজিক মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, তথাপি তাহারা শস্য চালানি ও সুপারির ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছে।

সমস্যা প্রবল। তাহারা এ পর্যন্ত কোন কর্মতৎপরতা দেখাইতে পারে নাই, অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই।"

সুপারির ব্যবসায়ের কথা বলিলাম। আর একটি শোচনীয় দৃষ্টান্ত দিতেছি। রংপুরের উত্তরাংশে (প্রধানতঃ নীলফামারী মহকুমায়) উৎকৃষ্ট তামাক হয়। বর্মাতে চুরুট তৈয়ারির জন্য এই তামাকের চাহিদা খুব আছে। বাংলার ফসলের রিপোর্ট (১৯২৮-২৯) হইতে দেখা যায়, সাধারণতঃ ১,৩৮,২০০ একর জমিতে তামাকের চাষ হয়। ১৯২৪-২৯ এই পাঁচ বৎসরের উৎপন্নের উপর মণ প্রতি গড়ে ১৬৸৴০ দাম এবং প্রতি একরে ৬ মণ উৎপন্নের পরিমাণ ধরিয়া, উৎপন্ন তামাকের মোট মূল্য ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়।(১২) কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তামাকের বাজার সবই বর্মী ও বোম্বাইওয়ালা খোজাদের হাতে।(১৩) রংপুরের জমিদার ও উকিলেরা তাঁহাদের ছেলেদের কলিকাতায় কলেজে পড়িতে পাঠান এবং ৪।৫ বৎসর ধরিয়া প্রতি ছেলের জন্য মাসিক ৪৫।৫০৲ টাকা ব্যয় করেন। যাঁহারা কলিকাতায় ছেলে পাঠাইতে পারেন না, স্থানীয় কলেজে ছেলে পাঠান। এই সব যুবকেরা লেখা-পড়া শেষ করিয়া যখন জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করে, তখন চারিদিকে অন্ধকার দেখে। উপায়ান্তর না দেখিয়া হয় তাহারা বেকার উকিল অথবা সামান্য বেতনের শিক্ষক বা কেরানী হয়। আমি বহুবার বলিয়াছি যে, ঐ সব জমিদার ও উকিলেরা যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্যের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিতেন অথবা কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা ও তাঁহাদের সন্তানেরা নিজেদের জেলায় ও গ্রামে থাকিয়াই লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতে পারিতেন। তামাক বা পাটের

---

(১১) ১৯২৮—২৯ সালে তামাকের ফসল খুব ভাল হইয়াছিল; প্রায় ১,৯০,০০০ একর জমিতে তামাকের চাষ হয়। প্রতি একরে ১২½ মণ হিসাবে মোট ২৩,২৭,৫০০ মণ তামাক হয়। বাজারদর প্রায় ২০৲ টাকা মণ ছিল। স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে এই হার বেশী। সেইজন্যই ঐ বৎসর মোট উৎপন্ন তামাকের মূল্য প্রায় ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল, অর্থাৎ গত পাঁচ বৎসরের গড় হিসাবে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশী। পাটের ন্যায় এই তামাকের চাষও বাজার-চলতি দরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(১৩) কলিকাতা হইতে বর্মায় যাহারা তামাক (কাঁচা) চালান দেয়, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীর নাম ঃ—

মেসার্স এইচ. থাই অ্যান্ড কোং, ২নং আমড়াতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।
,, এইচ. টি. এম. এইচ. তায়ুব অ্যান্ড কোং, ১২নং আমড়াতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।
,, এইচ. ই. এন. মহম্মদ অ্যান্ড কোং, ১৯নং জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা।
,, এন. জে. চাঁদ, ২৩নং আমড়াতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।
,, এ. ডি. ব্রাদার্স, ১৪৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

"রংপুর জেলার কোতোয়ালী থানার কাবারু গ্রামের জমিরুদ্দীন নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে কমিটির সাক্ষাৎ হয়। জমিরুদ্দীন নিজে ১৮ বিঘা জমিতে তামাকের চাষ করে এবং তামাক ব্যবসায়ে সে একজন বড় রকমের দালাল। এই সব দালালের মারফত ব্যবসায়ীরা তামাক পাতা ক্রয় করে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে—প্রধানতঃ আকিয়াব, মৌলমিন ও রেঙ্গুন হইতে ব্যবসায়ীরা আসে। ঐ অঞ্চলে প্রায় ৫০০ দালাল আছে এবং জমিরুদ্দীন তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একজন দালাল। কিন্তু সে-ই বৎসরে প্রায় ৫০ হাজার টাকার তামাকের কারবার করে।—**Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee,—1929-30.**

আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারিয়াছি। জমিরুদ্দীনের মত অসংখ্য দালাল আছে। তাহারা সাধারণ গ্রাজুয়েটদের চেয়ে ৪ গুণ বেশী উপার্জন করে। এবং সামান্য চাকরির লোভে বাড়ী ছাড়িয়া তাহাদের বিদেশে যাইতে হয় না।

মরসুম বৎসরের মধ্যে তিন মাসের বেশী থাকে না, অবশিষ্ট কয়েক মাস তাঁহারা লেখাপড়া, কৃষিকার্য এবং অন্যান্য কাজ করিতে পারিতেন।

ইংলণ্ডের অভিজাতদের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরাই 'জ্যেষ্ঠাধিকার আইন' অনুসারে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কনিষ্ঠ পুত্রেরা সাইরেনসেস্টার বা অন্যান্য স্থানের কৃষি-কলেজে পড়িতে যায় এবং সেখানে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া অস্ট্রেলিয়া অথবা কানাডায় গিয়া ধনী কৃষক হইয়া বসে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত লোকেরা হাত-পা-চোখ নিজেরাই যেন বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন এবং বাঁধা রাস্তা ছাড়া অন্য কোন পথে চলিতে পারেন না। তাঁহাদের একথা কখনই মনে হয় না যে, ভাল সার ও বীজ প্রয়োগ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্যের দ্বারা, চাষের উন্নতি ও উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন করা যায়। সুতরাং তাঁহারা গতানুগতিক ভাবেই চলিতে থাকেন এবং আবহমানকাল হইতে যেভাবে চাষ হইতেছে, তাহাই হইয়া থাকে।

রংপুর বুড়ীহাটে একটি সরকারী তামাকের ফার্ম আছে এবং সেখানে ভাল জাতের তামাকের চাষ হয়—জমিতে যথাযোগ্য সার প্রভৃতিও দেওয়া হয়। কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায়সাহেব যামিনীকুমার বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে উৎপন্ন বুড়ীহাট ফার্মের তামাক অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'তামাকের চাষ' গ্রন্থে তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা ও গবেষণা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানীয় জমিদারদের ছেলেরা এই সুযোগ গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করে না। সরকারী তামাকের ফার্মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পত্র লিখিয়া আমি যে উত্তর পাইয়াছি, তাহাতেও এই কথা সমর্থিত হয় ;—"আমি দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাইতেছি যে—ভদ্রলোকের ছেলেরা উন্নত প্রণালীর তামাকের চাষ শিখিবার জন্য আজকাল এখানে খুব কমই আসে।" বাঙালী যুবকদের বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উপাধির মোহে এতদূর অধঃপতন হইয়াছে যে, তাহাদের ঘরের কাছে যেসব সুযোগ সুবিধা আছে, তাহাও তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। একথা ভাবিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

আমি দেখিতেছি, প্রতি বৎসর নূতন নূতন রেলপথ খোলা হইতেছে, কিন্তু ঠিকাদারির কাজ সমস্তই কচ্ছী(১৪), গুজরাটী এবং পঞ্জাবীরা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালী কোথায়? প্রতিধ্বনি বলে—বাঙালী কোথায়?' কবি কালিদাস বলিয়াছেন—

রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্নাদা মনোর্বর্ত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥

অর্থাৎ প্রচলিত পথ হইতে এক চুলও এদিক ওদিক যাইতে পারে না।

---

(১৪) দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীযুত জগমল রাজার নাম করা যায়। ইনি কচ্ছদেশবাসী, এবং বালী ব্রিজের ঠিকাদারি লইয়াছিলেন। কয়েকটি কয়লার খনির কয়লা তুলিবার ঠিকাদারিও ইনি লইয়াছেন। শ্রীযুত রাজা এলাহাবাদের একজন বড় ব্যবসায়ী। সেখানে তাঁহার একটি কাচের কারখানা আছে। আমাদের প্রচলিত ধারণা অনুসারে যে ব্যক্তি অর্ধশিক্ষিত বলিলেও হয়, তিনি একাকী ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত এতগুলি বিভিন্ন রকমের ব্যবসা কিরূপে পরিচালনা করেন, তাহা সাধারণ উপাধিমোহগ্রস্ত বাঙালীর নিকট দুর্বোধ্য প্রহেলিকা মনে হইতে পারে।

(৩) বাংলার ব্যবসায়ে অবাঙালী

কিন্তু দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া লাভ কি? মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরা সমস্ত ব্যবসা অধিকার করিয়া আছে। কোথায় টাকা উপার্জন করা যায়, সে সম্বন্ধে তাহার যেন একটা স্বাভাবিক বোধশক্তি আছে। যেখানেই সে যায়, সেইখানেই খুঁটি গাড়িয়া স্থায়িভাবে বসে এবং স্থানীয় তিলি, সাহা প্রভৃতি জাতীয় আবহমানকালের ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়।

আমি এই শোচনীয় অবস্থার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিতে পারি। উহা হইতে অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইবে, বাঙালীরা নিজেদের কি শোচনীয় অবস্থার মধ্যে টানিয়া নামাইয়াছে।

বাঙালীরা বাংলার ব্যবসাক্ষেত্র হইতে ক্রমে ক্রমে বিতাড়িত হইতেছে। অ্যালুমিনিয়মের টিফিনের বাক্স, রান্নার পাত্র, বাটি, থালা প্রভৃতি বাঙালীর গৃহে আজকাল খুব বেশী ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু এ সমস্তই ভাটিয়ারা তৈরি করে। ভারতের সর্বত্র এই অ্যালুমিনিয়ম বাসনের ব্যবসা তাহাদের একচেটিয়া। ইহার তৈরি করিবার প্রণালী অতি সহজ। বিদেশ হইতে পাৎলা অ্যালুমিনিয়মের পাত যন্ত্রযোগে পিটিয়া বিবিধ আকারে পাত্র তৈরি হয়। এম. এস-সি., ডিগ্রীধারী বাঙালী গ্রাজুয়েট যুবক অ্যালুমিনিয়মের দ্রব্যগুণ মুখস্থ বলিতে পারে, উহাদের রাসায়নিক প্রকৃতিও তাহারা জানে। কিন্তু ভাটিয়ারা এসব কিছুই করে না, তবু এই ধাতু হইতে নানা দ্রব্য তৈরি করিয়া তাহারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করে।

খনিশিল্পেও বাঙালীদের স্থান অতি নগণ্য। এই শিল্পে ইউরোপীয়েরাই সর্বাগ্রগণ্য। ভারতবাসীদের মধ্যে মাড়োয়ারী এবং কচ্ছীরাই প্রধান। তাহারা ভূতত্ত্ব ও খনিজতত্ত্বের কিছু জানে না ; তৎসত্ত্বেও তাহারাই সর্বদা খনি ব্যবসায়ের সুযোগ সন্ধান করে। তাহারা অনেক খনির ইজারা লইয়াছে এবং বহু কয়লা ও অভ্রখনির তাহারা মালিক। এই সব খনির কাজ তাহারা নিজেরাই পরিচালনা করে। খনিবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভূতত্ত্বে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী বাঙালী গ্রাজুয়েটেরা ঐ সব ব্যবসায়ীদের অধীনে চাকরি পাইলে সৌভাগ্য জ্ঞান করে। লাক্ষা শিল্পেও বাঙালীর স্থান নাই। মাড়োয়ারীরা ইউরোপীয়দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এই ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছে। কোদারমাতে (বিহার) অভ্রের বড় খনি আছে। অভ্রের ব্যবসায়ের প্রবর্তকদের মধ্যে কয়েকজন বাঙালীর নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবসায় ইউরোপীয় ও মাড়োয়ারীদের একচেটিয়া। ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে ভারত হইতে যে অভ্র রপ্তানি হইয়াছে, তাহার মূল্য এক কোটি টাকারও বেশী। (*Indian Mica*—R. R. Chowdhury)

মোটরযানের ব্যবসা পঞ্জাবীদেরই একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহারা বৈদ্যুতিক মিস্ত্রীর কাজও ভাল করে। প্লাম্বিং ব্যবসায়ে শ্রমশিল্পের কাজ উড়িয়ারাই করে। কলিকাতার জুতানির্মাতারা চীনা কিংবা হিন্দুস্থানী চর্মকার। কলিকাতায় এবং মফঃস্বল শহরে, চাকর, রাঁধুনী বামুন প্রভৃতি হিন্দুস্থানী অথবা উড়িয়া।

সমস্ত মজুর, রেলওয়ে কুলি এবং হুগলী ও অন্যান্য নদীতে নৌকার মাঝি, বিহারী কিংবা হিন্দুস্থানী। ঢাকা, কলিকাতা এবং অন্যান্য শহরের নাপিতেরা প্রধানতঃ অ-বাঙালী। কলিকাতায় রাজমিস্ত্রীর কাজও অ-বাঙালীরা অধিকার করিতেছে। কলিকাতায় একজনও গাড়োয়ান বা কুলি বাঙালী নয়।

বাংলার শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় সরকারী রিপোর্টে (১৯০৬) দেখা যায় যে, ২০ বৎসর পূর্বে পাটের কলে সব বাঙালী মজুর ছিল, কিন্তু ১৯০৬ সালে তাহাদের দুই-তৃতীয়াংশ অ-বাঙালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙালী মজুরের সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে এবং বর্তমানে তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৩ জনের বেশী নহে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও রাঁধুনী, মিষ্টান্নবিক্রেতা, নাপিত ও মাঝি সবই বাঙালী ছিল।

কলিকাতা শহরে এখন মিষ্টান্নবিক্রেতা, হালুইকর ও মুদির দোকান প্রভৃতি মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানীরা চালাইয়া থাকে। শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দ পর্যন্ত, ওদিকে উত্তরবঙ্গে সান্তাহার, পার্বতীপুর এবং জলপাইগুড়ি প্রভৃতি পর্যন্ত, ই. বি. রেলওয়ের শাখা বাঙালী অধ্যুষিত স্থানের মধ্য দিয়াই গিয়াছে। কিন্তু স্টেশনে মিষ্টান্নবিক্রেতা ও খাবার দোকানওয়ালারা গুজরাটী এবং পার্শী। বস্তুতঃ যেসব কাজে গঠনশক্তির বা তদারকি করিবার প্রয়োজন আছে, তাহা বাঙালীর ধাতে যেন সহ্য হয় না।

আমার বাল্যকালে, কলিকাতার গোয়ালারা সব বাঙালী ছিল। কিন্তু এখন আর ঐ ব্যবসায়ে বাঙালী দেখা যায় না। হিন্দুস্থানী গোয়ালারা বাঙালীদের ঐ ব্যবসায় হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। হিন্দুস্থানী গোয়ালারা ভাল জাতের গরু ও মহিষ রাখে, তাহাদের পুষ্টিকর ভাল খাদ্য খাওয়ায়। সুতরাং বাঙালী গোয়ালাদের গরুর চেয়ে তাহাদের গরু বেশী দুধ দেয়। কেবল কলিকাতা নয়, মফঃস্বল শহরেও বাঙালী ধোপা নাপিত বিরল হইয়া পড়িতেছে এবং হিন্দুস্থানীরা তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে।

বাঙালীরা কেন এই শ্রমশিল্পী চাকর ও মজুরের কাজ হইতে বিতাড়িত হইতেছে, তাহার নানা কারণ দেখানো হয়, তাহার মধ্যে একটি ম্যালেরিয়ার জন্য বাঙালীজাতির জীবনী-শক্তির ক্ষয়। ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা হয় যে, বর্ধমান, হুগলী ও দিনাজপুর জেলার কোন কোন অংশে, সাঁওতালেরা স্থায়িভাবে বসবাস করিয়াছে এবং চাষের কাজ বহুল পরিমাণে তাহাদের দ্বারাই করা হইয়া থাকে। এই যুক্তির মধ্যে কিছু সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহা সত্যকার কারণ বা সন্তোষজনক কারণ নয়। বর্ধমান, প্রেসিডেন্সি এবং রাজসাহী বিভাগের পক্ষে ম্যালেরিয়ার যুক্তি কিয়ৎপরিমাণে খাটে, কিন্তু ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ এখনও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অনেকাংশে মুক্ত। কিন্তু এই সব স্থানেও অবাঙালীদের প্রাধান্য যথেষ্ট। বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলে এত বেশী বিহারী শ্রমিকেরা কিরূপে আসিল? পূর্ব-বঙ্গের খেয়াঘাটগুলিও এই বিহারীদের দ্বারা চালিত হয়।

খুলনা, বাগেরহাট এবং তৎসংলগ্ন ফরিদপুর জেলায় বড় বড় খেয়াঘাটগুলি নিলামে সর্বোচ্চ ডাকে ইজারা দেওয়া হয়। কিন্তু স্থানীয় বাঙালীরা এই সব

খেয়াঘাট চালাইতে পারে না। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলার সমস্ত খেয়াঘাটের ইজারাদার হিন্দুস্থানী ছত্রপৎ সিং, এই সব খেয়াঘাট জেলা বোর্ড হইতে নিলামে ইজারা দেওয়া হয় এবং জেলা বোর্ডগুলি সম্পূর্ণরূপে বাঙালীদেরই পরিচালিত। কিন্তু কোন বাঙালী যদি খেয়াঘাটের ইজারা নেয়, তাহা হইলে আলস্য ও ব্যবসা-বুদ্ধির অভাবে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না এবং শীঘ্রই সে দেনাদার হইয়া পড়ে। এই কারণে খেয়াঘাটগুলি হিন্দুস্থানীদের একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা হয়তো কুলি বা ভৃত্যরূপে কাজ আরম্ভ করে এবং শেষে নিজেদের শ্রম ও অধ্যবসায় বলে বাঙালীদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লয়।

পূর্ববঙ্গে বর্ষার পর যখন জল শুকাইয়া যায়, সেই সময় ঐ অঞ্চলের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, সেই সময় বিহার হইতে পালকির বেহারারা আসিয়া বেশ পয়সা উপার্জন করে। বাংলার দূরবর্তী নিভৃত গ্রামেও আমি বাঙালী বেহারা কমই দেখিয়াছি। পূর্বে, কৃষকেরা অবসর সময়ে পালকি বহিয়া অর্থ উপার্জন করিত, কিন্তু এখন তাহারা অনাহারে মরিবে, তবু বেহারার কাজ করিবে না। বস্তুতঃ, একটা অবসাদ, মোহ এবং শ্রমের মর্যাদাজ্ঞানের অভাব বাঙালীর চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

নিম্নজাতিদের মধ্যে কয়েক বৎসর হইল একটা নূতন ধরনের জাতির গর্ব ও মর্যাদা-জ্ঞান দেখা যাইতেছে। তাহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া দাবি করে এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কোন মাল বহন করিতে চায় না, নৌকা বাহিতে চায় না। ফলে অসংখ্য হিন্দুস্থানী মজুর ও নৌকার মাঝি আসিয়া বাংলাদেশ দখল করিয়া বসিয়াছে, আর বাঙালীরা না খাইয়া মরিতেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিতে রায়তদের অনেকটা স্থায়ী স্বত্ব জন্মে, খাজনা-বৃদ্ধির আশঙ্কা তেমন নাই। তাহার উপর বাংলা দেশের জমিও স্বভাবতঃই উর্বরা, এই সমস্ত কারণ সমবায়ে বর্তমান শোচনীয় আর্থিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই আমি দেখাইয়াছি যে, জমির উৎপন্ন ফসলে বাংলার সমস্ত লোকের পোষণ হয় না এবং কোন বৎসর অজন্মা হইলে, লোকে অনাহারে মরে।(১৬)

১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িতের সেবাকার্যের সময়ে সান্তাহার রেলওয়ে স্টেশনের জমিতে সেবা-সমিতির প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। চারিদিকের গ্রামের লোকের যে দুর্দশা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয় এবং সেই সময়ে শীতের উত্তর বাতাসে লোকের কষ্ট আরও বাড়িয়াছিল। লোকেরা শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিত এবং কম্বল, কাপড় ও খাদ্যশস্য চাহিত। সেই সময়ে সান্তাহারে ৪।৫ হাজার হিন্দুস্থানী কুলি থাকিত। তখন পার্বতীপুর হইতে শিলিগুড়ি পর্যন্ত 'ব্রড্‌গেজ' বা বড় ল্যাইন খোলা হয় নাই। সুতরাং 'বড় লাইন' হইতে 'ছোট লাইনে'

---

(১৬) ১৯২৮ সালে বাংলার ৭।৮টি জেলা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইয়াছিল, যথা—বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, দিনাজপুরের কিয়দংশ, মুর্শিদাবাদ এবং যশোহর ও খুলনার কিয়দংশ। ১৯৩০—৩১ সালে ব্যবসারে মন্দা এবং পাটের মূল্য হ্রাসের জন্য বাংলার কৃষকদের শোচনীয় দুর্দশা হইয়াছিল।

মাল বহন করিবার জন্য এবং লাইন মেরামত করিবার জন্য এই কুলিদের প্রয়োজন হইত। কিন্তু ঐ অঞ্চলের বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামবাসীদের বাড়ী স্টেশন হইতে অল্প দূরে হইলেও, তাহাদের দ্বারা কুলির কাজ করানো যাইত না, তাহারা বলিত যে উহাতে তাহাদের 'ইজ্জত' যাইবে। সেবা-সমিতির প্রধান কার্যালয় যখন সান্তাহার হইতে আত্রাইয়ে স্থানান্তরিত হইল, তখন মাসিক ২০৲ টাকা মাহিয়ানায় কতকগুলি হিন্দুস্থানী কুলিকে চাউলের বস্তা ও অন্যান্য জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইল। স্থানীয় লোকেরা সেবা-সমিতি হইতে ভিক্ষা লইলেও, তাহারা ঐ সব 'কুলির কাজ' করিতে কিছুতেই রাজী হইল না। সময়ে সময়ে ২।৪ জন স্থানীয় লোক পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত বেশী মজুরি দাবি করিত এবং কাজও আন্তরিকভাবে করিত না।

(৪) শ্রমের অনভ্যাস ও অধ্যবসায়ের অভাবই ব্যর্থতার কারণ

চীনা মিস্ত্রীরা বাঙালী মিস্ত্রীদিগকে ক্রমেই কার্যক্ষেত্র হইতে হঠাইয়া দিতেছে। ইহার কারণ চীনা মিস্ত্রীদের উচ্চশ্রেণীর কারিগরি, পরিশ্রমপটুতা ও দক্ষতা। ব্যক্তিগতভাবে তুলনা করিলে বাঙালীরা দক্ষতা ও পরিশ্রমপটুতায় হিন্দুস্থানীদের নিকট দাঁড়াইতে পারে না, হিন্দুস্থানীরা আবার চীনাদের নিকট দাঁড়াইতে পারে না।(১৭) বাঙালী মিস্ত্রী ও চীনা মিস্ত্রীদের সঙ্গে তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ দেখা যাইবে, যদিও তাহারা সমাজের একই স্তরের লোক এবং উভয়েই অশিক্ষিত। চীনা মিস্ত্রীরা ধীরে ধীরে কলিকাতায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং রেলওয়ে ও **P W. D.** হইতে ঠিকাদারি লইতেছে। তাহারা নিজেরা কারখানা স্থাপন করে, কিন্তু বাঙালী মিস্ত্রীরা (তাহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান) দিন মজুরি পাইয়াই সন্তুষ্ট এবং স্বীয় অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য কোন চেষ্টা করে না। একথা সকলেই জানে যে, বাঙালী মিস্ত্রীরা যে মুহূর্তে বুঝিতে পারে যে, তাহাদের কাজ তদারক করিবার জন্য কেহ নাই, সেই মুহূর্তেই তাহারা কাজে ঢিলা দিতে আরম্ভ করে। তাহাদের এই কদভ্যাস একরূপ প্রবাদ বাক্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দুস্থানীরা বাঙালীদের চেয়ে বেশী কর্মঠ, কিন্তু চীনারা ইহাদের সকলের চেয়ে কর্মঠ ; তা ছাড়া, চীনারা বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন। কোন চীনা কখনও তাহার কর্তব্যে অবহেলা করে না। তাহার প্রভুর নজর তাহার কাজের উপব থাকুক আর না-ই থাকুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। সে বেশী মজুরি নেয় সত্য, কিন্তু প্রতিদানে ভাল কাজ করে এবং বেশী কাজ করে। আর একটি প্রভেদ এই যে, বাঙালী

---

(১৭) কলিকাতায় পূর্বে হিন্দু ছুতার মিস্ত্রীদেরই প্রাধান্য ছিল, কিন্তু আধুনিক কালে মিস্ত্রীদের ছেলেরা স্ব-ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক এবং কেরানীর কাজ পাইবার জন্য ব্যগ্র হওয়াতে, হিন্দু মিস্ত্রীদের স্থান চীনা ও এদেশীয় মুসলমান মিস্ত্রীরা দখল করিতেছে।... ভারতীয় মিস্ত্রীদের প্রধান দোষ, তাহারা সঠিক মাপজোখ করিতে অনিচ্ছুক, যন্ত্রপাতি ভাল আছে কি না, তাহা দেখে না এবং তাহাদের সময়-জ্ঞানের অত্যন্ত অভাব। এ দেশের প্রচলিত প্রবাদেও ছুতার মিস্ত্রীদের এই সময়-জ্ঞানের অভাবের প্রতি কটাক্ষ আছে।—**Cumming :** ***Review of the Industrial Position and Prospects of Bengal in 1908, p. 16.***

বা হিন্দুস্থানী শ্রমশিল্পীর উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা নাই, সে তাহার চিরাচরিত পথে চলে, যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে। কিন্তু একজন চীনা যে কেবল ভাল কাজ করে, তাহাই নয়, কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দেয় এবং উহাতে গর্ববোধ করে। দিনের পর দিন সে তাহার কাজে উন্নতি করে, যতদূর সম্ভব তাহার কাজে কোন ত্রুটি হইতে সে দেয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার চরিত্রে নানা দোষও আছে। আফিং খাওয়ার অভ্যাস সে ক্রমে ত্যাগ করিতেছে বটে, কিন্তু সে এখনও জুয়াখেলায় অত্যন্ত আসক্ত। কিন্তু চীনারা অশিক্ষিত হইলেও বেশী কৌশলী ও অধ্যবসায়ী। রেঙ্গুন, মালয় উপনিবেশ এবং আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে তাহারা নিজেদের বসতি বিস্তার করিয়াছে। প্যারী, আমস্টার্ডাম এবং ম্যানচেস্টারেও চীনাদের দেখা যায়। সেখানে তাহারা দোকানদার, শ্রমিক ইত্যাদি রূপে জীবিকানির্বাহ করে। বস্তুতঃ, চীনারা হিমশীতল মেরুপ্রদেশেই হোক আর রৌদ্রতপ্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই হোক, যে কোন জলবায়ুর মধ্যে টিকিয়া থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে, বাঙালী শ্রমশিল্পীদের অধ্যবসায় নাই; এই পরিবর্তনশীল যুগে বিচিত্র অবস্থার সঙ্গে সে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে না। সে অনাহারে মরিবে, তবু পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিবে না। পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা জাতিগত কুসংস্কার না থাকার দরুন, অধিকতর সাহসী ও অধ্যবসায়শীল। নদীবক্ষের স্টীমারে তাহারাই সারেঙ এবং লস্করের কাজ করে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান, পি. এ্যাণ্ড ও. কোং এবং অন্যান্য কোম্পানির সমুদ্রগামী জাহাজেও তাহারাই প্রধানতঃ লস্করের কাজ করে। তাহারা অনেক সময়ে জনবহুল পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পদ্মার চরে অথবা আসামের জঙ্গলে যাইয়া বসতি করে এবং সেখানে তাহারা প্রচুর ধান ও পাট উৎপন্ন করে। তৎসত্ত্বেও তাহারা চীনাদের সঙ্গে তো দূরের কথা, উত্তর ভারত হইতে আগত হিন্দুস্থানীদের সহিতও প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে না।

কলিকাতায় ছোট ছোট চামড়ার কারখানা এবং জুতার দোকান সমস্তই চীনা, জাঠ মুসলমান এবং হিন্দুস্থানী চামারদের হস্তগত। নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি হইতে আমার উক্তির সত্যতা বুঝা যাইবে ঃ—

"কলিকাতায় চীনাদের প্রায় ২৫০ শত জুতার দোকান আছে, উহারা সকলে মিলিয়া প্রায় ৮।১০ হাজার মুচিকে কাজে খাটায়। প্রচলিত প্রথা এই যে, জুতার উপরের অংশ চীনারা তৈরি করে এবং সুকতলা ও গোড়ালি মুচিরা সেলাই করিয়া দেয়। এই কাজে মুচিদের মজুরি সাধারণতঃ দৈনিক ৸০ আনা হইতে ৸৶০ আনা। বেশী কারিগরির কাজ হইলে মজুরি এক টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়।" *The Statesman,* Oct., 1930.

মুচিদের সংখ্যা যদি গড়ে ৯ হাজার এবং প্রত্যেকের মজুরি দৈনিক তেরো আনা ধরা যায়, তাহা হইলে মুচিদের আয় বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। হিন্দুস্থানীদের জুতার দোকানে আরও কয়েক হাজার মুচি নিজেরা জুতা নির্মাণের ব্যবস্থা করে; এবং পূর্বোক্ত হারে তাহারাও বৎসরে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। সুতরাং

কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হইলেও, ইহা সত্য যে, অবাঙালী মুচিরা এই বাংলাদেশে বসিয়া বৎসরে ৫২ লক্ষ টাকা অথবা অর্ধ কোটি টাকার অধিক উপার্জন করে।

ঢাকা শহরের নিকটে যে সব চামার বাস করে, তাহাদের ব্যবসা নাই, সুতরাং তাহারা অনশনক্লিষ্ট জীবন যাপন করে। বাংলার অনুন্নত জাতিদের মধ্যে তাহারাই সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও নিপীড়িত। তাহারা জীবিকার জন্য ভিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করে না। যদি তাহারা জুতা মেরামত বা জুতা সেলাইয়ের কাজও করিত, তাহা হইলেও দৈনিক বারো আনা এক টাকা উপার্জন করিতে পারিত। কিন্তু এই কাজ হিন্দুস্থানী বা বিহারী চামারেরা দখল করিয়া লইয়াছে। অবশ্য এই কর্মে অপ্রবৃত্তিই ঢাকার চামারদের এই দুর্দশার কারণ। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদরি কেরী সাহেব একথা বলিতে লজ্জা বোধ করিতেন না যে, তিনি এক সময়ে চর্মকারের কাজ করিতেন; লেনিনের পদাধিকারী স্ট্যালিন তাঁহার দারিদ্র্যের দিনে মুচির কাজ করিতেন। কিন্তু আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার আগাগোড়া একটা কাল্পনিক গর্বে আচ্ছন্ন।

একজন শিক্ষিত অধ্যবসায়শীল বাঙালী সরকারী রিসার্চ ট্যানারীতে তিন বৎসর শিক্ষা লাভ করিয়া জুতার ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি সাধারণতঃ তাঁহার কারখানাতে দশ জন হিন্দুস্থানী চামার নিযুক্ত করেন, উহারা দিন ১০।১২ ঘণ্টা কাজ করিয়া প্রত্যহ গড়ে এক জোড়া করিয়া জুতা তৈরি করে। তাহাদের আয় দৈনিক গড়ে ১৷৷৵০ অথবা মাসে ৫০ টাকা। বাঙালী যুবকটি আমাকে বলিয়াছিল যে, একজন চীনা মুচি যদিও মাসিক এক শত টাকার কমে কাজ করিতে রাজী হইবে না, তবুও তাহার দ্বারা কাজ করানো শেষ পর্যন্ত লাভজনক। কেননা সে বেশী পরিশ্রম করে এবং তাহার কাজও ভাল হয়। চীনারা মৌমাছিদের মত পরিশ্রমী। তাহারা দিনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত কাজে লাগায়, এক মিনিট সময়ও নষ্ট করে না। তাহাদের মেয়েরাও সমান পরিশ্রমী, এবং বাঙালী মেয়েদের মত তাহারা দিবানিদ্রায় সময় নষ্ট করে না। দোকানের পিছনে নিজেদের বাড়ীতে তাহারা হয় কাপড় কাচায় ব্যস্ত অথবা জামা সেলাই করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতায় চীনারা জুতা ও চামড়ার ব্যবসায়ে বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকারও বেশি উপার্জন করে। তা ছাড়া, চীনা ছুতারেরাও বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করে।

(৫) অধ্যবসায় ও উদ্যমের অভাব ব্যর্থতার কারণ

আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি, তখন সমস্ত মসলা ব্যবসায়ীরা বাঙালী ছিল। এখন গুজরাটীরা এই ব্যবসায় বাঙালীদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে।(১৮) আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়,

---

(১৮) বাংলায় 'গন্ধবণিক' শব্দের অর্থ মসলা ব্যবসায়ী—এ পর্যন্ত এ ব্যবসা তাহাদেরই একচেটিয়া ছিল।

আমি নিম্নে কয়েকজন প্রসিদ্ধ মসলা ব্যবসায়ীর নাম করিতেছি :—আর্মেনিয়ান স্ট্রীট—রামচন্দ্র রামরিচ পাল, জানকীদাস জগন্নাথ, রাউথমল কানাইয়ালাল। আমড়াতলা স্ট্রীট—রতনজী

প্রথম যখন ব্রিটিশ পণ্য বর্জন আরম্ভ হয়, তখন স্বদেশী সিগারেট বা বিঁড়ির প্রচলন হয়। তখন কলিকাতায় বহু ভবঘুরে এই বিড়ির ব্যবসা করিয়া সাধু উপায়ে দুই পয়সা উপার্জন করিত। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরাই, যথা, গাড়োয়ান, ছ্যাকড়া গাড়ীওয়ালা, কুলি প্রভৃতি সাধারণতঃ বিড়ি খাইত। উচ্চস্তরের লোকেরা বিড়ি পছন্দ করিত না। গুজরাটীরা সর্বদা নূতন সুযোগের সন্ধানে থাকে, তাহারা চট করিয়া বুঝিতে পারিল যে, যেখানে বিড়ির পাতা পাওয়া যায় এবং শ্রমের মূল্য কম, সেই স্থানে যদি বৃহৎ আকারে বিড়ির ব্যবসা ফাঁদা যায়, তবে খুব ভাল ব্যবসা চলিবে। তদনুসারে তাহারা মধ্যপ্রদেশকে কার্যক্ষেত্র করিয়া লইল। বি. এন. রেলওয়ে এই কাজের উপযুক্ত স্থান। এখানে জমি শুষ্ক অনুর্বর, অধিবাসীদের জীবিকা সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হয়, কাজেই মজুরি খুব কম। তা ছাড়া ঐ স্থানের বনে শাল ও কেন্দুয়া গাছ আছে, উহার পাতায় মোড়ক ভাল হয়। বোম্বাই অঞ্চল হইতে তামাক আমদানি করা হয়। কিন্তু গণ্ডিয়া কলিকাতা বা লাহোরের চেয়ে বোম্বাইয়ের বেশী কাছে, সুতরাং তামাক পাতা আনিতে রেলের মাসুল কম পড়ে। এই বিড়ি তৈরির ব্যবসা সম্পূর্ণরূপেই কুটীর-শিল্প, কোন কল ইহাতে ব্যবহৃত হয় না। বড় বড় বিড়ির ফার্মও আছে, ১৯২৬ সালে ইহার একটি আমি পরিদর্শন করি। এগুলি কেবল বিড়ি পাতার এবং তৈরী বিড়ি সংগ্রহের গুদাম। এইরূপে একটি বৃহৎ ব্যবসা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইহার দ্বারা প্রায় ৫০ হাজার লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে। কারখানা হইতে বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিড়ি তৈরি হইতেছে। আধুনিক স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই ব্যবসায়ের জোর হইয়াছে, কেননা অন্ততঃপক্ষে বাংলাদেশে সর্বশ্রেণীর লোক বিড়ি খাওয়া আরম্ভ করিয়াছে এবং বিড়ির ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হইতেছে।(১৯)

এই শোচনীয় কাহিনী আমি এখন শেষ করি। লোহালক্কড়ের শত শত দোকান

জীবনদাস, রামলাল হনুমান দাস, গোপীরাম যুগলকিশোর, শুকদেও জহরমল, এন. জগতচাঁদ, জগন্নাথ মতিলাল, যশোরাম হীরানন্দ, সুরজমল সতুলাল, তার মহম্মদ জালু, দোজী দাদাভাই হোসেন কাসেম দাদা, হাজী আলি মহম্মদ আলি শা মহম্মদ, মতিচাঁদ দেওকরন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাঙালী তাহার বংশানুক্রমিক ব্যবসা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে।

(১৯) বিড়ি ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ১৯২৮—২৯ সালে প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী সিগারেট আমদানি হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সিগারেটের পরিবর্তে লোকে বিড়ি ব্যবহার করাতে, বিড়ি ব্যবসায়ে খুব লাভ হইতেছে। কাঁচা মাল সরবরাহের ব্যবসাও বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে; এক শ্রেণীর চূর্ণ তামাক এবং কেন্দুয়া গাছের পাতাই ইহার কাঁচা মাল। যাহারা বিড়ি এবং তৎসম্পর্কীয় কাঁচা মালের ব্যবসা করে, এরূপ কয়েকটি প্রধান ফার্মের নাম দেওয়া গেল :—

মূলজী সিক্কা এন্ড কোং, এজরা স্ট্রীট; ভোলা মিঞা, ক্যানিং স্ট্রীট; চুণিলাল পুরুষোত্তম, চিৎপুর রোড; কালিদাস ঠাকুরসী, আমড়াতলা স্ট্রীট; ভাইলাল ভিকাভাই, আমড়াতলা স্ট্রীট; মণিলাল আনন্দজী, হ্যারিসন রোড; সতীশচন্দ্র চন্দ্র, হ্যারিসন রোড।

দেখা যাইতেছে, বিড়ি ব্যবসায়ে মাত্র একটি প্রধান বাঙালী ফার্ম আছে। অধিকাংশ বিড়ির কারখানাই মধ্যপ্রদেশে বি. এন. রেলওয়ে লাইনের ধারে—সম্বলপুর, বিলাসপুর, চম্পা, হেমগিরি, গণ্ডিয়া, গিধৌড় প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। ঐ সব স্থানে শ্রমের মূল্য কম। ছোট ছোট কারখানাগুলিতে সাধারণতঃ দৈনিক ২০০ শ্রমিক কাজ করে, আর বড় কারখানাগুলিতে দৈনিক গড়ে দুই হাজার পর্যন্ত শ্রমিক কাজ করে।

গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বেও যে সমস্ত হিন্দুস্থানী মজুরের কাজ করিত, তাহারা নিলামে নানাবিধ কলকব্জা বা তাহার অংশ কিনিতে থাকে। এখন তাহারা রীতিমত ব্যবসায়ী এবং তাহাদের সঙ্ঘ আছে। তাহারা সর্বদাই পুরাতন কলকব্জা প্রভৃতি জিনিস কিনিবার সন্ধানে থাকে, কোন কোন সময়ে টাকা সংগ্রহ করিয়া পুরাতন স্টীমার পর্যন্ত কিনিয়া ফেলে। ইহাদের দোকানে সর্বপ্রকার পুরানো কলকব্জা লোহালক্কড় প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই ব্যবসায়ে বাঙালী নাই।

দুর্ভাগ্যক্রমে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি গুরুতর ভ্রম, এমন কি অপরাধ করিয়াছে—কমার্স বা বাণিজ্য বিদ্যায় উপাধি দানের ব্যবস্থা করিয়া। ছাত্রেরা মনে করে কতকগুলি পুস্তক পড়িয়া, বি. কম. ডিগ্রীর যোগ্যতা লাভ করিয়া তাহারা ব্যবসাজগতে সাফল্য অর্জন করিবে। কিন্তু বি. কম. উপাধিধারীর মস্তিষ্ক কতকগুলি বড় বড় কেতাবী কথায় পূর্ণ হয়। পরে সে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারে, কিন্তু তখন আর সংশোধনের সময় থাকে না। সে তাহার অধীত পুস্তকাবলী হইতে পাতার পর পাতা মুখস্থ বলিতে পারে। সে অর্থনৈতিক ভূগোল এবং অর্থনীতি পড়ে, এবং তুলা, পাট, প্রভৃতি কিরূপে সরবরাহ হয় এবং কিরূপেই বা তাহা চালান হয়, এসব তথ্য তাহার নখাগ্রে থাকে। কিন্তু অশিক্ষিত বিড়িওয়ালা ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করে নাই, তৎসত্ত্বেও ভারতের কোথায় সস্তায় কাঁচা মাল ও মজুর পাওয়া যায় ঐ সমস্ত তথ্য তাহার মানস-দর্পণে ভাসিতেছে এবং সেগুলি কাজে লাগাইতেও সে জানে। হতভাগ্য বি. কম. ডিগ্রীধারী কোন মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া ফার্মে কেরানীগিরি পাইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র। তাহার বিদ্যার গর্ব ধোঁয়ায় পরিণত হয়। অন্ধভাবে ইউরোপীয় ধারার অনুসরণ করার ফলেই আমাদের যুবশক্তির এইরূপ শোচনীয় অপব্যয় হইতেছে। ইংলণ্ড ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী জাতি, একথা আমরা ভুলিয়া যাই। সেখানে শিল্প-বাণিজ্য অর্থনীতি বিজ্ঞান হিসাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য বাঙালীরা এখনও শিখে নাই। তা ছাড়া লণ্ডনে দিবাভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে যে সব বক্তৃতা দেওয়া হয়, সন্ধ্যাকালে ব্যাঙ্ক রেলওয়ে, ব্যবসায়ী ফার্ম প্রভৃতিতে নিযুক্ত শিক্ষানবিস যুবকদের উপকারের জন্য সেগুলি পুনরাবৃত্তি করা হয়। আমাদের দেশে উহার অনুকরণ করিলে ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী জুতিবার মত অবস্থা হইয়া দাঁড়াইবে।

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে (১৯শ পরিচ্ছেদ) দেখাইয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের মোহ আমাদের যুবকদের কিরূপ অকর্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা ব্যবসাক্ষেত্রে কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে বিমুখ।(২০)

---

(২০) একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়,—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মোহ আমেরিকার যুবকযুবতীদেরও সম্প্রতি পাইয়া বসিয়াছে। তাহাদের উদ্যম ও দৃঢ়তার কথা ইতিপূর্বে বহুবার বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহারাও আরামের চাকরি ও ব্যবসার মোহিনী প্রলোভনে ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৩২ সালের ২০শে জুলাই তারিখের 'হিন্দু' পত্রে লিখিত হইয়াছেঃ—

বাংলাদেশে আগত মাড়োয়ারী বা অবাঙালী তাহার ব্যবসার প্রথম অবস্থায় সামান্যভাবে জীবনযাপন করে, সে যতদূর সম্ভব কম ব্যয়ে জীবনধারণ করে। সে কায়িক পরিশ্রম করিতে সর্বদা প্রস্তুত এবং সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ক্রমাগত পরিশ্রম করে এবং ইহার ফলে সে দেশীয় ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা সস্তায় জিনিস বিক্রয় করিয়া প্রতিযোগিতায় তাহাদের পরাস্ত করিতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এসিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে কেন নানারূপ কঠোর আইন করিয়াছে, তাহা এখন বুঝা শক্ত নহে। 'জন চীনাম্যান, এক মুষ্টি অন্ন খাইয়া থাকে, মদ্যপানও করে না, সুতরাং কম মজুরিতে কাজ করিয়া তাহার শ্বেতাঙ্গ সহকর্মীদের সে প্রবল প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়ায়। হকার বা ছোট ব্যবসায়ীদের কাজে সে অল্প লাভে জিনিস বিক্রয় করিতে পারে।' বস্তুতঃ, এসিয়াবাসীরা যতই ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হোক না হোক, আত্মরক্ষার জন্যই আমেরিকাকে 'ইমিগ্রেশান' আইন করিতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে অর্থনৈতিক কারণই বেশী, বর্ণবিদ্বেষ ততটা নাই।

বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে বাঙালীরা ক্রমেই বিতাড়িত হইতেছে, ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা। অবশ্য দোষ তাহাদের নিজেরই। ১৯৩১ সালের ১১ই ফেব্রুআরি তারিখের 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখক বলিয়াছেন ঃ—

"১৮৯০ সালের কোঠায় আমি যখন বোম্বাই হইতে প্রথম কলিকাতায় আসি, তখন অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যই বাঙালীদের হাতে ছিল। কিন্তু উদ্যোগ, অধ্যবসায় এবং সাধুতার অভাবে তাহারা ব্যবসাক্ষেত্র হইতে ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয়, মাড়োয়ারী, খোজা, ভাটিয়া, মাদ্রাজী এবং পার্শীদের দ্বারা বহিষ্কৃত হইয়াছে।...বাঙালী ব্যবসায়ীর প্রায় সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ে যথা চাউল, পাট, চিনি, লবণ প্রভৃতিতে—প্রধান ছিল। কিন্তু ১৮৯০ সালের পর র‍্যালি ব্রাদার্স পূর্বেকার বাঙালী ফার্মের স্থলে মাড়োয়ারী ফার্মকে তাহাদের দালাল নিযুক্ত করিল। ঐ মাড়োয়ারী ফার্ম স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কার সুদক্ষ পরিচালনায় এখনও কাপড়ের ব্যবসায়ে র‍্যালি ব্রাদার্সের দালালের কাজ করিতেছে। মাড়োয়ারী ফার্ম একটি বড় ব্যবসায়ী ফার্মের দালালি হস্তগত করায়, মাড়োয়ারী দোকানদার প্রভৃতি স্বভাবতঃই উহাদের নিকট হইতে

"আমেরিকায় সহজসাধ্য ব্যবসায়ের মোহে ফটকাবাজী অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেকেই ডাক্তার, উকিল, জমিদার, বিজ্ঞাপনের এজেন্ট অথবা অধ্যাপক হইতে চায়। কঠোর পরিশ্রম করিতে তাহারা অনিচ্ছুক এবং কৃষিকার্যের শ্রম অন্যত্র হইতে আগত শ্বেতেতর লোকেরাই করে। পূর্বোক্ত কালো পোশাক-পরা বৃত্তিসমূহ যত লোকের প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক প্রবেশ করিতেছে এবং তাহার ফলে বেকারসমস্যা বাড়িতেছে। কম্যান্ডার কেনওয়ার্দি বলেন, আমেরিকায় প্রায় ২০ হাজার উকিল আছে, তাহাদের অধিকাংশেরই কোন কাজ নাই। একজন বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার ও পর্যটক, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, আমেরিকায়—আইনের ব্যবসার সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা। নিউ ইয়র্কের অর্ধেক উকিলেরই পাঁচ সেন্ট দিয়া একখানি খবরের কাগজ কিনিবার সামর্থ্য নাই। তথাপি অতীতের মত বর্তমানেও নূতন নূতন লোক আইনের ব্যবসায়ে যোগদান করিতেছে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রাজুয়েট বাহির হয়। ইহাদের এক-চতুর্থাংশও কোন কাজ পায় না। শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯২৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশানে ৫,৬৩,২৪৪ জন পুরুষ এবং ৩,৫৬,১৩০ জন স্ত্রীলোক ডিগ্রী লইয়াছে। এই যে কায়িক শ্রমের প্রতি অনিচ্ছা, ইহাই আমেরিকায় প্রবল বেকার সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।"

নানারূপ সুবিধা পাইতে লাগিল এবং মাড়োয়ারীরা ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত ব্যবসা হইতে বাঙালীদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিল। সকলেই জানে যে, বর্তমান পাটের ব্যবসায় শতকরা ৮০ ভাগ মাড়োয়ারীদের হাতে।

"বাঙালীরা নিজেদের দোষে কিরূপে ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে স্থানচ্যুত হইতেছে, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাধাবাজার স্ট্রীটে পূর্বে সমস্ত পশম ব্যবসায়ী বাঙালী ছিল। কিন্তু তাহারা দ্বিপ্রহরের পূর্বে তাহাদের দোকান খুলিত না। উহার ফলে কচ্ছী মুসলমান বোরারা—বাঙালী পশম ব্যবসায়ীদিগকে রাধাবাজার হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। বোরারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, তাহারা সকালে ৭।৮টার সময় তাহাদের দোকান খুলে। সুতরাং যাহারা সকালে জিনিস কিনিতে চায় তাহারা ঐ বোরাদের দোকানেই যায়।"

৬০।৭০ বৎসর পূর্বে ইউরোপীয় সদাগরদের বেনিয়ান বা মুচ্ছুদ্দিরা সমস্তই বাঙালী ছিল। এইরূপ কয়েকজন প্রসিদ্ধ বাঙালী মুচ্ছুদ্দির নাম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—গোরাচাঁদ দত্ত (ক্রুক রোম অ্যান্ড কোং); তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র চণ্ডী দত্ত চুঁচুড়ার চন্দ্র ধর নামক একজনের সঙ্গে যৌথ কারবার চালাইতে থাকেন। পরে তাঁহাদেরই একজন সাব-এজেন্ট ঘরশ্যামল ঘনশ্যামদাস, উক্ত ইউরোপীয় ফার্মের বেনিয়ান নিযুক্ত হয়,—বাঙালীরা এইরূপে স্থানচ্যুত হয়।

প্রাণকৃষ্ণ লাহা অ্যান্ড কোং, গ্রেহাম অ্যান্ড কোং, পিকফোর্ড গর্ডন অ্যান্ড কোং, আন্ডারসন অ্যান্ড কোং প্রভৃতি আটটি ইউরোপীয় ফার্মের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। শিবচরণ গুহের পুত্র অভয়চরণ গুহ, গ্রেহাম অ্যান্ড কোং, পিল জ্যাকব, সুইনি কিলবার্ন অ্যান্ড কোং, স্যাকারস্টীন অ্যান্ড কোং প্রভৃতি নয়টি ইউরোপীয় ফার্মের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। ললিতমোহন দাস (১৮৯০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়) জর্জ হেন্ডারসন অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড মার্কান্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ, রোজ অ্যান্ড কোং এবং র‍্যালি ব্রাদার্সের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। দ্বারকানাথ এবং তাঁহার পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত র‍্যালি ব্রাদার্সের (কাপড়ের ব্যবসা বিভাগ) মুচ্ছুদ্দি ছিলেন।

আমার নিকটে একখানি চিত্তাকর্ষক পুস্তিকা আছে— *A Short Account of the Residents of Calcutta in 1822 by Baboo Ananda Krishna Bose* (রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র)।(২১) এই পুস্তিকায় তদানীন্তন কলিকাতা শহরের ধনী ব্যক্তিদের নামের তালিকা আছে। কলিকাতার যে সমস্ত বাসিন্দা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামও ইহাতে আছে। তাহা হইতে আমি কয়েকটি নাম উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

১। বৈষ্ণবদাস শেঠ—তিনি কলিকাতার একজন প্রাচীন অধিবাসী, সাধু-প্রকৃতি, সম্ভ্রান্ত এবং ধনী ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পূর্বপুরুষেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বস্ত্র ব্যবসা বিভাগের দেওয়ান ছিলেন। কলিকাতার সমস্ত শেঠ ও বসাকেরা তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্ব।

---

(২১) তাঁহার পৌত্র জে. কে. বসু কর্তৃক প্রকাশিত।

২। আমিরচাঁদ বাবু—তিনি প্রথমে রপ্তানী মাল-গুদামের জমাদার ছিলেন। পরে অর্থ সঞ্চয় করিয়া তিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত পণ্যজাতের ঠিকাদারি পান। একক ব্যবসায়ীরা বিদেশ হইতে যেসব মাল আমদানি করিত, তিনি সেগুলির খরিদ্দার ছিলেন। এইরূপে তিনি এক কোটি টাকার উপরে উপার্জন করেন। তিনি বদান্য প্রকৃতির লোক ছিলেন, বাগবাজারে থাকিতেন এবং স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত শিখদের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৩। লক্ষ্মীকান্ত ধর—তিনি খুব ধনী ছিলেন এবং কয়েকজন ভূতপূর্ব গবর্নর এবং কর্নেল ক্লাইভের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র মহারাজা সুখময় রায় তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। সুখময় রায় মার্কুইস অব ওয়েলেস্‌লির সময় 'রাজা' উপাধি পান, তিনি ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের একজন ডিরেক্টরও ছিলেন।

৪। শোভারাম বসাক—ইনি বড়বাজারের একজন ধনী অধিবাসী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট কাপড়ের বিক্রেতা ছিলেন এবং আরও নানারূপ ব্যবসা করিতেন।

৫। রামদুলাল দে সরকার—তিনি প্রথমে মদনমোহন দত্তের চাকরি করিতেন। তার পর মেসার্স ফেয়ারলি অ্যান্ড কোং ও আমেরিকাদেশীয় কাপ্তেনদের চাকরি করিয়া এবং নিজে ব্যবসা করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেন। সুতানটি সিমলায় থাকিতেন।(২২)

৬। গোবিনচাঁদ ধর—নীলমণি ধরের পুত্র, ব্যাঙ্কার। ইউরোপীয় জাহাজী কাপ্তেনদের কাজ করিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয় করেন।

এই তালিকায় লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মাত্র একজন অ-বাঙালী ধনীর নাম আছে।

ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হুগলী নদীর তীরে প্রথম পাটের কল এবং আধুনিক যুগোপযোগী প্রথম ব্যাঙ্ক, প্রধান বাঙালী ধনীদের মূলধন ও সহযোগিতার দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন সেই বাঙালীদের স্থান কোথাও নাই।

"জর্জ অকল্যান্ড হুগলী নদীর তীরে প্রথম পাটের সুতা বোনার কল স্থাপন করেন। তিনি ১৮৫২—৫৩ সালে কলিকাতায় আসেন এবং বিশ্বম্ভর সেন নামক একজন দেশীয় বেনিয়ানের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়।......১৮৫৫ সালে রিশড়াতে প্রথম ভারতীয় অংশীদারের সহিত কারবার করেন।" —**D. R. Wallace** : ***The Romance of Jute***, **pp. 7 & 11.**

---

(২২) অধিকাংশ বিদেশী ব্যবসায়ীরা কলিকাতাস্থিত ইউরোপীয় ফার্মসমূহের এজেন্সি মারফত কারবার করিতেন। কিন্তু আমেরিকার ব্যবসায়ীরা ভারতীয় ব্যবসায়ী ও দালালদের মারফত কারবার করিতেন, কেননা ইহাদের কমিশন, দালালি প্রভৃতির হার কম ছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে রামদুলাল দে-ই সর্বপ্রধান ছিলেন। এই বাঙালী ভদ্রলোক প্রথমে মাসিক ৪।৫ টাকা বেতনে কেরানীর কাজ করিতেন, পরে নিজের ক্ষমতায় কলিকাতার একজন প্রধান ব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। ১৮২৪ সালে প্রায় ৪ লক্ষ পাউণ্ড বা ৬০ লক্ষ টাকার সম্পত্তির রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। **J. C. Sinha** : ***Journal of the Asiatic Society of Bengal***, **N. S. 25, 1929, pp. 209-10.**

"১৮৬৩ সালে কলিকাতা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশান স্থাপিত হয়। ২রা মার্চ, ১৮৬৪ তারিখে উহার নূতন নামকরণ হয়—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। কলিকাতাতেই প্রথমে ইহার প্রধান কার্যালয় ছিল, ১৮৬৬ সালে উহা লণ্ডনে স্থানান্তরিত হয়। ইহার ফলে ব্যাঙ্কের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লোপ পায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, লণ্ডনে কার্যালয় স্থানান্তরিত করিবার সময়, ৭ জন ডিরেক্টরের মধ্যে ৪ জন ছিলেন ভারতীয়, যথা—বাবু দুর্গাচরণ লাহা, হীরালাল শীল পতিতপাবন সেন এবং মানিকজী রুস্তমজী। দুইজন অডিটারের একজন ছিলেন বাঙালী, তাঁহার নাম শ্যামাচরণ দে। ঐ সময়ে ব্যাঙ্কের প্রদত্ত মূলধন ৩১,৬১,২০০ টাকা হইতে বাড়িয়া ৪,৬৬,৫০০ পাউণ্ডে দাঁড়াইল,—সুতরাং অ-ভারতীয় অংশীদারদের প্রতিনিধি অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল।" *Report of Bengal Provincial Banking Enquiry Committee, 1929—30*, vol. i., p. 45.

(৬) কেরানীগিরি এবং বাঙালীর ব্যর্থতা

এখন আমরা দেখিতেছি যে, বাঙালী সমস্ত ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে। তাহার জন্য কেবল গোটাকয়েক সামান্য বেতনের কেরানীগিরি আছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও মাদ্রাজীরা আসিয়া আজকাল ভাগ বসাইতেছে এবং শীঘ্রই তাহারা এ কাজ হইতেও বাঙালীদের বহিস্কৃত করিবে। বলা যাইতে পারে যে, কেরানীগিরি আমাদের অতীত জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, ইহা আমাদের জীবন ও চরিত্রের অংশবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা যেন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে।(২৩) কেরানীগিরি বাঙালী-চরিত্রের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, ধনী অভিজাতবংশের ছেলেরাও এ কাজ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাঙালীদের মধ্যে, বিশেষতঃ সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যাইতেছে। তাহারা ইউরোপীয় সদাগর আফিসে বা ব্যাঙ্কে লক্ষ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ জমা দিয়া ক্যাশিয়ার বা সহকারী ক্যাশিয়ারের চাকরি গ্রহণ করে, কিন্তু তবু ব্যবসায়ে নামিবে না, কেননা তাহাতে ঝুঁকি আছে। যে কোন ঝুঁকি বা দায়িত্ব নেয় না, সে কোন লাভও করিতে পারে না, ইহা একটা সুপরিচিত কথা। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা একথা স্মরণ রাখে না। এই ফর্মা প্রেসে দিবার সময় নিম্নলিখিত পত্রখানির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল ঃ—

সদাগরের কেরানী

"সম্পাদক মহাশয়,

লর্ড ইঞ্চকেপ প্রভৃতির মত বড় বড় ব্যবসায়ী এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা বলেন যে, ভারত তাঁহাদের নিকট অশেষপ্রকারে ঋণী, বহু ভারতবাসীর জন্য তাঁহারা

(২৩) আমার প্রকাশ্য বক্তৃতায় আমি, মুন্সেফ, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, ইনস্পেক্টর জেনারেল এমন কি একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলদেরও "সম্মানার্হ কেরানী" আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হই নাই।

অন্নসংস্থান করিয়াছেন। ইউরোপীয় বণিকেরা গরীব ভারতীয় কেরানীদিগকে এই ভিক্ষুক বৃত্তি দিবার জন্য গর্ব অনুভব করেন বটে, কিন্তু তৎপরিবর্তে ইহাদের নিকট তাঁহারা যে কাজ আদায় করিয়া লন, তাহা যৎকিঞ্চিৎ বেতনের তুলনায় ঢের বেশী। ৩০্ টাকা মাহিনার একজন কেরানী তাহার প্রভুর চিঠিপত্র লেখে, তাঁহার ব্যাকরণের ভুল সংশোধন করে, উহা 'ফাইল' করে, প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্র গুছাইয়া রাখে ; তাহার স্মরণশক্তি প্রখর, কারবারে ১০।২০ বৎসর পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাও মনে রাখিতে হয়, ক্রিকেট ক্লাব, বোটিং ক্লাব, সুইমিং ক্লাব, বয়-স্কাউট সংক্রান্ত কার্যের সেক্রেটারী হিসাবে প্রভুর ব্যক্তিগত কাজও সে করে। প্রভু কহিলে সে দৌড়ায়, চেঁচাইতে বলিলে চেঁচায়, 'মহিলা সভার' চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি মেমসাহেবের ঘরের কাজও সে করে—এবং এ সমস্তই মাসিক ত্রিশ টাকা মাহিনার পরিবর্তে।—ইহাকে মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির ব্যভিচার ভিন্ন আর কি বলিব?

* * *

"যেসব বিদেশী ফার্ম ভারতে ব্যবসায় করিয়া ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়াছে, তাহারা ভারতীয় কেরানীদের বুদ্ধি, পরিশ্রম এবং কর্মশক্তি সহায়েই তাহা করিয়াছে। যাহারা ইউরোপ বা আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়া ধনী হইয়াছে, ভারতীয় কেরানীদের অধ্যবসায় ও বিশ্বস্ততাই তাহাদের উন্নতির প্রধান কারণ।......

"পাশ্চাত্যের বণিকেরা আসিয়া ভারতীয় কেরানীদের বুদ্ধি ও কর্মশক্তি কাজে খাটাইয়া, নিজেরা ধনী হয় এবং এদেশ ত্যাগ করিবার সময় ঐ হতভাগ্য কেরানীদের অকর্মণ্য, রুগ্ণদেহ, দরিদ্র অক্ষম করিয়া ফেলিয়া যায়।"

(অমৃতবাজার পত্রিকা, ২১।৫।৩২)

এই পত্রে বাঙালী চরিত্রের সর্বপ্রধান দৌর্বল্য ও ত্রুটি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর স্বাভাবিক অক্ষমতা সম্বন্ধে একটি কথাও এই পত্রে নাই। পত্রলেখকের একমাত্র অভিযোগ এই যে, ইউরোপীয় প্রভুরা ভারতীয় কেরানীর বুদ্ধি ও কর্মশক্তি কাজে খাটায় অথচ তদুপযুক্ত বেতন দেয় না। অর্থাৎ বাঙালী যে 'জন্ম-কেরানী' একথা পত্রলেখক স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং যদি তাহাকে বেশী বেতন দেওয়া হইত, তাহা হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার মনে হয় নাই যে, কেবল ইউরোপীয়েরা নয়, মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরাও তাহাদিগকে এইভাবে খাটাইয়া নেয়। একজন এম. এস-সি., বি. এল. বৈজ্ঞানিক বৃত্তিতে কিছু করিতে না পারিয়া, বেকার উকিলের দল বৃদ্ধি করে, পরে হতাশ হইয়া 'কমার্স স্কুলে' ঢুকিয়া টাইপ রাইটিং পত্রলিখন প্রভৃতি শিখে এবং কোন ইউরোপীয়, মাড়োয়ারী বা গুজরাটী ফার্মে সামান্য বেতনে কেরানীগিরি চাকুরি নেয়। পত্রলেখক আর একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছেন,—চাহিদা ও যোগানের আর্থনীতিক নিয়ম অনুসারেই পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়। অনাহারক্লিষ্ট শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি সংবাদপত্রের 'কর্মখালি' বিজ্ঞাপনের দিকে সর্বদা থাকে। যখন একটি

৩০।৪০ টাকা বেতনের পদের জন্য শত শত গ্রাজুয়েট দরখাস্ত করে এবং দরখাস্তে এমন কথাও লেখা থাকে যে, কাজ না পাইলে তাহার পরিবার অনাহারে মরিবে,—তখন বেশী বেতনের আশা করাই যাইতে পারে না। তা ছাড়া, প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে মাদ্রাজীরাও দেখা দিয়াছে,—কিরূপে অতি সস্তায় দেহ ও প্রাণকে একত্র রাখা যায়, সে বিদ্যায় তাহারা সিদ্ধহস্ত। এই মাদ্রাজী কেরানীরাও অনেকস্থলে গ্রাজুয়েট, ইংরাজীতে বেশী দখল আছে এবং অতি কম বেতনে কাজ করিতে রাজী। এককথায়, অসহায় বাঙালী কেরানীর মনোবৃত্তি অনেকটা "টমকাকার কুটিরের" ক্রীতদাসের মনোবৃত্তির মত। সে তাহার ভাগ্যে সন্তুষ্ট,—তাহার একমাত্র দাবি এই যে, তাহার প্রভু তাহার প্রতি একটু সদয় ব্যবহার করিবে। তাহাকে যদি একটা বাঁধা বেতন দেওয়া যায় তবে ক্রীতদাসের মত, কলুর ঘানির বলদের মত দিনরাত কাজ করিতে রাজী। কিন্তু তাহার সমস্ত বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের চেষ্টা কখনই করিবে না,—ইউরোপীয় ও অবাঙালীরাই তাহা করিবে। "বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার" সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্বে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, এই কেরানীরা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সেক্সপিয়র তাঁহার "জুলিয়াস সিজার" নাটকে বাঙালী কেরানীদের কথা মনে করিয়াই যেন লিখিয়াছেন ঃ—

অ্যাণ্টনি ঃ গর্দভ যেমন স্বর্ণ বহন করে, সে তেমনি ভার বহন করিবে। আমরা তাহাকে যে ভাবে চালাইব, সেই ভাবে চলিবে। এবং আমাদের ধনরত্ন নির্দিষ্ট স্থানে যখন সে বহিয়া আনিবে, তখন আমরা তাহার ভার নামাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিব। ভারবাহী গর্দভকে যেমন ছাড়িয়া দিলে সে তাহার কান ঝাড়িয়া মাঠে চরিতে যায় এও তেমনি করিবে।

অক্টেভিয়াস ঃ আপনি যেরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু সে বিশ্বস্ত ও সাহসী যোদ্ধা।

অ্যাণ্টনি ঃ আমার ঘোড়াও সেইরূপ, অক্টেভিয়াস। সেইজন্য আমি ভারবহনে তাহাকে নিযুক্ত করি। এই সৈনিককে আমি যুদ্ধ করিতে শিখাই, চলিতে, দৌড়াইতে, থামিতে বলি,—তাহার দৈহিক গতি ও ভঙ্গী আমার মনের শক্তিতেই চালিত হয়।"

প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অন্যতম প্রবর্তক মহর্ষি সুশ্রুত সংক্ষেপে সেক্সপিয়রের এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারবাহী গর্দভ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—'খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য'—অর্থাৎ ভারবাহী গর্দভ কেবল চন্দনের ভারের কথাই জানে, তাহার সুগন্ধি জানে না।

'সদাগরের কেরানী' ভুলিয়া যায় যে, খাঁটি ভারতীয় ফার্মেও (যথা বোম্বাইয়ে) কেরানীদের বাজার-দর অনুসারে অতি সামান্য বেতন দেওয়া হয় এবং ব্যবসায়ীরা তাহাদের কাজে খাটাইয়া নিজেরা ধনী হয়।

দশ বৎসর পূর্বে (১৯২২, জানুআরি ২৫শে) 'ইংলিশম্যান' ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, বাঙালী কেরানী লোপ পাইবে।

কলিকাতার পরিবর্তনশীল জনসংখ্যা

উপরোক্ত শিরোনামায় একটি প্রবন্ধে 'ইংলিশম্যান' লিখিয়াছিলেন বাঙালীরা কিরূপে তাহাদের কার্যস্থান হইতে ক্রমশই বে-দখল হইতেছে ঃ—

"লোকে যখন বলে যে, গত ২০ বৎসরে কলিকাতার লোকসংখ্যার প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে, তখন তাহারা সাধারণতঃ কলিকাতার যে সব উন্নতি হইয়াছে, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, রাস্তা-ঘাট, দালান-কোঠা, আলো ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা উন্নততর হইয়াছে, সেই সব কথাই ভাবে। তাহারা সর্বাপেক্ষা যে বড় পরিবর্তন তাহাই লক্ষ্য করে না। কলিকাতা ক্রমেই অ-বাঙালী শহর হইয়া দাঁড়াইতেছে, এবং প্রতি বৎসরই অজস্র বিদেশী কলিকাতায় আমদানি হইতেছে—উহাদের উদ্দেশ্য কলিকাতায় বসবাস করিয়া জীবিকার্জন করা। ইহারা যে কেবল ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসে, তাহা নয়, পৃথিবীর সমগ্র অঞ্চল হইতেই আসে। যুদ্ধের সময় ভারতের বাহির হইতে লোক আসা বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে উহাদের সংখ্যা দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতেছে। একথা সত্য যে, জার্মানেরা ভারত হইতে একেবারে বিদায় হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের পরিবর্তে আমেরিকাবাসীরা আসিতেছে। তাহারাও জার্মানদের মতই কর্মশক্তিসম্পন্ন এবং কলিকাতায় বাস করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প। আর এক স্তরে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী স্থানসমূহ হইতে আগত লোকদের ধরিতে হইবে, উহারা বাঙালী দোকানদারদের সঙ্গে রীতিমত প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক মধ্য এসিয়া ও আর্মেনিয়া হইতে আগত, উহারাও কলিকাতায় বাঙালীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া অন্নসংস্থান করিয়া লইতেছে। চীনা পাড়াতেও লোক বাড়িতেছে এবং জুতা তৈরি ও ছুতারের কাজ বাঙালী মিস্ত্রীদের নিকট হইতে তাহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বে-দখল করিয়াছে।

"কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতাতেই বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান বেশী মার খাইতেছে। ২০ বৎসর পূর্বেও কলিকাতা শহরের ঘন বসতিপূর্ণ জায়গাগুলি বাঙালীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে কলিকাতার কোন অঞ্চল সম্বন্ধেই এমন কথা আর বলা যায় না। যুদ্ধের পূর্ব হইতেই অবশ্য মাড়োয়ারীদের আমদানি হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এখনও উহা পঞ্চাশ বৎসরের বেশী হয় নাই। তৎপূর্বে মুচ্ছুদ্দি, দালাল, মধ্যস্থ ব্যবসায়ী, দোকানদার যাহারা কলিকাতার ঐশ্বর্য গড়িয়া তুলিতেছিল, তাহারা সকলেই ছিল বাঙালী। বড়বাজার বাঙালী-কেন্দ্র ছিল এবং সেখান হইতেই শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িত। বর্তমানে বড়বাজারের কথা বলিলেই মাড়োয়ারীদের কথা বুঝায়। মাড়োয়ারীরা কলিকাতার বড় বড় অর্থনীতিক সমস্যার মীমাংসা করে, এবং শেয়ারবাজারে, পাইকারী বাজারে সর্বত্রই তাহাদের প্রভাব। খুচরা দোকানদারিতেও পঞ্জাবী বেনিয়া এবং হিন্দুস্থানী মুদিদের আমদানি হইয়াছে। উহারা অলিগলির মধ্যে নিজেদের ভাষায় লিখিত সাইনবোর্ড টাঙাইয়া পরম উৎসাহে ব্যবসা করিতেছে। কলিকাতার বিদেশী বস্ত্র বর্জনের সুযোগ লইয়া বোম্বাইয়ে বোরা এবং পাঠান

ব্যবসায়ীরা কিরূপে বাজারে স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্বে দুই একবার বলিয়াছি। তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করা কঠিন হইবে। যে কাজে বাঙালীদের প্রতিপত্তি ছিল, সেই কেরানীগিরির কাজ হইতেও পার্শী ও মাদ্রাজীরা তাহাদের বে-দখল করিতেছে।

"সে দিন বেশীদূর নয়, যে দিন বাঙালী দালালের মত বাঙালী কেরানীও বিরল হইবে। এই শহরের শ্রমশিল্পী ও যান্ত্রিকের কাজে শিখেরা বাঙালীদের স্থানচ্যুত করিতেছে। সাধারণ শ্রমিকের কাজ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই উড়িয়া ও পূরবিয়াদের হস্তগত। ২০ বৎসর পূর্বে গৃহের ভৃত্য প্রভৃতির কাজ বাঙালী মুসলমানেরাই করিত। এখন গুর্খা ও পাঠানেরা সেই সব কাজ করিতেছে। কলিকাতার সমস্ত কাজকর্ম ও ব্যবসার হিসাব লইলে, এই অবস্থাই দেখা যাইবে। বড় বড় ইমারত মাড়োয়ারীদের দখলে এবং ফটকে রাজপুতেরা পাহারা দিতেছে। কলিকাতা যে আন্তর্জাতিক বসতি-স্থল হইয়া উঠিতেছে, ইহা তেমন ভাবে লক্ষ্য না করিলেও, বাঙালীরা যে এখান হইতে স্থানচ্যুত হইতেছে, এ কথা বাঙালীরা নিজেই বলিতেছে। বাঙালীরা "ধ্বংসোন্মুখ জাতি"—ইহা বাঙালীদেরই উক্তি।"

এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, গত ৮ বৎসরে কলিকাতায় মাদ্রাজী ও পঞ্জাবীদের আমদানি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

(৭) বাঙালীর বিলোপ

এইরূপে বাঙালীরা জীবন-সংগ্রামে অন্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পারিয়া ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রেও তাহারা হটিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান'-এর ভারতস্থিত সংবাদদাতা একটি প্রবন্ধে বাঙালীদের এই দুরবস্থা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত পত্রের ভারতস্থিত সংবাদদাতা সাধারণতঃ যেরূপ বিচারবুদ্ধি ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়া থাকেন, এই প্রবন্ধেও তাহার অভাব নাই। এতদিন ধরিয়া যেসব কথা বলিতেছি, প্রবন্ধে সেই সমস্ত কথার সার সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রবন্ধটি মূল্যবান, কেননা ইহাতে বুঝা যাইবে, বিদেশীরা আমাদের কি দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে ঃ—

"গত বৎসরের ভারতের রাজনীতিক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে বাঙালীরা সেখানে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

"কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার কয়েক বৎসর পরেও বাঙালীরা ভারতের চিন্তানায়ক ছিল। পশ্চিম ভারতে জি. কে. গোখলে এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের মত লোক জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু সাহিত্য, বিজ্ঞান, এবং রাজনীতিতে বাঙালীরা এ দাবি অবশ্যই করিতে পারিত যে, তাহারা আজ যাহা চিন্তা করে, সমগ্র ভারত পর দিন তাহাই চিন্তা করিবে। কিন্তু বাঙালীরা এখন সচেতন হইয়া দেখিতেছে যে, তাহাদের নেতারা বৃদ্ধ, তাঁহাদের স্থান অন্য কেহ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না ; এবং দিল্লীর ব্যবস্থা-পরিষদে অথবা কংগ্রেসে বাঙালী প্রতিনিধিদের

প্রভাব খুবই কম।—রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র বাংলা হইতে উত্তর ও পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে।

পশ্চিম ভারতের প্রাধান্য

"পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ভারতীয় রাজনীতিতে একটা নূতন জিনিস। চিতপাবন ব্রাহ্মণেরা পূর্বে এই অঞ্চলের সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রাধান্য করিত। গোঁড়া ব্রাহ্মণ তিলকের মৃত্যুর পর ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মিঃ গান্ধীর অভ্যুদয়ে নিশ্চিতই তাহাদের লাভ হইয়াছে,—কেননা তিনি গুজরাটী এবং ঐ সব ব্যবসায়ীদেরই স্বজাতি। তিনি তাহাদের কংগ্রেসের যোগদানের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন এবং দলের ফান্ডে বহু অর্থ দান করিয়া তাহারা নিজেদের স্থান সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছে। একবার যখন তাহারা আবিষ্কার করিল যে, ধনীদের পক্ষে রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা কঠিন, তখন তাহারা ক্রমশঃই অধিকতর ক্ষমতা হস্তগত করিতে লাগিল। কংগ্রেসের ভিতরে, তাহারা বিদেশী বর্জনের মূল শক্তি। তুলাজাত বস্ত্রাদির উপর ঐ বিদেশী বর্জন নীতির ফল সংরক্ষণ শুল্কের মতই। গান্ধী-আরুইন চুক্তির পরেও যাহাতে ঐ বিদেশী বর্জনের অজুহাত থাকে, সেদিকে তাহারা বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল।

"স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গান্ধী-আরুইন চুক্তি ব্রিটিশ দ্রব্য 'পিকেটিং' করা বন্ধ করিয়াছে, বিদেশী বর্জন আন্দোলন বন্ধ করে নাই। সম্ভবতঃ মিঃ গান্ধী বাজারে সর্ব প্রকার পিকেটিং বন্ধ হইলে সন্তুষ্ট হইতেন, কেননা উহার ফলে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ বিষয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ ব্যবসায়ীরা তাঁহার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং 'প্যাক্টের' শর্তের বাহিরে তিনি যাইতে পারেন না। 'বোম্বে ক্রনিক্ল' বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের মুখপত্ররূপে এ বিষয়ে মিঃ গান্ধীর বিরোধী।

বাঙালী ও কলওয়ালাগণ

"বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা হাতে-বোনা খদ্দরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু মাড়োয়ারী বা গুজরাটী কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের লাভের জন্য তাহারা বেশী দামী কাপড় কিনিতে রাজী নয়। বাংলার প্রধান শিল্প পাট; উহা প্রায় সমস্তই বিদেশে রপ্তানি হয় এবং কলিকাতার সকল জাতির ব্যবসায়ীরা দেখিতেছে যে, তাহারা ভারতের 'কামধেনু'। পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীরা যেভাবে ফেডারেটেড চেম্বার অব কমার্স" দখল করিয়াছে এবং গবর্নমেন্টের উপর নিজেদের মতামতের প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাতে এই ধারণা দৃঢ়তর হইয়াছে। করাচী ও বোম্বাইয়ের কয়েক জন পার্শী বণিককে সাহায্য করিবার জন্য নূতন লবণ শুল্ক-নীতির দ্বারা বাংলার উপর অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা পড়িবে।

কালো কোটধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি—কর্মপ্রেরণার অভাব

"বাংলার এই অবনতি এমন সুস্পষ্ট যে, ভারতবাসীরা নিজেদের মধ্যেই ইহা লইয়া খুব আলোচনা করিতেছে। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষ দিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমান বাংলার পক্ষে ইহা একটা দুর্লক্ষণ। বহু বৎসর হইল জমিদারশ্রেণী পল্লী হইতে শহরে চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের সন্তানদের সামান্য বেতনে কেরানীগিরি করা ছাড়া আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া মনে হয়। ইহা একটা অদ্ভুত ব্যাধি যে, এই প্রদেশের ভদ্রলোক যুবকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, এমনকি ধনীর ছেলেরাও সামান্য কেরানীগিরি প্রভৃতি কাজ পাইলেই সন্তুষ্ট হয়; পক্ষান্তরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা আসিয়া বাঙালীদের প্রত্যেক ব্যবসায় হইতে স্থানচ্যুত করিতেছে এবং যে সমস্ত কাজে শক্তি ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, সে সমস্ত তাহারাই করিতেছে। শিক্ষাপ্রণালীর উপর সমস্ত দোষ চাপানো নির্বুদ্ধিতা;—বাঙালীর চরিত্রে এমন কিছু ত্রুটি আছে, যাহার ফলে অতীতের গৌরবে মশগুল হইয়া অকর্মণ্য অবস্থায় কালযাপন করিতেছে।"

এই অংশ ছাপাখানায় পাঠাইবার সময় আমি "লিবার্টি" পত্রে (১১-৮-৩২) N. C. R. স্বাক্ষরিত একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের' পত্রপ্রেরকের অধিকাংশ কথার তিনি পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন :—

"বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইতে বাঙালীরা কেবল অনুচরের দল সৃষ্টি করিয়াছে, নেতার জন্ম দিতে পারে নাই, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাগরেতী মাত্র করিয়াছে,—একথা বলিলে ভুল বলা হইবে। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলা দেশ ভারতের নেতৃত্ব করিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে ও সার্বজনীন আন্দোলনে বাঙালীরই প্রাধান্য ছিল। উহার পর এই প্রাধান্য হইতে নামিয়া বাংলা অন্যান্য প্রদেশের সমপর্যায়ে দাঁড়ায়। ঐ সমস্ত প্রদেশের লোক তখন নিজেদের রাজনৈতিক জীবনকে সঙ্ঘবদ্ধ ও উন্নততর করিয়াছে এবং যে সমস্ত রাজনীতিক নেতা তাহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙালী নেতাদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেন। ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই অবস্থা বর্তমান ছিল।......কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙালীরা ভারতের নেতৃত্ব করিয়াছেন, একথা অস্বীকার করাও যেমন ভুল,—'ভিকটোরিয়ান যুগে' বাঙালীদের যে প্রাধান্য ছিল, তাহা হইতে চ্যুত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করাও তেমনি ভুল।"

(৮) বাঙালীদের ব্যর্থতার জন্য বাংলাদেশ হইতে বার্ষিক অর্থশোষণ

এ বিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। বিগত আদমসুমারির বিবরণে দেখা যায়, বাংলাদেশে ২২ লক্ষ অ-বাঙালী (অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক) আছে। তাহারা মন্দার সময়ে কিংবা ২।৩ বৎসর অন্তর স্ব-প্রদেশের বাড়ীতে যায়।

বাংলায় কাজ চালাইবার জন্য নিজেদেরই কোন লোক রাখিয়া যায়। ই. আই. রেলওয়ের যাত্রীসংখ্যা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, অন্য প্রদেশ হইতে বাংলাদেশে ক্রমাগত লোক আমদানি হইতেছে। তাহাদের মধ্যে অল্প লোকেই স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গে আনে। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতিদের মধ্যে যাহারা এদেশে সপরিবারে স্থায়িভাবে বসতি করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা বেশী নহে এবং তাহারা সাধারণতঃ কলিকাতাতেই থাকে। ২২ লক্ষের মধ্যে ২ লক্ষ স্ত্রীলোক ও শিশুদের সংখ্যা ধরা যাইতে পারে, ইহারা উপার্জন করে না। একজন কুলি, ধোপা বা নাপিত পর্যন্ত মাসে ২৫।৩০ টাকা উপার্জন করে। একশ্চেঞ্জ গেজেট বা ক্যাপিট্যালের পাতা উল্টাইয়া যদি দৈনিক ব্যবসায়ের হিসাব এবং "ক্লিয়ারিং হাউসের" কার্যাবলী পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইবে বাংলার চলতি কারবারের টাকা এবং স্থায়ী সম্পদের কত অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য সংসৃষ্ট মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতিদের হাতে আছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে লক্ষপতি।(২৪) বাঙালীদের সেখানে স্থান নাই।

যদি এই সমস্ত লোকের মাসিক আয় গড়ে ৫০৲ টাকা ধরা যায়, তাহা হইলে উহারা বিশ লক্ষ লোকে মাসে অন্ততঃপক্ষে ১০ কোটি টাকা উপার্জন করিতেছে। অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ১২০ কোটি টাকা বাংলাদেশ হইতে শোষিত হইতেছে।(২৫)

---

(২৪) ১৯২১ সালের আদমসুমারির বিবরণে দেখা যায়, রাজপুতানা এজেন্সীর ৪৭,৮৬৫ জন এবং বোম্বাই প্রদেশের ১১,২৩৫ জন লোক বাংলাদেশের অধিবাসী হইয়াছে। প্রথমোক্তদের মধ্যে ১২,৫০৭ জন বিকানীরের লোক এবং ১০,৩১৬ জন জয়পুরের লোক কলিকাতাতেই আছে। আদমসুমারির বিবরণ লেখক বলিয়াছেন,—"উত্তর ভারতের ব্যবসায়ীরা কলিকাতা শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রমেই অধিক পরিমাণ অংশ গ্রহণ করিতেছে। কলিকাতার বাহিরেও তাহারা নিশ্চয়ই ঐরূপ করিয়া থাকে।" বোম্বাই হইতে এত লোক যে কলিকাতায় আমদানি হইতেছে, তাহার কারণ দেখাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "ঐ প্রদেশের ব্যবসায়ীরা অধিক সংখ্যায় কলিকাতায় আসাতেই এরূপ ঘটিতেছে।"

(২৫) এই সংখ্যা অনেকের নিকট অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বহু তথ্য আমার হাতে আছে। কলিকাতার নিকটবর্তী পাটকলসমূহের এলাকায় যেসব ডাকঘর আছে, উহা হইতে ১৯২৯ সালে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার মণি-অর্ডার হইয়াছে :—**Indian Jute Mills Association, Report, 1930.**

একজন বিহার প্রবাসী পদস্থ বাঙালী আমাকে লিখিয়াছেন :—"বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের বাঙালীদের সম্বন্ধে আপনি যে যত্ন লইতেছেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। গত মাসে ছাপরা ডাকঘরেই বাংলা হইতে ১০ লক্ষ টাকা মণি-অর্ডার আসিয়াছে। ইহা এক সারণ জেলাতেই বাংলা হইতে আগত টাকার হিসাব।

"বাংলা হইতে এখানে যেসব মণি-অর্ডার আসিয়াছে, তাহার তিন মাসের হিসাব দিতেছি—

জানুআরি (১৯২৭)	...	...	টাকা ১১,৫৮,০০০
ফেব্রুআরি (১৯২৭)	...	...	" ১১,০২,৮০০
মার্চ (১৯২৭)	...	...	" ৯,৩৭,৯০১

তিন মাসের গড় ধরিলে মাসে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা হয়। পক্ষান্তরে ছাপরা হইতে বাংলায় মাসেমাসে গড়ে এক হাজার টাকার বেশী বাংলাদেশে মনি-অর্ডার হয় না। এখানে যে কয়েক জন বাঙালী থাকে, তাহারা কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করে,—বিশেষতঃ, আমরা এই প্রদেশের অধিবাসী হইয়াছি বলিয়া এখানেই উপার্জিত অর্থ ব্যয় করি। কিন্তু একটি স্কুলের মাস্টারিও যদি বাঙালীকে দেওয়া হয় অমনি চারিদিক হইতে চিৎকার উঠে—বিহার বিহারীদের জন্য!"

"বাংলার সম্পদ শোষণ" এই শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯২৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন,—"১৯২৬ সালে একমাত্র কটক জেলাতেই বাংলা হইতে ৪ লক্ষ টাকার মনি-অর্ডার হইয়াছিল।

আমি যতদূর সম্ভব তথ্য দ্বারা আমার কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য, সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না এবং আমার হিসাব কতকটা অনুমান মাত্র, যদিও তাহার ভিত্তি সুদৃঢ়। বিশেষজ্ঞেরা যে সব হিসাব দিয়াছেন, তাহার দ্বারা আমার অনুমান অনেক সময়ই সমর্থিত হয়। বাংলা হইতে কত টাকা বোম্বাই, রাজপুতানা, বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে বাহির হইয়া যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ণয় করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু যে হিসাব এখানে দেওয়া যাইতেছে, তাহা ধীরভাবে বিবেচনা করিবার যোগ্য।

সকলেই জানেন যে, মাড়োয়ারী এবং অন্যান্য স্বচ্ছল অবস্থার হিন্দুস্থানীরা আটা, ডাল, ঘি খাইয়া থাকে, ঐ সব জিনিস তাহারা বাংলার বাহির হইতে নিজেরাই আমদানি করে। কেবল উড়িয়ারা ভাত খায়। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে—অবাঙালীরা যাহা উপার্জন করে, তাহা তাহাদের নিজেদের পকেটেই যায়। সুতরাং মাড়োয়ারী, ভাটিয়া বা পঞ্জাবী যদিও কলিকাতায় থাকিয়াই অর্থ উপার্জন করে, তবু তাহাদের অর্থে বাংলার সম্পদ বৃদ্ধি হয় না, কিংবা তাহারা বাংলার অধিবাসী হওয়াতে বাংলার কোন আর্থিক উন্নতি হয় না।(২৬) তাহারা কামস্কাটকা বা টিম্বাকটোর অধিবাসী হইলেও বাংলার বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না।

মাড়োয়ারীরা বাংলার চারিদিকে তাহাদের জাল বিস্তার করিয়াছে। তাহারা চতুর, বেশ জানে যে, বাঙালীদের চোখ একবার খুলিলে এবং ব্যবসার দিকে তাহাদের মতি গেলে, তাহাদের (মাড়োয়ারীদের) স্থানচ্যুত হইতে হইবে এবং বাংলাদেশে এ সকল সুবিধা আর তাহারা ভোগ করিতে পারিবে না। এই আত্মরক্ষার প্রেরণাতেই তাহারা কোন বাঙালী যুবককে তাহাদের ফার্মে শিক্ষানবিসরূপে লইতে চায় না। বাঙালী যুবকেরা কখন কখন ইউরোপীয় ফার্মে শিক্ষানবিস হইতে পারে এবং ক্রমশঃ উচ্চতর পদ লাভ করিয়া অবশেষে অংশীদার পর্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু একজন বাঙালীর পক্ষে মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া ফার্মে-শিক্ষানবিস হওয়া অসম্ভব। কেবল ইহাই নহে। আমি এমন অনেক দৃষ্টান্ত জানি যে, বাঙালী যুবকেরা যে সব ছোটখাট ব্যবসা করিয়াছিল, তাহা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। মাড়োয়ারী প্রতিযোগীরা অত্যন্ত কম দরে মাল বিক্রয় করিয়া ঐ সব বাঙালী ব্যবসায়ীর আর্থিক ধ্বংস সাধন করিয়াছে। এই কারণে বলিতে হয় যে, মাড়োয়ারীরা নামে কলিকাতার অধিবাসী হইলেও তাহারা বাংলার স্বার্থের বিরোধী, এককথায় এই সব অ-বাঙালী অধিবাসীদের ব্যবসার স্বার্থ

এখানে বলা প্রয়োজন যে, উড়িয়ারা বাংলাদেশে রাঁধুনি, চাকর, প্লাম্বার এবং কুলি হিসাবে অর্থ উপার্জন করে। সুতরাং অন্যান্য অ-বাঙালী অপেক্ষা উড়িয়ারা কম টাকা দেশে পাঠাইতে পারে। কিন্তু মনি-অর্ডার যোগে তাহারা তাহাদের সঞ্চিত অর্থের অতি সামান্য অংশই পাঠায়। বেশির ভাগ অর্থ তাহারা বাড়ী যাইবার সময় সঙ্গে লইয়া যায়।"

(২৬) স্থানীয় কোন সংবাদপত্রে জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন—(৬ই জানুয়ারি, ১৯৩২)ঃ

"অ-বাঙালীদের সাধারণ প্রথা এই যে, তাহারা নিজেদের জাতীয় মুচি, নাপিত, ধোবা, ভৃত্য প্রভৃতি রাখে। তাহার অর্থ এই যে, বাঙালীরা অ-বাঙালীদের নিকট হইতে এক পয়সা লাভ করিতে পারে না। ইউরোপীয় ফার্মগুলি কিন্তু সাধারণতঃ বাঙালী কর্মচারীদের সাহায্যে তাহাদের আফিস ও কাজকারবার চালাইয়া থাকে।"

ছাড়া বাংলার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নাই, এবং তাহারা বাংলার অর্থে পুষ্ট হইয়া বাংলারই আর্থিক উন্নতির পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

আমি স্বীকার করি যে, পাট ও চা'-এর ব্যবসায়ে পৃথিবীর বাজার তাহাদের আয়ত্ত। এই দুই ব্যবসায়ে যে লাভ হয়, তাহাতে বাংলার অর্থ শোষিত হয় না, কিন্তু তদ্ব্যতীত যে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বাংলারই শোষিত অর্থ। বাংলা হইতে অ-বাঙালীদের উপার্জিত প্রত্যেকটি টাকা বাংলার হতভাগ্য সন্তানদের মুখ হইতে ছিনাইয়া লওয়া খাদ্যের সমান।

যখনই কোন যুবককে উপদেশ দেওয়া হয় যে, কেরানীগিরি বা স্কুলমাস্টারি না করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য কর,—তখনই সে মামুলী জবাব দেয়—"কোথায় মূলধন পাইব?" ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে, দেশ-হিতকামী ব্যক্তিরা বহু যুবককে ব্যবসা করিবার জন্য মূলধন দিয়াছেন, একথা আমি জানি।—কিন্তু প্রায় সর্বত্রই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, ঐ সব যুবকেরা ব্যবসায়ে সফল-কাম হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ, ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ রীতিমত শিক্ষানবিসি করা প্রয়োজন। আগে ক্ষুদ্র আকারে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে এবং যদি প্রথমাবস্থায় সাফল্য লাভ করা নাও যায়, তবু ব্যবসায় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে পারা যায়। ব্যর্থতাই সাফল্যের অগ্রদূত। আমাদের সাধারণ যুবকেরা ব্যবসার আরম্ভেই যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা ভগ্নহৃদয় হইয়া পুনরায় সেই পুরাতন বাঁধা পথ (চাকরি) অবলম্বন করে।

বাংলাদেশে একটা প্রবাদ আছে যে, মাড়োয়ারীরা প্রথমতঃ লোটা-কম্বল ও ছাতু লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করে। রেলওয়ে হইবার পূর্বে মারবারের মরুভূমি হইতে তাহারা পায়ে হাঁটিয়া বাংলাদেশে আসিত। এখনও তাহারা ঐরূপই করে, প্রভেদের মধ্যে পায়ে হাঁটার পরিবর্তে রেলগাড়ীতে চড়ে। আর আমাদের যুবকেরা বিলাসী ও অলস; তাহারা চায় কোন কষ্ট না করিয়া ফাঁকি দিয়া কার্যসিদ্ধি করিতে! কোটিপতি ব্যবসায়ী কার্নেগী যুবকদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাঁহা উল্লেখযোগ্য ঃ—

"আজকাল দারিদ্র্যকে অনিষ্টকর বলিয়া আক্ষেপ করা হয়। যে সমস্ত যুবক ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে না, তাহাদের জন্য করুণা প্রকাশ করাও হয়। কিন্তু এ বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের উক্তি আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি—'যুবকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় পৈতৃক সম্পত্তি দারিদ্র্য।' আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে,—এই দরিদ্রদের মধ্য হইতেই মহৎ এবং সাধু ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করিবেন। আমার এ ভবিষ্যদ্বাণী অর্থশূন্য অতিরঞ্জন নহে। কোটিপতি বা অভিজাতদের বংশ হইতে পৃথিবীর লোকশিক্ষক, ত্যাগী, ধর্মাত্মা, বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক, রাজনীতিক, কবি বা ব্যবসায়ীরা জন্মগ্রহণ করেন নাই। দরিদ্রের কুটীর হইতেই ইঁহারা আসিয়াছেন। ......সকলেই বলিবেন যে, যুবকের প্রথম কর্তব্য আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্য নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তোলা।"—*The Empire of Business.*

(৯) বোম্বাই কিভাবে বাংলার অর্থ শোষণ করিতেছে

বাংলার বাজারে বোম্বাই মিলের কার্পাস বস্ত্রজাত কি পরিমাণে চলিতেছে, তাহার সঠিক হিসাব দেওয়া কঠিন। যতদূর হিসাব-সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, কলিকাতা বন্দরে বাহির হইতে প্রায় ১২৫·২ কোটি গজ কাপড় আমদানি হয়, আর স্থানীয় উৎপন্ন বস্ত্রজাতের পরিমাণ মাত্র ১৩·৪ কোটি গজ। কলিকাতা বন্দরে যে কাপড় আমদানি হয় তাহা সমস্ত বাংলা, বিহার, আসাম এবং যুক্তপ্রদেশেরও কতকাংশে যায়। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কলিকাতা বন্দরে আমদানী স্বদেশী মিলের কাপড় বাংলাদেশেই বেশী বিক্রয় হয়। অন্যান্য স্থানে, বিশেষতঃ বিহারে হাতে বোনা কাপড় (খদ্দর) বেশি চলে। বিশেষ সতর্কতার সহিত হিসাব করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, ১৯২৭-২৮ সালে যে ১২৫·২ কোটি গজ কাপড় কলিকাতা বন্দরে আমদানি হইয়াছিল (মিঃ হার্ডির হিসাবে), তাহার মধ্যে ১০০ কোটি গজ কাপড়ই বাংলাদেশে বিক্রয় হইয়াছিল। এই সম্পর্কে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা জীবনযাত্রার আদর্শ উচ্চতর, কেননা এখানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী। বাংলাদেশে বিক্রীত এই ১০০ কোটি গজ কাপড়ের মূল্য ১০ কোটি টাকা ধরা যাইতে পারে। সরকারী বিবরণে দেখা যায় যে, ১৯২১ সালে বাংলাদেশে যে ভারতীয় বস্ত্রজাত আমদানি হয়, তাহার মূল্য ৬ কোটি টাকা হইবে। ইহার সংগে পূর্বোক্ত হিসাবের সামঞ্জস্য আছে বলা যাইতে পারে। কেননা ১৯২১ সাল হইতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসারের ফলে ভারতীয় মিলের বস্ত্রজাত ক্রমেই বেশী পরিমাণে বিদেশী বস্ত্রজাতের স্থান অধিকার করিতেছে।(২৭)

'ক্যাপিট্যাল' (১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩১) পত্রে এই সম্পর্কে কয়েকটি সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

"কার্পাস শিল্প সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, আরও ১৫০।২০০ মিল তৈরি করিলে ভারতের চাহিদা মিটিবে। সুতরাং বাংলা যদি তাহার নিজের কাপড়ের চাহিদা নিজে মিটাইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষরূপে উদ্যোগী হইতে হইবে। অন্যথা তাহাকে চিরকাল বোম্বাইয়ের তাঁবেদারিতে থাকিতে হইবে, কেননা এখন যেসব কাপড়ের কল আছে, সেগুলি বোম্বাইয়ের এলাকার মধ্যেই অবস্থিত। কার্পাস শিল্পের কেন্দ্র হইবার সুযোগসুবিধা বোম্বাইয়ের চেয়ে বাংলার কম নহে। এ বিষয়ে বাধা বাংলায় উপযুক্ত মূলধন ও উৎসাহের অভাব। কয়লা, তুলা, শ্রম এবং চাহিদা এ সবই পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রিটিশদের কর্মশক্তি অন্য পথে গিয়াছে এবং বস্ত্রশিল্পে বোম্বাই প্রদেশ তাহার আর্থিক সম্পদ ও রাজনৈতিক প্রভাবের বলে

---

(২৭) ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারী মিঃ এম. পি. গান্ধী একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার Indian Cotton Textile Industry গ্রন্থে তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ কোটি টাকা মূল্যের বস্ত্রজাত বাহির হইতে বাংলায় আমদানি হয়। আমি কমপক্ষে ১০ কোটি টাকা ধরিয়াছি।

অবশ্য বোম্বাই যে কাপড় যোগায়, তাহার মূল্য হইতে কাঁচা তুলার মূল্য বাদ দিতে হইবে, কেননা বাংলাতে তুলা উৎপন্ন হয় না।

একরূপ একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়াছে। ইহার ফলে স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ শুল্ক-নীতি-প্রসূত সমস্ত লাভের কড়ি বোম্বাইয়ের ভাণ্ডারে যাইতেছে। এ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা নাই। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারত আমদানী বস্ত্র-জাতের জন্য বৎসরে ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। ঐ ব্যবসা নানা কারণে ভারতীয়দের হাতে যাইয়া পড়িতেছে এবং দেখা যাইতেছে যে, অধিকাংশ কাপড়ের কলই বোম্বাই প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইহার ফলে কেবল বস্ত্রশিল্পে নয়, সমস্ত প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যাপারে বোম্বাই প্রদেশই ভারতে প্রভুত্ব করিবে। বোম্বাইয়ের এই আর্থিক অভিযান এখনই আরম্ভ হইয়াছে। যদিও ইহা এখন প্রাথমিক অবস্থায় আছে এবং কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা ও ব্রিটিশ সম্প্রদায়, কংগ্রেস কার্যপ্রণালী অনুসারে, আর্থিক ব্যাপারে বোম্বাইয়ের অধীন হইয়া পড়িবে। জামসেদপুরে যাহা ঘটিয়াছে, কলিকাতাতেও তাহারই পুনরভিনয় হইবে। আর বোম্বাই যদি বস্ত্রশিল্পে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার কার্যক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়, তবে সে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও আর্থিক ব্যাপারে ভারতের রাজধানী হইয়া দাঁড়াইবে এবং কলিকাতা বিজয় করিতে তাহার পক্ষে ২০ বৎসরের বেশী লাগিবে না। আমাদের এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে স্বরাজের আমলে, বাংলাদেশ আর্থিক ব্যাপারে পরাধীনই থাকিয়া যাইবে, কেবল ব্রিটিশ বণিকদের পরিবর্তে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা তাহার প্রভু হইবে।"—ডিচারের ডায়েরী।

বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা বাঙালীদের দেশপ্রেমের সুযোগ লইয়া যেভাবে বাংলাকে শোষণ করিয়াছে, তাহার পরিচয় নিম্নলিখিত কথোপকথনের ভিতর দিয়া পাওয়া যাইবে। বোম্বাইয়ের একজন কলওয়ালার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর এইরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল ঃ—

"আপনি জানেন যে, ইহার পূর্বেও স্বদেশী আন্দোলন হইয়াছিল?"

"হাঁ, তাহা জানি।"—আমি উত্তর দিলাম।

"আপনি ইহাও অবশ্য জানেন যে, বঙ্গভঙ্গের সময়ে বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছিল? যখন ঐ আন্দোলন বেশ জোরে চলিতেছিল, তখন আমরা কাপড়ের দাম চড়াইয়া দিয়াছিলাম। আরও অনেক কিছু অন্যায় কাজ করিয়াছিলাম।"

"হাঁ, আমি এ সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছি এবং তাহাতে বেদনা বোধ করিয়াছি।"

"আমি আপনার দুঃখ বুঝিতে পারি, কিন্তু ইহার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। আমরা দান-খয়রাতের জন্য ব্যবসা করিতেছি না। আমরা লাভের জন্য ব্যবসা করি, অংশীদারদের লভ্যাংশ দিতে হয়। আমাদের পণ্যের মূল্য চাহিদা অনুসারে নির্ধারিত হয়। চাহিদা ও যোগানের অর্থনীতিক নিয়ম কে লঙ্ঘন করিতে পারে? বাঙালীদের জানা উচিত ছিল যে, তাহাদের আন্দোলনে স্বদেশী বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে ও উহার মূল্য বাড়িয়া যাইবে।"

আমি বাধা দিয়া কহিলাম,—"বাঙালীদের প্রকৃতি আমার মতই বিশ্বাস-প্রবণ। তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল যে, কলওয়ালারা দেশের সঙ্কটসময়ে স্বার্থপরতার

বশবর্তী হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। কলওয়ালারা এতদূর চরমে উঠিয়াছিল যে, বিদেশী কাপড়ও প্রতারণা করিয়া দেশী বলিয়া চালাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই।"

"আমি আপনার বিশ্বাসপ্রবণ স্বভাবের কথা জানি, সেইজন্যই আপনাকে আসিতে বলিয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য আপনাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া—যাহাতে সরলহৃদয় বাঙালীদের মত আপনিও বিভ্রান্ত না হন।" **Gandhi : *Autobiography,* vol. II.**

অন্য প্রদেশের লাভের জন্য বাংলাদেশ ও তাহার দরিদ্র কৃষকদের কিভাবে শোষণ করা হইতেছে, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিদেশ হইতে আমদানী করোগেট টিনের (ইস্পাতের) উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসাইয়া টাটার লৌহশিল্প-জাতকে যেভাবে সংরক্ষিত করা হইয়াছে, তাহাতে বাংলার স্বার্থকেই বলি দেওয়া হইয়াছে, ইহা আমি নানা তথ্য সহকারে প্রমাণ করিতে পারি। ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স বা সাম্রাজ্যবাণিজ্য-নীতির জন্য কেবলমাত্র ব্রিটিশ লৌহজাত এই অতিরিক্ত শুল্ক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। বর্তমান আমদানি-শুল্কের ফলে বাংলাদেশকে দ্বিগুণ ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। বাংলা করোগেট টিনের প্রধান খরিদ্দার,—বাংলার দরিদ্র লোকেরা বিশেষ পূর্ববঙ্গের কৃষকেরা এই আমদানি-শুল্ক বৃদ্ধির জন্য করোগেট টিনের জন্য বেশী মূল্য দিতে বাধ্য হয়। যখন প্রতি টনে দশ টাকা শুল্ক ছিল, তখন করোগেট টিনের দাম ছিল—প্রতি টন ১৩৭৲ টাকা। ১৯২৫—২৬ সালে টাটা কোম্পানির চিৎকারের ফলে ঐ শুল্ক বৃদ্ধি পাইয়া টন প্রতি ৪৫৲ টাকা হইল। ১৯২৬ হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ঐ শুল্ক কিছু কমিয়া টন প্রতি ৩০৲ টাকা থাকে। ১৯৩১ সালে ঐ শুল্ক হঠাৎ বাড়িয়া টন প্রতি ৬৭৲ টাকা হইয়া দাঁড়ায়, ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শতকরা ২৫৲ টাকা 'সারচার্জের' দরুন উহা বৃদ্ধি পাইয়া টন প্রতি ৮৩৸৹ আনায় উঠে। এই শুল্কবৃদ্ধির ফলে বাংলার দরিদ্র কৃষকদের বিষম ক্ষতি হইল। এদিকে টাটা কোম্পানি শুল্কবৃদ্ধির সুযোগ লইয়া করোগেট টিনের দাম টন প্রতি ২১৮৲ টাকা চড়াইয়া দিয়াছে। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এই দেশীয় শিল্পের সঙ্গে বিদেশী শিল্পের মূল্যের এত বেশী তফাত যে, দেশবাসী দাবি করিতে পারে কেন এই দেশীয় শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া মূল্য সুলভ করিবার ব্যবস্থা হইবে না? করোগেট টিনের ব্যবসা পূর্বে বাঙালী ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির ফলে ঐ সমস্ত বাঙালী ব্যবসায়ীরা ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে। এখন অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা বাঙালীদের স্থানচ্যুত করিয়া ক্রমে ক্রমে এই ব্যবসা হস্তগত করিতেছে। কেননা টাটারা এখন আর বাঙালী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কারবার করিতে প্রস্তুত নহে। সুতরাং আমি যে বলিয়াছি, বোম্বাইওয়ালাদের লাভের জন্য বাঙালীদের শোষণ করা হইতেছে, তাহাদের স্বার্থে বলি দেওয়া হইতেছে, তাহা এক বর্ণও মিথ্যা নয়। অদৃষ্টের পরিহাসে বাংলা বোম্বাইয়ের শোষণক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে, ঐ প্রদেশের ব্যবসায়ীরা বাংলায় আসিয়া বাঙালীদের স্কন্ধে চড়িয়া ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিতেছে।

টাটা কোম্পানি এতকাল ধরিয়া সংরক্ষণ-নীতি ও সরকারী সাহায্যের সুবিধা

ভোগ করিবার ফলে যদি নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে এবং বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত, তবে বাংলার লোকেরা যে স্বার্থত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার একটা সার্থকতা থাকিত। অর্থনীতিশাস্ত্রের ইহা একটা সুপরিচিত সত্য যে, কোন শিশু শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। কিন্তু চিরকাল ধরিয়া এরূপ সংরক্ষণ করা যাইতে পারে না, কেননা তাহাতে অযোগ্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং পরিণামে তাহার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি ঘটে। টাটা কোম্পানির দৃষ্টান্তে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই দরিদ্রদেশের অধিবাসীদের অবস্থার তুলনায় ব্রিটিশ শাসন ব্যয়সাধ্য বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু টাটারা তাহার উপর টেক্কা দিয়াছে। বহু বৎসর পূর্বে স্যার দোরাব টাটা গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার কারবারে বিদেশ হইতে আনীত বিশেষজ্ঞদিগকে কোন কোন ক্ষেত্রে বড়লাটের চেয়েও বেশী বেতন দেওয়া হয় ; এবং এইজন্যই বুঝি বাংলাদেশকে এরূপভাবে শোষণ করা হইয়াছে!—আমদানি-শুল্কের বৈধতা বা অবৈধতা লইয়া বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে, আমি বলিতে চাই যে, বোম্বাইকে রক্ষা ও তাহার ঐশ্বর্যবৃদ্ধির অর্থ বাংলার দুর্গতি। এই শোষণ-কার্যের বিরাম নাই এবং ইহা ক্রমেই বাংলার পক্ষে বেশী অনিষ্টকর হইয়া উঠিতেছে।

তারপর, চিনি-শিল্পের কথা ধরা যাক। ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশে ভারতে আমদানী সাদা চিনির উপর মণ-করা ছয় টাকা শুল্ক বসিয়াছে এবং এইভাবে সংরক্ষিত হইয়া দেশীয় চিনি-শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। যেসব চিনির কল আছে, তাহারা বার্ষিক শতকরা ২৫ টাকা হইতে ৫০ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ দিতেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও বিহারে প্রতি বৎসর গড়ে ২৫টি করিয়া চিনির কল স্থাপিত হইতেছে এবং আশা করা যাইতেছে যে কয়েক বৎসরের মধ্যে যে লভ্যাংশ পাওয়া যাইবে, তাহাতেই মূলধন উঠিয়া আসিবে। পূর্বেই দেখাইয়াছি, বাংলাদেশ ভারতে আমদানী সাদা চিনির বড় খরিদ্দার ছিল। সুতরাং যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের চিনি যে বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা বেশী বিক্রয় হইবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, এইসব চিনির কলের কোনটাই বাঙালীর উদ্যোগে বা মূলধনে স্থাপিত হয় নাই। এখানেও আমাদের জাতির অক্ষমতা ও কর্মবিমুখতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বোম্বাই মিলসমূহে ম্যানেজিং এজেণ্টদের অযোগ্যতা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। তাহারাও তাহাদের ব্যবসার সুবন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছুক নহে। আমরা দেখিতেছি ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশান গবর্নমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভারতে আমদানী জাপানী বস্ত্রের উপর শতকরা এক শত ভাগ শুল্ক বসানো হোক। তাহাদের আবেদন তদন্তের জন্য ট্যারিফ বোর্ডের নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং খুব সম্ভব গবর্নমেণ্ট আমদানি-শুল্ক যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিবেন।

একথা বলা বাহুল্য যে, টাটার লোহার কারখানা, বস্ত্র-শিল্প, লবণ-শিল্প এবং চিনি-শিল্পের একটা বৃহৎ অংশ, বোম্বাইয়ের মূলধনীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। বর্তমানে গবর্নমেণ্টের আর্থিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে তাঁহারা ভারতের করদাতাদের অর্থে নিজেদের তহবিল ভর্তি করিবার সুযোগ পাইলে খুশী হন। সুতরাং 'সাম্রাজ্যের স্বার্থের' যদি ক্ষতি না হয়, তবে গবর্নমেণ্ট সংরক্ষণ-নীতি সমর্থন করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, এই সংরক্ষণ-শুল্কের বোঝা বেশীর ভাগ বাঙালী ক্রেতাদেরই বহন করিতে হয়। যে 'ট্রাস্ট প্রথা' আমেরিকা সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যকে করতলগত করিয়াছে, স্পষ্টই বুঝা যায়, তাহা আমাদের দেশেও তাহার বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অতিরিক্ত রক্ষণ-শুল্কের দ্বারা বোম্বাইয়ের শিল্পের কোন উন্নতি হয় নাই, বরং উহার ফলে বাংলার দরিদ্র ক্রেতাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এককথায় আমাদের অক্ষমতার জন্য বাংলাদেশ শিল্প-বাণিজ্যে বোম্বাইয়ের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। এমনকি, কলিকাতা ব্যবসা-বাণিজ্যে বোম্বাইয়ের 'লেজুড়' হইয়া দাঁড়াইতেছে, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইন্সিওরেন্স কোম্পানি কর্তৃক বাংলার অর্থ শোষণ

ভারতীয় এবং বিদেশী উভয় প্রকার ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলি মিলিয়া বাংলাদেশের অর্থ নিয়মিতভাবে শোষণ করিতেছে। 'ভারতীয়' বলিলেই 'বোম্বাই প্রদেশীয়' বুঝিতে হইবে,—ইন্সিওরেন্স কোম্পানির পক্ষে একথা বিশেষভাবেই খাটে।

কতকগুলি দেশে বিদেশী ইন্সিওরেন্স কোম্পানিসমূহের উপর নানারূপ বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা হইয়াছে,—উদ্দেশ্য, দেশীয় ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলি যাহাতে অবৈধ প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে। মেক্সিকো, চিলি, ব্রেজিল, বুলগেরিয়া, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে, এইরূপ বিধিনিষেধ আছে। কিছুদিন হইল তুরস্কের ইন্সিওরেন্স কোম্পানি-গুলির উন্নতিবিধানের জন্য ঐদেশে আইন হইয়াছে। ভারতের নিকট প্রতিবাসী ক্ষুদ্র রাজ্য শ্যামে পর্যন্ত স্বদেশী ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য আইন হইয়াছে। আত্মমর্যাদা ও স্বার্থের দিক হইতে ভারতবাসীদেরও ভারতীয় কোম্পানিসমূহেই বীমা করা উচিত।

কিন্তু ভারতে দুর্ভাগ্যক্রমে এই উভয়েরই অভাব। অধুনাতম "ইন্সিওরেন্স ইয়ার বুক" বা বীমাজগতের বর্ষপঞ্জীতে দেখা যায় যে, আমরা প্রতি বৎসর বিদেশী ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলিকে ৫ কোটি টাকা প্রিমিয়াম দিয়া থাকি ; অর্থাৎ যেসব লোকের স্বার্থ আমাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহাদের হাতেই আমরা এই বিপুল অর্থ দিয়া থাকি। যাহাদের সঙ্গে সব দিক দিয়াই স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ—তাহাদের হাতে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ তুলিয়া দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ?

ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলি বাংলাদেশের অর্থ কিভাবে শোষণ করিতেছে, এই দিক দিয়া যখন দেখি, তখন স্তম্ভিত হইতে হয়।

নিম্নে উন্নতিশীল ভারতীয় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিগুলির নামের তালিকা, তাহাদের ব্যবসায়ের প্রসার, মূলধন প্রভৃতির হিসাব দেওয়া হইল :—

কোম্পানির নাম	কত টাকা মূল্যের ইন্‌সিওরেন্স ছিল	নূতন কাজ	মোট আয়	মোট ফাণ্ড
এসিয়ান	১,০০,৪৮,৩১০	৩১,২৯,৭৫০	৫,৮৬,৪৬৯	১২,৫০,১১২
ভারত	৫,১৫,৭২,৩৮৭	১,৫০,১৮,৫৪২	২৭,৭৩,৫৭৪	৯৬,৯১,৫৬৬
বোম্বে মিউচুয়াল	৬১,৯১,৮৮৭	১৮,৫৯,০০০	৩,৬৮,৬৮০	১১,৫৩,৮৪৮
বোম্বে লাইফ	১,৫৮,৯৬,০২৯	৪২,৬২,০০০	৭,৩৮,৫২৯	২১,৫২,৪৩২
কো-অপ অ্যাস্যু	৩১,২২,৫৫৩	৪,১৯,৫০০	১,৮৬,০৭৩	৭,৪৩,০২৫
ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট	২৮,৩৬,৮৩৩	১০,৪০,০০০	১,৬৭,০৩২	২,৯৫,৫৪৯
এম্পায়ার	৯,৪১,৭২,৭৫৩	১,২৭,০০,০০০	৫৯,৫৯,৮৪২	৩,২৮,৪১,২৭৯
জেনারেল	১,৬৯,৬৬,৪৪৪	৬০,০০,০০০	৯,২৯,৪৪৯	২০,১১,১১৫
হিন্দুস্থান কো অপাঃ	৩,০০,০০,০০০	১,০১,১১,০০০	১৪,৭৮,০০০	৭৫,০০,০০০
হিন্দু মিউচুয়াল	২১,৪০,৪৫৭	৩,৫৬,২৫০	১,২০,১৭০	৪০০,৯৬২
ইণ্ডিয়ান লাইফ	১,৬০,৫২,০০৪	৯,১৫,৫০০	৮,৪৯,৬৪১	৫৩,৯৪,৬২৬
আই. অ্যাণ্ড প্রুডেন	১,১৫,৫৪,৭৩৮	৩৬,১৯,০০০	৭,০৬,০২৬	১৯,০৫,৭০২
ইণ্ডিয়া ইকুই	৫৪,৩১,৭৫২	১২,৩৩,৫০০	৩,১২,২৭৬	১১,৫১,০০৪
লক্ষ্মী	১,৬৬,১৮,৬২০	৬৬,২৭,৩৫০	৮,২৫,১৬৬	৯,৩২,৮৭৯
ন্যাশনাল	৫,১৮,০৫,০২৭	১,০০,৩৪,৪০০	৩১,৬৯,০০০	১,৩৫,০০,০০০
নিউ ইণ্ডিয়ান	১,২৫,৯৬,৫৫৪	২৩,৭১,৫০০	৮,৮৯,০২৯	২৯,৮৭,৪৯৩
ওরিয়েন্টাল	৩১,৬৭,৫৯,৪৫৬	৫,৮৫,৫২,২০১	১,৮৪,৪৩,১৭৭	৮,৭৩,২৫,৭৪৭
পিপ্‌ল্‌স	২৭,৫৭,৭৫০	১৭,৩৮,৫০০	৯৮,৪৭৭	৭৯৩
ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া	১,২৪,৬১,৬৭৯	৩৩,৬৫,৫০০	৭,৮২,৯০১	২৯,৪২,৯৬১
ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া	১,০০,৮৩,৪৭৪	২২,৩১,৭৫০	৬,১৭,১১৮	১৮,৫৭,৬৩৯
জেনিথ	৩৭,১৪,৫৩৯	২৫,৪৬,৫০০	৩,১২,১৮০	৫,৬৬,০৯১

উপরে যে ২১টি কোম্পানির নাম করা হইল, তাহাদের মধ্যে মাত্র তিনটি কোম্পানিকে খাঁটি বাঙালী কারবার বলা যাইতে পারে। কিন্তু তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে যে, তাহারা নগণ্য। যেসব কোম্পানি সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বাংলার বাহিরের—বিশেষভাবে বোম্বাই প্রদেশের। বাংলার যে কোম্পানিটির সবচেয়ে ভাল অবস্থা, অ-বাঙালীরা তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। নূতন সাময়িক পত্র "ইন্‌সিওরেন্স ওয়ার্লড্" এ বিষয়ে বলিতেছেন—"এ কথা সুবিদিত যে, প্রতি বৎসর যত টাকার নূতন কাজ সমগ্র ভারতে হয়, তাহার প্রধান অংশ বাংলাতেই হইয়া থাকে। যে সমস্ত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি ভারতে কারবার করে, তাহারা বাংলাকে প্রধান কর্মক্ষেত্ররূপে গণ্য করিয়া থাকে এবং এখানেই এজেন্সি ও শাখা আফিস প্রভৃতি স্থাপন করে। তাহাদের মধ্যে অনেক কোম্পানি বাংলাতেই তাহাদের কাজের দুই-তৃতীয়াংশ পাইয়া থাকে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের লোকেরা বীমার তাৎপর্য অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে ভাল বুঝে।"—কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাতে বাঙালীর ব্যবসায়ে অক্ষমতা আরও ভালরূপে প্রকাশ পায়।

বাংলার সম্পদ ক্রমাগত শোষিত হইতেছে; উহা বিদেশীরাই কর্ক, আর অ-বাঙালীরাই কর্ক—ফল সমানই।

জীবনবীমার প্রয়োজনীয়তা বাঙালীরাই প্রথম ধরিতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বিদেশী বীমা কোম্পানিগর্লির পকেটে যাইতেছে, উহার প্রধান অংশ বাঙালীরাই দেয়। যে ২১টি ভারতীয় 'ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির কথা বলা হইল, তাহারাও বহ্ কোটি টাকা বাংলা হইতে টানিয়া লইতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিদেশী কোম্পানির চেয়ে ভারতীয় কোম্পানিগর্লিরই প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া ভারতীয় কোম্পানিগর্লির বিশেষ সর্বিধা হইয়াছে। সর্তরাং দেখা যাইতেছে, ব্যবসায়ে বাঙালীর অযোগ্যতা ও অক্ষমতার দর্ন বাংলা কয়েক কোটি টাকা বোম্বাইকে দিতে বাধ্য হইতেছে। গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া এইভাবে বাংলা যত টাকা দিয়াছে, তাহার পরিমাণ বিপর্ল।

নিম্নে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে বাংলার শোচনীয় দর্রবস্থা প্রতীয়মান হইবে। এই তালিকার জন্য মিঃ এস. সি. রায়ের নিকট আমি ঋণী।

প্রিমিয়ামের আয়

		১৯২৯
বোম্বাইয়ের কোম্পানি	টাকা	২,৫৪,৩৩,০০০
বাংলার কোম্পানি	"	৬৫,৮৫,০০০ (২৮)
মাদ্রাজের কোম্পানি	"	১২,৭২,০০০
পঞ্জাবের কোম্পানি	"	৪১,৬০,০০০
যর্ক্তপ্রদেশ, আজমীর ও দিল্লীর কোম্পানি	"	১১,৯৩,০০০

লাইফ ফাণ্ড

		১৯২৯
বোম্বাইয়ের কোম্পানি	টাকা	১৪,০৩,২৭,০০০
বাংলার কোম্পানি	"	২,৭০,২২,০০০ (২৯)
মাদ্রাজের কোম্পানি	"	৪৬,২৩,০০০
পঞ্জাবের কোম্পানি	"	১,২৮,৬৬,০০০
যর্ক্তপ্রদেশ, আজমীর ও দিল্লীর কোম্পানি	"	২৪,০৯,০০০

(২৮) 'ন্যাশন্যাল' কোম্পানি অ-বাঙালী, কেননা ইহা গর্জরাটীদের হাতে গিয়াছে। ইহার দর্ন ৩০ লক্ষ টাকা বাদ দিলে, বিদেশী কারবারের মর্ল্য ৩৫ লক্ষ টাকা মাত্র হয়। তাহার মধ্যে একটি কোম্পানির কারবারের মর্ল্যই ২৩ লক্ষ টাকা।

(২৯) ইহার মধ্যে "ন্যাশনালের" দর্ন ১½ কোটি টাকা। সর্তরাং খাঁটি বাঙালী কোম্পানির ফাণ্ডের পরিমাণ ১½ কোটি টাকা মাত্র।

দেখা যাইতেছে, যে, খাঁটি বাঙালী কোম্পানিগুলির প্রিমিয়ামের আয় ৩৫ লক্ষ টাকা এবং লাইফ ফাণ্ড ১½ কোটি টাকা মাত্র। ইনভেস্টরস্‌ রিভিউয়ের নবপ্রকাশিত সংখ্যায় দেখা যাইবে, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিগুলি কিরূপে কারবার চালায় এবং লাভ করে। ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিগুলির হাতে প্রভূত মূলধন থাকে এবং এই টাকার অধিকাংশ ইংলণ্ড ও আমেরিকার রেলওয়ে, ইলেকট্রিক কোম্পানি, গ্যাস কোম্পানি, লোহা ও ইস্পাত কোম্পানি, কয়লার ব্যবসায়, জাহাজের ব্যবসায় এবং টেলিগ্রাফ কোম্পানিসমূহের কারবারে খাটানো হয়। গ্রেট ব্রিটেনে বহু জাতিগঠনমূলক কার্যে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির ফাণ্ডের টাকা এইভাবে খাটানো হইয়া থাকে। ইহা একটি লাভজনক পন্থা এবং তাহারা এইভাবে তাহাদের শিল্প-সম্ভার বাড়াইয়াছে, শিল্প-বাণিজ্য, অর্থনীতি ব্যাপারে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইন্‌সিওরেন্স ফাণ্ডের শতকরা ৩৫ ভাগ রেলওয়েতে, ৩০ ভাগ স্থাবর সম্পত্তিতে এবং ৯ ভাগ মাত্র গবর্নমেণ্ট সিকিউরিটিতে খাটানো হইয়া থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বোম্বাইয়ের তথা বিদেশী কোম্পানিগুলির অধিকাংশ প্রিমিয়াম ও ফাণ্ডের টাকা বাংলা হইতেই প্রাপ্ত এবং ঐ টাকা তাহারা নিজেদের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য নিয়োগ করিয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যাপারে বাংলার প্রায় ২।৩ কোটি টাকা শোষিত হয় এবং ইহা আমাদের আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে প্রবল অন্তরায়।

নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানিতে অনেক চিন্তা করিবার কথা আছে। লেখক আমার সুপরিচিত এবং তিনি বাংলার শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেনঃ—

প্রাদেশিক পক্ষপাত

ক্যাপিট্যালের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩১

মহাশয়,

১৯৩১ সালের ৩রা ডিসেম্বরের "ডিচার্স ডায়েরিতে" স্যার পি. সি. রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রকাশিত "স্বরাজ এবং বাংলার আর্থিক অবস্থা" শীর্ষক পুস্তিকার বিস্তৃত সমালোচনা করা হইয়াছে। আপনার যুক্তিপূর্ণ সমালোচনায় কিন্তু দেখানো হয় নাই, বাংলা কিরূপে আর্থিক ধ্বংস হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। প্রাদেশিক পক্ষপাত যতদূর সম্ভব বর্জন করিতে হইবে. এবং উহা আমাদের নিকট রুচিকরও নহে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ইহা ছাড়া আর কি পথ আছে?

বাংলার বর্তমানের প্রধান সমস্যা তাহার কর্মহীন যুবকদের জন্য কর্মের সংস্থান করা। ডাক্তারি, ওকালতি-ব্যবসায়, কেরানীগিরি—সর্বত্রই বেজায় ভিড়। একমাত্র পথ শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতি করা। বাংলা গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, ইহার লোকসংখ্যা ৫ কোটি। সুতরাং বাংলার অধিবাসীদের পরিচ্ছদের জন্য প্রচুর কার্পাসজাত বস্ত্রের প্রয়োজন। প্রচুর লবণও তাহার পক্ষে প্রয়োজন। বাংলাদেশে অন্ততঃপক্ষে ৪০।৫০টি কাপড়ের কল এবং ১২টি লবণের কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। এবং বাংলা যদি ইহা

করিতে পারে তবে তাহার শিশু শিল্পের জন্য অন্ততঃপক্ষে ১০।২০ বৎসরের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এরূপ অবস্থায় বাংলার পক্ষ হইতে 'টার্মিনাল ট্যাক্স' বসানো কেবল সঙ্গত নয়, অত্যাবশ্যক। ভারতের ভিন্ন প্রদেশের প্রতিযোগিতার পথ বাংলাদেশ একেবারে রুদ্ধ করিতে চায় না। কিন্তু সে চায় যে, তাহার শিশু শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করে এবং ভিন্ন প্রদেশের প্রবল প্রতিযোগিতায় পরাস্ত না হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। যদি বোম্বাই অভিযোগ করে, তবে যুদ্ধের সময় বাংলাকে সে কিরূপ নির্লজ্জভাবে শোষণ করিয়াছে, তাহা তাহাকে স্মরণ করিতে বলি। সে তাহার কার্পাস-জাত বস্ত্রের মূল্য শতকরা ২০০ ভাগ বাড়াইয়া দিয়াছিল এবং অংশীদারগণকে প্রভূত লভ্যাংশ দিয়াছিল। বাংলার শ্রমিকেরা এই দুর্মূল্যের জন্য কাপড় কিনিতে না পারিয়া লজ্জায় আত্মহত্যা করিয়াছে। কিছুদিন হইল, বোম্বাই ও এডেনের ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য, বাংলার তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও, বাংলার আমদানী লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

বাঙালীদের যে দোষই থাক, তাহারা দেশপ্রেমিক জাতি এবং তাহাদেরই জন্য ভারতে, বিশেষভাবে বোম্বাইয়ে কার্পাস-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু বোম্বাই তাহার কি প্রতিদান দিয়াছে? স্বদেশী বাঙালীর মজ্জাগত, তাহাবা যদি বলে যে, আমরা সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদের শিল্প রক্ষা কবিব, তাহা হইলে কেহই এই সঙ্গত ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে না; ব্রিটিশেবা তো পারেই না, কেননা তাহারা নিজেদের দেশে শিল্প রক্ষার জন্য শতকরা ১০০ ভাগ শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব করিতেছে।

—ভবদীয় নৃপেন্দ্রকুমার গুপ্ত

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আর্থিক ক্ষেত্রে অবাঙালীর হস্তে পরাজিত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত, মন্দভাগ্য বাঙালীর রক্তমোক্ষণ চলিয়াছে। সে রক্তস্রাব বন্ধ করিবার কিংবা ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবার কোন চেষ্টাই হইতেছে না।

(১০) নিরপেক্ষ প্রামাণিক ব্যক্তিদের অভিমত

এ বিষয়ে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ এবং কথা বলিবার অধিকারী এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত আমি উদ্ধৃত করিতেছি।

আমার ভূতপূর্ব ছাত্র এবং হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার, ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালীর ব্যর্থতা সম্বন্ধে বহু চিন্তা করিয়াছেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার নিকট নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেনঃ—

"আশা করি আমার এই সুদীর্ঘ পত্রের জন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমি যখন দেখি যে, বাঙালীদের মস্তিষ্ক প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হইলেও তাহারা প্রতিযোগিতায় সর্বত্র পরাস্ত হইতেছে, তখন আমি গভীর বেদনা বোধ করি।

"আমি বহু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীকে প্রশ্ন করিয়াছি, জেরা করিয়াছি। আইনজ্ঞ পরামর্শদাতা হিসাবে আমি তাহাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার পরিচয় ভালরূপেই জানি। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, এই অবনতির অবস্থাতেও বাঙালীরা ঐ সব লোকেদের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। মাড়োয়ারীরা ব্যবসায়ে কেন সাফল্য লাভ করে এবং বাংলার বাজার এমনভাবে কিরূপে তাহারা দখল করিয়াছে, আমি অনেক সময় তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাদের কোন শিক্ষা নাই, কোন বিশেষ জ্ঞান নাই এবং তাহাদের সামাজিক প্রথা ও আচার ব্যবহার অত্যন্ত অনুদার ও সঙ্কীর্ণ। তবে কেন তাহারা এমন সাফল্য লাভ করে? আমার বিশ্বাস যে, মাড়োয়ারীদের নিজেদের মধ্যে এমন বিশ্বাস ও সহযোগিতার ভাব বর্তমান যাহা বাহিরের লোকে ধারণা করিতে পারে না। বাঙালীদের মধ্যে আমি তাহা দেখিতে পাই না।

"মাড়োয়ারীদের মধ্যে হাজার হাজার টাকার লেনদেন হইতেছে, তাহার কোন দলিল-পত্র রাখা হয় না, এমন কি রসিদও নেওয়া হয় না। জহরতের প্যাকেট, হীরা মুক্তা প্রভৃতি দালালদের ও দর-দালালদের হাতে হাতে ঘুরে, তাহার কোন রসিদ থাকে না।

"দ্বিতীয়তঃ, নূতন নূতন চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার মোহে তাহারা শক্তি ক্ষয় করে না। আমি জানি না এ বিষয়ে কি করা যাইতে পারে। আমি ভদ্র যুবকদের ব্যবসায় শিখাইবার জন্য নিজে একটি 'ডেয়ারী' স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া এজন্য ৩৫ হাজার টাকা দিয়াছিলাম। দেখিলাম—বাঙালী যুবকদের অসাধুতা এবং কর্মবিমুখতা ভয়াবহ। ৩৫ হাজার টাকাই নষ্ট হইল আরও পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ঋণ শোধ করিতে হইল।

"আর একটি প্রচেষ্টায় আমার পাঁচ হাজার টাকা নষ্ট হইয়াছে—সেখানেও অবস্থা একই রকম। আমি লাভের জন্য এই সব প্রচেষ্টা করি নাই। বস্তুতঃ যদি চেষ্টা সফল হইত, আমার কোন লাভ হইত না। তাহাদের সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল যে, পাঁচ বৎসর তাহারা আমার টাকা খাটাইবে, তাহার পর ক্রমশঃ বিনা সুদে ঐ টাকা পরিশোধ করিবে। আমি জানি, এই সব সমালোচনা করা সহজ—কিন্তু কি উপায় আছে, তাহাও আমি দেখিতে পাইতেছি না।

"আপনি দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, আর আমি বিলাসিতার মধ্যে বাস করিতেছি। আপনিই আমার চেয়ে এ বিষয়ে ভাল বিচার করিতে পারিবেন। আমরা যদি কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারি, রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বভাবতঃই আমাদের হাতে আসিবে। কিন্তু আমাদের সমস্ত শক্তি শাসনসংস্কার, মন্ত্রিত্ব এবং ভোটের জন্য ব্যয় হইতেছে। এই সব অসার জিনিস অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

"সম্ভবতঃ যেসব বিষয় সকলেই জানে তৎসম্বন্ধে বাজে বকিয়া আমি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছি। আমি এ বিষয়ে নূতন কিছু বলিতে পারি নাই। আশা করি, আপনি আমাকে এই সব অসংলগ্ন কথার জন্য ক্ষমা করিবেন।"

মিঃ বি. এম. দাস ন্যাশনাল ট্যানারী এবং সরকারী ট্যানিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ট্যানারীর কাজে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সমগ্র ভারতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি ব্যবসায়ে বাঙালীদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমার নিকট নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেনঃ—

"আপনার পত্র পাইয়াছি। অবাঙালীদের তুলনায় বাঙালীদের ব্যবসায়ে যোগ্যতা কিরূপ, তাহা আপনি জানিতে চাহিয়াছেন।

"আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে যে, কলেজ হইতে বাহির হইয়াই আমি এই কাজে যোগদান করি। ইহাতে প্রায় ১৫ বৎসর আছি। কলিকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের সহিত কারবারের অভিজ্ঞতা আমার পূর্বে ছিল না। সুতরাং আমি খোলা মন লইয়াই কাজ আরম্ভ করি, কোন সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। পক্ষান্তরে, নিজে বাঙালী বলিয়া, আমি স্বভাবতঃ বাঙালীদের সঙ্গেই কারবার করিতে ভালবাসিতাম এবং তাহাদিগকে কাজের বেশী সুযোগ দিতাম।

"কিন্তু শীঘ্রই আমি বুঝিতে পারিলাম, যে কারবার আমি করিতাম তাহাতে বাঙালী ব্যবসায়ী খুব কমই ছিল, অধিকাংশই অবাঙালী। আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইতাম না এবং ইচ্ছা করিতাম, এই কাজে বাঙালী ব্যবসায়ীরা বেশী আসে। সেই-জন্য আমি বাঙালী ব্যবসায়ীদিগকে আমাদের সঙ্গে কারবার করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলাম এবং তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিলাম। আমার মনের ভাব ছিল যে, অবাঙালী ব্যবসায়ীদের পরিবর্তে বাঙালীদের সঙ্গে যদি আমি কারবার করিতে পারি, তবে আমি অধিকতর নিরাপদ হইতে পারিব। কিন্তু বাঙালীদের সঙ্গে কয়েকটি কারবার করিয়াই আমার এ মোহ দূর হইল।

"গত তের বৎসরের মধ্যে আমি পঞ্জাবী মুসলমান, খোজা, হিন্দুস্থানী, বিহারী মুসলমান এবং বাঙালীদের সঙ্গে কারবার করিয়াছি এবং তাহাদের ব্যবসায়ে যোগ্যতা; ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হইয়াছে। এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই আমি এখন কারবার করি। আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেবল একটি সম্প্রদায়ের কথা বলিব।

"**পঞ্জাবী মুসলমান**—আমার অভিজ্ঞতায় তাহারা ব্যবসায়ে সাধু, বিশ্বাসী, ছল-চাতুরিহীন। তাহারা বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস লাভ করিতে চায়। তাহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং মিতব্যয়ী।

"গত ১৫ বৎসরে আমি পঞ্জাবী ব্যবসায়ীদের নিকট বিশ্বাসের উপর প্রায় এক কোটি টাকার মাল বিক্রয় করিয়াছি। ব্যবস্থা এইরূপ যে, মাল সরবরাহ করিবার ৬০ দিন পরে মূল্য দিতে হইবে। তাহারা সাধারণতঃ ঠিক সময়ে মূল্য দেয়, ইহাই আমার অভিজ্ঞতা। যদি কোন বিশেষ কারণে তাহারা নির্দিষ্ট দিনে মূল্য না দিতে পারে, তবে তাহারা পূর্ব হইতেই খবর দেয় এবং আরও সময় চায়। পঞ্জাবী মুসলমান ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বাকী টাকা আদায় করিবার জন্য আমাকে কখন আদালতে যাইতে হয় নাই।

"তাহারা কখন চুক্তি ভঙ্গ করে না, চুক্তির শর্ত মানিয়া যদি লোকসান হয়, তাহা হইলেও নয়। একবার যে মাল তাহাদের নিকট বিক্রয় করা হয়, উহা খারাপ বলিয়া

তাহারা কখন মাল ফেরত দেয় না। তাহারা বরং তজ্জন্য 'রিবেট' চাহে এবং আমরাও সন্তুষ্টচিত্তে 'রিবেট' দিই।

"তাহারা কচিৎ চাকরি লইয়া থাকে। যাহারা অত্যন্ত গরীব, তাহারাও চাকরি করা অপেক্ষা রাস্তায় ফিরি করিয়া মাল বিক্রয় করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। সাধারণতঃ তাহারা সকাল ৬টার সময় কাজ আরম্ভ করে এবং রাত্রি ১০টা পর্যন্ত কাজ করে। আহারের জন্য তাহারা মধ্যাহ্নে আধ ঘন্টা এবং সন্ধ্যায় আধ ঘন্টা ব্যয় করে। তাহারা মিতাহারী, কখনও বেশী খাইয়া পেট ভর্তি করে না।

"তাহারা স্বল্পব্যয়ে সাদাসিধাভাবে জীবন যাপন করে। ২০।৩০ জন একত্রে কোন বাড়ী ভাড়া করে, সেখানে রাত্রিকালে তাহারা শয়ন করে। দৈনন্দিন কাজের জন্য যেখানে থাকে, দিনের আহার সেইখানেই সমাধা করে। আমাদের ন্যায় স্কুল-কলেজে তাহারা পড়ে না। যখন কোন বাঙালী ভদ্রলোক ব্যবসা আরম্ভ করে, তখন সে কাজে তাহার কোন যোগ্যতা থাকে না। সে অলস অমিতব্যয়ীর ন্যায় কাজ করে এবং ফলে সমস্ত গুলাইয়া ফেলে, ব্যবসায়ে ব্যর্থ হয়। তাহার মধ্যযুগের জীবনযাপন-প্রণালী, অলস প্রকৃতি, শ্রমসাধ্য কর্মে অনিচ্ছা, বাধাবিপত্তি ও কঠোরতা সহ্য করিতে অপ্রবৃত্তি, বাল্যবিবাহ এবং যৌথ পরিবার প্রথা—এই সমস্ত জালে জড়িত হইয়া তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। যখনই কোন যুবক কোন ছোটখাট ব্যবসা আরম্ভ করে, তখনই তাহার পরিবারের লোকেরা তাহার নিকট সাহায্য দাবি করিয়া চিৎকার করিতে থাকে। ফলে যুবক ব্যবসায়ী তাহার সমস্ত টাকা, এমন কি মহাজনের টাকা পর্যন্ত খরচ করিয়া ফেলে এবং ব্যবসা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। এ কাহিনী করুণ, বেদনাদায়ক, কিন্তু সত্য।

"সাফল্য লাভ করিতে হইলে, ব্যবসাবুদ্ধির বিকাশ করিতে হইবে। যুবকদিগকে পরিশ্রমপটু, কঠোরকর্মী, বিশ্বস্ত হইতে হইবে। তাহাদের সাদাসিধা জীবনযাপন করিতে হইবে, পারিবারিক বাধাবিপত্তি হইতে মুক্ত হইতে হইবে। এই সমস্ত তাহার গলায় পাষাণভারের মত ঝুলিয়া থাকে।"

জনৈক অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক আমাকে জানাইয়াছেন,—"কয়েক বৎসর পূর্বে ঢাকার একজন প্রধান পাটের ব্যবসায়ীকে আমি জিজ্ঞাসা করি,—বাঙালীরা কেন পাটের ব্যবসা হইতে বিতাড়িত হইতেছে। তিনি দুইটি কারণ প্রদর্শন করেন—(১) মাড়োয়ারীদের নিম্নতর জীবিকার আদর্শ; (২) নিজেদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে কারবারে মাড়োয়ারীগণ অন্যান্য বিদেশীদের তুলনায় সাধু।" সকল ব্যবসায় সম্পর্কেই এই কথাগুলি খাটে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাঁচ টাকা মাহিনায় রাঁধুনীর কাজে জীবন আরম্ভ করেন। এখন তিনি কলিকাতা বিল্‌ডার্স স্টোরস লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্ট। তিনি সম্প্রতি একখানি বাংলা সাময়িক পত্রে "বাংলার অন্তর্বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান" —শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অতীব শোচনীয়। আমি নিম্নে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

'৩৫ বৎসর পূর্বে ঘৃত ও চিনির ব্যবসা—প্রধানতঃ বাঙালীদের হাতেই ছিল।

বর্তমানে মাড়োয়ারীরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে স্থানচ্যুত করিয়াছে। পেঁয়াজের ব্যবসাতেও বাঙালী তাহার স্থান হারাইয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, এবং বিহার প্রদেশ হইতে যে পেঁয়াজ আমদানি হয়, তাহা অবাঙালীদেরই একচেটিয়া; বাংলায় উৎপন্ন পেঁয়াজও অবাঙালীদেরই হস্তগত। ৮।১০ বৎসর পূর্বেও বেলেঘাটায় (কলিকাতা) ১৫।১৬টি পেঁয়াজের গুদাম ছিল, বর্তমানে ঐস্থানে মাত্র ৭।৮টি পেঁয়াজের গুদাম আছে। গম বাঙালীর খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতেছে। অন্ততঃপক্ষে অবস্থাপন্ন বাঙালীরা উহা খায়। এই গমের ব্যবসা—অবাঙালীদের, প্রধানতঃ মাড়োয়ারীদের হস্তগত। কলিকাতার অলিগলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত বহু ছোট ছোট আটা ভাঙার কল আছে। ঐগুলি অশিক্ষিত হিন্দুস্থানীদের। তাহারা প্রথমে হয়তো সামান্য শ্রমিক বা মজুর রূপে কলিকাতায় আসিয়াছিল। ইহা ছাড়া কলিকাতায় তিনটি বড় আটার কল আছে, উহার প্রত্যেকটিতে দৈনিক প্রায় আট শত মণ আটা ভাঙা হয়। এই তিনটির মধ্যে মাত্র একটি কল বাঙালীর। ময়দার ব্যবসাও সম্পূর্ণরূপে অবাঙালীদের হাতে। এই ময়দা কলিকাতা হইতে বাংলার মফঃস্বলে সর্বত্র চালান হয়। প্রত্যহ বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে গাড়ী গাড়ী ডাল আমদানি হইতেছে। এই ব্যবসাও অবাঙালীদের হাতে। কলিকাতার আহিরীটোলা অঞ্চলে ডালের বড় বড় আড়ত আছে। এগুলিও হিন্দুস্থানীদের হাতে। তৈলবীজের ব্যবসাতেও অবাঙালীদের একচেটিয়া অধিকার। সরিষার তৈল বাঙালীদের একটি প্রধান খাদ্য, অবস্থাপন্ন লোক ছাড়া অন্য লোকে সাধারণতঃ ঘি ব্যবহার করিতে পারে না। বাংলার পাঁচ কোটি অধিবাসীর মধ্যে বোধ হয় দশ লক্ষ লোক ঘি ব্যবহার করিতে পারে। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এই সরিষার তৈল এবং অন্যান্য তেলের কল বাঙালীদের ছিল। এখন এইগুলি অবাঙালীদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। কোচিন, আন্দামান দ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় সওয়া কোটি টাকার নারিকেল তৈল আমদানি হয়। এই নারিকেল তৈলের ব্যবসা গুজরাটী কচ্ছী এবং মেমনদের হাতে।"

শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় আরও লিখিয়াছেনঃ—

"স্কুল-কলেজ ব্যবসাশিক্ষার স্থান নহে। ঐসব স্থানে অর্থনীতি, হিসাব রাখা ইত্যাদির মূলসূত্রগুলিই কেবল শেখা যাইতে পারে। জগতের সর্বত্র নিম্ন স্তর হইতেই ব্যবসা আরম্ভ করিতে হয় এবং নানারূপ বাধাবিপত্তি ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু বাঙালীরা অলস ও আয়েসী। তাহারা কোনরূপ কষ্ট করিতে বা ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছুক; ফলে অবাঙালীরা তাহাদিগকে সমগ্র কর্মক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতেছে।

"বাঙালী জাতি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক বৎসর হইল আলুর ব্যবসায়ের খুব প্রসার হইয়াছে। শিলং, দার্জিলিং ও নৈনিতাল হইতে প্রচুর আলু আমদানি হয়, কিন্তু বাঙালী কোন ব্যবসাই বড় আকারে করিতে পারে না। সুতরাং আলু আমদানির ব্যবসা যে মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানীদের হাতে পড়িবে, ইহা বিচিত্র নহে।"

মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকদের মধ্যে বেকার সমস্যা

শ্রীযুত রাজশেখর বসু একজন কৃতী বাঙালী। গত পঁচিশ বৎসর তাঁহারই পরিচালনাধীনে থাকিয়া বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমার অনুরোধে রাজশেখর বাবু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে বেকার সমস্যার কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেনঃ—

মধ্যবিত্ত বাঙালী—প্রাচীন ও নবীন

"একশত বৎসর পূর্বে বাংলার কয়েকটি উচ্চ জাতিই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উহাদের জীবিকা প্রায় বর্তমানের মতই ছিল, যথা—জমিদারি, চাষবাস, জমিদারের চাকরি, কৃষি ও মহাজনী। বহু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিতি ও পুরোহিতগিরি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। বৈদ্যেরা জাতব্যবসা হিসাবে কবিরাজি করিত। অল্পসংখ্যক লোক সরকারী অথবা ইয়োরোপীয় সওদাগরদের আফিসে কাজ করিত। ব্যবসাবাণিজ্য সাধারণতঃ নিম্নজাতীয় লোকদের হাতেই ছিল। শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের প্রতি ভদ্রলোকদের একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল এবং সামাজিক সঙ্কীর্ণতা বশতঃ ভদ্রলোকেরা তাহাদের প্রতিবেশী ব্যবসায়ীদের কোন খবর রাখিত না। সাধারণ মধ্যবিৎ বাঙালীদের অবস্থা এখনকার চেয়ে ভাল ছিল না। কিন্তু সে তাহার অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল, কেননা তাহার জীবনযাপন-প্রণালী সরল ছিল, অভাবও এত বেশী ছিল না।

"নূতন শিক্ষাব্যবস্থার আমদানি হওয়াতে, মধ্যবিৎ বাঙালীদের উপার্জনের ক্ষমতা বাড়িয়া গেল। সে এই নূতন ক্ষেত্রে অগ্রদূত, এবং অন্যান্য প্রদেশেও তাহার কাজের খুব চাহিদা হইতে লাগিল। তাহার নবলব্ধ ঐশ্বর্য এবং শহুরে জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে, তাহার জীবিকার আদর্শের পরিবর্তন হইল। তাহার প্রতিবাসীরা এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিল এবং তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে লাগিল। 'নিম্নজাতীয়' লোকেরাও শীঘ্রই আকৃষ্ট হইল এবং নিজেদের পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিয়া দলে দলে চাকরির অন্বেষণে ধাবিত হইল। বর্তমানে যে কেহ ইংরাজী শিখে এবং ভদ্রলোকদের আচারব্যবহার অনুসরণ করে, সেইই মধ্যবিৎ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়।

"দেখা যাইবে, মধ্যবিৎ সম্প্রদায়ের বাঙালীদের জীবিকার ক্ষেত্র এখন তাহাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে বিস্তৃত। তৎসত্ত্বেও তাহারা কেবল কতকগুলি বিশেষশ্রেণীর জীবিকাই পছন্দ করে। সাধারণ ভদ্রলোক এমন কাজ করিতে চায় না,—যাহাতে লেখাপড়ার প্রয়োজন হয় না। সে অল্পবেতনের কেরানীগিরি সাগ্রহে গ্রহণ করিবে অথবা ওকালতি-ব্যবসায়ে ভিড় জমাইবে; কিন্তু মুদী, ঠিকাদার অথবা পুরানো মালের ব্যবসায়ী হইবার কল্পনা সে করিতে পারে না। অশিক্ষিত অথচ ঐশ্বর্যশালী হিন্দুস্থানীদের অবলম্বিত ব্যবসায়ের প্রতি তাহার ঘোর অবজ্ঞা,—কিন্তু সে ঐসব অশিক্ষিত ব্যবসায়ীদের অধীনেই কেরানীগিরি করিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করে না। নিতান্ত কষ্টে পড়িলে সে কোন 'অশিক্ষিতের ব্যবসা' অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু তখনও সে এমন ব্যবসা বাছিয়া লইবে যাহা অপেক্ষাকৃত নূতন এবং নিম্নজাতীয় লোকদের

পৈতৃক ব্যবসা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সে মোটর ড্রাইভার, ঘড়ি মেরামতকারী অথবা যান্ত্রিকও হইতে পারে, কিন্তু দর্জী, ছুতার বা কামারের কাজ কখনই করিবে না।

"ইহার অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু উপরে যাহা বলিলাম, সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে তাহা মোটামুটি খাটে। নিম্নস্তর হইতে লোকের আমদানি হইয়া এই মধ্যবিৎশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে এবং প্রতিযোগিতায় ভদ্রজীবনের আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে। এই শ্রেণীর লোক মাত্র কতকগুলি জীবিকা পছন্দ করে, কিন্তু তাহাতে সকলের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে না। সেকালে এক এক জন উপার্জনশীল ব্যক্তি বহু দরিদ্র ও বেকার আত্মীয়দের ভরণপোষণ করিতেন। কিন্তু জীবিকার আদর্শ বাড়িয়া যাওয়াতে উপার্জনশীল ব্যক্তিদের নিজেদের কথাই বেশী চিন্তা করিতে হয়। দরিদ্র আত্মীয়দের কথা তাঁহারা ভাবিতে পারেন না। ফলে যৌথ পরিবার-প্রথা ভাঙিয়া যাইতেছে, এবং যৌথ পরিবারভুক্ত বহু ব্যক্তি অলস জীবনযাপন অসম্ভব দেখিয়া কাজ খুঁজিতে বাধ্য হইতেছে।

বর্তমান বেকার অবস্থার কারণ

"প্রধান কারণগুলি এইভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারেঃ—

(১) মধ্যবিৎশ্রেণীর লোকদের বিশেষ কতকগুলি জীবিকার প্রতি আসক্তি;—যথা, (ক) ডাক্তারি, ওকালতি, প্রভৃতি 'বিদ্বৎ ব্যবসা;' (খ) যেসব কাজে স্কুল-কলেজের শিক্ষা প্রয়োজনীয়; (গ) যেসব কাজের সঙ্গে নিম্নজাতির নাম জড়িত নহে।

(২) নূতন বৃত্তি শিখিবার সুযোগের অভাব,—নূতন জীবিকার অভাব।

(৩) ব্যবসায়ীদের সহিত সংস্পর্শ না থাকার দরুন ব্যবসা-বাণিজ্যে অজ্ঞতা।

(৪) যৌথ পরিবার প্রথা ভাঙিয়া যাওয়ায় বহু বেকার লোকের সৃষ্টি।

(৫) নিম্নস্তর হইতে বহু লোক আমদানি হইয়া মধ্যবিৎশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে; এই সব নূতন লোকের মনোবৃত্তি ভদ্রলোকদেরই মত।

(৬) বিদেশী এবং ভারতের ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। উহারা চরিত্র ও অভ্যাসের গুণে, বাঙালীদের চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশী যোগ্যতা প্রদর্শন করে।

প্রতিকারের উপায়

"এইরূপ প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, গবর্ণমেন্ট বা বিশ্ববিদ্যালয় যদি ব্যাপকভাবে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেই এই বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। 'বিদ্বৎ ব্যবসা' (ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি) শিখাইবার সুবন্দোবস্ত আছে। বাঙালীদের মধ্যে আইন শিক্ষা বরং অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ডাক্তারি ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার এখনও অবসর আছে। কিন্তু এই সব বৃত্তি কেবল স্বল্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষিতদেরই যোগ্য। যাহাদের যোগ্যতা মধ্যম রকমের, তাহাদের জন্য হিসাব রাখা, স্টেনোগ্রাফী ও কেরানীর কাজ শিখাইবার কয়েকটি স্কুল আছে। কৃষি, মেকানিক্যাল

ইঞ্জিনিয়ারিং, জরিপবিদ্যা, অঙ্কনবিদ্যা, মোটরগাড়ীর ড্রাইভারি ও মেরামতের কাজ, টেলিগ্রাফ সিগন্যালিং, তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য বৃত্তি শিখাইবার জন্যও কয়েকটি স্কুল আছে। এইসব স্কুল ভাল কাজ করিতেছে এবং এইগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে কার্যকরী শিক্ষা দান করিবারও প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু যেসব বিষয় শিখাইবার প্রস্তাব সাধারণতঃ করা হয়, তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য নাই, যথা,—ছুতারের কাজ, প্রাথমিক যন্ত্রবিদ্যা এবং বড়জোর সুতা কাটা ও বুননের কাজ। অবশ্য, এ সব বিষয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না,—ছেলেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, কর্মকুশলতা শিখানোই যদি ইহার উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু ছেলেরা এই শিক্ষার ফলে সাধারণ শ্রমশিল্পীর জীবিকা গ্রহণ করিবে, ইহা যদি কেহ আশা করেন, তাহা হইলে তিনি 'ভদ্রলোকদের' প্রকৃতি জানেন না। কেহ কেহ বলেন যে, আধুনিক যুগের শিল্পাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিবার জন্য কলেজের সঙ্গে টেকনোলজিক্যাল ক্লাস খুলিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে এখনও শিল্প কারখানা প্রভৃতি বেশী গড়িয়া উঠে নাই। সুতরাং এরূপ লোকের চাহিদা খুবই কম। ছাত্রেরা কলেজে 'বৈজ্ঞানিক শিক্ষা' সমাপ্ত করিয়া নিজেরা শিল্প কারখানা প্রভৃতি খুলিবে, এরূপ আশা করা ভ্রম। কলেজের ক্লাসে শিক্ষালাভের দ্বারা ব্যবসা গড়িয়া তোলা যায় না। কয়েকজন উৎসাহী ও উদোগী ছাত্র এইভাবে শিক্ষালাভ করিয়া ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নবশিক্ষিত শিল্পবিৎ (টেকনোলজিস্ট) যথাযোগ্য সমর্থন না পাইয়া ব্যবসায়ে নামিলে, উহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না।

"সুতরাং এখন কর্তব্য কি? ভবিষ্যতের আশায়, ছেলেদের শিল্প, কার্যকরী বৃত্তি প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হোক, আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু বর্তমানবংশীয়েরা যেন এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ না করে যে, 'টেকনিক্যাল' শিক্ষার দ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান হইবে, যেমন তাহাদের পূর্বগামীরা মনে করিত যে, সাধারণ স্কুল ও কলেজে শিক্ষালাভই জীবিকা সংস্থানের নিশ্চিত উপায়। যুবকদের বুঝা উচিত যে, পণ্য উৎপাদনের উপায় জানা ভাল বটে, কিন্তু পণ্য বিক্রয় করিতে জানাই অনেক স্থলে বেশী লাভজনক। বাংলার বাহির হইতে যে হাজার হাজার লোক আমদানি হইয়াছে, তাহাদের কার্যকলাপের প্রতি মধ্যবিৎ বাঙালীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এইসব লোকের স্বাভাবিক ব্যবসাবুদ্ধি ও সাহস ছাড়া অন্য কোন মূলধন নাই এবং ইহারই বলে তাহারা বাংলার সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে এবং এদেশের অন্তর্বাণিজ্য হস্তগত করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছে।

"বিদ্বৎব্যবসা ও কেরানীগিরির প্রতি ভদ্রলোকদের অস্বাভাবিক মোহ ঘুচাইতে হইবে। তাহাদিগকে ব্যবসার সর্বপ্রকার রহস্য শিখাইতে হইবে। কোন একটা অজ্ঞাত জীবিকার সম্বন্ধে যে ভয় ও ঘৃণার ভাব, ভদ্রযুবকদের মন হইতে যখন তাহা দূর হইবে, তখন তাহারা দেশের বিশাল ব্যবসাক্ষেত্রে নিজেদের স্থান করিয়া লইতে পারিবে। যে খুচরা দোকানী অথবা ঠিকাদার হইতে পারে, শিল্পী ও মজুরদের খাটাইতে পারে, বড় ব্যবসায়ী ও খুচরা দোকানদারের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী হইতে পারে, সে ছোট

দোকানদাররূপে কাজ আরম্ভ করিয়া নিজের অধ্যবসায় বলে বড় ব্যবসায়ী হইতে পারে। মিঠাইওয়ালা বা মুদীর ব্যবসায়ের মত ক্ষুদ্র কাজও পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে উচিত নহে। তাহার শিক্ষা ও মার্জিত রুচি কাজে খাটাইয়া সে তাহার গ্রাহকদের অধিকতর সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহার ক্ষুদ্র দোকানই সকলের নিকট আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিতে পারে।

"এইরূপ মনোবৃত্তি তাড়াতাড়ি সৃষ্টি করা যায় না। সংস্কারের বাধা অতিক্রম করিয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীদের ব্যবসা-বাণিজ্য শিখাইতে একটু সময় লাগিবে। ট্রেনিং ক্লাস কোন ব্যবসায়ের প্রাথমিক সূত্রগুলি শিখাইতে পারে মাত্র। কিন্তু যাহারা ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে তাহাদের সঙ্গে কাজ করিয়াই কেবল ব্যবসায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভবপর। অধিকাংশ ব্যবসায়ের জন্য স্কুলে শিক্ষা লাভ করা যায় না। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তি সীমাবদ্ধ, তাহাদের নিকট বেশী আশা করা অনুচিত। পারিবারিক আবহাওয়া এমনভাবে বদলাইতে হইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর প্রতি অতিরিক্ত মোহ যেন না থাকে। যুবকরা এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী জীবনসংগ্রামে বেশী কিছু সাহায্য করিতে পারে না। তবুও তাহারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, সে কেবল উপায়ান্তর রহিত হইয়া,—বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছাড়িলেই তাহাদিগকে কোন একটা জীবিকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, এই আশঙ্কায়। বাছাবাছা মেধাবী ছাত্রদের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীগুলি থাকুক। সাধারণ যুবকেরা নিজেদের শক্তি ও পিতামাতার অর্থ লক্ষ্যহীন কলেজী শিক্ষায় অপব্যয় না করিয়া, ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা পাস করিবার পর কোন ব্যবসায়ীর অধীনে কয়েক বৎসর শিক্ষানবিসি করিলে অনেক বেশী লাভবান হইবে।"

শ্রীযুত বসুর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা হইতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির অস্বাভাবিক মোহ সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে অনুধাবনযোগ্য। আমাদের যুবকেরা ঘটনাস্রোতে যেন লক্ষ্যহীনভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে এবং একবারও চিন্তা করে না কি আত্মহত্যাকর নীতি তাহারা অনুসরণ করিতেছে। এজন্য তাহাদের অভিভাবকরাই বেশী দায়ী।

আমাদের যুবকেরা বি. এ. বা বি. এস-সি. পাস করিলেই এম. এ. বা এম. এস-সি. পড়িতে আরম্ভ করে, কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার বিপদ যতদিন পারে, এড়াইবার জন্য। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, এই উচ্চশিক্ষার যত উচ্চতর ধাপে তাহারা উঠিবে, জীবনসংগ্রামে ততই তাহারা বেশী অপটু ও অসহায় হইবে।

হ্যাজলিট The Ignorance of the Learned—(বিদ্বান্‌দের অজ্ঞতা) শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন,—"যাহারা ক্লাসিক্যাল এডুকেশন (উচ্চ শিক্ষা) সমাপ্ত করিয়াও নির্বোধ হয় নাই, তাহারা নিজেদের ভাগ্যবান্ মনে করিতে পারে। পণ্ডিত ব্যক্তি জীবনের বাস্তব কার্যক্ষেত্রে নামিয়া চারিদিকে নানা বাধা ও অসুবিধা অনুভব করে।"

এইরূপে হতভাগ্য ডিগ্রীধারীরা নিজেদের যেন অজ্ঞাত দেশে অসহায় শিশুর মত বোধ করে।

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, যাহারা জ্ঞানার্জনে সত্যকার প্রেরণা বোধ করে, কেবল তাহাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি. পরীক্ষা শেষ হইয়াছে (৯ই অগস্ট ১৯৩২)। রসায়নশাস্ত্রে ২১ জন, পদার্থবিজ্ঞানে ১৭ জন, বিশুদ্ধ গণিতে ৩৮ এবং ব্যবহারিক গণিতে ৩৫ জন পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল। তন্মধ্যে রসায়নে ১১ জন দুই একদিন পরীক্ষা দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে, পদার্থবিজ্ঞানেও ১০ জন ঐরূপ করিয়াছে; বিশুদ্ধ গণিতে ৯ জন চলিয়া আসিয়াছে এবং ব্যবহারিক গণিতে ১১ জন (তাহারা সকলেই নিয়মিত ছাত্র) প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের পর আর পরীক্ষা দেয় নাই। মোট ১১১ জনের ৪০ জন শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয় নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে কলিকাতায় থাকিয়া একজন এম.এস-সি. ছাত্রের পড়িবার ব্যয় মাসিক ৪০৲ হইতে ৫০৲ টাকার কম নহে। সুতরাং দুই বৎসর কাল প্রত্যেক ছাত্রের অভিভাবকের গড়ে এক হাজার টাকা লাগিয়াছে এবং পূর্বোক্ত ৪০ জন ছাত্র মোট ৪০ হাজার টাকা অপব্যয় করিয়াছে। কিন্তু এই নগদ টাকার অপব্যয়েই দুঃখের শেষ নহে। জাতির মনুষ্যত্ব যেভাবে এইদিকে ক্ষয় হইতেছে, তাহা সত্যই ভয়াবহ।(৩০)

তারপর এখনও বাঙালী ছাত্রেরা বিদেশে, বিশেষতঃ জার্মানী ও আমেরিকায় যায়, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার মোহে। তাহারা এজন্য নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক দেয়, এমনকি বিবাহের বাজারে সর্বোচ্চ দরে নিজেকে নিলাম করিতেও সে লজ্জিত হয় না। কিন্তু দেশে ফিরিয়া সে চারিদিকে অকুল পাথার দেখে। সে ঝোঁকের মাথায় কখন কখন দুঃসাহসিক অভিযান করিতে পারে যথা, সে শ্রমিকদের দোভাষী হইয়া যাইতে পারে, অথবা হংকংএ সৈন্যবিভাগের ডাক্তার কিংবা কোন সমুদ্রগামী জাহাজের ডাক্তার হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু শীঘ্রই বাড়ীর জন্য তাহার মন আকুল হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে গুজরাটী, কচ্ছী, সিন্ধীরা, অশিক্ষিত হইলেও সিঙ্গাপুর, হংকং, কিওটো, ইয়োকোহামা, হনলুলু, সান ফ্রান্সিস্‌কো, কোনিয়া, মিশর ও প্যারীতে থাকিয়া ব্যবসায়ীরূপে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে।

পরিশেষে আমি পুনর্বার বলিতেছি যে, বাঙালী দুর্ভাগ্যক্রমে বড় বেশী আদর্শ-বাদী হইয়া পড়িয়াছে, ব্যবহারিক জ্ঞান তাহার অত্যন্ত কম। এই বৈজ্ঞানিক যুগে দ্রুত যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে, সে ইয়োরোপীয় ও চীনাদের সংস্পর্শে আসিয়াছে; মাড়োয়ারী, গুজরাটী, বোরা, পার্সী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, উড়িয়া, কচ্ছী, সিন্ধী প্রভৃতি অ-বাঙালীদের সঙ্গেও তাহার ঘনিষ্ট পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু জীবনের প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে সে প্রতিযোগিতায় হঠিয়া যাইতেছে। তাহার পাচক, ভৃত্য, ফিরি-ওয়ালা, কুলি, ক্ষেতের মজুর, জুতা-নির্মাতা, মুচি, ধোবা, নাপিত এ সমস্তই বাংলার

---

(৩০) আরও দুঃখের বিষয় এই, যে ২২ জন ছাত্র ব্যবহারিক গণিতে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই 'নিয়মিত ছাত্র' নহে, অর্থাৎ কেহই প্রথমবার পরীক্ষা দিতে যায় নাই। যাহারা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয় না, অথবা পরীক্ষায় ফেল করে, তাহাদের পুনর্বার 'অনিয়মিত ছাত্র' রূপে পরীক্ষা হয়। সুতরাং ইহাদের জন্য অভিভাবকদের অতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়।

বাহির হইতে আমদানি হইতেছে। দেশের অন্তর্বাণিজ্য, তথা বিদেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা—সমস্তই তাহার হাত হইতে চলিয়া যাইতেছে। এক কথায়, অন্ন-সংস্থানের ব্যাপারে, বাঙালী তাহার নিজের বাসভূমিতে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। ২২ লক্ষ অ-বাঙালী প্রতি বৎসর বিপুল অর্থ— ১২০ কোটি হইতে ১৫০ কোটি টাকা—বাংলা হইতে উপার্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আর বাঙালী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলিয়া মনে করিতেছে, এবং এই ডিগ্রী না পাইলে নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করিতেছে। সে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি চিরদিনই বিরূপ। ইহাকে সে ছোট কাজ বলিয়া মনে করে। সুতরাং অনাহারক্লিষ্ট ডিগ্রীধারীর দল যে বাজার ছাইয়া ফেলিবে, তাহা আর আশ্চর্য কি? খবরের কাগজে যখনই কোন ৫০্ হইতে ১০০্ শত টাকা মাসিক বেতনের কর্মখালির বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তখনই শত শত দরখাস্ত পড়িতে থাকে। যদি বেতন মাসিক ১৫০্ শত টাকা বা বেশী হয় তবে দরখাস্তের সংখ্যা হাজার হাজার হয়। গত ২৫ বৎসর ধরিয়া এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া আমি মনে গভীর বেদনা বোধ করিতেছি। বস্তুতঃ, আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালীর ব্যর্থতার বিষয় চিন্তা ও আলোচনা করা আমার একটা প্রধান কাজের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এই কারণেই স্বজাতির এই দৌর্বল্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমি সকলকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

বাংলার দুর্ভাগ্য এই যে, সে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের সর্বত্রই নিজেকে পরাস্ত হইতে দিয়াছে। কয়েকজন আইনজ্ঞ এবং উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরিয়া ব্যতীত তাহার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, অর্ধাহারক্লিষ্ট স্বল্পবেতনের কেরানী ও স্কুলমাস্টারে পরিণত হইয়াছে। আর তাহার দৌর্বল্য ও অক্ষমতার সুযোগ লইয়া, শক্তিশালী, উৎসাহী অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা সমস্ত ধনাগমের পথ দখল করিয়াছে। বিদেশী বা অ-বাঙালীর নিকট বাংলাদেশ অর্থোপার্জনের একটা বিশাল ক্ষেত্র, তাহারা এখানে প্রচুর উপার্জন করে। আর বাঙালীরা এখানে সেখানে একমুঠা অন্নের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছে।

দেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে এমন কি অন্তর্বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে না পারিয়া বাঙালীর চরিত্রের অধোগতিও হইতেছে। একজন স্বাবলম্বী ব্যবসায়ীর চরিত্রের সমস্ত দিক আশ্চর্যরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। তাহার কর্মক্ষমতা ও শাসনশক্তি বাড়িয়া যায়। সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে তাহার চরিত্রের অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু একজন আইনজীবী, কেরানী অথবা স্কুলমাস্টার, নিজ নিজ ক্ষেত্রে যতই কৃতী হউক,—যখনই নিজের এলাকার বাহিরের কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখনই সে ঘোর অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে সে একেবারে শিশুর মত সরল ও অজ্ঞ। তাহার দৃষ্টিও অতি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। এক কথায় নিজের সংকীর্ণ সীমার বাহিরে আসিলেই তাহার অবস্থা শোচনীয় হয়। কয়েক বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে বাংলার প্রতি-নিধিরা একেবারে নগণ্য হইয়া পড়িয়াছেন,—নিরপেক্ষ দর্শকদের এই মত। অর্থনীতি বিষয়ে কোন আলোচনা উপস্থিত হইলেই বাংলার প্রতিনিধিরা চাণক্যের উপদেশ

স্মরণ করিয়া নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে—"দূরতো শোভতে মূর্খঃ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।"

দালাল, পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস, কল্যাণজী নারায়ণজী, বালচাঁদ হীরাচাঁদ, ডেভিড সেসুন, বিড়লা অথবা খৈতান প্রভৃতি ব্যবসাজগৎ অথবা টাকার বাজারের সংস্পর্শে থাকাতে, জটিল অর্থনীতি বিষয়ে মতামত জ্ঞাপনে স্বভাবতঃই বেশী যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। আমাদের কলেজের অর্থনীতির বাঙালী অধ্যাপক কেবল পুঁথি-পড়া পণ্ডিত, ব্যবহারিক জ্ঞান তাহার কম। এক জন কলেজে শিক্ষিত ব্যক্তি "রিজার্ভ কাউন্সিল বিল" সম্বন্ধে সঠিক মত দিতে পারে না।—তা ছাড়া, একজন ধনী ব্যবসায়ীর পক্ষে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষ স্বাধীন মত ব্যক্ত করা সহজ। উপর-ওয়ালাদের ভ্রূকুটি বা অনুগ্রহে সে বিচলিত হয় না। সে দুই কুল বজায় রাখিবার চেষ্টা করে না, বা সময় বুঝিয়া নিজের মত পরিবর্তন করে না। পক্ষান্তরে কেরানী, চাকরিজীবী এবং অনুগ্রহপ্রার্থীর দল স্বভাবতঃই দাস মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়। তোষামোদ এবং পরনিন্দাতে সে পাকা হইয়া ওঠে, তাহার চরিত্রের অধোগতি হয়।

অদ্ভুত বোধ হইলেও, একথা সত্য যে, বাঙালী সাহিত্য ও বিজ্ঞানে যতই মৌলিক গবেষণা করিতেছে, ততই জীবিকা সংগ্রহে সে অক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছে। কেহ তাহাকে শিক্ষানবিস রূপে লইতেও সাহস পায় না, কেননা সে বড় বড় কথা বলে। সে নিজেও নিম্নস্তর হইতে শিক্ষানবিসি আরম্ভ করিতে অনিচ্ছুক। সাধারণ কলেজে শিক্ষিত যুবক মনে করে যে, ব্যবসায়ী হইতে হইলে তাহার সেক্রেটেরিয়েট টেবিল, বৈদ্যুতিক পাখা এবং মোটরগাড়ী চাই। সে আশা করে প্রথম হইতেই তাহার জন্য সর্বপ্রকার আরাম ও সুবিধা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, ফলে শেষ পর্যন্ত সে স্বল্প-বেতনের কেরানী জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হয় অথবা আত্মহত্যা করিয়া সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

জাতিভেদ—হিন্দুসমাজের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব (১) এক দিকে শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি সম্প্রদায়, অন্য দিকে কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ ও অন্তরায়—পারিবারিক কলহের কারণ

বংশানুক্রমের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, মানিয়া লওয়াও হইয়াছে। জাতিভেদ-পীড়িত ভারতেও এমন কতকগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহাতে মনে হয় যে, কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ বংশানুক্রমিক। বর্তমান ভারতে পাশ্চাত্য ভাব ও শিক্ষাবিস্তারের পর, পুনা ও মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ, বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ, এবং যুক্ত প্রদেশের অধিবাসী কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্য হইতেই সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের উদ্ভব হইয়াছে। স্যার টি. মাধব রাও. রঙ্গ চার্লু, বিচারপতি মুথুস্বামী আয়ার, ভাশ্যাম আয়েঙ্গার, প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ রামানুজম, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য বহু প্রধান ব্যক্তির আবির্ভাব এই কথাই প্রমাণিত করে। জাতি-ভেদ-প্রথার অসুবিধা ও তাহার গুরুতর ত্রুটিও ইহাতে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। বাংলার পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ মাত্র—অর্থাৎ তাহারা সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র। অপর পক্ষে, ইংলণ্ডে সাধারণ-শ্রেণীর মধ্য হইতে উদ্ভূত একজন চার্চিল ব্লেনহিমের যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ডিউক পদবিতে উন্নীত হন,—একজন পিট আর্ল অব চ্যাথাম হইতে পারেন। সাহিত্য জগতে একজন কসাইয়ের পুত্র "রবিনসন ক্রুসো"র প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হন,—জেলের একজন হীন ব্যবসায়ী "পিলগ্রিম্‌স প্রোগ্রেস" (১) বই লিখিতে পারেন। ফ্রান্সেও

---

(১) ইংলণ্ডের সিভিল ওয়ার বা গৃহযুদ্ধের সময়ে সাধারণশ্রেণীর মধ্য হইতে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল, বাক্‌ল তাঁহাদের একটি তালিকা দিয়াছেন। উহা হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"বড় বড় পাদরি, কার্ডিনাল বা আর্কবিশপ প্রভৃতি দ্বারা যেমন 'রিফর্মেশানের' সহায়তা হয় নাই, সমাজের নিম্নস্তরের সাধারণ লোকদের দ্বারাই হইয়াছে, ইংলণ্ডের বিদ্রোহ তেমনি সমাজের নিম্নস্তরের অতি সাধারণ লোকদের দ্বারাই হইয়াছে। যে ২।৪ জন উচ্চপদস্থ লোক জনসাধারণের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন এবং যেরূপ দ্রুতবেগে তাঁহাদের পতন হইয়াছিল, তাহাতেই বুঝা গিয়াছিল, হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে। যখন অভিজাতবংশীয় সেনাপতিদিগকে বিতাড়িত করিয়া নিম্নস্তরের মধ্য হইতে সেনাপতিদের নিযুক্ত করা হইল, তখনই ভাগ্যের পরিবর্তন আরম্ভ হইল, রাজতন্ত্রবাদীরা সর্বত্র পরাস্ত হইতে লাগিলেন।...ঐ যুগে দরজী ও শ্রমিকেরাই সাধারণের কাজ চালাইবার যোগ্য বিবেচিত হইল এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাহারাই প্রধান স্থান

এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নরম্যাণ্ডির ডিউক উইলিয়ামের (পরবর্তীকালে উইলিয়াম দি কঙ্কারার বা বিজয়ী উইলিয়াম) মাতা একজন চর্মকারের দুহিতা ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পাস্তুরের পিতা একজন চর্মশিল্পী ছিলেন। নেপোলিয়ন সত্যই গর্ব করিতেন,—প্রত্যেক প্রাইভেট সৈনিক তাহার ঝোলার মধ্যে ফিল্ডমার্শাল বা প্রধান সেনাপতির চিহ্ন বহন করে। প্রসিদ্ধ মিশনারী উইলিয়াম কেরী মুচি ছিলেন এবং বর্তমান রাশিয়ার অন্যতম প্রবর্তক জোসেফ স্টালিন জীবিকা নির্বাহের জন্য জুতা সেলাই করিতেন। পাশ্চাত্য দেশের কৃষক, তন্তুবায়, নাপিত, জুতানির্মাতা, মুচি প্রভৃতি এবং আমাদের দেশের ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ঐ সময়েও ইয়োরোপে সাধারণ লোকেদের মধ্যেই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 'হারগ্রিভস এবং আর্করাইট, টেলফোর্ড, রবার্ট বার্নস, হিউ মিলার এবং অন্য অনেকে কঠিন প্ররিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন,—কিন্তু নিজের শক্তি বলে তাঁহারা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের তাঁতিদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে।(২) অ্যানড্রু কার্নেগীর পিতা যন্ত্রযুগের পূর্বেকার তন্তুবায় ছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার পরিবারে এক রকমের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল দেখিতে পাই। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ হইতেও ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মুসোলিনীর পিতা কর্মকার এবং তাঁহার মাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ম্যাসারিকের পিতা ছিলেন কোচম্যান এবং ম্যাসারিক নিজে ১৩ বৎসর বয়সে কর্মকারের শিক্ষানবিসরূপে হাপর চালাইতেন। কিন্তু তবু এই সব বংশ হইতেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রমিক দলের সৃষ্টিকর্তা জেম্‌স কেয়ার হার্ডির দৃষ্টান্ত দেখুন। "তিনি আট বৎসর বয়সে কয়লার খনিতে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। এক দিনের

গ্রহণ করিল।.. সেই সময়ের তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভেনার, টাফনেল এবং ওকে। ইঁহাদের মধ্যে যিনি নেতা, সেই ভেনার ছিলেন মদ্য ব্যবসায়ী, তাঁহার সহকারী টাফনেল ছিলেন সূত্রধর, এবং কর্নেলের পদে উন্নীত হইলেও, ওকে ইসলিংটনের একটি মদের কারখানায় স্টোরকিপারের কাজ করিতেন।

"এগুলি ব্যতিক্রম নয়। ঐ যুগে লোকের যোগ্যতার উপরই তাহাদের উচ্চ পদ লাভের সম্ভাবনা নির্ভর করিত এবং কোন লোক যোগ্য হইলে তাহার জন্ম যে কুলেই হোক, যেরূপ ব্যবসায়েই সে লিপ্ত থাকুক, তাহার উন্নতি নিশ্চয়ই হইত। স্কিপন একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন, বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষা লাভও তিনি করেন নাই; তৎসত্ত্বেও তিনি লণ্ডন সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তিনি সেনাদলের সার্জেন্ট-মেজর-জেনারেল, আয়র্লণ্ডের সেনাপতি এবং ক্রমওয়েলের কাউন্সিলের ১৪ জন সদস্যের অন্যতম হইয়াছিলেন—*History of Civilization in England.*

(২) হিন্দুদের গল্পে ও কাহিনীতে মুসলমান তাঁতি বা জোলারাই নির্বোধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। (গ্রিয়ারসন—Bihar Peasant Life)। হিন্দু তাঁতিরাও ঐ রূপে বিদ্রূপের পাত্র। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের তাঁতিরা তাহাদের বুদ্ধিবলে নানা নূতন আবিষ্কার করিয়া কার্যক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে হারগ্রিভস ও অ্যানড্রু কার্নেগীর নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা উভয়েই তাঁতির ঘরে জন্মিয়াছিলেন।

জন্যও তিনি কোন বিদ্যালয়ে পড়েন নাই। তাঁহার মাতা তাঁহাতে পড়িতে শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু সতর বৎসর বয়সের পূর্বে তিনি নাম স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না। তিনি নিজে শর্ট হ্যাণ্ড শিখেন; কয়লার খনির মধ্যে বসিয়া তিনি এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতেন। তিনি কার্লাইল ও স্টুয়ার্ট মিল পড়িতেন এবং ২৩ বৎসর বয়সে তিনি জীবনের একটা আদর্শ, একটা দৃঢ় সংকল্প লইয়া খনি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।"—এ. জি. গার্ডিনার।

"লয়েড জর্জের পিতা ম্যানচেস্টারের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন দরিদ্র স্কুল-মাস্টার ছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য তিনি ঐ কাজ ত্যাগ করিয়া এমন বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, যাহাতে বাহিরে খোলা জায়গায় কাজ করিতে পারা যায়। তিনি ওয়েল্‌সে তাঁহার স্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন এবং চাষের কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন।... উইলিয়াম জর্জ যদিও শিক্ষকতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তবু তিনি তাঁহার পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার পড়িবার আগ্রহ পূর্বের মতই ছিল এবং শারীরিক শ্রমের কাজের পর বিশ্রামের সময় তিনি বই পড়িতেন।"(৩) তিনি তাঁহার বিধবা এবং দুইটি শিশু সন্তানকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। লয়েড জর্জের বয়স তখন দুই বৎসর মাত্র। লয়েড জর্জের মাতুল অবিবাহিত এবং দরিদ্র জুতা-নির্মাতা ছিলেন, তিনি তাঁহার বিধবা ভগিনী ও ভাগিনেয়দের ভার গ্রহণ করিলেন। এই মাতুলও জুতা সেলাই কাজের অবসরে অধ্যয়ন করিতে ভালবাসিতেন।

বার্নস গরীব চাষার ছেলে ছিলেন। কার্লাইল বলেন, "বার্নসের পিতা একজন চরিত্রবান কৃষক ছিলেন, কিন্তু তিনি এমন গরীব ছিলেন যে, ছেলেমেয়েদের একালের স্বল্পব্যয়সাধ্য স্কুলে পাঠাইয়াও লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই এবং বার্নসকে বাল্যকালে লাঙলের কাজ করিতে হইত।" বিভিন্ন কৃষকের ফার্মে কাজ করিয়া বার্নস সেই দারিদ্র্যের মধ্যেই বাস করিতে লাগিলেন। তের বৎসর বয়সে, তিনি স্বহস্তে শস্য মাড়াইতেন। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি প্রধান মজুরের কাজ করিতেন। স্কুলে গিয়া তিনি তাঁহার স্বল্প অবসরের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সঙ্গে পড়িতে লাগিলেন। আহারের সময় তাঁহার এক হাতে চামচ, অন্য হাতে বই থাকিত। ক্ষেতে কাজ করিতে যাইবার সময়ও তিনি সঙ্গে কয়েকখানি বই লইয়া যাইতেন এবং অবসর সময়ে পড়িতেন।

মাইকেল ফ্যারাডে কর্মকারের ছেলে ছিলেন এবং প্রথম বয়সে দপ্তরীর দোকানে শিক্ষানবিসি করিতেন এবং অতি কষ্টে সামান্য আহারে জীবনধারণ করিতেন।

কবি জেমস হগ নিয়মিতভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে প্রায়ই স্কুল ছাড়িয়া পিতাকে ভেড়া চরানোর কাজে সহায়তা করিতে হইত।

টমাস কার্লাইল নিজেও কৃষকের ছেলে ছিলেন, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার পিতা পুত্রকন্যাদের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিতেন এবং কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। দরিদ্রের ঘরে জন্মলাভ করিয়াও নিজের কৃতিত্ব-

(৩) *David Lloyd George* by **J. N. Edwards.**

বলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইয়াছিলেন, এরূপ আরও কয়েকজন ব্যক্তির নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও যে কোন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট পদ লাভের আশা করিতে পারে। প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁহার New Freedom নামক গ্রন্থে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্ত্ব কোথায় তাহা সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

"যখন আমি অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টাই, আমেরিকা রাষ্ট্রের পত্তনের কথা ভাবি, তখন এই কথাটি আমেরিকার ইতিহাসের সর্বত্র লিখিত আছে দেখিতে পাই,—যে সমস্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি দরিদ্র অখ্যাত বংশ হইতে উদ্ভূত হন, তাঁহারাই জাতির জীবনে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করেন। ইতিহাস পড়িয়া যাহা কিছু জানিয়াছি, অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের ফলে যাহা কিছু জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহাতে আমার এই প্রতীতি হইয়াছে যে, মানবের জ্ঞানসম্পদ সাধারণ মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ঐক্য, জীবনীশক্তি, সাফল্য উপর হইতে নীচে আসে না, বৃক্ষ যেমন গোড়া হইতে রস পাইয়া স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠে, পত্র-পুষ্প-ফলে ঐশ্বর্যশালী হয়, মানবসমাজেও ঠিক তেমনই ব্যাপার ঘটে। যে সমস্ত অজ্ঞাত অখ্যাত লোক সমাজের নিম্নস্তরে তাহার মূলদেশে থাকিয়া জীবন-সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদেরই প্রচণ্ড শক্তির দ্বারা সমাজ উন্নত হইয়া উঠিতেছে। একটা জাতির সাধারণ লোকেরা যে পরিমাণে মহৎ ও উন্নত হয়, জাতিও ঠিক সেই পরিমাণে মহৎ ও উন্নত হয়।"

এই সব দৃষ্টান্ত হইতে এই মহান শিক্ষা লাভ করা যায় যে, কৃষক, খনির মজুর, নাপিত বা মেষপালকের বৃত্তিতে কোন সামাজিক অমর্যাদা নাই। ঐ সব দেশে পরিশ্রম করিয়া সাধুভাবে জীবিকার্জন সম্মানজনক বিবেচিত হয়, কিন্তু আমাদের দেশে শ্রমের কোন মর্যাদা নাই। যাহারা 'ভদ্রলোক' বলিয়া পরিচিত, তাহারা অনাহারে মরিবে তবু কায়িক শ্রমের কাজ করিবে না,—বরং সামান্য বেতনের কেরানীগিরিতে সন্তুষ্ট হইবে। অনেক সময় সে আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া পরগাছার মত জীবন ধারণ করিতেও লজ্জিত হয় না।

আমাদের চামার, জোলা, তাঁতি, নাপিতেরা আবহমান কাল হইতে সেই একঘেয়ে পৈতৃক ব্যবসা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জীবনের কোন পরিবর্তন নাই, আনন্দ নাই। আমাদের কতকগুলি শ্রমশিল্পী অস্পৃশ্য জাতীয় এবং তাহারা যেভাবে দিনের পর দিন পৈতৃক ব্যবসা চালায়, তাহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হিন্দু ভারতের বাহিরে, লোকে যে কোন ব্যবসা বা জীবিকা অবলম্বন করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের সামাজিক মর্যাদার হানি হয় না। সমাজের যে কোন স্তরে তাহারা বিবাহ করিতে পারে, এবং এই কারণে তাহারা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যেও জীবনে সাফল্য লাভ করিতে পারে।

তিব্বত ও বর্মা ভারতের সংলগ্ন,—যথাক্রমে তাহার উত্তর ও পূর্বে অবস্থিত। বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়া বাংলা দেশ হইতে তাহারা তাহাদের সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। তাহারা জাতিভেদ জানে না এবং তাহাদের স্ত্রীলোকেরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে তাহা

আমেরিকার স্ত্রীলোকদের পক্ষেও ঈর্ষার বিষয়। চীনদেশেও বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়া বাংলার নিকট তাহার সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন প্রভৃতির জন্য বহুল পরিমাণে ঋণী। ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান লেখকেরা এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, এই চীনদেশে তিন হাজার বৎসরের মধ্যে অস্পৃশ্যতা বলিয়া কিছু নাই এবং জগতের মধ্যে এই জাতির ভিতরেই জাতিভেদের প্রভাব সর্বাপেক্ষা কম। দরিদ্র পিতামাতার সন্তানেরা অতীতে অনেক সময়ই 'মান্দারিন' হইয়াছে। আমাদের মধ্যে যে চামার সে চিরকাল চামারই থাকিবে এবং তাহার সন্তানসন্ততির সমাজে কোনকালে মর্যাদালাভের সম্ভাবনা নাই। তাহাদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা এইভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কৃষক, মেষপালক অথবা খনির মজুর অনেক সময় কবি বা ভূতত্ত্ববিদ হইয়া উঠে। যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সে পালিত হয়, তাহার ফলে তাহার চরিত্রের গুণাবলীর সম্যক বিকাশের সুযোগ ঘটে। আর আমাদের দেশের কৃষক, মেষপালক বা চামার এমন অবস্থার মধ্যে বর্ধিত হয় যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন আশা নাই। ডান্টের 'ইনফার্নো'-র মত তাহাদের মাটির ঘরের দরজায়ও যেন এই কথাটি লিখিত আছে—"এখানে যে প্রবেশ করিবে, তাহাকে সমস্ত আশা ত্যাগ করিতে হইবে।" যে চোরাবালিতে সে পড়িয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার কেহ নাই। রবার্ট বার্নসের জীবনী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত ছত্রগুলি পড়িলে বুঝা যায়, ব্রিটিশ কৃষক ও তাহার পারিবারিক জীবন এবং ভারতীয় কৃষক ও তাহার পারিবারিক জীবনের মধ্যে কি প্রভেদ! স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে, বর্তমান কালে ব্রিটিশ কৃষকের পারিবারিক জীবনের বহু উন্নতি হইয়াছে।

"বার্নসের শিক্ষা তখনও সমাপ্ত হয় নাই, সেই সময়ে তাঁহার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল। স্কটল্যাণ্ডের কৃষকেরা তাহাদের কুটীরকেই স্কুলে পরিণত করে; যখন সন্ধ্যা-কালে পিতা আগুনের কাছে আরামকেদারায় বসেন, তখন তিনি মুখে মুখে ছেলেদের নানা বিষয় শিখাইতে আলস্য করেন না। তাঁহার নিজের জ্ঞানও খুব সংকীর্ণ নহে, ইয়োরোপের ইতিহাস এবং গ্রেট ব্রিটেনের সাহিত্য তিনি জানেন। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব, কাব্য এবং স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসই তাঁহার বিশেষ প্রিয়। স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে যেসব যুদ্ধ, অবরোধ, সঙ্ঘর্ষ, পারিবারিক বা জাতীয় কলহের কথা কোন ঐতিহাসিক লিপি-বদ্ধ করেন না, একজন বুদ্ধিমান কৃষক, সে সমস্ত জানেন; বড় বড় বংশের ইতিহাস তাঁহার নখদর্পণে। স্কটল্যাণ্ডের গীতি-কবিতা, চারণ-গাথা প্রভৃতি তাঁহার মুখস্থ, এমন কি অনেক সুদীর্ঘ কবিতাও তাঁহার মুখস্থ আছে। যে সব ব্যক্তি স্কটল্যাণ্ডের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের কথা তাঁহার জানা আছে। এসব তো তাঁহার স্মৃতিপটেই আছে, ইহা ছাড়া তাঁহার শেলফের উপর পুঁথিপত্রও আছে। স্কটল্যাণ্ডের সাধারণ কৃষকের গৃহেও একটি ছোটখাট লাইব্রেরী থাকে,—সেখানে ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব এবং বিশেষভাবে কাব্যগ্রন্থাদি আছে। মিলটন এবং ইয়ং তাহাদের প্রিয়। হার্ভের চিন্তাবলী, 'পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস,' সকল কৃষকের ঘরেই আছে। র‍্যামজে, টমসন, ফার্গুসন, এবং বার্নস প্রভৃতি স্কচ লেখকদের গ্রন্থ; গান, চারণগাথা,

সবই ঐ গ্রন্থাগারে একত্র বিরাজ করিতেছে; বহু ব্যবহারের ফলে ঐগুলির মলাট হয়তো ময়লা হইয়াছে, পাতাগুলি কিছু কিছু ছিন্ন কীটদষ্ট হইয়াছে।"

রক্ত সংমিশ্রণের ফলে Species বা শ্রেণীর উন্নতি হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় সামাজিক প্রথা জাতিভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহার ফলে বংশানুক্রমিক উৎকর্ষ হয় না এবং নিম্নস্তরের জাতিরাও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এই জাতিভেদপ্রথার ত্রুটি ভারতীয় মহাজাতির, অথবা যে কোন রক্ষণশীল দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যাইতে পারে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম অবস্থায়, উচ্চবর্ণীয়েরাই (শিক্ষিত সম্প্রদায়) সর্বাগ্রে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। ব্রিটিশ শাসন যখন সুদৃঢ় হইল, তখন আদালত স্থাপিত ও আইনকানুন বিধিবদ্ধ হইল। আমলাতন্ত্রের শাসনযন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহও গড়িয়া উঠিল। সুতরাং আইনজীবী, স্কুলমাস্টার, সেক্রেটারিয়েটের কেরানী, ডাক্তার প্রভৃতির চাহিদা খুব বাড়িয়া গেল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহিত সংসৃষ্ট অসংখ্য কলেজের সৃষ্টি হইল এবং সেখানে দলে দলে ছাত্রেরা ভর্তি হইতে লাগিল; কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা উপাধিই পূর্বোক্ত ওকালতি, ডাক্তারি, কেরানীগিরি প্রভৃতি পদ লাভের প্রধান উপায় ছিল। কিছুকাল ব্যবস্থা ভালই চলিতে লাগিল। কতকগুলি উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের তথা জেলাকোর্টের কতকগুলি জজের পদও ভারতবাসীকে দেওয়া হইল। শাসন ও বিচার বিভাগের নিম্নস্তরের কাজগুলি সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীদেরই দেওয়া হইতে লাগিল। কেননা ঐসব পদের জন্য যে বেতন নির্দিষ্ট ছিল, তাহাতে যোগ্য ইয়োরোপীয় কর্মচারী পাওয়া যাইত না। এইরূপে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কেবল যে তাহাদের সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক চালনার ক্ষেত্র পাইল তাহা নহে, তাহাদের জীবিকার্জনের পথও প্রশস্ত হইল।

কিন্তু অন্য দিক দিয়া, এই অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম ব্যবস্থা সমাজদেহকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। শুনা যায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও যক্ষ্মার প্রথম অবস্থায় প্রতারিত হন, উহা তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষার প্রতি মোহের ফলে এখন ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। তাহারা সভয়ে দেখিল যে, তাহাদের সঙ্কীর্ণ কার্যক্ষেত্রে বিষম ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ইতিমধ্যেই অন্য লোকের হাতে চলিয়া গিয়াছে এবং ইহার অপরিহার্য পরিণাম বেকার সমস্যা ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে।

ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছা ও ঔদাসীন্য হেতু জাতীয় উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। দুই হাজার বৎসর পূর্বে ঈশপ তাঁহার দূরদৃষ্টিবলে, এমন একটি সমাজশরীরের কল্পনা করিয়াছিলেন, যাহার অংগ-প্রত্যংগ পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে আমরা সেই অসহযোগের দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। বাংলাদেশের শতকরা ৫৫ ভাগ লোক, বংশ, জাতি ও ভাষায় এক হইয়াও, হিন্দুসমাজের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজের ব্যবসায়ী জাতি—গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, সাহা, তিলি—

প্রভৃতিও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিত, যদি শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয় না হইত। শ্রীচৈতন্য সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন এবং জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

এই সব জাতি হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরেই রহিল এবং বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিল, যদিও সমাজের নিম্নস্তরে ইহাদের স্থান হইল। এখন হিন্দুসমাজের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। মুষ্টিমেয় লোক ইহার মস্তিষ্ক; কিন্তু বিশাল জনসমষ্টি যাহারা এই সমাজের দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহারা ঐ মস্তিষ্ক হইতে পৃথক এমন কি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ যেন পুরাণ-বর্ণিত কবন্ধবিশেষ!

এই ঘোর নির্বুদ্ধিতার জন্য বাংলা বিশেষ করিয়া ভীষণ ক্ষতি সহ্য করিয়াছে। বাংলার চিন্তাশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়—যাহাদের মধ্যে দেশহিতৈষণা, রাজনৈতিক বোধ প্রভৃতি জাগ্রত হইয়াছে, তাহারা ধনী ও ঐশ্বর্যশালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যখন কোন জাতীয় কার্যে অর্থের জন্য আবেদন করা হয়, কেহই তাহাতে সাড়া দেয় না। অসংখ্য অস্পৃশ্য জাতি—নমঃশূদ্র, পোদ প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক,—সাহা, তিলি, বণিকরা পর্যন্ত যেন সমাজদেহের অকর্মণ্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইয়াও তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চার করা যায় না।

আমি প্রকাশ্য বক্তৃতায় বহুবার হিন্দুসমাজের এই 'অচলায়তনে'র কথা বলিয়াছি। সংবাদপত্রে কোন কোন পত্রলেখক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, তিলি, সাহা, সুবর্ণবণিক, সৎচাষী, এমন কি নমঃশূদ্রদের মধ্যেও নব্য বাংলার কোন কোন কৃতী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রকারান্তরে তাঁহারা আমার কথাই সমর্থন করিতেছেন। বাংলায় কয়েকটি তিলি বংশ আছেন, যাঁহারা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া জমিদার ও ব্যবসায়ী, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বরাবরই আছে। দীঘাপাতিয়া, কাশিমবাজার, ভাগ্যকুল, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থানের তিলি বংশ হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে,—তাঁহারা সর্বাংশেই উচ্চবর্ণীয়দের সমতুল্য। কৃষ্ণদাস পাল দরিদ্র তিলির গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সাহাগণও অনুরূপ গৌরবের দাবি করিতে পারে। জগন্নাথ কলেজ (ঢাকা), মুরারিচাঁদ কলেজ (শ্রীহট্ট), এবং রাজেন্দ্র কলেজ (ফরিদপুর), সাহাদের বদান্যতার ফলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার কয়েকটি সুবর্ণবণিক পরিবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়ান রূপে ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতেও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের উদ্ভব হইয়াছে।

কিন্তু বাংলাদেশের আদমসুমারীর বিবরণ পড়িলে, আমার কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। পূর্বে যেসব দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল, সেগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। জাতিভেদ প্রথার ঘোর অনিষ্টকারিতা হিন্দু ভারতের সর্বত্রই জাজ্বল্যমান। (৪)

---

(৪) "তৃতীয় শতাব্দীতে এই সংকীর্ণতার অনিষ্টকর ফল দেখা গিয়াছিল। রোমক সমাজ অবসাদে ক্ষয় হইতে লাগিল, একটা গুপ্ত কারণ উহার জীবনীশক্তি নষ্ট করিতে লাগিল। যখন একটা রাষ্ট্রের একটা বৃহৎ সম্প্রদায় দূরে অলসভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, সাধারণের হিতের জন্য কিছুই করে না,—তখন বুঝিতে হইবে, ঐ রাষ্ট্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।" Renan's *Marcus Aurelius.*

বর্তমান বাংলা এবং ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় সাধারণতন্ত্রসমূহ তথা চীনের মধ্যে পার্থক্য এখন বুঝিতে পারা যাইবে। এ বিষয়ে আমরা তাহাদের বহু শতাব্দী পশ্চাতে পড়িয়া আছি। আমাদের সমাজদেহ জীর্ণ ও দূষিত এবং উহার অভ্যন্তরে ক্ষয়রোগ প্রবেশ করিয়াছে।

জাপান প্রবল চেষ্টায় জড়তা ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা যখন প্রমাণ করিতে যাই যে, এসিয়ার দেশসমূহও রাজনৈতিক উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে পারে, তখন আমরা জাপানের দৃষ্টান্ত দিই। কিন্তু জাপান তাহার সমাজসংস্কারের জন্য কি করিয়াছে, তাহা সুবিধামত আমরা ভুলিয়া যাই। ১৮৭০ খৃঃ পর্যন্ত জাপানের সামুরাইয়েরা আমাদের দেশের ব্রাহ্মণদের মতই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। এটা ও হিনিনেরা (জাপানের অস্পৃশ্য জাতি) এত অপবিত্র ও নোংরা বলিয়া গণ্য হইত যে, তাহাদিগকে সাধারণ গ্রামে বাস করিতে দেওয়া হইত না। তাহাদের জন্য পল্লীর বাহিরে স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হইত। ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে এইরূপ ব্যবস্থা এখনও আছে। কিন্তু ১৮৭১ সালের ১২ই অক্টোবরের চিরস্মরণীয় দিনে, সামুরাইয়েরা দেশপ্রেম ও মহৎ ভাবের প্রেরণায় নিজেদের বিশেষ অধিকারগুলি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিল, কৃত্রিম শ্রেণীভেদ ও জাতিভেদ তুলিয়া দিল এবং এইরূপে একটি সঙ্ঘবদ্ধ বিশাল মহৎ জাতি গঠনের পথ প্রস্তুত করিল। ১৮৭১ সালে জাপানে যাহা সম্ভবপর হইয়াছিল, এই বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও ভারতে তাহা সম্ভবপর হইতে পারিল না। (৩১শ ভারতীয় জাতীয় সমাজ সংস্কার সম্মেলনে মদীয় সভাপতির অভিভাষণ দ্রষ্টব্য; ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯১৭)।

জাপান আরও বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। গত অর্ধ শতাব্দীতে ব্যবসা-বাণিজ্যে জাপান কি আশ্চর্য উন্নতি করিয়াছে, তাহা এখানে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্তমানে ৪০ লক্ষ টনের জাপানী বাণিজ্য জাহাজ সগর্বে সমুদ্রে যাতায়াত করিতেছে। জাপানের কারখানায় ও তাঁতে উৎপন্ন পণ্য ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলি জাপানী প্রতিযোগিতা সহ্য করিতে না পারিয়া লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। অথচ জাপান এই ভারত হইতেই প্রতি বৎসর ২৯ কোটি টাকার কাঁচা তুলা ক্রয় করে। (৫)

---

(৫) প্রাচীন জাপানে ব্যবসায়ীরা সমাজের নিম্নস্তরে স্থান পাইত। "কিন্তু নব্য জাপান সভ্যতার পুনর্গঠন করিতে গিয়া দেখিল যে, তাহার বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়—সেই বিরাট কার্যের অযোগ্য। নূতন নূতন শিল্প উৎপাদনের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন, তাহা তাহারা যোগাইতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশের মত আগেকার বৃহৎ শিল্প উৎপাদনের অভিজ্ঞতা তাহাদের নাই। তাহারা সমাজের নিম্নস্তরে অধীনতার মধ্যে থাকিতেই অভ্যস্ত ছিল। সুতরাং উদ্ভাবনী বা প্রেরণা শক্তি তাহাদের নিকট হইতে আশা করা অন্যায়। সুতরাং প্রথম হইতেই—রাষ্ট্রই

ভারতকে তাহার নির্বুদ্ধিতার জন্য ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। জাতিভেদ বুদ্ধি ও প্রতিভাকে কেবল মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ রাখে নাই, ইহা অন্তর্বিবাদ ও কলহের একটা প্রধান কারণ। সংক্ষেপে ভারতীয় মহাজাতি গঠনের পক্ষে ইহা প্রধান অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। সহস্র প্রকারে ইহা সমাজের অনিষ্ট করিতেছে। জাপানেও তাহার নবজাগরণের পূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প—প্রাচীন প্রথায় সমাজের নিম্নস্তরের লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জন করিত, সামুরাইয়েরা তাহাদের সঙ্গে সমানভাবে মেলামেশা করিতে ঘৃণা বোধ করিত। কিন্তু জাপান যেন জাদুমন্ত্র বলে তাহার সামাজিক বৈষম্য বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে, তাহার অভিজাতশ্রেণীর নানাভাবেও সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে,—আর ভারত সেই পূর্বাবস্থাতেই অচল হইয়া আছে। ইহা যে তাহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় তাহার নাই।

(২) সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ—হিন্দু ভারতের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব—আর্থিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক বোধের উন্মেষ

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, সমুদ্রযাত্রা ও তাহার আনুষঙ্গিক সমুদ্র-বাণিজ্য প্রভৃতি কেবল জাতির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে নাই, তাহার মধ্যে রাজনৈতিক বোধও জাগ্রত করিয়াছে। প্রাচীন ফিনিসিয়া ও কার্থেজকে ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। মধ্যযুগের ভিনিস ও ফ্লোরেন্সের সাধারণতন্ত্রেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব শহরের বন্দরে পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে পণ্যদ্রব্য আসিয়া জমা হইত। উহা তাহাদের গর্ব এবং প্রতিবাসীদের ঈর্ষার বিষয় ছিল।

"আমার প্রচেষ্টা কেবল এক বিষয়ে বা এক স্থানে নিবদ্ধ নহে। কেবল বর্তমান বৎসরের আয়ই আমার সমস্ত সম্পত্তি নহে।" মার্চেণ্ট অব ভিনিস (সেক্সপীয়র)।

পুনশ্চ—"তাহার একখানি জাহাজ ট্রিপলিসে, আর একখানি ইণ্ডিসে যাইতেছে। আমি রিয়ালটোতে জানিতে পারিলাম যে, তাহার তৃতীয় আর একখানি জাহাজ মেক্সিকোতে ও চতুর্থ জাহাজ ইংলণ্ডে যাইতেছে। তাহার একটি অভিযান বিদেশে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।"—মার্চেণ্ট অব ভিনিস।

রিয়ালটো জীবনের চাঞ্চল্যে পূর্ণ ছিল। মেডিচির সময়ে ফ্লোরেন্স তাহার গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।(৬) ঐ স্থানে প্রসিদ্ধ শিল্পী, কবি, কূট রাজনীতিক এবং যোদ্ধাদের সমাগম হইত।

এ বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল; নূতন ব্যবসায়ীশ্রেণী ব্যাঙ্কার, বণিক, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, প্রাচীন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হইতে আসে নাই,—সামুরাইদের সম্প্রদায় হইতে আসিয়াছিল। এই সামুরাইদের পূর্ববৃত্তি এবং বিশেষ অধিকার প্রভৃতি তখন ছিল না।" Allen : *Japan.*

(৬) "ভিনিসের রাস্তা ও জলপথ যখন জীবনের স্রোতে পূর্ণ হইত, রিয়ালটো যখন বাণিজ্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত, তখন ভিনিস শহরকে কিরূপ দেখাইত, বর্তমানে তাহা কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু ফ্রেট ফেবার, পিয়েট্রো, কাসোলা এবং সর্বোপরি—ফ্রান্সিসকো পেট্রার্কের বর্ণনা হইতে আমরা সেই ঐশ্বর্য ও গৌরবের কিছু পরিচয় পাই। পেট্রার্ক সোচ্ছ্বাসে

বাটেভিয়া সাধারণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। বাটেভিয়া ক্ষুদ্র দেশ, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহার এক অংশে বাঁধ নির্মিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র ঐশ্বর্যে ও জনবলে বড় বড় সাম্রাজ্যকেও তুচ্ছ করিয়াছে। ইহার কারণ, তাহার প্রধান শক্তি ছিল নৌ-বল এবং বাণিজ্য। আন্টোয়ার্প, ওসটেণ্ড, লীজ, ব্রাসেল্‌স প্রভৃতি ঐশ্বর্যশালী শহর ছিল এবং ঐ সকল স্থানের অধিবাসীরা একদিকে যেমন ধনী অন্যদিকে তেমনই বীর ও দেশহিতৈষী ছিলেন। আবার হল্যাণ্ডই সর্বপ্রথম লুথারের সংস্কারবাদ গ্রহণ করিয়াছিল।

প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে লণ্ডনের ধনী বণিকেরাই পার্লামেন্টারী সৈন্যের প্রধান সমর্থক ছিল। তাহারাই যুদ্ধের উপকরণ যোগাইত এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পিউরিটান মতাবলম্বী ছিল। পক্ষান্তরে রাজতন্ত্রীদের প্রধান সহায় ছিল, অভিজাত-শ্রেণী এবং গ্রাম্য জমিদারগণ। ক্রমওয়েল জনবল ও ধনবলের সাহায্য সর্বদাই লাভ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই তিনি লণ্ডন শহরের উপর কমনওয়েলথের পতাকা উড্ডীন করিতে পারিয়াছিলেন। লণ্ডন শহর এবং ব্রিস্টল তাঁহাকে এই জনবল ও ধনবল যোগাইত।(৭) সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন দেশে, শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে উন্নত মতবাদ এবং রাজনৈতিক চেতনা, সমুদ্রযাত্রা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত! যেসব দেশ কেবলমাত্র কৃষিবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াছে, সেখানেই স্বেচ্ছা-শাসনতন্ত্র এবং বিদেশী শাসনের প্রাধান্য দেখা গিয়াছে। তাহার অধিবাসীরা সাধারণতঃ প্রাচীন প্রথা ও কুসংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং তাহাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ ও অনুদার হইয়া পড়ে। বাক্‌ল তাঁহার—"সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে এই কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেনঃ—

"আমরা যদি কৃষক ও শিল্পব্যবসায়ীদের তুলনা করি, তবে সেই একই নীতির ক্রিয়া দেখিতে পাইব। কৃষকদের পক্ষে আবহাওয়ার অবস্থা একটি প্রধান সমস্যা। যদি আবহাওয়া প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় তবে তাহাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞান এখনও বৃষ্টির প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মানুষ পূর্ব

বলিয়াছেন—'নদীর উপরে আমার গৃহের বাতায়ন হইতে আমি জাহাজগুলিকে দেখিতে পাই, আমার গৃহের চূড়া হইতে জাহাজের মাস্তুলগুলি উচ্চ। তাহারা জগতের সর্বত্র যায় এবং সর্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হয়। তাহারা ইংলণ্ডে মদ্য লইয়া যায়, সিথিয়ানদের দেশে মধু বহন করে, আসিরিয়া, আর্মেনিয়া, পারস্য ও আরবে জাফ্রান, তৈল, বস্ত্র চালান দেয়; গ্রীস ও মিশরে কাষ্ঠ বহন করে। তাহারা আবার ইয়োরোপের সর্বত্র বহন করিবার জন্য নানা দ্রব্য বোঝাই করিয়া আনে। যেখানে সমুদ্র শেষ হইয়াছে, সেখানে নাবিকেরা জাহাজ ছাড়িয়া স্থলপথে গিয়া ভারত ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করে। তাহারা ককেসাস্ পর্বত এবং গঙ্গা নদী অতিক্রম করিয়া পূর্ব সমুদ্রে গিয়া উপনীত হয়।'—The Venetian Republic.

(৭) "প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া লণ্ডন শহর রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ধর্মসংস্কারের প্রধান সমর্থক ছিল।" মেকলে—ইংলণ্ডের ইতিহাস।

"শহরের ব্যবসায়ীদের মধ্যেই পিউরিটানদের প্রাধান্য খুব বেশী ছিল।"—ঐ

"লণ্ডনের ধনী বণিকদের অধিকাংশই ছিল পিউরিটান।" কার্লাইল—"ক্রমওয়েল"।

"লণ্ডন শহরই এই সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমর্থক ও অর্থসাহায্যকারী ছিল।"—ঐ

হইতে এ সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না। সুতরাং লোকে মনে করিতে বাধ্য হয় যে, অতিপ্রাকৃত শক্তি বলেই ইহা ঘটে। আমাদের গির্জাসমূহে সেই কারণেই বর্ষার জন্য বা পরিষ্কার আবহাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়। ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা আমাদের এই কার্য নিশ্চয়ই ছেলেমানুষি মনে করিবে,—আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেরূপ ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রমের সহিত ধূমকেতুর আবির্ভাব বা গ্রহণ দেখিত, তাহা আমরা যেমন ছেলেমানুষি বলিয়া মনে করি।......গ্রামবাসীরা যে শহরবাসীদের চেয়ে অধিকতর কুসংস্কারগ্রস্ত হয়, ইহা তাহার একটি প্রধান কারণ। শহরে যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকর্ম করে, তাহাদের সাফল্য নিজেদের শক্তি ও যোগ্যতার উপরেই নির্ভর করে, যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত ঘটনা কৃষকদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, শহর-বাসীদের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।"

বর্তমান চীনেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর চীন কৃষিপ্রধান, এখানে চিরাচরিত প্রথা ও সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য, এবং এই অঞ্চল জাতীয় আন্দোলনের প্রধান বাধাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ চীনই প্রথম সান-ইয়াৎ সেনের আদর্শ ও মতবাদ গ্রহণ করে এবং এখানেই জাতীয়তাবোধ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কারণ, ক্যান্টনবাসীরা (দক্ষিণ চীনারা) ব্যবসা-বাণিজ্যে চিরদিনই অগ্রণী, তাহারা উন্নতিশীল জাতিদের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং ফলে তাহাদের দৃষ্টি উদার হইয়াছে। (৮)

বাংলাদেশ তথা হিন্দু ভারত নির্বোধের মত জাতিভেদ প্রথাকে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সমুদ্রযাত্রাকে নিষিদ্ধ করিয়াছিল। ইহার ফলে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে কূপমণ্ডূক হইয়া উঠিল।—হিন্দু সমাজের বাহিরের লোকদের সে 'ম্লেচ্ছ' আখ্যা দিল। সে নিজে ইচ্ছা করিয়া অন্ধ হইল এবং ধ্বংসের অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে লাগিল, আর তাহার দেশ, বিদেশী আততায়ীদের মৃগয়াক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। কবির ভাষায় সত্যই—

"নিয়তির কঠোর বিধানে তাহার পূর্ব গৌরবের উচ্চ শিখর হইতে সে পতিত ধূল্যবলুণ্ঠিত।"

(৩) জাতি সংমিশ্রণের সম্ভাবনা না থাকাতে, কলিকাতার ঐশ্বর্যশালী অবাঙালীরা স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতেছে—বাংলাদেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই

লম্বার্ডরা যখন ইংলণ্ডে যাইয়া বাস করে, তখন তাহারা তাহাদের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল; লণ্ডন শহরের লম্বার্ড স্ট্রীট এখনও তাহাদের

---

(৮) প্রণালী উপনিবেশ, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিস এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে চীনারা সংখ্যাবহুল এবং শক্তিশালী। প্রধানতঃ তাহাদেরই প্রদত্ত অর্থে চীনের জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছে, সম্পদের দিনে ও বিপদের দিনে সমানভাবে তাহারা সাহায্য করিয়াছে। মালয়েসিয়ার চীনা ব্যবসায়ী

ঐশ্বর্য ও প্রভাবের স্মৃতি বহন করিতেছে।(৯) আল্‌ভার অত্যাচারের ফলে ফ্লেমিশরা ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিয়াছিল। ইহারাই পশম ব্যবসায়ে উন্নত প্রণালীর প্রবর্তন করে। হিউগেনটস্‌রাও ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য গঠনে এইরূপ সহায়তা করিয়াছে। ফ্রান্স যখন ধর্মান্ধতার বশবর্তী হইয়া "এডিক্ট অব ন্যাব ন্যান্টিস্‌" প্রত্যাহার করে, তখন তাহার প্রায় ৪০ হাজার হিউগেনট অধিবাসী নিকটবর্তী প্রোটেস্টান্ট দেশসমূহে গিয়া আশ্রয় নেয়। ঐ সব দেশে তাহারা তাহাদের বীরত্ব, সাহস ও কর্মকুশলতার অবদান বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহারা দুই এক পুরুষের মধ্যেই ঐ সব দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। জন হেনরী ও কার্ডিন্যাল নিউম্যান এই দুই কৃতী ভ্রাতা, ডাচ্‌ বংশজাত, সম্ভবতঃ হিব্রু রক্তও এই বংশে ছিল। তাঁহাদের মাতা হিউগেনট বংশীয়।

হারবার্ট স্পেন্সার বলিতেন, তাঁহার মাতা ছিলেন হিউগেনট বংশীয় এবং সেই জন্যই প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে তাঁহার একটা বিদ্রোহের ভাব ছিল।

প্রসিদ্ধ জার্মান বৈজ্ঞানিক হেল্‌মহোল্‌জের মাতা উইলিয়াম পেনের বংশীয় ছিলেন। হেল্‌মহোল্‌জের দেহে জার্মান, ইংরাজ এবং ফরাসী রক্ত মিশ্রিত হইয়াছিল। উইলিয়াম অরেঞ্জের সহকর্মী ও বন্ধু বেন্টিঙ্ক বাটেভিয়ান বংশোদ্ভূত এবং তিনি নিজে ইংলণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ অভিজাতবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ফরাসী ঔপন্যাসিক আলেকজান্দার ডুমার দেহে নিগ্রো-রক্ত ছিল। লাডউইগ মণ্ডের জন্ম ও শিক্ষা জার্মানীতে, তিনি ইংলণ্ডে গিয়া ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেন এবং সেখানেই বসবাস করেন। তাঁহার অংশীদার জন ব্রুনারের সহযোগিতায় তিনি সেখানে একটি সুবৃহৎ অ্যাল-কালির কারখানা স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার শিক্ষা-স্থান জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন অর্থ দান করেন, ইংলণ্ডের ডেভি ফ্যারাডে গবেষণার জন্যও তেমনি প্রভূত অর্থ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আলফ্রেড মন্ড একজন বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং দেশপ্রেমিক ইংরাজ। দেশভক্ত চীনা রাজনীতিক ইউজেন চেন

সম্প্রদায় কান্টনের অধিবাসীদের বংশধর। তাহারা চীনাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক জাতীয়তা-বাদী।"—Upton Close: *The Revolt of Asia.*

পুনশ্চ—"দক্ষিণ চীন ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়া প্রথমে বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিয়াছিল।... দক্ষিণ চীনই বণিক, নাবিক ও লস্করের জন্ম দিয়াছিল এবং তাহারা বহু বিচিত্র দেশ ও তাহার অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল।

"এই দক্ষিণ চীন হইতে প্রথম ছাত্রের দল আসিয়াছিল যাহারা প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারের বাহিরে বিদেশে 'বর্বরদের' নিকট শিক্ষা লাভ করিতে গিয়াছিল। পাশ্চাত্যের নাবিক, বণিক ও মিশনারীদের শিল্প ও বিজ্ঞানের সঙ্গে এই দক্ষিণ চীনের লোকেরা বহুকাল হইতেই পরিচিত ছিল। সুতরাং তাহাদের নিজেদের সঙ্গে বিদেশীদের পার্থক্য কোথায় তাহা জানিবার জন্য তাহারা কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল।"—Monroe: *China—A Nation in Evolution.*

(৯) ১৩শ হইতে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিম দেশ হইতে যে সব ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ী আসিয়াছিল, তাহাদের সাধারণ নাম দেওয়া হইত 'লম্বার্ড,' যদিও তাহারা সকলেই লম্বার্ড প্রদেশের লোক ছিল না।

বলেন যে, তাঁহার দেহে চীনা, ব্রিটিশ এবং আফ্রিকান রক্ত আছে। অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই।

যে সমস্ত বিদেশী ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, ইংলণ্ডের দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত। তাহার এই উদার নীতির জন্য সে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ইংলণ্ড বহু ইহুদীকে তাহার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। এই মিশ্রণের ফলে ইংরাজজাতির অশেষ উন্নতি হইয়াছে। বেঞ্জামিন ডিজ্‌রেলি (লর্ড বিকনসফিল্ড), জর্জ জোয়াকিম গশেন, এডুইন মণ্টেগু, স্যামুয়েল হারবার্ট এবং রুফাস আইজ্যাকস্ (লর্ড রেডিং), ইংরাজজাতির সঙ্গে একাত্মভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন এবং রাজনীতিক রূপে ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা অবহিত ছিলেন। ইংলণ্ডে অনিষ্টকর জাতিভেদ-প্রথা না থাকার জন্য, ইঁহারা দুই এক পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদানের ফলে ইংরাজ জাতিভুক্তই হইয়াছিলেন।(১০) পক্ষান্তরে বাংলাদেশে, ঐশ্বর্যশালী অবাঙালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে বাস করে, বাঙালীজাতির সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ধনী মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরা (ভাটিয়া) ধর্মে হিন্দু, তাহারা গঙ্গাস্নান করে এবং কালীমন্দিরে পূজা দেয়, গো-মাতাকেও পবিত্র মনে করে, কিন্তু তবু বাঙালীদের সঙ্গে তাহাদের ব্যবধান বিস্তর, উভয়ের মধ্যে যেন দুর্ভেদ্য চীনা প্রাচীর বর্তমান।

আমার বক্তব্য এই যে, জাতিভেদ বাঙালীর বর্তমান দুর্ভাগ্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী। যদি বাঙালী ও মাড়োয়ারীর মধ্যে বিবাহপ্রথা থাকিত তবে উভয়ের মিশ্রণের ফলে এমন একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক হইত, যাহাদের মধ্যে উভয়জাতির গুণই বর্তমান থাকিত। একজন বিড়লা যদি কোন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিত,

---

(১০) "নর্মান কর্তৃক ইংলণ্ড বিজয়ের পর প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত অ্যাংলো-নর্মান ও অ্যাংলো-স্যাক্সনদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ ছিল না। এক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল উদ্ধত গর্ব, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল নীরব অবজ্ঞা। একই দেশে বাস করিলেও তাহারা ছিল দুই ভিন্ন জাতি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা জন এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণের রাজত্বকাল পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এই সময় হইতে প্রাচীন বিবাদের ভাব দূর হইতে থাকে। স্যাক্সনেরা নর্মানদের বিরুদ্ধে আর গৃহবিবাদে যোগ দিত না, নর্মানেরাও স্যাক্সনদের ভাষাকে ঘৃণা করিত না, কিংবা ইংরাজ নামে অভিহিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত না। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের বিদেশী মনে করিত না। তাহারা মনে করিত, তাহারা একই জাতি; তাহারা সমবেত চেষ্টায় সমগ্র জাতির স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণসাধন করিতে শিখিয়াছিল।"—Creasy : *The Fifteen Decisive Battles of the World.*

পুনশ্চ—"যাহারা উইলিয়ামের পতাকাতলে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং অন্য পক্ষে যাহারা হ্যারল্ডের পতাকাতলে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের পৌত্রেরা পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইতে শিখিতেছিল। এই বন্ধুত্বের প্রথম নিদর্শন গ্রেট চার্টার (ম্যাগনা চার্টা), ইহা তাহাদের সমবেত চেষ্টায় লব্ধ এবং তাহাদের সকলের হিতই ইহার মূল লক্ষ্য।"—মেকলে, ইংলণ্ডের ইতিহাস।

"চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইংলণ্ডের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন মিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছিল। এইরূপে টিউটনিক বংশের তিনটি শাখার সঙ্গে আদিম ব্রিটনের মিশ্রণে যে জাতির উদ্ভব হইল, পৃথিবীর কোন জাতির চেয়েই তাহারা নিকৃষ্ট নহে।"—মেকলে, ইংলণ্ডের ইতিহাস।

তাহা হইলে তাহাদের সন্তানেরা একের ব্যবসা-বুদ্ধি এবং অন্যের তীক্ষ্ম মস্তিষ্ক লাভ করিত। গোয়েঙ্কার কন্যার সঙ্গে বসুর ছেলের বিবাহ হইলে তাহাদের সন্তানের মধ্যে উভয় জাতির গুণই থাকিত। প্রসিদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্রবিদ স্যার হেনরী মেইন বলিয়াছেন যে, মানবজাতির সামাজিক প্রথাসমূহের মধ্যে জাতিভেদের মত এমন অনিষ্টকর কু-প্রথা আর নাই। তাঁহার এই কথা একটুও অতিরঞ্জিত নহে। বিবাহের কথা দূরে থাকুক, পরস্পরের মধ্যে আহার-ব্যবহারও নাই। এমনকি মাড়োয়ারীদের মধ্যেও কয়েকটি শাখা-জাতি আছে, যথা—আগরওয়ালা, অসোয়াল, মহেশ্বরী প্রভৃতি—ইহাদের পরস্পরের মধ্যেও বিবাহ হয় না। ফলে এই হইয়াছে যে, বাঙালী ও মাড়োয়ারী পরস্পরের মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান। সাধারণ বাঙালীরা ল্যাপল্যাণ্ড-বাসীদের সামাজিক প্রথা আচারব্যবহার সম্বন্ধে যেমন কিছুই জানে না, মাড়োয়ারী-দের সম্বন্ধেও তেমনি কিছুই জানে না। মাড়োয়ারীদেরও বাঙালীদের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই। ঐশ্বর্যশালী জৈন সম্প্রদায় সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য (মাড়োয়ারীদের মধ্যেও কেহ কেহ জৈন ধর্মাবলম্বী)। মাড়োয়ারী, জৈন এবং হিন্দুস্থানী ক্ষেত্রীরা বহু পুরুষ হইল বাংলা দেশে বসবাস করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ব্যবসা-বুদ্ধি বিশেষরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাঙালীর দুর্ভাগ্যক্রমে সে ইহাদের স্বজাতীয় বলিয়া গণ্য করিতে পারে নাই। মাড়োয়ারী প্রভৃতিদের মধ্যে ব্যবসা-বুদ্ধি বংশানুক্রমিক, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি নাই। সেইজন্য তাহারা কেবল সঙ্কীর্ণচেতা নহে,—ঘোর কুসংস্কারেরও বশবর্তী। তাহারা কোন ভাল কাজে হয়তো টাকা দিতে আপত্তি করিবে, কিন্তু একজন বাবাজী বা গেরুয়া-ধারীর পাল্লায় পড়িয়া পূজা-হোমের জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিবে; তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া জুয়াখেলায় হাজার হাজার টাকা নষ্ট করিবে। এইভাবে কত অর্থের অপব্যয় হয়, আমি তাহার কিছু খবর রাখি। সাধারণ বাঙালী সাহা বা তিলিরাও—এবিষয়ে মাড়োয়ারী, জৈন প্রভৃতিরই মত। তাহারা অনেক সময় মাড়োয়ারীদের উপরেও টেক্কা দেয়।

আমার একজন ভূতপূর্ব ছাত্র 'স্যার তারকনাথ পালিত রিসার্চ স্কলার' ছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলন এবং চিরকৌমার্যের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পূর্ববঙ্গে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং অবনত শ্রেণীদের শিক্ষা ও উন্নতি সাধনের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে বহু ধনী সাহা ব্যবসায়ী আছেন। একদিন তিনি তাঁহাদের এক জনের নিকট গেলেন এবং বিদ্যালয়ের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু উক্ত ব্যবসায়ী তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। এমন সময়ে একজন দাড়িওয়ালা বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যবসায়ীটি বাবাজীর পদতলে পড়িয়া মিনতি করিয়া বলিলেন,—"প্রভু, আমি আপনার ও আপনার চেলাদের কি সেবা করিতে পারি?" সাধু চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উত্তেজিতভাবে প্রথমেই এক সের গাঁজা (মূল্য প্রায় ৮০, টাকা) দাবি করিলেন। গাঁজা দেওয়া হইলে সাধু কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। তারপর আটা, ঘি, প্রভৃতি বহুবিধ খাদ্যদ্রব্যের তালিকা হইল। এই সব খাদ্যে সাধু

ও তাঁহার নিষ্কর্মা চেলাদের উদর পূজা হইবে। এক কথায় ব্যবসায়ীটি কোন দ্বিধা না করিয়া সাধু ও তাঁহার চেলাদের জন্য তখনই পাঁচ শত টাকা খরচ করিয়া ফেলিলেন, কেননা তাঁহার মতে উহা পুণ্যকার্য। কিন্তু তিনিই আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাঁচটি টাকা দিতে অসম্মত হইলেন, যদিও ঐ বিদ্যালয়ের দ্বারা তাঁহার স্বজাতীয় ছেলেরাই অধিকতর উপকৃত হইবে।(১১)

আমি আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার নূতন গৃহের জন্য অতিকষ্টে সাধারণের চাঁদা হইতে আট হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। আর তাহারই দুই এক মাইলের মধ্যে একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী জয়পুর হইতে আনীত শ্বেত 'মাক্রানা' প্রস্তরের একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন! এই বহুমূল্য প্রস্তর দিয়াই কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মিত হইয়াছে। (১২) ঐ মন্দিরে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার উপর মন্দির-সংলগ্ন একটি ধর্মশালার জন্যও তিনি অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। আর একজন ধনী মাড়োয়ারী, হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থ পুষ্করক্ষেত্রে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন!

এইসব মন্দির ও ধর্মশালায় সেকেলে গোঁড়া পুরোহিত এবং গাঁজাখোর সাধু-দেরই আড্ডা। সুতরাং এই সব দান হইতে সমাজের খুব কমই উপকার হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কেবল মাড়োয়ারীদের দায়ী করিয়া কি হইবে? কচ্ছী মেমন এবং নাখোদা মুসলমানেরা কলিকাতার ধনী ব্যবসায়ী, কিন্তু তাহাদের কোন শিক্ষা ও সংস্কৃতি নাই এবং তাহাদের দৃষ্টি মাড়োয়ারীদের মতই সংকীর্ণ, তাহারা মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার করিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবে, কিন্তু বিদ্যালয় বা হাসপাতাল নির্মাণের জন্য এক পয়সাও দিবে না। হালের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছিঃ—

"কচ্ছী মেমন বা নাখোদা মুসলমানদের বদান্যতায় জাকেরিয়া স্ট্রীটে—বাংলার মধ্যে বৃহত্তম মসজিদ নির্মিত হইতেছে। ইহার জন্য ব্যয় পড়িবে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। ভারতে এরূপ মসজিদ আর নাই। ইমারতটি চারতলা হইবে এবং স্থাপত্য শিল্প ও সৌন্দর্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন হইবে। প্রধান গম্বুজের উচ্চতা হইবে ১১৬

---

(১১) এই অংশের প্রুফ দেখিবার সময়, আমি জানিতে পারিলাম যে, একজন তিলি ব্যবসায়ী মহাসমারোহে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। তিনি একখানি বিমান যান ভাড়া করিয়া কন্যার বাড়ীতে উপহারদ্রব্য পাঠাইয়াছেন, দুইখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীযুক্ত স্পেশ্যাল ট্রেনে বরযাত্রীদিগকে লইয়া গিয়াছেন। এইরূপে বাহ্য আড়ম্বরের জন্য তিনি হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু এই ব্যক্তিই হয়তো তাঁহার স্বজাতীয় বালিকাদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অল্প কয়েক শত টাকাও দিতে চাহিবেন না। খুব সম্ভব যে অর্থ এখন তিনি অপব্যয় করিতেছেন, তাহা তাঁহার পিতা মাথায় পণ্যের বোঝা বহিয়া অতিকষ্টে উপার্জন করিয়াছিল। সে তাহার জীবিতকালে মোটরগাড়ীতেও চড়ে নাই, আর তাহার ছেলে—ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে বিমানযান ভাড়া করিয়া উপহারদ্রব্য পাঠাইতেছে!

(১২) মধ্যপ্রদেশে বাংলার চেয়েও মাড়োয়ারীদের বেশী প্রাধান্য। রায়পুর, বিলাশপুর, ছাত্রিশ-গড় প্রভৃতি স্থান মাড়োয়ারীদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

ফুট, দুইটি প্রধান মিনার ১৫১ ফুট করিয়া উচ্চ হইবে এবং তাহার নীচে ২৫টি ছোট ছোট মিনার থাকিবে। এম. এস. কুমার মসজিদটির নকশা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাঁহারই তদারকিতে উহা নির্মিত হইতেছে।"—The Illustrated Weekly Hindu (27th July, 1930).

এবিষয়ে মাদ্রাজ সৌভাগ্যশালী, চেটিদের মধ্যে অনেকেই ধনী মহাজন ও ব্যাঙ্কার, তাহারা মাদ্রাজ প্রদেশেরই লোক। তাহারা যে অর্থ উপার্জন করে, তাহা মাদ্রাজেই থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের দৃষ্টান্ত সঙ্কীর্ণ ও অনুদার। একজন অন্নমালী চেটিয়ার (বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিলেও হয়। এই সব চেটিয়া মন্দির-সংস্কার এবং বিগ্রহের অলঙ্কারে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। (১৩)

গঙ্গাসাগর স্নানের সময় (মকর সংক্রান্তিতে সহস্র সহস্র যাত্রী পুণ্য লাভার্থে যায় এবং ধনী মাড়োয়ারীরা বাবাজী ও ভিক্ষুকদের যাতায়াতের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে। তাহারা মনে করে উহাতে তাহাদের পুণ্য হইবে। আজিমগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) ও অন্যান্য স্থানে বহু ধনী জৈন আছেন; তাঁহারা ঐ সব স্থানে প্রায় তিন শত বৎসর হইল বাস করিতেছেন। তাঁহারা আবু পর্বত এবং পলিতানায় (গুজরাট) প্রতি বৎসর তীর্থ দর্শনে যান। তাঁহারা এই উপলক্ষে এক এক জন ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিয়া থাকেন। মধ্যযুগে ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টানদের মনে জেরুজেলাম তীর্থে ক্রুসেড সম্বন্ধে যেরূপ মনোভাব ছিল, এই জৈনদের মনোভাবও অনেকটা সেইরূপ। যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম, তাহা ব্যতিক্রম নহে, সাধারণ নিয়ম এবং উহা হইতেই ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইয়াছে বুঝা যাইতে পারে।

শুধু মাড়োয়ারী বা জৈনদের দোষ দিলেই বা কি হইবে, যাঁহারা চিন্তানায়ক হইবার দাবি করেন, এখন সব কলেজে শিক্ষিত বাঙালীরাও, পৌরোহিত্যের কুসংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন এবং নানা অসম্ভব গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা পোষণ করেন। তাঁহারাও সাধারণ লোকদের মতই সাধুদের মোহে প্রলুব্ধ ও প্রতারিত হন। মুন্সীগঞ্জের সত্যাগ্রহই তাহার দৃষ্টান্ত। সেখানকার উকিলেরা (কেহ কেহ তন্মধ্যে এম. এ. বি. এল.) নিম্নজাতীয়দিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না। (১৪)

---

(১৩) "এসব ব্যাপারে কিরূপ প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত আমি দিতেছি। ৯ বৎসর পূর্বে আমি যখন পুনর্বার রামনাদে যাই, তখন দেখি সেখানে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মন্দিরের সংস্কার হইতেছে।"—J. B. Pennington : *India*, Jan. 13, 1919.

(১৪) 'সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক স্পেনের অধঃপতন সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী ভাষায় নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

"যে জাতি সতৃষ্ণ নয়নে কেবল অতীতের দিকে চাহিয়া থাকে, সে কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। উন্নতি যে সম্ভবপর, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করে না। তাহাদের নিকট প্রাচীনতাই জ্ঞানের প্রতীক এবং প্রত্যেক উন্নতিচেষ্টাই বিপজ্জনক। স্পেন ঠিক এই অবস্থায় আছে। এই কারণে স্পানিয়ার্ডদের মধ্যে এমন অচলতা ও জড়তা, তাহাদের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য নাই, আশা-উৎসাহ নাই। এই কর্মবহুল যুগে তাহারা সভ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়, এই বিশ্বাসে তাহারা কিছুই করিতে চায় না। তাহারা বিশ্বাস করে যে,

অ্যানড্রু কার্নেগী কেবল তাঁহার নিজের জন্মভূমিতে নয়, তাঁহার বাসভূমিতেও 'শ্রমিক প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তিনি আমেরিকাতে 'গবেষণা মন্দির' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং স্কটল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও বহু অর্থ দান করিয়াছেন। রকফেলারও ঐ উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। চীনাদের উন্নতির জন্য এবং গ্রীষ্মদেশীয় রোগসমূহ (tropical diseases) নিবারণের জন্যও তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। যদি সাপ্তাহিক 'লণ্ডন টাইমসের' কোন একটি সংখ্যা পড়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, বহু ধনী নিজেদের উইলে লোকহিতের জন্য দান করিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে 'অপাত্রে দান' খুব কমই আছে। বৎসরের পর বৎসর এইরূপ বহু দানে বিদ্যালয় ও হাসপাতালসমূহ পুষ্ট হইতেছে অথবা নূতন বিশ্ববিদ্যালয়, বা যক্ষ্মা, ক্যান্সার, গ্রীষ্মদেশীয় রোগসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থ জমা হইতেছে।(১৫)

'বার্নাডোস হোমস,' যক্ষ্মানিবাস, শহরের জনবহুল অঞ্চলে নূতন পার্ক, কৃষির উন্নতি, গোজাতির উন্নতি—এইসব কাজে পাশ্চাত্যের দাতারা প্রতিনিয়তই অর্থ দান

প্রাচীনকাল হইতে যে জ্ঞান তাহারা পরম্পরাক্রমে লাভ করিয়াছে, বর্তমান যুগে তার চেয়ে বেশী জ্ঞান লাভ করা যায় না। এই কারণে তাহারা তাহাদের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার রক্ষা করিবার জন্যই ব্যস্ত, নূতন কোন পরিবর্তনের কল্পনা তাহারা সহ্য করিতে পারে না, যদি তাহার ফলে প্রাচীন জ্ঞানের মূল্য কমিয়া যায়।...এদিকে মানুষের জ্ঞান জগতে যুগান্তর সৃষ্টি হইতেছে, মনুষ্য প্রতিভা অভূতপূর্ব উন্নতি করিতেছে। স্পেন নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতেছে, বহির্জগতের কোন আঘাতে সে সাড়া দেয় না, নিজেও বহির্জগতে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে না। ইয়োরোপীয় মহাদেশের এক কোণে মধ্যযুগের ভাবপ্রবাহ ও সঞ্চিত জ্ঞানের ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ এই বিশাল দেশ নিশ্চেষ্টবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। এবং সকলের চেয়ে দুর্লক্ষণ স্পেন তাহার এই শোচনীয় অবস্থাতেই সুখী। যদিও ইয়োরোপের মধ্যে সে সর্বাপেক্ষা অনুন্নত দেশ, তবু সে নিজেকে সর্বাপেক্ষা উন্নত মনে করে। যেসব জিনিসের জন্য তাহার লজ্জিত হওয়া উচিত, সেই সব জিনিসের জন্যই সে গর্বিত।"

এই সব মন্তব্য ভারতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর প্রযোজ্য। স্পেনে অন্ততঃপক্ষে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা নাই অথবা স্পানিয়ার্ড এবং ইংরাজ, ফরাসী বা অন্য কোন জাতীয় লোকের সঙ্গে বিবাহের বাধাও নাই।

(১৫) প্রসিদ্ধ কৃত্রিম রেশমব্যবসায়ী মিঃ স্যামুয়েল কোর্টল্ড মিড্লসেক্স হাসপাতালে একটি নূতন ইনস্টিটিউটের জন্য পূর্বে ৪০ হাজার পাউণ্ড দিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি ঐ উদ্দেশ্যে আরও ২০ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

স্যার উইলিয়াম মরিস মোটরগাড়ী-নির্মাতা। তিনি সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, এ বৎসর তাঁহার ফার্ম হইতে তিনি যে ২০ লক্ষ পাউণ্ড লভ্যাংশ পাইবেন, তাহার সমস্তই লোকহিতের জন্য ব্যয় করিবেন।

লেডী হাউস্টন লণ্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালে বিনা শর্তে এক লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

সম্প্রতি একটি তারের খবরে (নভেম্বর, ১৯৩১) প্রকাশ পাইয়াছে,—স্যার টমাস লিপটনের সম্পত্তির ট্রাস্টিগণ সম্পত্তির সমস্ত আয়ই গ্লাসগো, লণ্ডন এবং মিড্লসেক্সের নিকটবর্তী হাসপাতাল ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহে দান করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই সম্পত্তির মূল্য দশ লক্ষ পাউণ্ডের বেশি হইবে।

করিতেছেন। আর আমাদের দেশে ধনী ব্যবসায়ীদের শিক্ষা-দীক্ষা নাই, তাহাদের দৃষ্টি অনুদার, সংকীর্ণ, তাহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যেসব মন্দির নির্মাণ বা সংস্কার করে, সেগুলি কেবল চরিত্রহীন পুরোহিত এবং গাঁজাখোর বাবাজী ও সাধুদের আড্ডা।

ভারতের মধ্যে কেবল একটি সম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। পক্ষান্তরে শিক্ষা-সংস্কৃতিতেও তাঁহারা উন্নত, তাঁহাদের মধ্যে বহু দাতা ও দেশ-হিতৈষীর উদ্ভব হইয়াছে। আমি বোম্বাইয়ের পার্শীদের কথা বলিতেছি। তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প—মোট এক লক্ষের বেশি নহে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে উদার দৃষ্টি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বদান্যতার অভাব নাই। ইংরাজ ও আমেরিকান লোক-হিতৈষী দাতাদের সঙ্গে তাঁহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। জে. এন. টাটা, কামা, জিজিভাই, ওয়াদিয়া প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরিবার ব্যতীতও, এমন বহু পার্শী ধনী পরিবার আছেন, যাঁহারা দানশীলতার জন্য বিখ্যাত।(১৬)

গুজরাটীরা কর্মশক্তি ও লোকহিতৈষণায় পার্শীদের চেয়ে পশ্চাৎপদ নহে। বিঠলদাস ঠাকুরসী অথবা গোকুলদাস তেজপাল ব্যতিক্রম নহেন। পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের মত লোক স্ব-সম্প্রদায়ের অলঙ্কারস্বরূপ। তিনি যে কেবল বিচক্ষণ ব্যবসায়ী তাহা নহে, আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রেও তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য। মাড়োয়ারীদের সঙ্গে তুলনায় গুজরাটীরা অধিকতর উদার দৃষ্টিসম্পন্ন এবং দেশানুরাগী। লোকহিতের জন্য নিজের স্বার্থবুদ্ধি কিরূপে সংযত করিতে হয়, মাড়োয়ারীদের সে বিষয়ে এখনও অনেক শিখিবার আছে। সে কেবল স্বার্থের প্রেরণায় অর্থোপার্জন করে। গুজরাটে একটি প্রচলিত কথা আছে—"তমে মাড়োয়ারী থেই গেয়া"—(তুমি মাড়োয়ারী হইয়াছ)। ইহা তিরস্কার বাক্য রূপে ব্যবহৃত হয়।

বাংলার আর একটি দুর্ভাগ্যের কথা বলিব। যে সমস্ত মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া এদেশে কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছে, তাহারাও বাংলাকে নিজেদের দেশ বলিয়া মনে করে না। তাহারা বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য দখল করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু এই ঐশ্বর্য হইতে, তাহাদের বাসভূমি বাংলার কোন উপকার হয় না। কলিকাতার অধিকাংশ ধনী ব্যবসায়ী বিকানীরের লোক এবং তাহারা বিকানীরেই নিজেদের ঐশ্বর্য লইয়া যায়। ব্রিটিশেরা যতদিন বাংলায় থাকে, ততদিন খানসামা, বাবুর্চি, আয়া প্রভৃতির বেতন বাবত এবং মুরগী, ডিম, মাছ প্রভৃতি কিনিয়া কিছু টাকা বাংলায় দেয় কিন্তু মাড়োয়ারী এ দিক দিয়াও বাংলাকে এক পয়সা দেয় না। সে তাহার নিজের খাদ্যদ্রব্য আটা, ডাল, ঘি প্রভৃতি নিজের দেশ হইতে লইয়া আসে। তাহার ভৃত্যেরাও হিন্দুস্থানী এবং নিরামিষভোজী বলিয়া তাহারা মুরগী, ডিম, মাছ প্রভৃতিও কিনে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাতাদের দানের পরিমাণ প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা, কিন্তু কোন মাড়োয়ারী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য

(১৬) পরলোকগত স্যার ডোরাব টাটার উইল অনুসারে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লোকহিতকর কার্যে দান করা হইয়াছে। এই সম্পত্তির মূল্য ২।৩ কোটি টাকা।

কিছু দান করে নাই। নাগপুরের যে ধনী ব্যবসায়ীর কথা পূর্বে বলিয়াছি, মাড়োয়ারী ধনীদের মনোবৃত্তি অনেকটা সেইরূপ।(১৭)

মাড়োয়ারীরা বাংলাদেশের অথবা মধ্য প্রদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য উদার-ভাবে দান করিতে কুণ্ঠিত। যে দেশে সে ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে, সে দেশ তাহার নিকট হইতে কোন উপকার পায় না। কিন্তু আর একজন শিক্ষিত ও ধনী হিন্দুর নাম আমি উল্লেখ করিব। যে দেশে তিনি অর্থোপার্জন করিয়াছেন, সেই দেশের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার ঋণ স্মরণ করিয়া, তিনি উহার প্রতিদানে প্রায় সমস্ত সম্পত্তি দিয়াছেন। ইনি রাও বাহাদুর লক্ষ্মীনারায়ণ, কাম্‌তীর ব্যবসায়ী। সম্প্রতি (নভেম্বর, ১৯৩০) নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য তিনি ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতার ধনী মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের নিকট আমি ক্ষমা লাভের প্রত্যাশী। মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মাড়োয়ারী বলিয়াই আমার কোন অভিযোগ নাই। তাহারা মোটেই কৃপণ নহে; যখনই কোন স্থানে বন্যা বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখনই তাহারা মুক্তহস্তে দান করে। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব এবং সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির জন্য তাহার দান অনেক সময়ই অপাত্রে ন্যস্ত হয়। সুখের বিষয়, ইহার ব্যতিক্রম আছে। ঘনশ্যাম দাস বিড়লার মত লোক যে কোন সম্প্রদায়ের গৌরবস্বরূপ। ভারতের আর একজন মহৎ সন্তান, যিনি দেশপ্রেম, অতুলনীয় ত্যাগ ও অশেষ বদা-ন্যতায় দেশবাসীর চিত্তে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়াছেন সেই শেঠ যমুনালাল বাজাজও এই মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের লোক। আশার কথা, মাড়োয়ারীদের মধ্যে, বিশেষভাবে আগরওয়ালা শাখার মধ্যে, ধীরে ধীরে নব জাগরণ হইতেছে। (১৮)

---

(১৭) বিশ্ববিদ্যালয়ে মাড়োয়ারীদের দান যে অতি সামান্য তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবেঃ—

"কেশোরাম পোদ্দার (আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মেডাল ফণ্ড) ১০,০০০; বিড়লা হিন্দী লেকচারশিপ ফণ্ড ২৬,২০০্; গণপতি রাও খেমকা (পঞ্চম জর্জ করোনেশান মেডাল ফণ্ড) ১,০০০্;—মোট ৩৭,২০০্।

বোম্বাইয়ের অধিবাসীদের মত মাড়োয়ারীদের যদি দেশহিতৈষণার ভাব থাকিত তবে তাহারা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে, যথা—বিশ্ববিদ্যালয়, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, চিত্তরঞ্জন জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষৎ, মূক বধির বিদ্যালয়, অন্ধ বিদ্যালয় প্রভৃতিতে কয়েক কোটি টাকা দান করিত। "যাহার প্রচুর আছে, তাহার নিকটেই লোক বেশী প্রত্যাশা করে।"

পক্ষান্তরে, অ্যান্‌ড্রু কার্নেগী তাঁহার বাসভূমির হিতসাধনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। "পিট্‌সবার্গে আমি ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়াছি। আমি পিট্‌সবার্গ শহরে জনহিতকর কার্যে ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছি বটে, কিন্তু পিট্‌সবার্গ হইতে আমি যাহা পাইয়াছি, উহা তাহার কিয়দংশ মাত্র। পিট্‌সবার্গ ইহা পাইবার অধিকার রাখে।"—আত্মচরিত।

(১৮) মাড়োয়ারী নিখিল ভারত আগরওয়ালা মহাসভায় দুইটি অধিবেশনে সভাপতিরা যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তুলনার জন্য তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইলঃ—

"প্রতিদিনই আমরা হৃদয়বিদারক পারিবারিক অশান্তির কথা শুনিতে পাই, উহা এ যুগের অনুপযোগী বিবাহ-প্রথারই কুফল। বালিকাকে অল্প বয়সেই তাহার পিতৃগৃহের লেখাপড়া

সম্প্রতি আমি কয়েকজন তরুণ মাড়োয়ারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তাহারা মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট এবং ভবিষ্যতে মাড়োয়ার, বিকানীর, যোধপুরের মুখ উজ্জ্বল করিবে। কিন্তু বর্তমানে তাহাদের কোন প্রতিষ্ঠা নাই।

এই ছত্রগুলি দুই বৎসর পূর্বে লিখিত হয়। সম্প্রতি একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা হইতে আমার পূর্বোক্ত অভিযোগগুলি প্রমাণিত হইবেঃ—

"পিলানী শহর জয়পুরের মহারাজা বাহাদুরের আগমনে সরগরম হইয়া উঠে; গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত শহরে নূতন বিড়লা কলেজ ভবনের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই মহারাজার আগমন হইয়াছিল।"

* * * *

"১৯২৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং ছাত্রাবাসের জন প্রকাণ্ড গৃহসমূহ নির্মিত হয়। রাজা বলদেওদাস বিড়লা এই বিদ্যালয়ের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং উহার ব্যয়নির্বাহের জন্য 'বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্ট' করেন। ট্রাস্টের ভাণ্ডারে এখন ১২ লক্ষ টাকা জমা হইয়াছে। ১৯২৯ সালে স্কুলটি ইন্‌টারমিডিয়েট কলেজে পরিণত হয়, ১৯৩০ সালে উহার সংগে বাণিজ্য শিক্ষার ক্লাস যোগ করা হয়।"—লিবার্টি, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩১।

বিড়লারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ২৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের জন্মভূমিতে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা ১২ লক্ষ টাকারও বেশি দান করিয়াছেন। বিড়লা ভ্রাতারা বাংলা দেশে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু বাংলায় বাস তাঁহাদের নিকট প্রবাস মাত্র।

স্মরণ রাখিতে হইবে, শিক্ষা সংস্কৃতি এবং উদার দৃষ্টির দিক দিয়া, বিড়লারা উচ্চশ্রেণীর মাড়োয়ারী। কিন্তু তবু তাঁহারা তাঁহাদের জাতিগত সঙ্কীর্ণতা এবং গ্রাম্য অনুদার ভাব ত্যাগ করিতে পারেন না।

(৪) হিন্দু রক্ষণশীলতার পুনরভ্যুদয় ভারতের উন্নতির পক্ষে বাধাস্বরূপ

আমাদের বহু হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা গীতায় উচ্চাঙ্গের অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন, হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিক উদারতা এবং অন্য ধর্মের চেয়ে তাহার

খেলাধুলার আবহাওয়ার মধ্য হইতে ছিনাইয়া লওয়া হয় এবং তাহারই মত একটি নির্দোষ বালকের সংগে তাহার বিবাহ হয়। কিছুদিন পরেই আমরা শুনিতে পাই যে, বালকটির মৃত্যু হইয়াছে এবং একটি বালবিধবা রাখিয়া গিয়াছে। জীবনে ঐ বালবিধবা যে অপরিসীম দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা অবর্ণনীয়। এরূপ দৃষ্টান্তও দেখিতে পাই, একজন বৃদ্ধ জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া তাহার নাতিনীর বয়সী বালিকাকে বিবাহ করে, কেননা উক্ত বৃদ্ধ বিপত্নীক জীবন যাপন করিতে অক্ষম। আপনারাই বিবেচনা করুন এরূপ বিবাহের কি বিষময় পরিণাম, ইহা সমাজ-শরীরকে ক্ষয় করিতেছে।"

১২শ নিখিল ভারত মাড়োয়ারী আগরওয়ালা মহাসভার সভাপতিরূপে শ্রীযুত ডি. পি. খৈতান বলেন, শিক্ষার অভাব, রক্ষণশীলতা, বাল্যবিবাহ, পর্দা-প্রথা প্রভৃতি সামাজিক উন্নতির গতি প্রতিহত করিতেছে।

শ্রেষ্ঠতার ব্যাখ্যা করিবেন, অস্পৃশ্যতার তীব্র নিন্দা করিবেন। কিন্তু যখন এই সব তত্ত্ব ও উপদেশ কার্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারাই সর্বাগ্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক ওয়াদিয়া বলিয়াছেনঃ—

"আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা হিন্দুধর্মের উদারতা সম্বন্ধে অজস্র শ্লোক উদ্ধৃত করেন, কিন্তু যদি কেহ সেগুলি আন্তরিক বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে তিনি একান্তই নিরাশ হইবেন। উদ্ধৃত শ্লোকগুলি কেবল লোকদেখানোর জন্য, কাজ করিবার জন্য নহে। আমার মনে হয় যে, হিন্দুধর্মকে উদার ও সার্বভৌম প্রমাণ করিবার জন্য এত বেশী সময় ব্যয় করা হইয়াছে যে, তদনুসারে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় নাই! ভয় হইতেই নির্যাতন আসে; এই ভয়কে জয় না করিলে, কেহই পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না।"—দার্শনিক সম্মেলনে সভাপতির বক্তৃতা (ডিসেম্বর, ১৯৩০)।

সুতরাং, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, হিন্দুসভা এবং সংগঠনের ঝুড়ি ঝুড়ি বক্তৃতা সত্ত্বেও, প্রত্যহই বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতেছে। কেনই বা করিবে না? সামাজিক ব্যাপারে, ইসলাম জাতি, বর্ণ অথবা মতামতের পার্থক্য স্বীকার করে না। অস্পৃশ্যতা ইসলামধর্মে অজ্ঞাত। কার্লাইলের মতে, ইহা মানুষের মধ্যে সাম্যবাদের প্রচার করে। কার্লাইল অন্যত্র বলিয়াছেন,—"যে মানুষের কথা শুনিয়া বুঝা যায় না, সে কি করিবে বা কি করিতে চায়, তাহার সঙ্গে কোন কাজ করা অসম্ভব। সেই মানুষকে তুমি বর্জন করিবে, তাহার সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবে।" আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, নমঃশূদ্র বন্ধুরা হিন্দু নেতাদের ভণ্ডামিতে বিরক্ত হইয়া অন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবে।(১৯)

---

(১৯) ১৭-৬-৩১ তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে "উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের অত্যাচার" শীর্ষক নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিলঃ—

"ঢাকায় সংবাদ আসিয়াছে যে, শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ মহকুমার সমগ্র নমঃশূদ্র সম্প্রদায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ডাঃ মোহিনীমোহন দাস সুনামগঞ্জ বার লাইব্রেরী এবং কংগ্রেস কমিটির নিকট এ বিষয়ে সত্য সংবাদ জানিবার জন্য তার করেন। তিনি উত্তর পাইয়াছেন যে, ঘটনা সত্য। উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের অত্যাচার এবং ঢাকার একজন মুসলমান মৌলভীর প্রচারকার্যের ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে।"

যে খৃষ্টানধর্ম ভগবানের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবি করে, মুসলমানধর্ম স্থানে স্থানে তাহাকেও অতিক্রম করিতেছে। ইসলামধর্মের দৃষ্টি উদার গণতন্ত্রমূলক। জনৈক আধুনিক লেখক বলিয়াছেন—"ইসলামধর্ম মরুভূমির মধ্যে জন্ম লাভ করিয়াছিল। মরুভূমি সাম্যবাদের প্রধান ক্ষেত্র। ইসলামধর্ম অতি শীঘ্রই তিন মহাদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে কোন দিনই জাতিবৈষম্য নাই। ইসলামের নিকট সব মুসলমানই ভাই ভাই, তাহারা—কাল্ট বা বার্বার, তুর্ক বা পারসীক, ভারতবাসী অথবা জাভাবাসী—যাহাই হোক না কেন। এ কেবল ভাবজগতের সাম্য নহে, দৈনন্দিন জীবনে ও সামাজিক আচার-ব্যবহারে এই সাম্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাম্যই দরিদ্র ও নিম্নস্তরের লোকদের ইসলামধর্মে আকর্ষণ করে; তাহারা জানে যে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিলে, অন্য সমস্ত মুসলমানের সমান হইবে। আমার মনে হয়, আফ্রিকা মহাদেশ জয় করিবার জন্য খৃষ্টানধর্ম ও মুসলমানধর্মের মধ্যে যে

হিন্দু সমাজের জটিল ব্যবস্থা ও স্তরভেদের মধ্যে বহু দুর্বল স্থান আছে। এক দিকে মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোক—ইহারা প্রায় সকলেই উচ্চ-বর্ণীয়; আর এক দিকে লক্ষ লক্ষ অনুন্নত শ্রেণীর লোক, ইহারা সকলেই নিম্ন জাতির। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইহাদেরই মধ্যে গণ্য। সুতরাং শেষোক্ত শ্রেণী যে উচ্চ শ্রেণীদের আহ্বানে সাড়া দিবে না, ইহা স্বাভাবিক। বিশাল হিন্দুসমাজ বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মত; বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতি উহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত ছড়াইয়া আছে—তাহাদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। একই ভাব ও জীবন-প্রবাহ এই সমাজের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত নহে। উচ্চবর্ণীয় ও নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে নিয়ত কোলাহলে—এই সমাজের অনৈক্য ও বিচ্ছেদের ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই 'অচলায়তন' হিন্দুসমাজের নানা অর্থহীন প্রথা ও জীর্ণ আচারের নিন্দা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর ৬৩তম জন্মদিনে—রবীন্দ্রনাথ দেশ-বাসীর নিকট যে বাণী প্রদান করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেনঃ—

"যুক্তিহীন কুসংস্কার, জাতিভেদ এবং ধর্মের গোঁড়ামি, এই তিন মহাশত্রুই আমাদের সমাজের উপর এতদিন প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। সমুদ্রপার হইতে আগত যে কোন বিদেশী শত্রুর চেয়ে উহারা ভয়ঙ্কর। এই সব পাপ দূর করিতে না পারিলে, কেবলমাত্র ভোট গণনা করিয়া বা রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করিয়া আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব না। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে এই কথাই আমাদের স্মরণ করিতে হইবে, কেননা মহাত্মাজী নবজীবনের সাহস এবং স্বাধীনতালাভের দুর্জয় সঙ্কল্প আমাদিগকে দান করিয়াছেন। জড়তা ও অবিশ্বাস হইতে আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতা—মহাত্মা তাঁহার অতুলনীয় চরিত্রপ্রভাবে এই বিরাট আন্দোলনই দেশে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতেছি। সেই সঙ্গে ইহাও আমরা আশা করি যে, এই আন্দোলনে জাতির মনে যে শক্তি সঞ্চার হইবে, তাহার ফলে আমাদের বহু দিনের সামাজিক কুপ্রথা এবং জীর্ণ আচারের পুঞ্জীভূত জঞ্জালরাশিও দূর হইবে।"

(৫) বংশানুক্রম ও আবেষ্টন—সুপ্রজনন বিদ্যা— আমার জীবনে ঐগুলির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা

একটি দরিদ্র কৃষক বালিকা তাহার পিতার মেষপাল চরাইতে চরাইতে, এক অতিপ্রাকৃত দৃশ্য দর্শন করিল। সে স্পষ্ট দৈববাণী শুনিতে পাইল;—দৈববাণী তাহাকে অর্লিন্সকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য অনুজ্ঞা দিতেছে। সে অমানুষিক শক্তি লাভ করিল এবং বহু দুঃসাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন করিল। পৃথিবীর

প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহাতে ইসলামই বিজয়ী হইবে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা যদি বর্ণবৈষম্যের কুসংস্কার, শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টানধর্মের সত্যকার ভ্রাতৃত্ববাদ আন্তরিকভাবে প্রচার না করে, তবে তাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে না।"

মসজিদে আমির এবং ফকির পাশাপাশি বসিয়া উপাসনা করে। এই কারণেই মালয় উপনিবেশ, জাভা, বোর্নিও এবং সুমাত্রায় ইসলামধর্ম এত দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

শ্রেষ্ঠ নাট্যকার "সোয়ান অব অ্যাভন" (অ্যাভনের শ্বেত হংস) বাণীর বরপুত্র সেক্সপীয়রের পিতামাতা কবিত্বের ধার ধারিতেন না ও নিরক্ষর ছিলেন। যীশু, মহম্মদ, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, অথবা নিউটনের জীবনে এমন কোন গুণ ছিল না, যাহাকে বংশানুক্রমিক মনে করা যাইতে পারে।

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ উইলিয়ম হার্শেল হ্যানোভার শহরের সৈন্যবিভাগের একজন কর্মচারীর পুত্র ছিলেন। হার্শেলের মাতার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "তিনি নিজে লিখিতে জানিতেন না, বিদ্যাচর্চার প্রতি বিমুখ ছিলেন, নবযুগের ভাবধারাও তাঁহার মনকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্রকন্যাদের সকলেরই সঙ্গীতবিদ্যার প্রতি অনুরাগ ছিল, হার্শেল ১৭ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে গিয়া অর্গানবাদক এবং সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে জীবিকা অর্জন করেন। প্রত্যহ প্রায় ১৪ ঘণ্টা কাল অর্গান বাজাইয়া ও সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া তিনি রাত্রিকালে নির্জনে গণিতশাস্ত্র, আলোকবিদ্যা, ইটালীয় অথবা গ্রীক ভাষা—অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।" (লজ)।..."আলোকবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা তিনি গভীরভাবে আলোচনা করিতেন, বালিশের পরিবর্তে বই মাথায় দিয়া ঘুমাইতেন, আহারের সময়েও পড়িতেন এবং অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিতেন না। তিনি জ্যোতিষের সমস্ত অত্যাশ্চর্য রহস্য জানিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যে গ্রেগো-রিয়ান রিফ্লেক্টর যন্ত্র তিনি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, তিনি নিজে দূরবীক্ষণ তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহার শয়নগৃহকেই কারখানায় পরিণত করিলেন এবং অবসরসময়ে দর্পণ লইয়া ঘষা-মাজা করিতে লাগিলেন।" "সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রতিভার পশ্চাতে বংশানুক্রমিক গুণ থাকা চাই, এ কথা হ্যাণ্ডেলের জীবনে প্রমাণিত হয় না। তাঁহার পরিবারের কেহই সঙ্গীতবিদ্যা জানিত না। বরং হ্যাণ্ডেলের পিতামাতা তাঁহার বাল্যকালে তাঁহাকে গানবাজনা করিতে দিতেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও হ্যাণ্ডেল সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আট নয় বৎসর বয়সে সুরশিল্পী হইয়া উঠিলেন।" রামমোহন রায় গোঁড়া ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে সমাজে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি প্রবল ছিল। কৈশোর বয়সেই একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে তিনি পার্সীতে একখানি পুস্তিকা লেখেন,—উহার ভূমিকা ছিল আরবী ভাষায়। তাঁহার এই বিপ্লবমূলক সামাজিক মতবাদের জন্য তিনি পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইলেন। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ গ্যাল্টন, কার্ল পিয়ার্সন প্রভৃতি বংশানুক্রমিক বিদ্যার ব্যাখ্যাতারা যেখানে বংশগত গুণের একটি দৃষ্টান্ত দিবেন, তৎস্থলে তাহার বিপরীত নয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

কেবল সহোদর ভ্রাতাদের নয়, যমজ ভ্রাতাদেরও রুচি, প্রবৃত্তি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের দেখা যায়। মহাকবি মিলটন ক্রমওয়েলের একজন প্রধান সমর্থক; পক্ষান্তরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রিস্টোফার ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের সময় রাজ-তন্ত্রবাদী ছিলেন এবং বৃদ্ধবয়সে তিনি কেবল পোপের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হন নাই,

দ্বিতীয় জেমসের রাজত্বে বিচারকের পদও গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজশক্তিকে তিনি সর্বদা সমর্থন করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন।(২০)

সুপ্রজনন বিদ্যা সম্বন্ধে আমার এত কথা বলিবার কারণ এই যে, আমি আমার নিজের রুচি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই। আমার চরিত্রের কোন কোন বৈশিষ্ট্য পৈতৃক ধারা হইতে প্রাপ্ত মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু আমার বাল্যকালেই আমি যে ব্যবসাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম, তাহার কোন বংশানুক্রমিক ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি কৃষিকার্যের প্রতি আমার প্রবল অনুরাগ ছিল। আমি কোদাল দিয়া মাটি কাটিতাম, এবং নিজে চাষ করিয়া বীজ বুনিয়া নানারূপ ফসল উৎপাদন করিতাম। গোবর, ছাই এবং গলিত পত্রের সার দিয়া জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতাম। কৃষকেরা যে প্রণালীতে চাষ করিত, তাহা আমি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতাম। আমি দেখিতাম, যে পোড়া পাতার ছাই ব্যবহারে জমির উর্বরতা বাড়ে এবং ঐ জমিতে কচু ও কলা প্রভৃতি ভাল হয়। অবশ্য, আমি তখন জানিতাম না যে,—গাছের পাতার ছাইয়ে যথেষ্ট পরিমাণে পটাশ আছে। অন্য নানা রকম ফসলও আমি জন্মাইতাম। আমি এই সব কাজ ইচ্ছামত করিতে পারিতাম, কেননা আমার পিতামাতা এ বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেন এবং এই উদ্দেশ্যে মজুর প্রভৃতি কাজে লাগাইবার জন্য অর্থও দিতেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আমি যে নারিকেল ও সুপারির গাছ রোপণ করিয়াছিলাম, তাহা এখনও বাল্যের মধুর স্মৃতি জাগরূক করে। কলিকাতায় আসিবার পর হইতে আমি গ্রীষ্মের ছুটি ও শীতের ছুটির প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম,—ঐ সময়ে বাড়ী গিয়া মনের সাধে চাষের কাজ করিতে পারিব, ইহাই ভাবিতাম। আমার স্বভাবগত ব্যবসাবুদ্ধিও এই সময়ে প্রকাশ পাইত। আমাদের জমিতে যে ফসল হইত তাহার সামান্য অংশই পরিবারের প্রয়োজনে লাগিত। উদ্বৃত্ত ফসল হাটে বাজারে বিক্রয় করিতে হইত। ইহাতে চাষের খরচা উঠিয়া লাভের সম্ভাবনা থাকিত।

এই সময় হইতে আমার দোকানদারী বুদ্ধি বা ব্যবসাবুদ্ধির (২১) বিকাশ হইল। গ্রামের জমিদারের ছেলে হইয়া জমির ফসল হাটে বাজারে বিক্রয় করি, ইহাতে আমাদের কোন কোন প্রতিবেশী লজ্জাবোধ করিতেন। কিন্তু আমি উহা গ্রাহ্য করিতাম না। কয়েক বৎসর পরে আমার এই ব্যবসাবুদ্ধি বিপদে আমার সহায়স্বরূপ হইল। আমার পিতা ভাবপ্রবণ লোক ছিলেন, একসময়ে তিনি ঝোঁকের মাথায় একটি কাজ করিয়া

---

(২০) মেণ্ডেলের নিয়ম এবং বাইসমানের জীবাণুতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সুপ্রজনন-বিদ্যার এইসব আপাতবিরোধী ঘটনার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, কিন্তু উহা অসম্পূর্ণ।

জনৈক আধুনিক বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন—"ব্যক্তির চরিত্র-বিকাশের উপর বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। বংশানুক্রম ব্যক্তির চরিত্রের ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে,—পারিপার্শ্বিক কতকগুলি গুণের বিকাশে সহায়তা করে, কতকগুলিতে বাধা দেয়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না।"

(২১) আমি ব্যাপকভাবে এই শব্দ ব্যবহার করিতেছি। নেপোলিয়ান ইংরেজ জাতিকে অবজ্ঞাভরে বলিতেন—"দোকানদারের জাতি"।

লোকসান দিয়াছিলেন। এইচ. এইচ. উইলসনের সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান ঐ সময়ে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ৪০।৫০ টাকাতেও উহার এক খণ্ড পাওয়া যাইত না। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আমার পিতাকে ঐ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে সম্মত করেন। পণ্ডিত নিজে পুস্তকের মুদ্রণ-ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করিবার ভার লইলেন এবং পিতাকে বুঝাইলেন বই বিক্রি করিয়া খুব লাভ হইবে। বই ছাপা হইল। কিন্তু আশানুরূপ বিক্রয় হইল না এবং আমার পিতার প্রায় সাত হাজার টাকা লোকসান হইল। তখনকার দুইজন সুপরিচিত সংস্কৃত গ্রন্থপ্রকাশক পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর এবং ভুবনমোহন বসাক প্রতি কপি নামমাত্র দুই টাকা মূল্যে কয়েক শত বই কিনিলেন। তাঁহারা ব্যবসায়ী লোক ছিলেন, সুতরাং বই বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বেশ লাভ হইল। কিন্তু অবশিষ্ট কয়েক শত খণ্ড বই আমাদের বাড়ীতেই রহিল। আমি পুরানো কাগজের দরে উহা বিক্রি করিতে রাজী হইলাম না। আমি সযত্নে সেগুলি বাঁধাই করিয়া রাখিলাম। বাংলার আর্দ্র জলবায়ুতে উই ও কীটের হাত হইতে এই সমস্ত বই রক্ষা করা দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু আমার যত্ন ও পরিশ্রমের পুরস্কার কয়েক বৎসর পরে মিলিল। ১৮৭৮ সালে আমাদের কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিতে হইল, কেননা পিতা তখন ঋণগ্রস্ত হইয়া সবদিকে খরচ কমাইতে বাধ্য হইলেন। ৮০নং মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। এই সময় আমার ব্যবসাবুদ্ধি কাজে লাগিল। পিতা আমার মাসিক খরচের টাকা পাঠাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া, আমি তাঁহাকে এই দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলাম, উইলসনের অভিধান প্রতি খণ্ড ছয় টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে। কলিকাতার পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট হইতে এবং ভারতের নানাস্থান হইতে অর্ডার আসিতে লাগিল। বই বেশ বিক্রি হইতে লাগিল এবং আমি সাহসপূর্বক পুস্তকবিক্রয়ের এজেন্সি খুলিয়া বসিলাম। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় অ্যাণ্ড ব্রাদার্সের নামে উইলসনের অভিধান প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং আমার এজেন্সিরও ওই নাম দিলাম। আমার কোন মূলধন ছিল না, সুতরাং অভিধান বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের নীচে এই কথাটিও লেখা থাকিল—"মফঃস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।" বাড়ীর দরজায় "জি. সি. রায় অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক"—এই নামে একখানি সাইনবোর্ড টাঙাইয়া দিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে, কলেজের পড়া শেষ হইলে আমি পুস্তক-বিক্রয়ের ব্যবসা অবলম্বন করিব।(২২) ঐ সময়েও সরকারী চাকরির প্রতি আমার একটা বিরাগের ভাব ছিল। কিন্তু গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পাইয়া আমার সমস্ত মতলব বদলাইয়া গেল। ভগবানের ইচ্ছায়, আমার যাহা কিছু শক্তি ও যোগ্যতা বিজ্ঞানসেবা ও দেশের অন্যান্য নানা কাজে নিয়োজিত হইল।

---

(২২) এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমার তিন জন ছাত্র (রসায়নে এম. এস-সি.) ক্ষুদ্র আকারে পুস্তক ব্যবসা আরম্ভ করিয়া, এখন উহা সুবৃহৎ ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছেন; বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা আমার দ্বারা অণুপ্রাণিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ফার্মের নাম চক্রবর্তী, চাটার্জী অ্যাণ্ড কোং, পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক। আমার বাল্যকালের মনের আকাঙ্ক্ষা এই দিক দিয়া চরিতার্থ হইয়াছে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট (১)

যে সব মানুষকে আমি দেখিয়াছি

যদিও রাজনীতিক হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার কোন কালেই ছিল না, বক্তা হিসাবে প্রসিদ্ধ হইবার ইচ্ছাও আমার নাই,—তথাপি খ্যাতনামা রাজনৈতিক বক্তাদের বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ আমি কখনও ত্যাগ করি নাই। ইলবার্ট বিল আন্দোলন যখন প্রবলভাবে চলিতেছিল, তখন (১৮৮৩) উইলিসের কক্ষে লর্ড রিপনকে সমর্থন করিবার জন্য লিবারেল রাজনীতিকদের এক সভা হয়, আমি ঐ সভাতে যোগ দেই। জন ব্রাইট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন,—বক্তাদের মধ্যে ডবলিউ. ই. ফরস্টার, স্যার জর্জ কাম্বেল এবং লালমোহন ঘোষ ছিলেন। আমাদের স্বদেশবাসী লালমোহনের বক্তৃতা চমৎকার হইয়াছিল, যদিও তাঁহার পূর্বে ইংলণ্ডের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ বক্তা ব্রাইট বক্তৃতা করেন। গ্লাডস্টোন, জোসেফ চেম্বারলেন, মাইকেল ডেভিট্, জন ডিলন, উইলফ্রিড লসন, লর্ড রোজবেরী, এবং এ. জে. ব্যালফুরের বক্তৃতা আমি শুনিয়াছি। আমি এডিনবার্গের একটি প্রসিদ্ধ জনসভাতেও উপস্থিত ছিলাম, ঐ সভায় প্রসিদ্ধ আফ্রিকা ভ্রমণকারী এইচ. এম. স্টান্‌লি প্রধান বক্তা ছিলেন। ১৯২৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিরূপে আমি যখন ডাবলিনে যাই, তখন অতিথিদের সম্বর্ধনার জন্য একটি উদ্যান সম্মিলনী হয়। আমি সেখানে আইরিশ ফ্রি স্টেটের গবর্নর জেনারেল মাননীয় টি. এম. হিলির সাক্ষাৎ লাভ করি। তিনি তখন বয়সে প্রবীণ এবং তাঁহার যৌবনের তেজস্বিতা কিছু শান্ত হইয়াছে। তাঁহার সহাস্য বদন এবং মধুর ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় নাই যে, তিনিই পূর্বকালের সেই বিখ্যাত "টিম" হিলি; গত ১৮৮০ সালের কোঠায় ইনিই পার্লামেণ্টে চরমপন্থী, নিয়ত বাধাপ্রদানকারী পার্নেলের দলভুক্ত সদস্য ছিলেন।

ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে লালমোহন ঘোষের বাগ্মিতা উচ্চাঙ্গের ছিল। সুরেন্দ্রনাথের যেসব মুদ্রাদোষ ছিল, লালমোহনের তাহা ছিল না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ নব্য বঙ্গের যুবকদের আদর্শ ছিলেন এবং তাঁহার আবেগময়ী ওজস্বিনী বক্তৃতা যুবকদের চিত্তের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার অদ্ভুত স্মরণশক্তিও ছিল। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার পুনা অধিবেশনের প্রেসিডেন্টরূপে তিনি অপূর্ব বক্তৃতা শক্তির পরিচয় প্রদান করেন। তিনি একটিবারও না থামিয়া তিন ঘণ্টা কাল অনর্গল বক্তৃতা করেন। তাঁহার হাতে যে মুদ্রিত অভিভাষণ ছিল, একবারও তিনি তাহার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

গোখেল বাগ্মী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সাবলীল বক্তৃতা বহু তথ্যে পূর্ণ থাকিত। তিনি সংখ্যাসংগ্রহে নিপুণ ছিলেন, বক্তৃতায় অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার মনে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা সংশয় থাকিত না, কেননা তথ্য

সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। তিনি বাক্য-সংযমের মূল্য বুঝিতেন এবং বেকনের প্রবন্ধের মত সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিতেন। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা হৃদয়ের উপর, আর গোখেলের বক্তৃতা মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিত। ভারতের জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবর্তক আনন্দমোহন বসু এত দ্রুত অনর্গল বক্তৃতা করিতেন যে, রিপোর্টারদের পক্ষে তাঁহার বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করা কঠিন হইত। তাঁহার বক্তৃতায় কিছু অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসের কথা থাকিত। এই পুস্তকের পূর্বাংশে তাঁহার একটি বক্তৃতা উদ্ধৃত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা ও ধর্মোপদেশও আমি বহুবার শুনিয়াছি। তিনি ছিলেন একাধারে ভাবুক ও ঋষি; কখনও যুক্তিতর্ক তুলিতেন না, আবেগময়ী ভাষায় নূতন বাণী শুনাইতেন।

আমি কয়েকজন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা ও বক্তার কথা বলিলাম। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিশত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে প্রসিদ্ধ সম্মেলন হইয়াছিল, তাহার কথা স্বভাবতঃই আমার মনে আসিতেছে। যে সমস্ত বিখ্যাত অতিথি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া দেশবিদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে মহাসমারোহে সম্বর্ধনা করা হয়। এত বেশী বিখ্যাত পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির একত্র সমাগম দেখিবার সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে। এই সম্মেলনে সুপ্রসিদ্ধ সাফী ছিলেন; রোমে যখন সাধারণ-তন্ত্র ঘোষণা করা হয়, তখন ম্যাজিনি, আর্মেলিনি এবং সাফী, এই তিনজনকে সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। সুয়েজ খালের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিনান্ড লেসেপ্‌স্‌, জীবাণু-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ রাসায়নিক পাস্তুর, পদার্থবিজ্ঞানবিদ শারীরতত্ত্ববিদ এবং গণিতজ্ঞ হারমান ভন হেল্‌মহোল্‌জ, আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি জেমস রাসেল লাওয়েল, ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিং—সম্মেলনে এই সব বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সাফী ও হেল্‌মহোল্‌জ বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন এবং লেসেপ্‌স্‌ ও পাস্তুর মাতৃভাষা ফরাসীতে বক্তৃতা করেন।

আমি প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে এই বিবরণ লিখিতেছি, আমার বিশ্বাস আমার বিবরণে কোন ভুল হয় নাই।

পরিশিষ্ট (২)

উপসংহার

আমি সঙ্কোচ ও সংশয়পূর্ণ হৃদয়ে, জনসাধারণের সম্মুখে এই আত্মজীবনী উপস্থিত করিতেছি। যে কোন পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার কোন কোন অংশ সংক্ষিপ্ত, কতকটা অসংলগ্ন। এক সময়ে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, গ্রন্থখানি আমূল সংশোধন করিয়া ছাপিতে দিব। কিন্তু ঘটনাচক্রে বর্তমান সময়ে আমার জীবন অত্যন্ত কর্মবহুল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আমূল সংশোধন করিতে গেলে পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব হইত, অথচ এদিকে পরমায়ুও শেষ হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত কারণে 'শুভস্য শীঘ্রং' এই নীতি অবলম্বন করিয়া বহু দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আমি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম।

পুস্তকের কোন কোন অংশ ৮।৯ বৎসর পূর্বে লিখিত হয়, ১৯২৬ সালে ইয়োরোপ যাতায়াতের সময় কতকাংশ লিখি। অন্যান্য অংশ বাংলার সর্বত্র, তথা ভারতের নানা প্রদেশে ভ্রমণের সময় গত কয়েক বৎসরে লিখিত হয়। এই সমস্ত কারণে পুস্তকের স্থানে স্থানে খাপছাড়া ও অসংলগ্ন বোধ হইতে পারে।

কেহ কেহ হয়তো পরামর্শ দিবেন যে, জুতা নির্মাতার শেষ পর্যন্ত নিজের ব্যবসায়েই লাগিয়া থাকা উচিত, রসায়নবিদের পক্ষে তাহার লেবরেটরীর বাহিরে যাওয়া উচিত নহে। সৌভাগ্যক্রমে অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে, এই আত্মজীবনীতে কেবল রসায়নের কথা নাই, বাহিরের অনেক কথাও আছে।

আমি যাহা তাহাই, আমার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী অনেক ভাব আছে। বার্নার্ড শ' যথার্থই বলিয়াছেন, "কোন লোকই খাঁটি বিশেষজ্ঞ হইতে পারে না, কেননা তাহা হইলে সে একটা আস্ত আহাম্মক হইবে।" এই পুস্তকে যেসব বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা পরস্পর-বিরোধী কতকগুলি ব্যাপারের একত্র সংগ্রহ; অথচ ইহা একজন বাঙালী রসায়নবিদের জীবনকাহিনীরূপে গণ্য হইতে পারে কিনা, পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন।

আমার জীবন বৈচিত্র্যহীন শিক্ষকের জীবন। কোন লোমহর্ষণ অভিযান, অথবা উত্তেজনাপূর্ণ বিপজ্জনক ঘটনা, আমার জীবনে ঘটে নাই। কোন রাজনৈতিক গুপ্ত কথাও উদ্‌গ্রীব পাঠকদিগকে আমি শুনাইতে পারিব না। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস, বৈচিত্র্যহীন, চমকপ্রদ ঘটনাবর্জিত অনাড়ম্বর জীবনের সরল কাহিনী আমার দেশবাসীর নিকট বিশেষতঃ যুবকদের নিকট কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষাপ্রদ ও হিতকর হইবে।

আমার জীবনের সমস্ত প্রকার কার্যকলাপের কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। পুস্তক লিখিয়া শেষ করিবার পর, আমি ৪।৫ বৎসর উহা ফেলিয়া রাখি এবং বাংলার আর্থিক অবস্থা বিশেষরূপে অধ্যয়ন করি। আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালীর শোচনীয় ব্যর্থতা যে আমার ব্যক্তিগত ধারণা নয়, বাস্তব সত্য, তৎসম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় হইতে চেষ্টা

করি। দেখিলাম, এ সম্বন্ধে সে সমস্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। আমি ঐ সব বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রন্থের পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছি।

আমি যুবকদের নিকট বক্তৃতায় অনেক বার বলিয়াছি যে, আমি প্রায় ভ্রমক্রমে রাসায়নিক হইয়াছিলাম। ইতিহাস, জীবন-চরিত, সাহিত্য এই সব দিকেই আমার বেশী ঝোঁক। ইহাতে অসাধারণ কিছু নাই হাক্‌সলি বলিতেন যে, যদিও তিনি প্রাণিতত্ত্ববিদরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তবু দর্শন ও ইতিহাস তাঁহার মনের উপর চিরকাল প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। "ইংলিশ মেন অব লেটার্স" সিরিজে হিউমের উপর তিনি যে নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই এই উক্তি প্রমাণিত হয়। লর্ড হ্যাল্‌ডেন দর্শনশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও, আইনজ্ঞ এবং রাজনীতিক-রূপেও অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

আমি স্বীকার করি, আমার মধ্যে অদ্ভুত স্ব-বিরোধী ভাব আছে। যদিও আমি একজন শিল্প-ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য, তথাপি আমার তরুণ বয়স হইতেই আমি এই জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি এবং বিষয়-সম্পত্তির উপর আমার বিরাগ প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং শিল্পব্যবসায়ীরূপে সাফল্য লাভ করিতে যে গুণ বিশেষভাবে থাকা চাই, তাহা আমার নাই, কেননা, "অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্" —এই কথাটি সর্বদা আমার মনে রহিয়াছে। এই পুস্তকের সর্বত্র খৃষ্টের এই সুরই প্রধান—"পৃথিবীর ধনরত্ন ও ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিও না, কেননা যেখানে ঐশ্বর্য, হৃদয়ও সেখানে থাকে।"

তৎসত্ত্বেও যদি কেহ ধৈর্য ধরিয়া এই বহি আগাগোড়া পড়েন, তবে দেখিতে পাইবেন, আমার জীবনের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে একটা সংযোগসূত্র আছে এবং সেগুলি একই জীবন-প্রবাহের অংশ মাত্র। সংক্ষেপে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, আমি লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করি নাই।

দুঃখের বিষয়, আত্মজীবনীতে 'আমি' শব্দটির পুনঃপুনঃ ব্যবহার অপরিহার্য। ইহাতে অহং জ্ঞানের ভাব অতিমাত্রায় ফুটিয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং যখনই এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, তখনই আমার বিষম দায়িত্বের কথা স্মরণ হইয়াছে। যেক্ষেত্রে আমি কাজ করিয়াছি, ভগবানের হস্তধৃত যন্ত্ররূপেই করিয়াছি। আমার ব্যর্থতা আমার নিজের, ভুল করা মানুষের স্বাভাবিক। কিন্তু আমার জীবনে যদি কিছু সাফল্য হইয়া থাকে, তবে তাহা ভগবানের ইচ্ছাতেই হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবানই আমাদের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। লর্ড হ্যাল্‌ডেন তাঁহার আত্ম-জীবনীতে মানবজীবনের মধ্যে ভগবদিচ্ছার এই প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেনঃ—

"যেসব বিষয়ে আমি সাফল্য লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার কোন সাফল্যবোধ নাই। আমি কাজ করিয়াছি, এবং তাহাতে সুখ পাইয়াছি, এই পর্যন্ত। মানুষের নিকট হইতে বেশী সম্পদ, সম্মান, শ্রদ্ধা পাওয়ার চেয়ে, সে সুখ অনেক ভাল। কেননা ঐ সুখের মধ্যে এমন একটি জিনিস আছে যাহা বাহিরের কোন কিছুই দিতে পারে না।

বাহিরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমি এই বলিতে পারি, যদি পুনরায় আমাকে প্রথম হইতে জীবন যাপন করিতে হইত, তবে পারতপক্ষে সব ঘটনার সম্মুখীন হইতাম না। একজন বিখ্যাত রাজনীতিক আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনার যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহার সাহায্যে পুনরায় কি আপনি নূতনভাবে জীবন আরম্ভ করিতে চাহেন?' আমি বলিয়াছিলাম—'না'। আমি আরও বলি,—'আমরা জীবনে যেসব সাফল্য লাভ করি, ঘটনাচক্র অথবা দৈবের অংশ তাহার মধ্যে কতটা, তাহা আমরা সম্যক ধারণা করিতে পারি না।' উক্ত রাজনীতিকও উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমিও পুনর্বার জীবন আরম্ভ করিতে চাই না, কেননা যে ঘটনাচক্র বা দৈব একবার আমার সহায় ছিল, সে যে পুনর্বার আমার প্রতি সদয় হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি?' খুব শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনেও ঘটনাচক্রের প্রভাব যথেষ্ট এবং সকল ঘটনা ও অবস্থার মধ্যে সুখদুঃখ অনাসক্ত থাকিবার শিক্ষা দর্শনশাস্ত্রের নিকট হইতে আমাদের লাভ করিতে হইবে। জ্ঞান ও বুদ্ধি-মত নিয়ত কার্য করিয়া যে ফল হয়, তার বেশী মানুষ আশা করিতে পারে না।"

জে. এস. মিল সংশয়বাদীরূপে গণ্য (কেহ কেহ তাঁহাকে নিরীশ্বরবাদীও বলেন); কিন্তু তিনি এক স্থানে বলিতে গেলে অদৃষ্টবাদের বা ভগবানের বিধানের উপর তাঁহার বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথাঃ—

"কেহ নিজের কোন কৃতিত্ব ব্যতীতই ধনী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কেহ কেহ বা এমন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন যে, নিজের কার্যের দ্বারা ধনী হইতে পারেন। অধিকাংশ লোককেই সমস্ত জীবনে কঠোর পরিশ্রম ও দারিদ্র্য ভোগ করিতে হয়। অনেকে অতি নিঃস্ব ভিখারীরূপে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হয়। জীবনে সাফল্য-লাভের প্রধান উপায়—জন্ম বা বংশ, তার পর ঘটনাচক্র এবং সুযোগ-সুবিধা। যিনি ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তিনি সাধারণতঃ নিজের পরিশ্রম ও কার্য-দক্ষতার বলেই তাহা লাভ করেন বটে, কিন্তু কেবলমাত্র কার্যকুশলতা বা পরিশ্রমে কিছুই হইত না, যদি ঘটনাচক্র ও সুযোগ-সুবিধা তিনি না পাইতেন। অল্প লোকের ভাগ্যেই সেরূপ ঘটিয়া থাকে।...চরিত্রের সদ্‌গুণ অপেক্ষা কর্মশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি জীবনে সাফল্যলাভের পক্ষে বেশী প্রয়োজন। অধিকাংশ লোকের পক্ষে, তাঁহাদের চরিত্র যতই সৎ হোক না কেন, অনুকূল ঘটনাচক্রের সাহায্য ব্যতীত জগতে সাফল্য-লাভ সম্ভবপর নয়।"

আমার জীবনের বিবিধ কর্মবৈচিত্র্যের মধ্যে আমি নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্যটির তাৎপর্য অনুভব করিয়াছিঃ—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

বাঙালীদের ত্রুটি ও দৌর্বল্য সম্বন্ধে আমি অনেক কথা বলিয়াছি; আমার এই সময়োচিত সাবধান-বাণী অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হইবে না, এই আশাতেই ঐসব কথা বলিয়াছি। বাঙালীর চরিত্রে অনেক মহৎ গুণ আছে এবং আমি নিজেকে বাঙালী বলিয়া গর্ব অনুভব করি। কিন্তু একটা প্রধান বিষয়ে, জীবিকা-সংগ্রহ ও অর্থ-

সংস্থানে—সে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে। গত ৪০ বৎসর ধরিয়া বাঙালার এই অন্ন-সমস্যার কথা আমি চিন্তা করিয়াছি এবং আমি সশঙ্কচিত্তে দেখিতেছি যে, বাঙালী তাহার 'নিজ বাসভূমে' জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না। এইসব কথা লিখিবার সময় আমি বাংলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেছি এবং বাংলার বালক ও যুবকদের কার্যকলাপ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিতেছি। তাহাদের শীর্ণ দেহ, রক্তহীন বিবর্ণতা, জ্যোতিঃহীন চক্ষু, অনাহার-ক্লিষ্টতারই পরিচয় প্রদান করে। তাহার মুখে একটা অসহায় ভাব। পরাজয়ের গ্লানি যেন তাহার সমগ্র চরিত্রের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে এবং ক্রমেই গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে। যে জাতির যুবশক্তি এইভাবে নৈরাশ্য-পীড়িত এবং মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের ভবিষ্যতের কোন আশা থাকে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার জীবনসায়াহ্নে আমি একেবারে আশা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

একজন শিক্ষাব্যবসায়ী হিসাবে, আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিয়াছি—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মোহ বাঙালী-চরিত্রের একটা প্রধান ত্রুটি। অন্য জাতিদের তুলনায় বাঙালীদের মধ্যেই এই মোহ বোধ হয় খুব বেশী। বার্নার্ড শ' বলিয়াছেন,—"নির্বোধের মস্তিষ্কই দর্শনকে নির্বুদ্ধিতায়, বিজ্ঞানকে কুসংস্কারে, এবং শিল্প-সাহিত্যকে পাণ্ডিত্যগর্বে পরিণত করে। এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা।" "পণ্ডিত ব্যক্তি অলস, সে পড়িয়া সময় নষ্ট করে। তাহার এই মিথ্যা জ্ঞান হইতে দূরে থাকিতে হইবে। অজ্ঞতা অপেক্ষাও ইহা ভয়ঙ্কর। কর্মতৎপরতাই প্রকৃত জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।" কথাগুলি খাঁটি সত্য। ঐ প্রসিদ্ধ লেখকের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমিও বলি,—"কোন ব্যক্তি যে বিষয়ে নিজে কিছু জানে না, সে যদি অপর এক অযোগ্য ব্যক্তিকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেয় এবং তাহাকে বিদ্যালাভের জন্য সার্টিফিকেট দেয়, তবে, শিক্ষার্থীটি 'ভদ্রলোকের শিক্ষা' সমাপ্ত করিল বলা যায়।" কিন্তু এই শিক্ষার ফলে তাহার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়।

আমি বাঙালী চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাহার দোষ-ত্রুটি দেখাইতে দ্বিধা করি নাই। অস্ত্রচিকিৎসকের মতই আমি তাহার দেহে ছুরি চালাইয়াছি এবং ব্যাধিগ্রস্ত অংশ দূর করিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু বাঙালী আমারই স্বজাতি এবং তাহাদের দোষ-ত্রুটির আমিও অংশভাগী। তাহাদের যেসব গুণ আছে, তাহার জন্যও আমি গর্বিত, সুতরাং বাঙালীদের দোষ-কীর্তন করিবার অধিকার আমার আছে।

আমাদের চোখের সম্মুখেই পৃথিবীতে নূতন ইতিহাস রচিত হইতেছে। বেশী দিন পূর্বের কথা নয়, চীনা ও তুর্কীরা পাশ্চাত্যের অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র ছিল। তাহারা অলস, দুর্বল, ক্ষয়গ্রস্ত জাতির দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইত। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেরিত নেতাদের পরিচালনায় তাহারা শতাব্দীর নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে, নিজেদের জড়তা ও নৈরাশ্য পরিহার করিয়াছে এবং জগতের বিস্ময়বিস্ফারিত চোখের সম্মুখে নবযৌবনের শক্তি লাভ করিয়াছে।

সুতরাং বাঙালী তথা ভারতবাসী—কেন পশ্চাৎপদ থাকিবে, তাহাদের জাতীয় জীবন কেন পূর্ণতা লাভ করিবে না, তাহার কোন কারণ আমি দেখিতে পাই না।

"এরিয়োপেজিটিকায়" কবি মিল্টনের গম্ভীর উদাত্ত বাণী আমার স্মৃতিপথে ভাসিয়া আসিতেছে—

"আমার মানসনেত্রে আমি একটি মহৎ জাতির নব অভ্যুদয় দেখিতেছি,—বীর্যশালী কেশরীর মতই নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া সে তাহার কেশর সঞ্চালন করিতেছে।"



নির্ঘণ্ট

পরিশিষ্ট (৩)

নির্ঘণ্ট

সঞ্চিত ধনের গুপ্ত সংবাদ জানিতেন। কিন্তু তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে পিতাকে কিছুই বলিয়া যাইতে পারেন নাই। একথা পূর্বে বলিয়াছি।

আমাদের বাড়ীর অন্দর মহলের উপরতলার (যাহা এখনও আছে) দরজা লোহার পাত দিয়া মোড়া, তাহার উপর বোল্ট্ বসানো। ইহার উদ্দেশ্য, ডাকাতেরা সহজে যাহাতে ঐ দরজা না ভাঙিতে পারে। এই উপরতলার কিয়দংশ এখনও "মালখানা" নামে অভিহিত হয়। আমার পিতা দেয়ালের স্থানে স্থানে গুপ্তধনের সন্ধানে খুঁড়িয়াছিলেন। কিন্তু কিছুই পান নাই, ঐ সমস্ত স্থান এখনও দেখা যায়, কেননা সেখানে নূতন ইট সুরকি বসাইয়া মেরামত করা হইয়াছিল। বহু বৎসর পরে আমার পিতার যখন অর্থসংকট উপস্থিত হয় এবং পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় হইতে থাকে, তখন আমার মাতা (যদিও সাধারণতঃ তিনি কুসংস্কারগ্রস্ত ছিলেন না) একজন 'গুণী'কে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার নির্দেশ অনুসারে সিঁড়ির নিচে একটি স্থান খনন করান, কিন্তু এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। আমি এই ব্যাপারে বেশ কৌতুক অনুভব করি। কেননা, আমার ঐ সব অতি-প্রাকৃত ব্যাপারে কখনই বিশ্বাস ছিল না।

আমার পিতা

প্রায় ২৫ বৎসর বয়সে আমার পিতা পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশুনা করার ভার গ্রহণ করেন। তিনি খুব মেধাবী ছিলেন। তিনি পারসী ভাষা জানিতেন, সংস্কৃত ও আরবীও কিছু জানিতেন। ইংরাজী সাহিত্যেও তাঁহার বেশ দখল ছিল এবং আমার বাল্যকালে তাঁহার মুখ হইতেই আমি প্রথম 'ইয়ং'-এর 'Night Thoughts' এবং 'বেকন'-এর 'Novum Organum' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম শুনি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ,' 'হিন্দুপত্রিকা,' 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এবং তাহার পূর্ববর্তী 'অমৃত-প্রবাহিনী' ও 'সোমপ্রকাশে'র তিনি নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। কেরী কৃত হোলী বাইবেলের অনুবাদ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ও 'রাজাবলী,' লসনের 'পশ্বাবলী' (জীবজন্তুর কথা) এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস'(১) তাঁহার লাইব্রেরিতে ছিল। সমসাময়িক যুগের তুলনায় আমার প্রপিতামহও বেশ শিক্ষিত লোক ছিলেন মনে হয়। ইহার একটি প্রমাণ, তিনি 'সমাচার দর্পণে'র নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। 'সমাচার দর্পণ' প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর হইতে মিশনারীগণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আমার বাল্যকালে আমাদের লাইব্রেরিতে এই সংবাদপত্রের ফাইল আমি দেখিয়াছি। বিলাতে ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং-এর সময়ে গ্রামের ভদ্র-লোকেরা যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন, আমার পিতাও কতকটা সেইভাবে জীবন

অর্থ সঞ্চিত করে ('ডেলী হেরাল্ড' হইতে কলিকাতার সংবাদপত্রে উদ্ধৃত বিবরণ—ফেব্রুআরি, ২৯শে, ১৯৩২)।

যদিও বর্তমান অনেক গ্রামে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক এবং কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির ব্যাঙ্কের সুবিধা আছে, তথাপি প্রাচীন রীতি অনুযায়ী অর্থ সঞ্চয়ের প্রথা এখনও বিদ্যমান।

ডাঃ এইচ. সিংহের 'Early European Banking in India' পৃঃ ২৪০ দ্রষ্টব্য।

(১) দ্বিভাষায় লিখিত পাঠ্যগ্রন্থ (১৮৪৩) লর্ড হার্ডিঞ্জের নামে উৎসর্গীকৃত।

আরম্ভ করেন। স্কোয়ার অলওয়ার্দির সংগে তাঁহার চরিত্রের সাদৃশ্য ছিল। তাঁহার অবস্থা সচ্ছল ছিল, সুতরাং নিজের রুচি অনুসারে চলিতে পারিতেন। কলিকাতার সংগেই তাঁহার বেশি যোগ ছিল এবং তিনি ঐ শহরের শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের সংগে মিশিতেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান প্রধান লোকদের সংগে তাঁহার পরিচয় ছিল। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৬০ খৃীষ্টাব্দের পূর্বে) আমার পিতা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি সংগীত ভাল বাসিতেন। এবং ওস্তাদের মত বেহালা বাজাইতে পারিতেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার বৈঠকখানায় সংগীতের 'জলসা' বসিত এবং পরবর্তী জীবনে স্বভাবতই তিনি সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সংগীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শেষোক্ত দুই জন বাংলাদেশে হিন্দু সংগীতের পুনরভ্যুদয়ের জন্য অনেক কাজ করিয়াছেন। আমার পিতা পৈতৃক সম্পত্তি পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া প্রথমেই ভদ্রাসন বাটীর সদর মহল ভাঙিয়া নূতন করিয়া নির্মাণ করেন। স্থাপত্যশিল্পেও তাঁহার বেশ সৌন্দর্যবোধ ছিল। দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা ও সি. এস. আই. উপাধিপ্রাপ্ত) আমাদের গ্রামের নিকটে সোলাদানা জমিদারি ক্রয় করেন। তিনি আমাদের বাড়ীতে দুই একদিনের জন্য পিতার আতিথ্য গ্রহণ করেন। সুন্দরবনের সীমানার নিকটবর্তী একটি গ্রামে এমন বাড়ী ও সুসজ্জিত বৈঠকখানা দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। কেননা, আমাদের বাড়ী ও বৈঠকখানা কলিকাতার যে কোন ধনীর বাড়ী ও বৈঠকখানার সংগে তুলনীয় ছিল।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমার পিতা ১৮৫০ খৃীঃ অঃ অর্থাৎ আমার জন্মের এগার বৎসর পূর্বে নিজের জমিদারিতে স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি "নব্য বাংগলার" ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সুতরাং, নিজের জেলায় শিক্ষা বিস্তারে তিনি একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। রাড়ুলিতে তিনিই বলিতে গেলে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহারই পার্শ্বে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। ৭৫ বৎসর পূর্বে এ সব বিদ্যালয় বাংলার অধিকাংশ স্থানেই বিরল ছিল এবং গ্রামের গৌরবস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইত। বর্তমানে এক খুলনা জেলাতেই ৪৫টা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, তা ছাড়া দুটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ এবং বালিকাদের জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ও আছে।

এই প্রসংগে ইংরাজী ভাষায় লিখিত 'আত্মচরিত' প্রচারের ৩ বছর পরে প্রকাশিত বাংলা ১৩৪০ সালের ৫ই ফাল্গুনের 'দেশ' পত্রিকায় সু-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র বাগল প্রদত্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। উহা হইতে আমার পিতার বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় মিলিবে ঃ—

"ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে কলিকাতায় প্রথম ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়। কিছু সময়ের মধ্যে এই শিক্ষা বাংলাদেশের সুদূর পল্লীতেও ছড়াইয়া পড়ে। সেকালে বিদ্যোৎসাহী লোকের বড় একটা অভাব ছিল না। তাঁহাদের চেষ্টায় গ্রামে পল্লীতে ইংরাজী বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর একটি লক্ষ্য

করিবার বিষয় বালিকা বিদ্যালয়ও তখন নানাস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পিতা হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় নিজ রাড়ুলিগ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানকার বালক বালিকাদের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দেন। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জন' হইতে এখানে যে সব অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে সে যুগে বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রচারের উদ্যোগে আয়োজন সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে।"

রাড়ুলি অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার

[**সংবাদ প্রভাকর**, ১০ ফেব্রুআরি, ১৮৫৮। ২৯ মাঘ, ১২৬৪]

আমরা নিম্নস্থ পত্রখানি অতি সমাদরপূর্বক প্রকটন করিলাম।

"কিয়দ্দিবস অতীত হইল জিলা যশোহরের অন্তর্গত রাড়ুলিগ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় এবং অন্যান্য কতিপয় মহোদয়গণের প্রযত্নে প্রোক্ত রাড়ুলি পল্লীতে গবর্নমেণ্ট সাহায্যকৃত একটি স্বদেশীয় ভাষার বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াবধি বালকবালিকারা যথাবিধি-ক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং সুশিক্ষার প্রভাবে তাহারা স্ব স্ব পঠিত বিষয়ে একপ্রকার ব্যুৎপন্নও হইয়াছে বটে, ফলতঃ অতি অল্পকালের মধ্যে এই রাড়ুলি বিদ্যালয়স্থ ছাত্রেরা যেরূপ কৃতকার্য হইয়াছে, অন্যত্র প্রায় সেরূপ শুনিতে পাওয়া যায় না। বিগত পৌষ মাসে জিলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব তথা খুলনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং অন্যান্য কতিপয় সদ্বিদ্যাশালী মহাত্মাগণ অত্র বিদ্যালয়ে শুভাগমন পুরঃসর বালকবালিকা-কুলের পরীক্ষা গ্রহণে যথোচিত সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে বিদ্যালয়ের সমুন্নতির বিস্তারিত বিবরণ করিতে হইলে এই বলা উচিত যে, বিদ্যালয়েব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সুনিয়মে শিক্ষাপ্রদান ও প্রস্তাবিত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের অবিচলিত অধ্যবসায় এবং গাঢ়তর উৎসাহই তাহার প্রধান কারণ।"

সংবাদ সাধুরঞ্জন, ২৪শে মে, ১৮৫৮। ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৫।

নিম্নস্থ বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিষয়টি অতি সমাদরপূর্বক প্রকটন করা গেল।

"গবর্নমেণ্টের আনুকূল্য প্রাপ্ত, যশোহরস্থ রাড়ুলির স্কুলের বালকাবলীর ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা বিগত বর্ষের সেপ্টেম্বর মাসে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ রায় মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে চারিজন বালক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ছাত্র হরিশ্চন্দ্র বসু, নবীনচন্দ্র ঘোষ কলিকাতাস্থ মেডিকেল কালেজে ও শীতলচন্দ্র বসু, পরেশনাথ রায়, যশোহরস্থ ইংরাজী স্কুলে আগামী ১লা মার্চ হইতে প্রবিষ্ট ও অব্যাঘাতে চারি বর্ষ পর্যন্ত ছাত্রবৃত্তি সম্ভোগে বিদ্যানুশীলন করিবেন। এই ছাত্রগণের অবলম্বিত অধ্যবসায়.সমধিক ফলোপধায়ক দর্শনে অন্যান্য ছাত্রগণের আশালতার উদ্দীপকতা বিদ্যাভ্যাসে একাগ্রতা জন্মিয়াছে। 'অল্পবয়স্ক

শিশুগণের অন্তঃকরণে পরিশ্রমের পুরস্কার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্তের অভিসন্ধি সংস্পর্শে বিদ্যাশিক্ষার একান্ত অনুরাগ সঞ্চার, সুতরাং না হওয়ার বিষয় কি? এত অল্প-কালের মধ্যে বিদ্যার্থিগণের এতদনুরূপ ফললাভ হইবেক ইহা মনোরথের অগোচর। বিদ্যালয় সংস্থাপনাবধি দিন গণনা করিলে ইহার বয়ঃক্রম দুই বৎসর অতীত হয় নাই, তাহার তুলনা এরূপ হওয়া কেবল উপদেষ্টাগণের সদুপদেশ শিক্ষাপ্রণালীর সুকৌশলেরি মাহাত্মই স্বীকার করিতে হইবে। সংস্কৃত কলেজের সুশিক্ষিত সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ শিক্ষাবিধান করিতেছেন। গবর্নমেণ্ট প্রদত্ত সম্পাদকীয় ভার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পরম বিদ্যোৎসাহী, বিশেষতঃ স্বদেশ ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি প্রত্যহ অন্ততঃ দুই ঘটিকা পর্যন্ত প্রগাঢ় উৎসাহ সহকারে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সদুপদেশ অমূল্য অসমুদ্র-সম্ভূত রত্ন-স্বরূপ, যে প্রকার দিনকরের কর নিস্তেজ বস্তুতে প্রতিফলিত হইয়া সেই বস্তু নয়ন-প্রফুল্লকর শোভায় শোভিত হয়, তদ্রূপ সুমধুর উপদেশাবলী বালকগণের অন্তঃকরণে নীত হইয়া তাহাদিগের জ্ঞানাভাব ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করে। স্কুলের অবস্থা ক্রমে যেরূপ সমুন্নতি হইতেছে তাহাতে তত্রত্য বালকবালিকারা ভাষা শিক্ষা বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হইবেক। আমরা বোধ করি অব্যাঘাতে তিন চারি বৎসর যথাবিধানে শিক্ষাকার্য সুসম্পন্ন হইলে বিদ্যালয়ের অনেকাংশে শ্রীবৃদ্ধি হইবেক। বিগত ১০ই ফেব্রুআরি তারিখে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার প্রশংসিত বাবু বিদ্যালয়ে আগমন ও নিয়মিতরূপে পরীক্ষা গ্রহণে প্রতিগমন করিতে করিতে ১২ই ফেব্রুআরি তারিখে প্রধান ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত মেং উডরো সাহেব মহোদয় বিদ্যালয়ে উপনীত হইয়া শিক্ষা সমাজের প্রচারিত পদ্ধতিক্রমে বালক বালিকার প্রত্যেককে এক এক করিয়া পরীক্ষা লইয়া অতীব সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তদনন্তর সম্পাদকবাবুর যত্নাতিশয্যবশতঃ সাহেব এই পল্লীর অনতিদূরবর্তী কাটিপাড়াস্থ গ্রাম্য স্কুল সন্দর্শন করিতে গিয়া-ছিলেন, তথায় চতুর্দিকে মনোহর পুষ্পোদ্যান পরিশোভিত সুখসেব্য বায়ু সেবিত সুবিস্তৃত সুসজ্জিত রমণীয় বিদ্যামন্দির দর্শন ও যথা কথঞ্চিৎ ছাত্রগণের একজামিন করিলেন। অতঃপর স্কুল সংস্থাপনকারী শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধর ঘোষ মহাশয়ের প্রযত্ন ক্রমে এই স্কুলটি গবর্নমেণ্টের তত্ত্বাবধারণে আনার প্রস্তাব হইয়াছে। বাবু বার্ষিক তিন শত টাকা চাঁদা দিতে সম্মত হইয়াছেন। এ প্রদেশের মধ্যে এস্থান সর্বপ্রধান, সকলে মনে করিলে যত্ন করিলে মাসিক এত চাঁদা সংগ্রহ হয় যে তদ্দ্বারা বিদ্যালয় স্কুল অথবা কলেজ সংস্থাপন ও অনায়াসে ব্যয় নিষ্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু মনের অনৈক্যতা, ধনের উন্মত্ততা, স্ব স্ব স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি কারণে বিঘ্ন বিঘটন করে, এইক্ষণে গবর্নমেণ্টের যত্নবারি বিতরিত হইলে স্কুলটি চিরস্থায়ী হইতে পারে।”

“রাড়ুলি অঞ্চল হইতে এক বন্ধু আমাকে জানাইয়াছেন,—হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী কিরূপ বিদ্যোৎসাহী ও স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন একটি ঘটনা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। হরিশ্চন্দ্র ১৮৫৮ সন হইতে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া

বাস করিতেন। তখন তিনি তাঁহার সহধর্মিণী ভুবনমোহিনীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বয়ং ভুবনমোহিনীকে বাংলা পাঠ শিক্ষা করিতে সহায়তা করিতেন।

হরিশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে শুধু বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যালয়টি এখন একটি দ্বিতল গৃহে অবস্থিত। হরিশ্চন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র বিশ্ববিশ্রুত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রাড়ুলি অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের জন্য বহু-সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার উপস্বত্বের কতক অংশ বালিকাদের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টি এখন আচার্য রায় মহাশয়ের মাতা ভুবনমোহিনীর নামে।"

এই স্থলে গত ষাট বৎসরে বাংলাদেশে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এই ষাট বৎসরের স্মৃতি আমার মনে জ্বলন্ত আছে।

আমার পিতার বার্ষিক ছয় হাজার টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু তাহার পূর্বে দুই পুরুষে আমাদের পরিবার যে সম্পত্তি ভোগ করিয়াছেন, এই আয় তাহার তুলনায় সামান্য, কেননা আমার প্রপিতামহ ও পিতামহ উভয়েই বড় চাকুরি করিতেন। আমার পিতা যে অতিরিক্ত সম্পত্তি লাভ করেন, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, তাঁহার বিবাহের সময় আমার পিতামহ আমার মাতাকে প্রায় দশ হাজার টাকার অলঙ্কার যৌতুক দিয়াছিলেন। আমার পিতার যে সব রূপার বাসন ছিল, তাহার মূল্যও কয়েক হাজার টাকা। আমার মনে পড়ে, আমার বাল্যকালে কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে একই সময় রূপার থালা, বাটি ইত্যাদিতে খাদ্য পরিবেষণ করা হইয়াছিল। আমার পিতা মোগল বাদশাহের আমলের সোনার মোহর সগর্বে আমাকে দেখাইতেন। আমার মাতার সম্মতিক্রমে তাঁহার অলঙ্কারের কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া অন্য লাভবান কারবারে লাগানো হয়। বস্তুতঃ, তাঁহার নামে একটি জমিদারিও ক্রয় করা হয়। আমার পিতা অর্থনীতির মূল সূত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, অলঙ্কারে টাকা আবদ্ধ রাখা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়; কেননা, তাহাতে কোন লাভ হয় না; তাঁহার হাতে যথেষ্ট নগদ অর্থও ছিল, সুতরাং তিনি লগ্নী কারবার করেন এবং কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাহাতে বেশ লাভ হইয়াছিল। ঐ সময়ে অল্প আয়ের লোকদের পক্ষে টাকা খাটাইবার কোন নিরাপদ উপায় ছিল না এবং চোর ডাকাতদের হাত হইতে চিরজীবনের সঞ্চিত অর্থ কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহা লোকের পক্ষে একটা বিষম উদ্বেগের বিষয় ছিল। এই কারণেই লোকে সঞ্চিত অর্থ ও অলঙ্কার মাটির নিচে পুঁতিয়া রাখিত।

সুতরাং যখন আমার পিতা নিজে একটি লোন আফিসের কারবার খুলিলেন, তখন গ্রামবাসীরা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ উহাতে স্থায়ী সুদে সাগ্রহে জমা দিতে লাগিল। আমার পিতার সততার খ্যাতি ছিল। এইজন্যও লোকে বিনা দ্বিধায় তাঁহার লোন আফিসে টাকা রাখিতে লাগিল। এইরূপে আমার পিতার হাতে নগদ

টাকা আসিয়া পড়িল। বহু বৎসর পরে এই ব্যবসায়ের জন্য আমার পিতা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। আমার পিতার মোট বার্ষিক আয় প্রায় দশ হাজার টাকা ছিল। এখনকার দিনে এই আয় সামান্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেকালে ঐ আয়েই তিনি রাজার হালে বাস করিতেন। ইহার আরও কয়েকটি কারণ ছিল।

আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসনকে কেন্দ্র করিয়া যদি চার মাইল ব্যাস লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যায়, তবে আমাদের অধিকাংশ ভূসম্পত্তি উহারই মধ্যে পড়ে। ইহা হইতেই সহজে বুঝা যাইবে, আমার পিতা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ স্কোয়ারদের মত বেশ সচ্ছলতা ও জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করিতে পারিতেন; কারণ এই যে, তিনি তাঁহার নিজের প্রজাদের মধ্যেই রাজত্ব করিতেন। আমাদের সদর দরজায় মোটা বাঁশের যষ্টিধারী ছয়জন পাইক বরকন্দাজ থাকিত। আমার পিতা তাঁহার কাছারি বাড়ীতে সকাল ৮টা হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বসিতেন, ঐ কাছারি যেন গম্‌গম করিত। তাঁহার এক পার্শ্বে মুন্সী অন্য পার্শ্বে খাজাঞ্চী বসিত এবং নায়েব গোমস্তারা প্রজা ও খাতকদের নিকট হইতে খাজনা লইত বা লগ্নী কারবারের টাকা আদায় করিত।

কাছারিতে রীতিমত মামলা-মোকদ্দমার বিচারও হইত। এই বিচারপ্রণালী একটু রুক্ষ হইলেও, উভয় পক্ষের নিকট মোটামুটি সন্তোষজনক হইত। কেননা, বাদী বিবাদীদের সাক্ষ্য বলিতে গেলে প্রকাশ্যেই গ্রহণ করা হইত। বিবাদের বিষয় সকলেরই প্রায় জানা থাকিত এবং যদি কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া বিচারকের চোখে ধুলা দিতে চেষ্টা করিত, তবে তাহা প্রায়ই ব্যর্থ হইত। আর এখনকার আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতি দেওয়ার যে প্রলোভন আছে, তখনকার দিনে তাহা ছিল না। অবশ্য, এই বিচারপ্রণালী দোষমুক্ত ছিল না। কেননা, তখনকার দিনে গ্রামবাসী জমিদারের সংখ্যা বেশী ছিল না এবং এই গ্রামবাসী জমিদারের নিকটেও অনেক সময় ঘুষখোর ও অসাধু নায়েবদের মারফতই যাইতে হইত। বলা বাহুল্য বাদী বা বিবাদীকে অধিকাংশক্ষেত্রেই নিজের সুবিধার জন্য এই নায়েবদিগকে ঘুষ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইত। তবে ঐ বিচারপ্রণালীর একটা দিক প্রশংসনীয় ছিল। রুক্ষ এবং সেকেলে "খারাপ" প্রথায় সুবিচার (বা অবিচার) করা হইত, কিন্তু তাহাতে অযথা বিলম্ব হইত না। আর ব্যাপারটা তখন তখনই শেষ হইয়া যাইত, তাহা লইয়া বেশী দূর টানাহেচড়া করিতে হইত না; অন্য একটি অধ্যায়ে আমি এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'পলাতক' জমিদার—পরিত্যক্ত গ্রাম—জলাভাব—গ্রামগুলি কলেরা ও ম্যালেরিয়ার জন্মস্থান

সেকালে অধিকাংশ জমিদারই আপন আপন প্রজাদের মধ্যে বাস করিতেন। যদিও তাঁহারা কখন কখন অত্যাচার করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের এই একটা গুণ ছিল যে, তাঁহারা প্রজাদের নিকট হইতে যাহা জোর জবরদস্তি করিয়া আদায় করিতেন, তাহা প্রজাদের মধ্যেই ব্যয় করিতেন, সুতরাং ঐ অর্থ অন্য দিক দিয়া প্রজাদের ঘরেই যাইত। কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে খুব অল্প কথায় এই ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন—

প্রজানামেবভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥

প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করিতেন—রবি যেমন পৃথিবী হইতে রস গ্রহণ করে, তাহা সহস্র গুণে ফিরাইয়া দিবার জন্য (বৃষ্টি প্রভৃতি রূপে)।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই জমিদারদের "কলিকাতা প্রবাস" আরম্ভ হয় এবং বর্তমানে ঐ ধনী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, ফরিদপুর, বরিশাল ও নোয়াখালির কতকগুলি বড় জমিদারি কলিকাতার ধনীদের হাতে যাইয়া পড়ে। সুতরাং ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, ঐতিহাসিক জেমস্ মিল বিলাতের কমন্স সভায় সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে ১৮৩১—৩২ খ্রীঃ সাক্ষ্যদানকালে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন,—

"জমিদারদের অধিকাংশই কি তাঁহাদের জমিদারিতে বাস করেন?—আমার বিশ্বাস, জমিদারদের অধিকাংশই জমিদারিতে বাস করেন না, তাঁহারা কলিকাতাবাসী ধনী লোক।

"সুতরাং জমিদারি বন্দোবস্তের দ্বারা একটি ভূস্বামী ভদ্র সম্প্রদায় সৃষ্টির যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে—আমি তাহাই মনে করি।

যোগীশ সিংহ বলিয়াছেন—"পূর্বে কারারুদ্ধ করিয়া খাজনা আদায়ের প্রথা ছিল। নিলামের প্রথা তাহা অপেক্ষা কম কঠোর হইলেও ইহার ফলে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর কুঠারাঘাত করা হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবার

২২ বৎসরের মধ্যে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ এমন কি অর্ধেক জমিদারি নীলামের ফলে কলিকাতাবাসী ভূস্বামীদের হাতে পড়িল।"(১)

এই নিন্দনীয় প্রথা দেশের যে কি ঘোর অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে পুষ্করিণী খনন এবং বাঁধ বা রাস্তা নির্মাণ করা এদেশের চিরাচরিত প্রথা ছিল। বাঁকুড়া জেলায় পূর্বে পানীয় জল এবং সেচন-কার্যের জন্য বড় বড় জলাধার খনন করা হইত। এখন সেগুলির কিরূপ দুর্দশা হইয়াছে, তাহা আমি পরে দেখাইব। নিম্নবঙ্গেও যে ঐরূপ সুব্যবস্থা ছিল তাহার কথাই আমি এখন বলিব। প্রাতঃস্মরণীয় রানী ভবানী তাঁহার বিস্তৃত জমিদারিতে অসংখ্য পুষ্করিণী খনন করান। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে যে সমস্ত হিন্দু সামন্তরাজগণ মোগল প্রতাপ উপেক্ষা করিয়া বাংলাদেশে প্রাধান্য স্থাপন করেন, তাঁহারা বহু সুবৃহৎ (কতকগুলি বড় বড় হ্রদের মত) পুষ্করিণী খনন করান। ঐগুলি এখনও আমাদের মনে প্রশংসার ভাব জাগ্রত করে। নিম্নবঙ্গে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকারী মুসলমান পীর ও গাজীগণ এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। প্রধানতঃ, এই কারণেই হিন্দুদের মনে তাঁহাদের স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে। তাহারা কেবল যে ঐ সব পীর ও গাজীর দরগায় 'সিন্নি' দেয়, তাহা নহে, তাহাদের নামে বার্ষিক মেলাও বসায়।

রাজা সীতারাম রায়ের পুষ্করিণী সম্বন্ধে ওয়েস্টল্যান্ড বলেন,—"১৭০ বৎসর পরেও উহাই জেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ জলাধার। ইহার আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৪৫০ গজ হইতে ৫০০ গজ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৫০ গজ হইতে ২০০ গজ। ইহাতে কোন সময়েই ১৮ ফুট হইতে ২০ ফুটের কম গভীর জল থাকে না। সীতারামের ইহাই সর্বপ্রধান কীর্তি এবং তিনি একমাত্র ইহার সঙ্গেই নিজের নাম—"রাম" যোগ করিয়াছিলেন।"—ওয়েস্টল্যান্ড, "যশোহর", ২৯ পৃঃ।(২)

---

(১) প্রথম প্রথম যে জেলায় জমিদারি সেখানে উহা নিলাম হইত না, 'বোর্ড অব রেভেনিউয়ের' কলিকাতার আফিসে নিলাম হইত। এই কারণে বহু জাল জুয়াচুরির অবসর ঘটিত এবং নিলামের কঠোরতা বৃদ্ধি পাইত। তখনকার "কলিকাতা গেজেটের" অধিকাংশই নিলামের বিজ্ঞাপনে পূর্ণ থাকিত। কখনও কখনও এজন্য অতিরিক্ত পত্রও ছাপা হইত।—সিংহ, "ইকনমিক অ্যানালস্", ফুটনোট, ২৭২ পৃঃ।

দক্ষিণ সাহাবাজপুর এবং হাতিয়াতে বহু পুষ্করিণী আছে। ঐ গুলি নির্মাণ করিতে নিশ্চয়ই বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে। পুষ্করিণীগুলির চারিদিকে সমুদ্রের লোনাজল প্রবেশ নিবারণ করিবার জন্য উচ্চ বাঁধ আছে।—"বাখরগঞ্জ", ২২ পৃঃ।

কাচুয়া হইতে অল্প দূরে কালাইয়া নদীর মুখের নিকটে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী নির্মাণ করিবার জন্য কমলার নাম বিখ্যাত। পুষ্করিণীটি এখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহা অবশেষ আছে তাহাতেই বুঝা যায়, জেলার মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা বড় পুষ্করিণী। বিখ্যাত দুর্গাসাগর হইতেও উহা আয়তনে বড়।—"বাখরগঞ্জ",—৭৪ পৃঃ।

(২) বেভারেজ তাঁহার "বাখরগঞ্জ" গ্রন্থে এইরূপ বড় বড় পুষ্করিণীর বিবরণ দিয়াছেন :—"এই পুষ্করিণী খনন করিতে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই পুষ্করিণীতে এখন জল নাই। কিন্তু কমলার মহৎকার্য ব্যর্থ হয় নাই। এই পুষ্করিণীর শুষ্ক তলদেশে এখন প্রচুর ধান হয় এবং ইহার চারিদিকের বাঁধের উপর তেঁতুল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষপূর্ণ, বাঁশঝাড় ঘেরা ৪০।৪৫টি কৃষকের গৃহ দেখা যায়। চারিদিকের জলাজমি হইতে ঊর্ধ্বে অবস্থিত এই সব বাড়ী দেখিতে মনোহর। একজন বিলুপ্ত-স্মৃতি বাঙালী রাজকুমারীর মহৎ অনুষ্ঠানের সাক্ষী

প্রাচীন জমিদারদের প্রাসাদোপম বড় বড় বাড়ী নির্মাণ করিতে নিপুণ রাজমিস্ত্রী ও স্থপতিদের অন্নসংস্থান হইত, স্থাপত্যশিল্পেরও উন্নতি হইত। কিন্তু বড় বড় অভিজাত বংশের লোপ এবং প্রধানতঃ তাহাদের বংশধরদের গ্রাম ত্যাগের ফলে ঐ সমস্ত শিল্পীরা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। অধিকাংশ প্রাচীন জমিদারদের সভায় সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ থাকিতেন, ইঁহারাও লোপ পাইতেছেন। পুরাতন পুষ্করিণী-গুলি প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং ঐ স্থান ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বৎসরের মধ্যে ৬ মাস হইতে ৮ মাস পর্যন্ত গ্রামে জলাভাবে অতি সাধারণ এবং কর্দমপূর্ণ ডোবার দ্বারা যে পানীয় জল সরবরাহ হয়, তাহা "গলিত জঞ্জাল" অপেক্ষা কোন অংশে ভাল নহে। এই সব স্থানে প্রতি বৎসর কলেরা ম্যালেরিয়াতে বহুলোকের মৃত্যু হয়। ঘন জঙ্গল ও ঝোপ ঝাড়ের দ্বারা রুদ্ধ-আলোক এই সব গ্রাম ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করে। যাহারা পারে, তাহারা সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করিয়া শহরে যাইয়া বাস করে। কলেজে শিক্ষিত সম্প্রদায় অন্যত্র কেরানীগিরি করিয়া জীবিকা অর্জন করে, সুতরাং তাহারাও গ্রামত্যাগী, ভদ্রলোকদের মধ্যে যাহারা অলস ও পরজীবী তাহারা এবং কৃষকগণই কেবল গ্রামে থাকে। গ্রামত্যাগী জমিদারগণ কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাসা বাঁধিয়া বর্তমান 'সভ্য জীবনে'র আধুনিকতম অভ্যাসগুলিও গ্রহণ করিয়াছেন।(৩)

এই সব সভ্য জমিদারদের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় স্বদেশজাত আসবাব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের "গ্যারেজে" "রোলস্ রয়েস" বা "ডজ" গাড়ী বিরাজ করে। আমি যখন এই কয়েক পংক্তি লিখিতেছি, তখন আমার মনে পড়িতেছে, একখানি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের কথা, ইহার পুরা এক পৃষ্ঠায় মোটরগাড়ীর বিজ্ঞাপন থাকে—উহার শিরোনামায় লিখিত থাকে—"বিলাস ও

আজ তাহাদের এই সুখ-ঐশ্বর্য!" কর্নাট অঞ্চলে জমিদারদের খনিত পুষ্করিণীসমূহের উল্লেখ করিয়া বার্কও উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।—"বাখরগঞ্জ", ৭৫—৭৬ পৃঃ।

(৩) ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। ইতিমধ্যেই গ্রামত্যাগী জমিদার দল সেখানে দেখা দিয়াছে।

"তালুকদারেরা প্রজাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতার মত, এই কথার এখন কি মূল্য আছে? আমি বলিতে বাধ্য যে, আমরা কোন কোন বয়স্ক প্রজাকে দেখিলাম, যাহারা সেকালের কথা এখনও স্মরণ করে। তখন তাহারা তালুকদারের আশ্রয়ে বাস করিত। এই তালুকদারেরা জমিদারিতেই বাস করিত। তাহাদের চক্ষু-কর্ণ সর্বদা সজাগ থাকিত এবং নিজেরা ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রজাদের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন করিতে দিত না। কিন্তু তাহারা গত ৩০ বৎসরের মধ্যে লক্ষ্ণৌ শহরে বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছে, আর নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি অধস্তন কর্মচারীরা তাহাদের জমিদারি চালাইতেছে।—গোইন,, "ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স"—২৬২-৬৩ পৃঃ।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "পল্লীসমাজে" বর্তমানকালের ভাব তাঁহার অননুকরণীয় ভাষা ও ভাবের দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছেন।

আর একখানি সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসে ("বিদ্যুৎলেখা"—প্রফুল্লকুমার সরকার), বাংলার পল্লীর 'ভদ্রলোক' অধিবাসীদের কি গভীর অধঃপতন হইয়াছে, নিম্ন শ্রেণীর লোকদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা তাহারা কিরূপে প্রাণপণে প্রতিরোধ করে, এমন কি পুষ্করিণী-সংস্কার পর্যন্ত করিতে দেয় না, এই সব কথা চিত্রিত হইয়াছে। এখানে নূতন ভাব ও আদর্শ লইয়া একজন সংস্কারপ্রয়াসী শিক্ষিত যুবক আসিয়াছেন, কিন্তু গ্রামবাসী গোঁড়ার দল তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিল।

ঐশ্বর্যের আধার।" এই বিজ্ঞাপন আমাদের পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন জমিদার ও ব্যারিস্টারদের মন প্রলুব্ধ করে।

বড় বড় ইংরাজ বণিক অথবা মাড়োয়ারী বণিকেরা এই সব বিলাস ভোগ করে বটে, কিন্তু তাহারা ব্যবসায়ী লোক। হয়ত ৫।৭টা জুট মিলের দালাল বা ম্যানেজিং এজেন্টরূপে তাহাদিগকে বজবজ হইতে কাঁকিনাড়া পর্যন্ত দৌড়াইতে হয়। সুতরাং তাহাদের দৈনিক কার্যের জন্য তাহাদিগকে দুই একখানি মোটর গাড়ী রাখিতে হয়।(৪) তাহারা যাহা ব্যয় করে, তাহা অপেক্ষা শত গুণ বা সহস্র গুণ অর্থ অর্জন করে। এবং বহুক্ষেত্রে তাহারা প্রকৃতই ধনোৎপাদক। কিন্তু আমাদের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন জমিদারগণ বা বারের বড় ব্যারিস্টারেরা পরজীবী মাত্র। তাহারা দেশের ধন এক পয়সাও বৃদ্ধি করে না, উপরন্তু দেশের কৃষকদের শোণিততুল্য অর্থ শোষণ করিয়া বাহিরে চালান দিবার তাহারাই প্রধান যন্ত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ললিত মাধব সেনগুপ্ত, এম. এ. ১৯৩০ সালের ৬ই জুলাইয়ের 'অ্যাড্ভান্স' পত্রে এই "পরিত্যক্ত গ্রাম" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"যদি কেহ বাংলার পল্লীতে গিয়া দুদিন থাকেন, তিনিই পল্লীবাসীদের জীবন-যাত্রার প্রণালী দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন। বস্তুতঃ, এখন পল্লীজীবনের প্রধান লক্ষণই হইতেছে—আলস্য। কোন গ্রামবাসী দিনের অধিকাংশ সময় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে, এ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। এমন কি ফসলের সময়েও তাহাকে তেমন উৎসাহী দেখা যায় না। সে তাহার পিতৃপিতামহের চাষের প্রণালী যন্ত্রচালিতবৎ অবলম্বন করে এবং ফসলের সময় গেলেই, আবার পূর্ববৎ আলস্যে কাল যাপন করে। বৎসরের পর বৎসর পুতুলের মত যেভাবে সে চাষ করিয়া আসিতেছে, সে চিন্তাও করে না—তাহা অপেক্ষা কোন উন্নততর প্রণালী অবলম্বন করা যায় কি না।

---

(৪) লর্ড কেবুল তাঁহার মৃত্যুসময়ে বার্ড এণ্ড কোংর কর্তা ছিলেন এবং ঐ কোম্পানি ১৩টি মিল এবং ১১টি জুট মিল কোম্পানি পরিচালনা করিত।

"যাহারা আজকাল মোটর গাড়ীতে ভ্রমণ করে, তাহাদের মধ্যে শতকরা দশজনও ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে, মোটর গাড়ী রাখিতে পারে না"—জজ ক্রফোর্ড; ইনি বর্তমান যুগের বিলাসিতার তীব্র সমালোচক। পাঁচ বৎসর পূর্বে বার্নেট নামক স্থানে তিনি বলেন,—"যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকে, তবে একজন কাউণ্টি কোর্ট জজেরও মোটর গাড়ী রাখিবার অধিকার নাই, কেননা কেবল মাত্র তাঁহার বেতন (বার্ষিক ১৫০০ পাউণ্ড) মোটর রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।"

জজ ক্রফোর্ড আরও বলেন, "আজকাল চারিদিকেই অমিতব্যয়িতার প্রভাব, যে সমস্ত লোক আদালতে আসে তাহারা নিজেদের ক্ষমতার অতিরিক্ত বিলাসে জীবন যাপন করে। লোকে ধারে বিবাহ করে এবং দেনায় ও মামলায় জীবন কাটায়।"

একজন শ্রমিক বালিকা ৪ শিলিং ১১ পেন্স মূল্যের দস্তানা পরিবে, ইহা তিনি কলঙ্কের ব্যাপার মনে করেন। এবং যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার জুতার মূল্য ১ পাউণ্ড, হ্যাট ১৩ শি. ১১ পে. এবং কোট ৫ গিনি, তিনি সত্যই মর্মাহত হইলেন।

ইংলণ্ডের মত ধনী দেশের পক্ষে যদি এই সব মন্তব্য প্রয়োগ করা হয়, তবে বলিতে হয়, আমাদের দেশে যাহারা মোটের গাড়ী ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে হাজারকরা একজনেরও ঐরূপ বিলাসিতা করিবার অধিকার নাই।

সুতরাং গ্রামের প্রধান লক্ষণই হইল আলস্য। আর আলস্যের স্বাভাবিক পরিণাম দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের পরিণামে কলহ, মামলা-মোকদ্দমা এবং অন্যান্য অভিযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। মানুষ সব সময়েই অলস হইয়া থাকিতে পারে না, তাহাকে কিছু-না-কিছু করিতেই হইবে। অলস মস্তিষ্কেই যত রকমের শয়তানি বুদ্ধির উদয় হয়। কাজেই পল্লীবাসীরা পরস্পরের সঙ্গে কলহ করে, একের বিরুদ্ধে অন্যকে প্ররোচিত করে এবং যাহারা তাহাদের আন্তরিক উপকার করিতে চেষ্টা করে, তাহাদেরই অনিষ্ট করে। এইরূপে তাহারা তাহাদের সময় ও অর্থের অপব্যয় করে,—যদি সেগুলি যথার্থ কাজে লাগানো যাইত, তবে পল্লীর প্রাণ-শোষণকারী বহু সামাজিক ও আর্থিক ব্যাধি দূর হইতে পারিত।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রামে শিক্ষালাভ—কলিকাতায় গমন—কলিকাতা—অতীত ও বর্ত্তমান

আমার নিজের জীবনের কথা আবার বলিতে আরম্ভ করিব। আমার দুই জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং আমি আমার পিতার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্যস্কুলে বাল্য শিক্ষালাভ করি। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যখন মাইনর বৃত্তি পরীক্ষায় পাস করেন, তখন এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইল যে আমার পিতার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে কথা পরে বলিব। আমার নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করি।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমি প্রথম কলিকাতায় আসি। তখন আমার মনে যে ভাব জাগিয়াছিল, তাহার স্মৃতি এখনও আমার মনে স্পষ্ট হইয়া আছে। আমার পিতা ঝামাপুকুর লেন এবং রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীর বিপরীত দিকে বাড়ী নেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেশবচন্দ্র সেন তখন সবেমাত্র তাঁহার নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পিতার বাসা ঐ সমাজের খুব নিকটে ছিল। দিগম্বর মিত্রের অতিথিপরায়ণতা বিখ্যাত ছিল। তাঁহার বন্ধুরা সর্বদাই সেখানে সাদরে অভ্যর্থিত হইতেন এবং কয়েক বৎসর পর্যন্ত আমার পিতা প্রায়ই সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। পিতা পরবর্তী জীবনে প্রায়ই আমাদের নিকট দিগম্বর মিত্র এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হেমচন্দ্র কর, মুরলীধর সেন প্রভৃতি তখনকার দিনের অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তির কথা বলিতেন।

আমি অগস্ট মাস মহানন্দে কলিকাতায় কাটাইলাম এবং প্রায় প্রতিদিনই নূতন নূতন দৃশ্য দেখিতাম। আমার চক্ষুর সম্মুখে এক নূতন জগতের দৃশ্য আবির্ভূত হইল। তখন নূতন জলের কল কেবল প্রবর্তিত হইয়াছে এবং শহরবাসীরা পরিস্কৃত জল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গোঁড়া হিন্দুরা অপবিত্রবোধে ঐ জল ব্যবহার করিতে তখনও ইতস্ততঃ করিতেছে। কিন্তু জলের বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষই শেষে জয়ী হইল। ক্রমে ক্রমে ন্যায়, যুক্তি এবং সুবিধাবোধ কুসংস্কারকে দূরীভূত করিল ও সর্বত্র উহার ব্যবহার প্রচলিত হইল। মাটির নিচের পয়ঃনালী নির্মাণ কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অবস্থা কেমন ছিল তাহার চিত্র যদি এখানকার লোকের নিকট কেহ অঙ্কিত করে, তবে তাহারা হয়তো তাহা চিনিতেই পারিবে না। শহরের উত্তরাংশে দেশীয় লোকের বসতিস্থানে রাস্তার দুইধারে খোলা নর্দমা ছিল, আর তাহা হইতে জঘন্য দুর্গন্ধ উঠিত। বাড়ীর সংলগ্ন পায়খানা-গুলি গলিত মলকুণ্ড ছিল বলিলেই হয়। ঐ গুলি পরিষ্কার করিবার ভার গৃহের অধিবাসীদের উপরই ছিল, আর সে ব্যবস্থা ছিল একেবারে আদিম যুগের। শহরবাসীরা অসীম ধৈর্যসহকারে মশা ও মাছির উপদ্রব সহ্য করিত।

সুয়েজ খাল তখন সবেমাত্র খোলা হইয়াছে। কিন্তু হুগলী নদীতে মাত্র কয়েকখানি সাগরগামী স্টীমার ছিল, তখনও অসংখ্য পালের জাহাজ ও তাহার মাস্তুলে হুগলী নদী আচ্ছন্ন। হাইকোর্ট এবং মিউজিয়ামের নূতন বাড়ী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখনও কলিকাতায় কোন চিড়িয়াখানা হয় নাই। তবে "মার্বেল প্রাসাদে"র রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ী একটা ছোটখাট চিড়িয়াখানা ছিল এবং বহু দর্শকের ভিড় সেখানে হইত। হুগলী নদীর ধারে তখন আধ ডজনেরও কম জুটমিল ছিল।(১)

মাড়োয়ারী কর্তৃক বাংলার অর্থনৈতিক বিজয়ের লক্ষণ তখনও স্পষ্ট দেখা দেয় নাই। এই বিজয় অবশ্য একটি প্রবল যুদ্ধে করা হয় নাই, ক্রমে ক্রমে ধীরে, শান্তভাবে তাহারা বাংলাদেশকে আর্থিক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছে।

এক শতাব্দী পূর্বে মতিলাল শীল, রামদুলাল দে, অক্রুর দত্ত এবং আরও অনেকে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে ক্রোড়পতি হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে শিবকৃষ্ণ দাঁ এবং রাজা হৃষীকেশ লাহার পূর্বপুরুষ—প্রাণকৃষ্ণ লাহা যথাক্রমে আমদানী লৌহ ব্যবসায়ে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ে প্রভূত ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পুরাতন হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিভাশালী ছাত্র ডিরোজিওর শিষ্য রামগোপাল ঘোষ, প্রসিদ্ধ বক্তা এবং রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তাঁহাকে বিলাতের এক পত্র "ভারতীয় ডেমস্থেনিস" এই আখ্যা দিয়াছিলেন। রামগোপাল ঘোষ তাঁহার অধিকাংশ সহাধ্যায়ীর মত সরকারী চাকুরি গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হন নাই। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন এবং একজন ইংরাজ অংশীদারের সঙ্গে 'কেলসাল ও ঘোষ' নামে ফার্ম খুলেন।(২) রামগোপাল ঘোষের বন্ধু ও সতীর্থ প্যারীচাঁদ মিত্র সরকারী চাকুরি অপেক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্যই বরণীয় মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসায় ছিল। ব্রিটিশদের আগমনের প্রথম সময় হইতেই বাঙালীরা ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ফার্মসমূহের 'বেনিয়ান' (মুৎসুদ্দি) ছিলেন এবং এই উপায়ে তাঁহারা বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি, তখন পর্যন্ত গোরাচাঁদ দত্ত, ঈশান বসু এবং অন্যান্য বিখ্যাত 'বেনিয়ান'দের স্মৃতি বাঙালীদের মধ্যে জাগ্রত ছিল। কিন্তু এই সব প্রথম আমলের বাঙালী মহাজন এবং বেনিয়ানেরা নিজেদের বংশাবলীর জন্য ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারি কিনিবার প্রলোভনে সহজেই তখনকার ধনীদের মন আকৃষ্ট হইত। আর এক দিকে "সূর্যাস্ত আইন" এবং

---

(১) ১৮৬০—৭০ এই দশ বৎসরে ৫টা মিল ৯৫০টি তাঁতসহ কার্য করিতেছে।—ওয়ালেশ, "রোমান্স অব জুট", ২৬ পৃঃ।

(২) ছাত্রাবস্থাতেই অবকাশ সময়ে ঘোষ বাজারের অবস্থা এবং দেশের উৎপন্ন দ্রব্যজাতের বিষয় আলোচনা করিতে থাকেন। ২০ বৎসর বয়সের পূর্বেই তিনি মাল আমদানি শুল্কের সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রথমে বেনিয়ান, পরে অংশীদার রূপে একটি ইউরোপীয় ফার্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি নিজের ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁহার ফার্মের নাম হইল আর. জি. ঘোষ এণ্ড কোং—রেঙ্গুনে ও আকিয়াবে তাঁহার কোম্পানির শাখা ছিল। তিনি ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করেন এবং বহু অর্থ উপার্জন করেন। বাকলাণ্ড—"Bengal under the Lt. Governors" —১০২৪ পৃঃ।

অন্য দিকে মালিকদের আলস্য, বিলাসিতা ও উচ্ছৃংখলতার জন্য জমিদারিও সর্বদা নিলামে চড়িত। জমিদারির প্রতিষ্ঠাতারা সাধারণতঃ স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন, নিজেদের শক্তিতে জমিদারি করিতেন, সুতরাং তাঁহারা প্রায়ই উচ্ছৃংখল স্বভাবের লোক হইতেন না। কিন্তু তাঁহাদের বংশধরেরা "রূপার ঝিনুক" মুখে লইয়াই জন্মগ্রহণ করিত, নিজের চেষ্টায় কিছুই তাহাদের করিতে হইত না এবং ইহাদের চারিদিকে মোসাহেব ও পরগাছার দল ঘিরিয়া থাকিত। সুতরাং তাহারা যে বিলাসী ও উচ্ছৃংখল হইত, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। তাহারা নিজেদের মানসিক উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করিত না, কেবল বিলাস-ব্যসনে ডুবিয়া থাকিত। "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।" ডাঃ জনসনকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়,—"জ্যেষ্ঠাধিকারের পরিণাম কি?" তিনি উত্তর দেন যে, "ইহাব ফলে পরিবারে কেবল একজন নির্বোধকেই সৃষ্টি করা হয়।" কিন্তু হিন্দুদের এবং ততোধিক মুসলমানদের মধ্যে উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় পৈতৃক সম্পত্তি অসংখ্য সমান অংশে বিভক্ত হয় এবং তাহার ফলে অসংখ্য মূঢ়, নির্বোধ এবং উচ্ছৃংখলের আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত হয়।

যাঁহারা ইউরোপীয়দের গদির বেনিয়ান ছিলেন, অথবা যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা যে পরিশ্রমী, কর্মঠ, উদ্যোগী ও সহিষ্ণু মাড়বার, যোধপুর ও বিকানীরের অধিবাসীদের দ্বাবা ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের সময়েই বড়বাজারের অনেক অংশ তাহাদের হাতে যাইযা পড়ে। কিন্তু তখনও কতকগুলি বড় বড় বাঙালী ব্যবসায়ী ছিল, যাহাদের পূর্বপুরুষরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব সহিত কারবাব করিয়াছিলেন।

কিন্তু সুয়েজ খাল খোলার পর হইতে প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসায়ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইল। ইহার ফল কিরূপ হইয়াছে, তাহা কলিকাতার ১৮৭০ সালের আমদানি রপ্তানির হিসাবের সঙ্গে ১৯২৭—২৮ সালেব হিসাবের তুলনা করিলেই বুঝা যায়।(৩) লণ্ডন, লিভারপুল এবং গ্লাসগো বোম্বাই ও কলিকাতার নিকটতর হইল। আর রেলওয়ের দ্রুত বিস্তৃতি ও তহাব সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরের স্টীমার সার্ভিস—সেই নৈকট্য আরও বৃদ্ধি করিল। বড়বাজাব ও ক্লাইভ স্ট্রীট এখন

(৩) কলিকাতার বন্দরে মোট আমদানী পণ্যজাতের মূল্য (গবর্নমেণ্ট স্টোর্স ব্যতীত) :—

	টাকা		টাকা
১৮৭০—৭১	১৬,৯৩,৯৮,১৮০	১৯২৭—২৮	৮৩,৫৯,২৪,৭৩৪

কলিকাতার বন্দর হইতে মোট রপ্তানী পণ্যজাতের মূল্য (গবর্নমেণ্ট স্টোর্স ব্যতীত) :—

	১৮৭০—৭১	১৯২৭—২৮
ভারতীয় পণ্যদ্রব্য	২২,৫৭,৮২,৯৩৫	১৩৭,৬৭,৩৮,৭৭৯
বিদেশী পণ্যদ্রব্য	২৯,৩৮,৫৫৩	৭০,৯৫,৮২২
মোট—	২২,৭৭,২১,৪৮৮	১৩৮,৩৮,৩৪,৬০১

উহা হইতে দেখা যাইবে যে, আমদানি ও রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের মূল্য প্রায় ছয় গুণ বাড়িয়াছে।

মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া ব্যবসায়ীতে পূর্ণ এবং বাঙালীরা বলিতে গেলে স্বেচ্ছাক্রমেই বাণিজ্যজগৎ হইতে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত হইয়াছে। বড়বাজারের দক্ষিণ অংশের যেখানে রয়েল এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্ক ও শেয়ার বাজার আছে, সেখানে ইউরোপীয় বণিকদের প্রাধান্য, কিন্তু সেখানে প্রত্যহ যে কোটি কোটি টাকার কারবার চলিতেছে তাহার সঙ্গে মড়োয়ারী ও ভাটিয়াদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই অঞ্চলের, তথা বড়-বাজারের জমির স্বত্ব পর্যন্ত বাঙালীদের হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে। অভাবে পড়িয়াই বাঙালীকে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইয়াছে। একটা জাতির জীবনে যে দুর্লভ সুযোগ আসে, তাহা এইভাবে কাড়িয়া লইতে দেওয়া হইল। বাংলা তাহার সুযোগ চিরকালের জন্য হারাইয়াছে। তাহার প্রাচীন অভিজাত বংশের বংশধরগণ এবং ভদ্রলোক সম্প্রদায় তাহাদের নিজের জন্মভূমিতেই গৃহহীন ভবঘুরে হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহারা হয় অনশনে আছে, অথবা সামান্য বেতনে কেরানীগিরি করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেছে।

এখন আমার নিজের কথা বলি। আমার সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করাতে, তাঁহাকে শিক্ষা শেষ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিতে হইল। আমার অগ্রজ এবং আমি এম. ই. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। আমার পিতার পক্ষে এখন একটা গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইল। তিনি সাধারণ পল্লীবাসী ভদ্রলোকের চেয়ে বেশী শিক্ষিত ছিলেন এবং কাব্য সাহিত্য প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ছেলেরাও যাহাতে তৎকালীন উচ্চতম শিক্ষা পায়, এজন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। তখনকার দিনে আমাদের গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিতে নৌকায় ৩।৪ দিন লাগিত। কিন্তু বর্তমান রেলওয়ে ও স্টীমারযোগে পথের দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে, এখন ১৪ ঘণ্টায় আমাদের গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসা যায়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শনাধীনে কোন প্রাসাদতুল্য হোটেল বা 'মেস' ছিল না। আমার পিতার সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ ছিল। প্রথম, একজন শিক্ষক অভিভাবকের অধীনে কলিকাতায় তাঁহার ছেলেদের জন্য একটি পৃথক বাসা রাখা; দ্বিতীয়, গ্রাম হইতে নিজেরাই কলিকাতায় আসিয়া বাস করা এবং স্বয়ং ছেলেদের তত্ত্বাবধান করা। কিন্তু এই শেষোক্ত পথেও অত্যন্ত অসুবিধা ছিল। আমার পিতা বড় জমিদার ছিলেন না এবং উপযুক্ত বেতন দিয়া কোন বিশ্বস্ত কর্মচারীর উপর গ্রামের সম্পত্তির ভার ন্যস্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার জমিদারি কতকগুলি ছোট ছোট তালুকের সমষ্টি ছিল এবং তিনি ব্যাঙ্কিং ও মহাজনীর কারবারও আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত কারবারে তিনি সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া বহু লোককে টাকা ধার দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে গ্রামে থাকিয়া ঐ সমস্ত সম্পত্তি ও কারবার নিজে দেখা অপরিহার্য ছিল। দীর্ঘকালের জন্য গ্রাম ছাড়িয়া দূরে বাস করা তাঁহার পক্ষে স্বভাবতই ঘোর ক্ষতি-কর। কোন্ পথ অবলম্বন করা হইবে, তাহা লইয়া আমাদের পরিবারে আলোচনা চলিতে লাগিল। আমার মনে আছে, পিতা ও মাতার মধ্যে ইহা লইয়া প্রায়ই আলোচনা হইত এবং এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত মীমাংসা করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন

ছিল। অবশেষে স্থির হইল যে, পিতামাতাই ছেলেদের লইয়া কলিকাতায় থাকিবেন, অন্যথা অল্পবয়স্ক ছেলেদের পক্ষে বিদেশে বাসা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া থাকা অসম্ভব।

আমার পিতা তাঁহার পল্লীজীবনের একটি অভাবের কথা বলিয়া প্রায়ই ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। পল্লীর যে ভদ্রসমাজের মধ্যে তাঁহাকে বাস করিতে হইত, তাহার বিরুদ্ধে তিনি অনেক সময়ই অভিযোগ করিতেন। পল্লীর ভদ্রলোকেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস করিতেন। হাফেজ, সাদি এবং বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিকদের গ্রন্থ পাঠে যাঁহার মন ও চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, যিনি রামতনু লাহিড়ীর পদমূলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তিনি শিক্ষায় অর্ধশতাব্দী পশ্চাৎপদ, কুসংস্কার-গ্রস্ত ও গোঁড়ামিতে পূর্ণ লোকদের সংসর্গে আনন্দলাভ করিবেন, ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহা নব্য বাংলার মন অধিকার করিয়াছিল এবং আমার পিতা এ বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ কার্যতঃ প্রমাণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। আমাদের গ্রামের স্কুলে মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ নামক একজন পণ্ডিত ছিলেন। টোলে-পড়া শিক্ষিত ব্রাহ্মণ হইলেও, তিনি তাঁহার পৈতা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই পণ্ডিত সহজেই বিধবা বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন।

প্রাচীন ও নবীন

এই "ধর্ম-বিরুদ্ধ" বিবাহের কথা দাবানলের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং শীঘ্রই যশোহরে আমার পিতামহের কানে যাইয়া পৌঁছিল। পিতামহ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, সুতরাং এই 'ঘোর অপরাধে'র কথা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। তিনি পাল্কির ডাক বসাইয়া তাড়াতাড়ি যশোহর হইতে রাড়ুলিতে আসিলেন এবং বিধবা বিবাহ বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। আমার পিতাকে বাধ্য হইয়া এই আদেশ মানিতে হইল এবং বিধবা বিবাহ দেওয়া আর ঘটিল না।

আমার পিতামহের শ্রাদ্ধে, পার্শ্বস্থ গ্রামের বহুলোক ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার করিল; কেননা, আমার পিতা তাহাদের মতে 'ম্লেচ্ছ' হইয়া গিয়াছিলেন। এমন কথাও প্রচারিত হইল যে, জনৈক প্রতিবাসীর হারানো বাছুরটিকে প্রকৃতপক্ষে হত্যা করিয়া চপ কাটলেট ইত্যাদি সুখাদ্য রন্ধনপূর্বক টেবিলে পরিবেষণ করা হইয়াছে। সাতক্ষীরার জমিদার উমানাথ রায় একটা ছড়া বাঁধিয়াছিলেন, তখনকার দিনে ঐ ছড়া খুব লোকপ্রিয় হইয়াছিল। ছড়ার প্রথম অন্তরাটি এইরূপ ঃ—

"হা কৃষ্ণ, হা হরি, এ কি ঘটাইল,
রাড়ুলি টাকীর(৪) ন্যায় দেশ মজাইল।"

---

(৪) টাকীর (২৪ পরগনা) কালীনাথ মুন্সী রামমোহন রায়ের সংস্কার আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন এবং সেই কারণে গ্রামেব গোঁড়াবা তাঁহার উপর খড়্গ-হস্ত ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় শিক্ষালাভ

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমার পিতামাতা স্থায়িভাবে কলিকাতায় আসিলেন এবং ১৩২নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ী ভাড়া করিলেন। আমরা এই বাড়ীতে প্রায় দশ বৎসর বাস করিয়াছিলাম।(১) আমার বাল্যকালের সমস্ত স্মৃতিই ঐ বাড়ী এবং চাঁপাতলা নামে পরিচিত শহরের ঐ অঞ্চলের সঙ্গে জড়িত। আমার পিতা আমাকে ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করিয়াছিলেন। হেয়ার স্কুল তখন ভবানীচরণ দত্তের লেনের সম্মুখে একটি একতলা বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। এখন ঐ বাড়ী প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

আমার সহাধ্যায়ীরা যখন জানিতে পারিল যে, আমি যশোহর হইতে আসিয়াছি, তখন আমি তাহাদের বিদ্রূপ ও পরিহাসের পাত্র হইয়া উঠিলাম। আমাকে তাহারা 'বাঙাল' নাম দিল এবং মন্দভাগ্য পূর্ববঙ্গবাসীদের যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে বলিয়া শোনা যায়, তাহার সবই আমার ঘাড়ে চাপানো হইল। এক শতাব্দী পূর্বে স্কটল্যাণ্ডের বা ইয়র্কশায়ারের কোন গ্রাম্য বালক তাহার কথার বিশেষ 'টান' এবং ভাব-ভঙ্গির বিশেষত্ব লইয়া যখন লণ্ডন শহরের বালকদের মধ্যে উপস্থিত হইত, তখন তাহার অবস্থাও কতকটা এই রকমই হইত। তখনকার দিনে জাতীয় জাগরণ বলিয়া কিছুই হয় নাই; সুতরাং অল্প লোকেই জানিত যে, আমার জেলা এমন দুই জন মহাযোদ্ধাকে জন্ম ও আশ্রয় দিয়াছে—যাঁহারা মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। অন্যথা বিদ্রূপকারীদিগকে আমি এই বলিয়া নিরুত্তর করিতে পারিতাম যে, রাজা প্রতাপাদিত্যের সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রসমূহ আমার গ্রামের অতি নিকটে এবং রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী মহম্মদপুর আমার জেলাতেই অবস্থিত। বাংলার তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত কবি এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্মদাতা "বাংলার মিল্‌টন" আমাদেরই গ্রামের দৌহিত্র এবং তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র আমাদের জেলাতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং স্তন্যপানে পুষ্ট হন—এসব কথা বলিয়াও আমি বিদ্রূপকারীদের নিরস্ত করিতে পারিতাম।

কলিকাতা আসিবার পূর্বে আমার মানসিক উন্নতি কিরূপ হইয়াছিল, সেকথা এখানে একটু বলিব। পিতার সঙ্গে আমাদের (আমি ও আমার ভাইদের) সম্বন্ধ সরল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। বই পড়া অপেক্ষা পিতার সঙ্গে কথা বলিয়া আমরা অনেক বিষয় বেশী শিখিতাম। তাঁহার নিকটে গিয়া কথাবার্তা বলিতে ও গল্পাদি করিতে তিনি আমাদের সর্বপ্রকার সুযোগ দিতেন। আমি অনেক সময়

---

(১) ঐ বাড়ীর এখনও সেই পুরাতন নম্বর আছে।

দেখিয়াছি, পিতা ও পুত্রের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান, পুত্র পিতাকে ভয় করিয়া চলে, দুই জনের মধ্যে যেন একটা রুক্ষ নীরবতার সম্বন্ধ বর্তমান। মাতা অথবা পরিবারের কোন বন্ধু পিতা ও পুত্রের মধ্যে অনেক সময়েই মধ্যস্থের কার্য করেন। আমার পিতা সৌভাগ্যক্রমে চাণক্য পণ্ডিতকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন।

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ॥

ইহাই চাণক্যের উপদেশ। কলিকাতা আসার পূর্বে আমি যখন গ্রাম্যস্কুলে পড়িতাম এবং আমার বয়স মাত্র নয় বৎসর, সেই সময়ে ইতিহাস ও ভূগোলের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। একদিন পিতার ভূগোলের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে আমার মনে ইচ্ছা হইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সিবাস্টপুল কোথায়? তিনি বলিলেন,—'কি সিবাস্টপুলের কথা বলিতেছ? ইংরাজেরা ঐ শহর কিরূপে অবরোধ করিল, তাহা আমি যেন চোখের সম্মুখে দেখিতেছি।' এই উত্তর শুনিয়া আমি নীরব হইলাম।

আর একবার ইংরাজের দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধের কথা বলিতে গিয়া তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেন, যাহা আমাদের যুবকদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। স্যার কলিন কাম্প্‌বেল (পরে লর্ড ক্লাইভ) তখন ছুটিতে আছেন এবং এডিনবার্গ ফিলজফিক্যাল ইনস্টিটিউটে বসিয়া সংবাদ-পত্র পড়িতেছেন। ইণ্ডিয়া অফিস হইতে তারযোগে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি ভারতে যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত আছেন কিনা? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"হাঁ"। কয়েক মিনিট পরেই আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কখন তিনি যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন? তিনি উত্তর দিলেন "এই মুহূর্তে!"

আমার পিতার মুখ হইতেই আমি প্রথম শিখি যে, প্রাচীন ভারতে গো-মাংস ভক্ষণ বেশ প্রচলিত ছিল এবং সংস্কৃতে অতিথির এক নাম হইল "গোঘ্ন" (যাঁহার কল্যাণার্থ গোহত্যা করা হয়)।(২) আমার মনে পড়ে তাঁহার মুখেই এই দুইখানি বহির নাম আমি প্রথম শুনি (Young's 'Night Thoughts' and Bacon's 'Novum Organum')। নাম দুইটি আমার কাছে অর্থহীন বোধ হইয়াছিল, ইহা আমি স্বীকার করিতেছি। কয়েক বৎসর পরে আলবার্ট স্কুলে আমি যে সব গ্রন্থ পুরস্কার পাই, তাহার মধ্যে একখানি ছিল এই 'Night Thoughts'. আমার মন কৌতূহলপ্রবণ ছিল। পড়াশুনাতেও আমার অনুরাগ ছিল। সেইজন্য আমি প্রায়ই পিতার গ্রন্থাগারের বইগুলি নাড়াচাড়া করিতাম। জন্‌সনের ডিক্সনারি দুই কোয়ার্টো ভ্যলুম, টড কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই বইখানি আমার চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রাচীন ও বিখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা হইতে যে সব উদ্ধৃতাংশ ছিল, তাহা আমার খুব ভাল লাগিত। আমি এই গ্রন্থের পাতা

---

(২) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কয়েকটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে "Beef Eating in Ancient India"(চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং); "প্রাচীন ভারতে গো-মাংস" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উল্টাইতাম এবং উদ্ধৃতাংশ মুখস্থ করিতাম, যদিও "Shak." 'Beau. and Fl'. এই সব সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ আমি বুঝিতাম না। একদিন আমি নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি মুখস্থ করিলাম—

"Ignorance is the curse of God, knowledge the wing wherewith we fly to heaven."—Shak. আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শুনিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন।

সেক্সপীয়রের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল এবং বাল্যকালে আমি যেটুকু পড়িয়াছিলাম, তাহার ফলেই অমর কবির নাটকের প্রতি—বিশেষতঃ, বিয়োগান্ত নাটকের প্রতি—আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল। স্কুলে আমার ছাত্রজীবনের কতকগুলি ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকেরা আমাদের পরীক্ষক থাকিতেন। প্যারীচরণ সরকার আমাদের ভূগোলের এবং মহেশচন্দ্র ব্যানার্জি ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন। এই দুইটি বিষয় আমার খুব প্রিয় ছিল, এবং সহাধ্যায়ীদের মধ্যে আমিই এই দুই বিষয়ে বেশী নম্বর পাইতাম। পর পর দুই বৎসর মৌখিক পরীক্ষায় মহেশ বাবুর নিকট আমি পুরা নম্বর পাইলাম। প্রশ্ন করা মাত্র আমি সন্তোষ-জনক ভাবে তাহার উত্তর দিতাম। একবার তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"তোমার বাড়ী কোথায়?" আমি বলিলাম "যশোহর"। এই উত্তরে তিনি বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, মনে হয়।

হেয়ার স্কুল

বর্তমানে যেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ অবস্থিত, পূর্বে সেখানে খোলা ময়দান ছিল এবং এটি আমাদেব খেলার মাঠরূপে ব্যবহৃত হইত। স্থানের সঙ্কুলান না হওয়াতে ১৮৭২ খৃীষ্টাব্দে হেয়ার স্কুল নূতন বাড়ীতে (এখন যে বাড়ীতে আছে) স্থানান্তরিত হয়। বিদ্যালয় গৃহের একটি ক্লাসের দেয়ালে গাঁথা মর্মরফলকে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কয়েক লাইন ইংরাজী কবিতা আছে। উহা ডি. এল. রিচার্ডসনের রচিত।

"Ah ! warm philanthropist, faithful friend,
Thy life devoted to one generous end :
To bless the Hindu mind with British lore,
And truth's and nature's faded lights restore !"

—হে পরোপকারী বিশ্বস্ত বন্ধু, তোমার জীবন একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সে উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ জাতির জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা হিন্দুজাতির মনকে জাগ্রত করা এবং সত্যের—তথা প্রকৃতির যে আলোক তাহাদের মনে ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনঃ প্রদীপ্ত করা।

কবিতাটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল এবং এখনও আমি উহা অক্ষরে অক্ষরে আবৃত্তি করিতে পারি।

তখন গিরিশচন্দ্র দেব হেয়ার স্কুলের এবং ভোলানাথ পাল প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। গবর্নমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত এই দুই স্কুল তখন বাংলাদেশের মধ্যে প্রধান বিদ্যালয় ছিল এবং উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় কোন্ স্কুলের ছাত্র প্রথম স্থান লাভ করিবে তাহা লইয়া বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। তখনকার দিনে কলিকাতায়, শুধু কলিকাতায় কেন, সমস্ত বাংলায় বে-সরকারী স্কুলের সংখ্যা খুব কম ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপালরূপে জেমস সাট্‌ক্লিফ হেয়ার ও হিন্দু উভয় স্কুলের কর্তা ছিলেন এবং তিনি প্রতি শনিবার নিয়মিতভাবে আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন। আমার পড়াশুনার বেশ অভ্যাস ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া আমি পুস্তক-কীট ছিলাম না। স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকে আমার জ্ঞান-তৃষ্ণা মিটিত না। আমার বই পড়ার দিকে খুব ঝোঁক ছিল এবং যখন আমার বয়স মাত্র ১২ বৎসর সেই সময় আমি শেষরাত্রে ৩টা, ৪টার সময় উঠিয়া কোন প্রিয় গ্রন্থকারের বই নির্জনে বসিয়া পড়িতাম। পরে আমি এই অভ্যাস ত্যাগ করি; কেননা, ইহাতে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়, লাভও বিশেষ কিছু হয় না। এখন পর্যন্ত ইতিহাস ও জীবনচরিত আমার খুব প্রিয় জিনিস। চেম্বারের জীবনচরিত আমি কয়েকবার আগাগোড়া পড়িয়াছি, নিউটন ও গ্যালিলিওর জীবনী আমার বড় ভাল লাগিত, যদিও সে সময়ে জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁহাদের দানের মহিমা আমি বুঝিতে পারিতাম না। স্যার উইলিয়ম জোন্স, জন লেডেন এবং তাঁহাদের ভাষাতত্ত্বের অগাধ জ্ঞান আমার মনকে প্রভাবান্বিত করিত। ফ্রাঙ্কলিনের জীবনীও আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। জোন্সের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার মাতার সেই উক্তি—'পড়িলেই সব জানিতে পারিবে'—আমি ভুলি নাই। আমার বাল্যকাল হইতেই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আমাকে খুব আকৃষ্ট করিতেন এবং ১৯০৫ সালে আমি যখন দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যাই, সেই সময় তাঁহার একখানি 'আত্মচরিত' সংগ্রহ করিয়া বহুবার পাঠ করি। পেন্সিলভেনিয়া প্রদেশের এই মহৎ ব্যক্তির জীবনী চিরদিনই আমার নিকট আদর্শ স্বরূপ ছিল—কিরূপে সামান্য বেতনের একজন কম্পোজিটার হইতে তিনি নিজের অদম্য অধ্যবসায় ও দুর্জয় শক্তির দ্বারা দেশের একজন প্রধান ব্যক্তিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন, তাহা আমি সবিস্ময়ে স্মরণ করিতাম।

ব্রাহ্ম সমাজ

কতকটা আশ্চর্যের বিষয় হইলেও, বাল্যকাল হইতেই আমি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। নানা কারণে ইহা ঘটিয়াছিল। আমার পিতা বাহ্যতঃ প্রচলিত হিন্দুধর্মে নামমাত্র বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু অন্তরে পূর্ণরূপে সংস্কারবাদী ছিলেন। আমার পিতার গ্রন্থাগারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার খুব সমাদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির রচনা ও উপদেশ ক্রমে ক্রমে আমার মনে ধর্মভাবের বীজ বপন করিয়াছিল। কোন শক্তিশালী ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব আমার মনের ধর্মবিশ্বাস

গড়িয়া তোলে নাই। কোন অপৌরুষেয় ধর্মে আমি স্বভাবতঃই বিশ্বাস করিতাম না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ফ্রান্সিস উইলিয়াম নিউম্যানের রচনাবলী, ফ্রান্সেস পাউয়ার কব্ এবং রাজনারায়ণ বসুর পত্রাবলী, আমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 'জার্মান স্কুলে'র অন্যতম প্রতিনিধি ষ্ট্রস বাইবেলের যে নব্য সংস্কার-মূলক আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাও আমার মনে লাগিত। ষ্ট্রস প্রণীত 'Life of Christ the Man' গ্রন্থে খ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী বর্জিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাচার্যগণের বিশেষ প্রিয় ছিল। রেনানের 'Life of Jesus' গ্রন্থকেও এই পর্যায়ে ফেলা যায়। আমার পরিণত বয়সে মার্টিনের 'Endeavours After the Christian Life'এবং 'Hours of Thought' থিওডোর পার্কার ও চ্যানিংএর রচনাবলী আমার নিত্য সহচর ছিল। বিশপ কোলেনসোর The Pentateuch Critically Examined' নামক গ্রন্থ আমার পড়িবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু অন্য গ্রন্থে এই পুস্তকের যে উল্লেখ আছে, তাহাতেই আমি ইহার উদ্দেশ্য ও মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। পরবর্তী কালে, মুসা কর্তৃক প্রচারিত সৃষ্টির সময়পঞ্জী এবং পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে ভূবিদ্যার আবিষ্কার এই উভয়ের মধ্যে গভীর অনৈক্য অপৌরুষেয় ধর্মে আমার বিশ্বাস আরও নষ্ট করে। হিন্দু সমাজের প্রচলিত জাতিভেদ এবং তাহার আনুষঙ্গিক 'অস্পৃশ্যতা' আমার নিকট মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধের ঠিক বিপরীত বলিয়া মনে হইত। বাধ্যতামূলক বৈধব্য, বাল্য বিবাহ এবং ঐ শ্রেণীর অন্যান্য প্রথা আমার নিকট জঘন্য বলিয়া বোধ হইত। আমার পিতা প্রায়ই বলিতেন যে, তাঁহার অন্ততঃ একটি ছেলে বিধবা বিবাহ করিবে এবং আমাকেই তিনি এই কার্যের উপযুক্ত মনে করিতেন। ব্রাহ্ম সমাজের সমাজ-সংস্কারের দিকটাই আমার মনের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে ফিরিয়া "সুলভ সমাচার" নামক এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই কাগজে অনেক নূতন ভাব থাকিত। কেশবচন্দ্রের নূতন সমাজ—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আমি তাঁহার ধর্মোপদেশ শুনিতে যাইতাম। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর কেশবচন্দ্রই এই নূতন সমাজ স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্রের গম্ভীর ওজস্বিনী কণ্ঠস্বরের ঝঙ্কার এখনও আমার কানে বাজিতেছে। টাউন হলে কিংবা ময়দানে বা অ্যালবার্ট হলে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ আমি কখনই ত্যাগ করিতাম না।

১৮৭৪ সাল আমার জীবনের একটি গুরুতর ঘটনাপূর্ণ বৎসর। আমি সেই সময় ৪র্থ শ্রেণীতে পড়িতাম। অগস্ট মাসে আমার গুরুতর রক্তামাশয় রোগ হইল এবং ক্রমে ঐ রোগ এত বাড়িয়া উঠিল যে, আমাকে স্কুলে যাওয়া ত্যাগ করিতে হইল। এ পর্যন্ত আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, পরিপাকশক্তি বা ক্ষুধারও কোন গোলযোগ ছিল না। আমি পৈতৃক অধিকারে সবল ও সুগঠিত দেহ পাইয়াছিলাম। কিন্তু আমার ব্যাধি ক্রমে স্থায়ী রোগ হইয়া দাঁড়াইল এবং যদিও সাত মাস

পরে তাহার তীব্রতা কিছু হ্রাস পাইল, তথাপি আমার স্বাস্থ্য ভাঙিগয়া গেল এবং পরিপাকশক্তি নষ্ট হইল। আমি ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িলাম এবং তরুণ বয়সেই আমার শরীর আর বাড়িল না। আমি বাধ্য হইয়া আমার আহার সম্বন্ধে কড়াকড়ি নিয়ম মানিয়া চলিতে কৃতসংকল্প হইলাম।

এক বিষয়ে এই ব্যাধি আমার পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হইল। আমি সব সময়েই লক্ষ্য করিয়াছি যে, ক্লাসে ছেলেদের পড়াশুনা বেশীদূর অগ্রসর হয় না। কতকগুলি ছেলের বুদ্ধি প্রখর নহে, কতকগুলির বুদ্ধি মাঝারি গোছের, আর অল্পসংখ্যক ছেলের বুদ্ধিই উচ্চশ্রেণীর থাকে। এই সব রকম ছেলেকেই একসঙেগ শিক্ষা দেওয়া হয়, ফলে ইহাদের সকলের বুদ্ধি ও মেধাব গড়পড়তা অনুসারে পড়াশুনার উন্নতি হয়; তার বেশী হয় না। ক্লাসে এক ঘণ্টা বক্তৃতা ৪৫ মিনিটের বেশী নহে, তার মধ্যে ছেলেদের হাজিরা ডাকিতেই প্রায় ১০ মিনিট সময় যায়। ইটন, রাগবী, হ্যারো প্রভৃতির মত ইংরাজী স্কুলে এমন অনেক সুবিধা আছে, যাহার ফলে এই সব ত্রুটির অন্য দিক দিয়া সংশোধন হয়। ঐ সব স্কুলে ছেলেরা এমন অনেক বিষয় শিখে, যাহা অমূল্য এবং যাহার ফলে তাহাদের চরিত্র গঠিত হয়। বই পড়িয়া যাহা শেখা যায় না, এরূপ সব বিষয়ে সেখানে তাহারা শিখে। 'ওয়াটারলুর যুদ্ধ ইটন স্কুলের ক্রীড়াক্ষেত্রেই জিত হইয়াছিল'—ওয়েলিংটনের এই উক্তির মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। এই সব স্কুলের হেডমাস্টারদের অনেক সময় বিশপের পদে অথবা অক্সফোর্ড বা কেম্‌ব্রিজের মাস্টারের পদে উন্নতি হয়। এইরূপ স্কুল একজন আর্নল্ড—অন্ততঃপক্ষে বাটলারের—গর্ব করিতে পারে।(৩)। কিন্তু বাঙালী ছেলেরা সাধারণতঃ যে সব স্কুলে পড়ে, তাহাদের এমন কোন সুবিধা নাই। এখানে তাহাকে এমন এক ভাষায় শিক্ষালাভ করিতে হয়, যাহা তাহার মাতৃভাষা নহে এবং ইহাই তাহার উন্নতির পক্ষে একটা প্রধান বাধা স্বরূপ।

ছেলে যদি ক্লাশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্র হয়, তাহা হইলেও ক্লাসে তাহার পড়াশুনার উন্নতি ধীর গতিতে হইতে বাধ্য। অজ্ঞাতসারে তাহার মনে একটা গর্ব হয়, কোন কোন সময়ে সে আত্মম্ভরী হইয়া উঠে। বাস্তবিকপক্ষে সে কতটুকু শিখে—অতি সামান্যই! অনেক সময় সে ভাবে যে, যাহা তাহাকে শিখিতে হইবে, তাহা তাহার পাঠ্য পুস্তকের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আছে। তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এতদ্ব্যতীত, প্রখর বুদ্ধিশালী ছাত্র যেটুকু তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সেইটুকু আয়ত্ত করিবার কৌশল শিখে। ক্লাসের প্রধান ছাত্রই যে সব সময়ে সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র, ইহাও সত্য নহে; যদিও কোন কোন সাধারণ শিক্ষক তাঁহার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির দ্বারা সেইরূপ মনে করিতে পারেন বটে।

লর্ড বায়রন এবং আমাদের রবীন্দ্রনাথ—অঙ্কে অত্যন্ত কাঁচা ছিলেন এবং সেই

---

(৩) সাম্রাজ্যের প্রথম বার্ষিক বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলনীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে গিয়া স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং আমি কেম্‌ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের মাস্টার ডাঃ বাটলারের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম।

কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাদের সাফল্যের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। স্যার ওয়াল্টার স্কটের শিক্ষক ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন যে, তিনি (স্কট) একজন গর্দ্দভ এবং চিরজীবন গর্দ্দভই থাকিবেন। এডিসনের শিক্ষক তাঁহাকে তাঁহার মাতার নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি (এডিসন) অত্যন্ত নির্বোধ।

শিক্ষার আরও উচ্চ স্তরে যাওয়া যাক। প্রায় দেড় শত জন "সিনিয়ার র‍্যাংলারের" জীবন আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পরবর্তী জীবনে তাঁহাদের অধিকাংশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা শোনা যায় না, তাঁহারা বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকরূপে জীবনযাপন করিয়াছেন মাত্র।

যাহা হউক, এইরূপে স্কুলের বৈচিত্র্যহীন শুষ্ক পাঠ্যপ্রণালী হইতে মুক্ত হইয়া আমি মনের সাধে নিজের ইচ্ছানুযায়ী অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করিলাম। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন, তিনি পিতার লাইব্রেরিতে আরও বহু মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ করিলেন। লেথব্রিজের 'Selections from Modern English Literature' তখন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য ছিল। এই বহি আমার এত প্রিয় ছিল যে ইহা আগাগোড়া কয়েকবার পড়িয়াছি। Selections পড়িয়া আমার জ্ঞানতৃষ্ণা মিটিল না, কিন্তু ইহা ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সোপানস্বরূপ হইল। গোল্ডস্মিথের 'Vicar of Wakefield' আমি পুনঃপুনঃ পাঠ করিলাম এবং উহার প্রত্যেক চরিত্রই আমার নিকট পরিচিত হইয়া উঠিল। স্কোয়ার থর্নহিল, মিঃ বার্চেল, অলিভিয়া, সোফিয়া, মোসেস এবং সেই অননুকরণীয় গীতি—'দি হারমিট' এবং অলিভিয়ার সেই বিলাপ-গীতি— 'When lovely woman stoops to folly'— অর্ধশতাব্দী পূর্বে আমার যেরূপ মনে ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। ইহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য, কেন না ইংরাজ পাদরির পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। বহু বৎসর পরে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে জর্জ ইলিয়টের 'Scenes from Clerical Life' ঐ ভাবে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বস্তুতঃ, মানব-প্রকৃতি দেশ-কাল-জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সর্বত্রই এক এবং কবির প্রতিভা যেখানে মানব-প্রকৃতির গভীর রহস্য ব্যক্ত করে, তখন তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করে। "স্পেক্টেটর" হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ এবং জনসনের 'রাসেলাস'ও আমি পড়িয়াছিলাম। 'রাসেলাসের' প্রথম প্যারা— Ye, who listen with credulity ইত্যাদি আমি এখনও অক্ষরে অক্ষরে আবৃত্তি করিতে পারি। শীঘ্রই আমি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। নাইটের 'Half-hours with the Best Authors' এই বিষয়ে আমাকে সহায়তা করিয়াছিল। সেক্সপীয়রের জুলিয়াস সীজর, মার্চেণ্ট অব ভিনিস এবং হ্যামলেটের কতকগুলি নির্বাচিত অংশ (যথা—Soliloquy) আমার সম্মুখে নূতন জগতের দ্বার খুলিয়া দিল এবং পরবর্তী জীবনে মহাকবির বহিগুলি যতদূর পারি পড়িব, ইহাই আমার অন্যতম আকাঙ্ক্ষা হইল।

এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক "বঙ্গদর্শন" মাসিক পত্র

প্রকাশিত হইল। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছিল। যদিও সেই অল্পবয়সে নিপুণহস্তে অঙ্কিত মানব-চরিত্রের ঐ সব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমি বুঝিতে পারিতাম না, তবুও কেবল গল্পের আকর্ষণে আমি ঐ প্রসিদ্ধ উপন্যাস অসীম ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়িতাম। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'বাল্মীকি ও তাঁহার যুগ' এবং রামদাস সেনের 'কালিদাসের যুগ' আমার মন পুরাতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, "বিবিধার্থ-সংগ্রহে" রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বাঙ্গলার সেনরাজগণ' ও ঐ শ্রেণীর অন্যান্য প্রবন্ধ বাংলার পুরাতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত করে। তখন কল্পনা করি নাই যে, পুরাতত্ত্বের প্রতি আমার এই আকর্ষণ পরবর্তী কালে "হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস" রচনাকার্যে আমাকে সহায়তা করিবে।

'বঙ্গদর্শনে'র দৃষ্টান্তে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত 'আর্যদর্শন' প্রকাশিত হইল। এই পত্রিকার প্রধান বিশেষত্ব ছিল, জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মচরিতের অনুবাদ। উহা আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিল। একটা বিষয় আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলাম। জেমস্ মিল তাঁহার প্রতিভাশালী পুত্রকে কোন সাধারণ স্কুলে পাঠান নাই এবং নিজেই তাহার বন্ধু ও শিক্ষক হইয়াছিলেন। অল্পবয়সে জন স্টুয়ার্ট মিলের বুদ্ধিবৃত্তির অসাধারণ বিকাশের ইহাই কারণ মনে করা যাইতে পারে। মাত্র দশ বৎসর বয়সে জন স্টুয়ার্ট মিল লাটিন ও গ্রীক ভাষা, পাটীগণিত এবং ইংলণ্ড, স্পেন ও রোমের ইতিহাস শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।

পাঠে অনুরাগ

আমি তখনকার দিনের তিনখানি প্রধান সাপ্তাহিক পত্রের নিয়মিত পাঠক ছিলাম—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (তখন ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হইত) এবং কৃষ্ণদাস পাল কর্তৃক সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট্'। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য এবং সরকারী কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারের তীব্র সমালোচনা আমি খুব উপভোগ করিতাম। নরেন্দ্রনাথ সেন ও কৃষ্ণবিহারী সেনের যুগ্ম সম্পাদকতায় প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' তখন এ অঞ্চলে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের কর্তৃত্বে পরিচালিত একমাত্র ইংরাজী দৈনিক ছিল। এই কাগজ পাইবার জন্য আমার এত আগ্রহ ছিল যে, ক্লাস আরম্ভ হইবার একঘণ্টা পূর্বে আমি অ্যালবার্ট হলে উহা পড়িবার জন্য যাইতাম।

এখানে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করিব, যাহা আমার জীবনের গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। একদিন আমি আমাদের গ্রন্থাগারে স্মিথের Principia Latina নামক একখানি বহি দেখিলাম। বহিখানি নিশ্চয়ই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোন পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়াছিলেন। কয়েকপাতা উল্টাইয়াই আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। ইহাতে যে সব পদ ও বাক্য ছিল, চেষ্টা করিয়া তাহার অর্থবোধ আমার হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা আমার পড়া ছিল। আমি দেখিলাম ল্যাটিন ও সংস্কৃত এই দুই প্রাচীন ভাষার আশ্চর্য সাদৃশ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ ল্যাটিন ভাষায় Recuperata pace, artes efflorescunt (শান্তি, প্রতিষ্ঠিত হইলে শিল্পকলার বিকাশ হয়) এই বাক্যটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংস্কৃতে অনুরূপ পদকে ভাবে ৭মী বলে। ইহাতে আমার মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইল। সেই অল্পবয়সে এই দুই ভাষার মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য সম্পর্কে সমস্ত বিষয় বুঝিবার মত জ্ঞান বা বুদ্ধি আমার হয় নাই, অথবা উহারা যে একটি মূল ভাষা হইতেই উৎপন্ন (Grimm's Law, Bopp's Comparative Grammar of the Indo-Aryan Languages প্রভৃতিতে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে), তাহা ধারণা করিবার শক্তিও আমার ছিল না। কিন্তু আমি তখনই ল্যাটিন শিখিবার সংকল্প করিয়া ফেলিলাম এবং সে সংকল্প অবিলম্বে কার্যে পরিণত করিলাম। শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত এই আমার ল্যাটিন ভাষা শিখিবার সুযোগ। আমি Principia র পাঠগুলি নূতনভাবে মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিলাম এবং শীঘ্রই Principia -র প্রথমভাগ শেষ করিয়া ফেলিলাম। তার পর দ্বিতীয়ভাগ এবং ব্যাকরণও পড়িলাম।

প্রায় সাত মাস আমাশয়রোগে ভুগিবার পর আমি অনেকটা ভাল হইলাম কিন্তু ঐ রোগ একেবারে সারিল না, ১৮৭৫ সাল হইতে জীর্ণব্যাধি রূপে উহা আমার সঙ্গের সাথী হইয়া আছে। উহার ফলে অজীর্ণ, উদরাময় এবং পরে অনিদ্রা রোগেও আমি আক্রান্ত হইলাম। আমি আহারাদি সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইলাম। ক্ষুধাবৃদ্ধি করিবার জন্য সকালে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণ করার অভ্যাস করিলাম। যখন গ্রামে থাকিতাম, তখন মাটি কাটিতাম বা বাগানের কাজ করিতাম। সাঁতার দেওয়া এবং নৌকা চালনাও আমার প্রিয় ব্যায়ামের মধ্যে ছিল।

একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়াকে কেন। যে আমি প্রকারান্তরে আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম, তাহা এখন বুঝা যাইবে। আমি অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি, সবলদেহ যুবকেরা তাঁহাদের 'বাঘের ক্ষুধা'র গর্ব করেন এবং প্রচুর পরিমাণে আহার করেন। কিছু দিন পর্যন্ত তাঁহাদের বেশ ভালই চলে। কিন্তু প্রকৃতি একদিকে যেমন যাহারা তাহার নিয়ম পালন করে তাহাদের উপর সদয়, অন্যদিকে তেমনি নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের কঠোর হস্তে শাস্তিদান করিয়া থাকে। এই সমস্ত লোক গর্ববশতঃ স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করে, ফলে বহুমূত্র, বাত, স্নায়বিক বেদনা প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া থাকে। সম্প্রতি কলিকাতার কয়েকটি জমিদার পরিবারে আমার যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। যদিও তখন বেলা দশটা, তথাপি তাঁহাদের কেহ কেহ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন নাই। অন্য কেহ কেহ তাঁহাদের বিশাল দেহ লইয়া বসিতে অসমর্থ হইয়া মেজের কার্পেটের উপর অজগর সর্পের মত পড়িয়া ছিলেন। আমি তাঁহাদের মুখের উপর বলিলাম যে, তাঁহাদের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গেও আমি আমার সাদাসিধা অভ্যাস ও কর্মময় জীবন বিনিময় করিতে পারি না। কিন্তু কেবল এই শ্রেণীর লোককে দোষ দিয়া লাভ কি?

আমাদের কোন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যাঁহাদের জন্য সমস্ত ভারত গৌরবান্বিত, স্বাস্থ্যের প্রাথমিক নিয়মগুলি উপেক্ষা করাতে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম অথচ শরীর চালনার অভাব—ইহারই ফলে কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, বিচারপতি তেলাঙ্গ, বিবেকানন্দ, গোখেল প্রভৃতি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ৪৪ বৎসর হইতে ৪৬ বৎসর বয়সের মধ্যে তাঁহাদের অধিকাংশের মৃত্যু হইয়াছে; অথচ ঐ বয়সে একজন ইংরাজ মাত্র জীবন-মধ্যাহ্নে উপনীত হইয়াছে বলিয়া মনে করে। ইহার দ্বারা দেশের যে কত বড় ক্ষতি হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মনে ভাবুন, গোখেল যদি আরও দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে দেশের কি লাভ হইত! গোখেল যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের খসড়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা গবর্নমেণ্টের সহানুভূতির অভাবে এমনভাবে উপেক্ষিত হইত না। এতদিনে উহা নিশ্চয়ই দেশের আইনে পরিণত হইত।

ফ্রুড কৃত কার্লাইলের জীবনচরিত যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা স্মরণ করিতে পারিবেন, যে, উক্ত স্কচ দার্শনিক ও মনীষী যখন এডিনবার্গে ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি বিষম উদরের বেদনায় ভুগিতেন। অনিদ্রারোগও তাঁহার চিরসহায় ছিল। অথচ স্বাস্থ্যের বিধি কঠোরভাবে পালন করিয়া এবং নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিয়া তিনি কেবল দীর্ঘজীবন লাভ করেন নাই, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও অসাধারণ পরিশ্রম করিতে পারিয়াছিলেন। হারবার্ট স্পেনসার কার্লাইলের অপেক্ষাও রোগে বেশি ভুগিয়াছিলেন। আমি এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বোধে তাহা হইতে বিরত হইলাম।

ল্যাটিন সামান্য কিছু শিখিয়া আমি দেখিলাম যে স্মিথের **French Principia (Parts I & II)** কাহারও সাহায্য ব্যতীত আমি বেশ পড়িতে পারি। ফরাসী, ইটালীয়ান ও স্পেনিশ এই তিন ভাষাই ল্যাটিন হইতে উদ্ভূত; সুতরাং মূল ভাষা ল্যাটিন জানিলে, ঐ তিন শাখা ভাষা অনায়াসেই আয়ত্ত করা যায় এবং এক একটি নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে পারিলে যেন এক একটি নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং আমার জীবনের এই অংশের কথা এখনও যে আমি আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু যত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হই না কেন, ইংরাজী সাহিত্য আমাকে যেন জাদু করিয়াছিল। কে. এম্‌. ব্যানার্জির **Encyclopaedia Bengalensis**—আমার পিতা যৌবনে পড়িয়াছিলেন। ঐ বহিতে **Arnold's Lectures of Roman History, Rollin's Ancient History,** এবং **Gibbon's Roman Empire** হইতে নির্বাচিত অংশ ছিল। ঐগুলি আমার মনের উপর আপনি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে বিখ্যাত রোম সম্রাটের **Meditations** পড়িণ গিবনের প্রসিদ্ধ রোমকসম্রাটত্রয়ের চরিত্রচিত্র (হাড্রিয়ান, এণ্টোনিনাস পিয়াস এবং মার্কাস আরেলিয়াস—ইঁহারা যেন ভগবানের আদেশে পর পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন)—আমার চিন্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্ককে অনেক সময় শান্ত করিয়াছে। আমার এই পরিণত বয়সেও ল্যাবরেটরীতে সমস্ত দিন কাজ

করিবার পর আমি লাইব্রেরিতে গিয়া একঘণ্টা ইতিহাস বা জীবনচরিত পড়িয়া বিশ্রাম লাভ করি, তার পর ময়দানে ভ্রমণ করিতে যাই।

পূর্বোক্ত চেম্বারের Biography ব্যতীত মণ্ডারের Treasure of Biography ও আমার বড় প্রিয় ছিল। আমি ঐ বইয়ের যেখানে ইচ্ছা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিতাম এবং পাতার পর পাতা পড়িয়া যাইতাম। একদিন ঐ বইতে আমি রাম-মোহন রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পাইলাম এবং দেখিলাম যে ঐ প্রবন্ধটিই স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত Reader No. IV এ অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে—যদিও তাহা স্বীকার করা হয় নাই। এই রীডারই হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল। Treasure of Biography তে বহু মহৎ লোকের জীবনী আছে, তন্মধ্যে কেবলমাত্র একজন বাঙালীর জীবনী সন্নিবিষ্ট করিবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার মনে বেদনাও হইল।

যখন আমাশয় ব্যাধি হইতে আমি অনেকটা মুক্ত হইলাম, তখন আমার নিয়মিত ভাবে স্কুলে পড়িতে আমার ইচ্ছা হইল। আমি কোন্ স্কুলে ভর্তি হইব, তৎসম্বন্ধে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার পিতা এ সব বিষয়ে মাথা ঘামাইতেন না। আমার উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এবং আমার পছন্দমত যে কোন স্কুলে ভর্তি হইবার জন্য তিনি আমাকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। আমি প্রায় দুই বৎসর স্কুলে অনুপস্থিত ছিলাম, সুতরাং সে হিসাবে আমি আমার সহপাঠীদের পিছনে পড়িয়াছিলাম। স্কুলের সেসনও তখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য আমি অ্যালবার্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। ঐ স্কুল তখন সবেমাত্র কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁহার সহকর্মীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং স্বভাবতঃই ইহার প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী এই স্কুলের 'রেক্টর' (কার্যতঃ হেডমাস্টার) ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি অল্প কিছুকালের জন্য জয়পুরে মহারাজার কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণবিহারীর স্থানে শ্রীনাথ দত্ত কাজ করিতেছিলেন। শ্রীনাথ দত্ত লণ্ডনে এবং সাইরেনচেস্টারে কৃষি-বিদ্যার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কিছুদিন হইল দেশে ফিরিয়াছেন। এই স্কুলে আমি আমার মনের মত পারিপার্শ্বিক অবস্থা পাইলাম। শিক্ষকেরা সকলেই ব্রাহ্ম সমাজের লোক। কেশব-চন্দ্র যখন জাতিভেদ ত্যাগ করিয়া আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন, তখন এই শিক্ষকেরা তাঁহার পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইলেন। এই সব সংস্কারের অগ্রদূতগণকে কিরূপ সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা এখনকার যুবকগণ ধারণা করিতে পারিবেন না। যাঁহারা পিতা-মাতার প্রিয় সন্তান, তাঁহাদের আশাভরসার স্থল, তাঁহাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সাহসের সঙ্গে সানন্দচিত্তে কোন দ্বিধা বা আপত্তি না করিয়া এই সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন। এই স্কুলে ভর্তি হইবার পর দুই মাস যাইতে না যাইতেই, সকলে আমার কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। আমার শিক্ষকেরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে

আমার সহপাঠীদের অপেক্ষা আমি সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ এবং অল্পবয়সে আমার এই অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যখনই Etymology বা শব্দরূপ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিত, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার মৌলিক অর্থ বলিয়া দিতে পারিতাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হোয়াইটের Natural History of Selborne হইতে উদ্ধৃত একটি লাইনে indification এই শব্দটি ছিল। আমার ল্যাটিনের সামান্য জ্ঞান হইতে ঐ ভাষার সহিত সংস্কৃতের সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

Nidus = Nidas (সংস্কৃত নীড়)
Decem = Dasam (সংস্কৃত দশম)

কিন্তু পরবর্তী সেসন হইতে হেয়ার স্কুলে ফিরিয়া যাইবার জন্য আমি মনে মনে আশা পোষণ করিতেছিলাম। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নামের সঙ্গে বহু গৌরবময় স্মৃতি জড়িত ছিল এবং শিক্ষাজগতে এই স্কুল একটা নিজস্ব ধারাও গড়িয়া তুলিয়াছিল। পক্ষান্তরে অ্যালবার্ট স্কুল নূতন স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই স্কুল হইতে কোন প্রতিভাশালী খ্যাতনামা ছাত্রও বাহির হয় নাই। সুতরাং আমি ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষা দিলাম না। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করিব, এ বিশ্বাস আমার ছিল; কিন্তু পুরস্কার লাভ করিবার পর ঐ স্কুল ছাড়িয়া যাওয়া আমার পক্ষে অন্যায় মনে হইয়াছিল। এই সব কথা ভাবিয়াই আমি পরীক্ষা দিলাম না। আমি আমার নিজ গ্রামে গিয়া দীর্ঘ ছুটি ভোগ করিলাম এবং নিজের ইচ্ছামত গ্রন্থ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্যের দিকেও মন দিলাম।

বাল্যকাল হইতেই আমি একটু লাজুক ছিলাম এবং সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মিশিতাম না। অধ্যয়ন, কৃষিকার্য ও ব্যায়ামই আমার প্রিয় ছিল। আমার বরাবর এইরূপ অভিমত যে, যেসব ছেলেরা শহরে মানুষ, তাহারা শহরের কদভ্যাসগুলির হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। তাহারা কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে লালিতপালিত হয়। ফলে নিজেদের তাহারা শ্রেষ্ঠ জীব মনে করে এবং গ্রাম্য বালকদের কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, আচার ব্যবহার লইয়া তাহারা নানারূপ শ্লেষ বিদ্রূপ বর্ষণ করে। তাহারা গ্রামের লোকদের প্রতি সহানুভূতিও বোধ করে না। জনৈক ইংরাজ কবি তাঁহার সময়ে গ্রাম্য জীবনের প্রতি শহুরে লোকদের এইরূপ অবজ্ঞার ভাব লক্ষ্য করিয়া, ক্ষুব্ধচিত্তে লিখিয়াছিলেন—

Let not Ambition mock their useful toil,
Their homely joys, and destiny obscure;
Nor Grandeur hear with a disdainful smile
The short and simple annals of the poor.

বর্তমানে, যাহারা চিরজীবন শহরে বাস করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মুখে "গ্রামে ফিরিয়া যাও" এই ধুয়া শুনিতে পাই। কিন্তু তাহাদের মুখে এসব তোতা-পাখীর বুলি, কেননা তাহাদিগকে যদি ২৪ ঘণ্টার জন্যও সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্যজীবন যাপন করিতে হয়, তবে তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়ে। কৃষক ও জনসাধারণের

৩

সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংসর্গের জন্যই আমি ১৯২১ ও ১৯২২ সালে দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িতদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলাম।(৪)

আমি বৎসরে দুইবার গ্রামে যাইতাম—শীতে ও গ্রীষ্মের অবকাশে। ইহার ফলে আমার মন শহরের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে অনেকটা মুক্ত হইত। আমার এই বৃদ্ধবয়সেও, শৈশবস্মৃতি জড়িত গ্রামে গেলে আমি যেমন সুখী হই এমন আর কিছুতেই হই না।

আমার পিতার বৈঠকখানায় যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গ আমি স্বভাবতঃ এড়াইয়া চলিতাম। কিন্তু সরল গ্রাম্যলোকদের সঙ্গে আমি খুব প্রাণ খুলিয়া মিশিতাম। আমি অনেক সময়ে তাহাদের পর্ণকুটীরে যাইতাম, সেকালে গ্রামে মুদীর দোকান খুব কমই ছিল; সাগু, এরারুট, মিছরি প্রভৃতি রোগীর প্রয়োজনীয় পথ্য গ্রামে অর্থব্যয় করিয়াও পাওয়া যাইত না। আমি রুগ্ণ গ্রামবাসীদের মধ্যে এই সকল জিনিস বিতরণ করিতে ভালবাসিতাম। মাতার ভাণ্ডার হইতেই আমি এই সব দ্রব্য গ্রহণ করিতাম, এবং আমার মাতাও সানন্দে এবিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতেন।

১৮৭৬ সালের জানুআরি মাসের প্রথমভাগে আমি কলিকাতায় ফিরিলাম। অ্যালবার্ট স্কুলের কর্তৃপক্ষের নিকট, যতদূর পর্যন্ত আমি পড়িয়াছি, তাহার জন্য সার্টিফিকেট চাহিলাম। উদ্দেশ্য হেয়ার স্কুলে অনুরূপ শ্রেণীতে ভর্তি হইব। কিন্তু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য(৫) প্রমুখ আমার শিক্ষকেরা সকলে মিলিয়া আমাকে এই কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়েরও শীঘ্রই জয়পুর হইতে ফিরিবার কথা ছিল। সুতরাং আমি মত পরিবর্তন করিলাম। আমার জীবনে এই আর একটি শুভ ঘটনা। হেয়ার স্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ অনেকটা কৃত্রিম ছিল। ক্লাসের বাহিরে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না, সেস্থলে তাঁহারা যেন আমাদের অপরিচিত ছিলেন।

হেয়ার স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মুখভঙ্গী করিতেন। তাঁহার অট্টহাস্য ও মুখভঙ্গী, আমাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিত। তাঁহার বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, ঘন গুম্ফ এবং মুখাকৃতির জন্য তাঁহাকে বাঘের মত দেখাইত। সেই জন্য আমরা তাঁহার নাম দিয়াছিলাম 'বাঘা চণ্ডী'। পক্ষান্তরে অ্যালবার্ট স্কুলে আমাদের শিক্ষকেরা শান্ত ও মধুর প্রকৃতির আদর্শস্বরূপ ছিলেন। আদর্শ শিক্ষকের যেসব গুণ থাকা উচিত, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সে সবই ছিল। আমি যেন এখনও চোখের উপর

---

(৪) তথাকথিত অবনত সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে অনেকে জেলা সম্মিলনীর জন্য সামান্য চাঁদা দিয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই অভিযোগ করে যে, "বাবুরা কেবল টাকার দরকার পড়িলে আমাদের কাছে আসেন কিন্তু তাঁহারা আমাদের স্বার্থ দেখেন না বা আমাদের সঙ্গে সমানভাবে মিশেন না।" দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের এই অভিযোগ সত্য। জাতিগত শ্রেষ্ঠতা হইতে যে অহঙ্কারপূর্ণ দূরত্বের ভাব জন্মে তাহাই শিক্ষিত ভদ্রলোক ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিষয়ে চীনা ছাত্রদের আচরণ আমাদের অনুকরণীয়।

(৫) সংস্কৃতের অধ্যাপক, অল্পদিন পূর্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

দেখিতেছি, তাঁহার অধরে মৃদু হাস্য এবং মুখ হইতে শান্ত জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে! মহেন্দ্রনাথ দাঁকেও আমরা সমান ভালবাসিতাম। ইঁহারা উভয়েই সামাজিক নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। আমি এবং আমার দুই একজন সহাধ্যায়ী তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায়ই যাইতাম এবং তাঁহাদের সঙ্গে সকল বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ করিতাম। ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বসমূহ তাঁহারা আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেন; অন্য ধর্মের সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে, ইহা অপৌরুষেয় নহে; ইহার প্রধান ভিত্তি প্রজ্ঞা ও বোধি (Rationalism and Intuition) জীবনে এই আমি প্রথম Intuition বা বোধির অর্থ অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিলাম। আদর্শ শিক্ষকের ব্যক্তিগত সংসর্গের প্রভাব কিরূপ তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। ইহার বহুদিন পরে যখন আমি Tom Brown's School Days নামক বইখানি পড়ি, তখন আমার পুরাতন শিক্ষকের কথা মনে হইয়াছিল; রাগবী স্কুলের আর্নল্ড কেন যে ছাত্রপরম্পরাক্রমে সকলের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

অর্ধশতাব্দী পূর্বের কথা স্মরণ করিলে, আমি অ্যালবার্ট স্কুলের শিক্ষকদের কথা—তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধের কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। পুরস্কার বিতরণের সময় আমি অবশ্য পুরস্কার পাইলাম না, কেননা আমি বহুদিন স্কুলে অনুপস্থিত ছিলাম। কিন্তু শিক্ষকেরা ব্যাপারটি অশোভন হয় দেখিয়া পরামর্শ করিয়া আমাকে সকল বিষয়ে উৎকর্ষতার জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার দিলেন। পর বৎসর আমি পরীক্ষায় প্রথম হইলাম এবং বহু পুস্তক পুরস্কার পাইলাম। ঐ সব পুস্তকের মধ্যে হ্যাজ্‌লিট কর্তৃক সম্পাদিত সেক্সপীয়রের সমস্ত গ্রন্থাবলী, ইয়ংয়ের Night Thoughts ও থ্যাকারের English Humorists ছিল।

কৃষ্ণবিহারী সেন জয়পুর হইতে ফিরিয়া স্কুলের 'রেক্টরের' কর্তব্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন—ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল, তবে তিনি বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার ভ্রাতা কেশবচন্দ্র সেনের তিনি বিপরীত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা বহু সভায় ব্রিটিশ শ্রোতৃমণ্ডলীকে পর্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। কৃষ্ণবিহারীর ছিল লিখিবার ক্ষমতা এবং সে ক্ষমতা তিনি উত্তমরূপেই চালনা করিতে পারিতেন। তিনি "ইণ্ডিয়ান মিররের" যুগ্মসম্পাদক ছিলেন, অন্যতম সম্পাদক ছিলেন তাঁহার খুল্লতাতভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ সেন। 'মিররে' যে রবিবার সংখ্যা প্রকাশিত হইত, কৃষ্ণবিহারী একাই তাহার সম্পাদক ছিলেন। এই সংখ্যায় কেবলমাত্র ধর্ম সম্বন্ধেই আলোচনা থাকিত। বস্তুতঃ ইহা ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম মুখপত্র ছিল।

কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সহকর্মীদের উদ্যোগে অ্যালবার্ট হল তখন সবেমাত্র স্থাপিত হইয়াছে। হলের নিচের তলায় স্কুলের ক্লাস বসিত, উপর তলার হলে এবং রিডিং রুমের পাশের কয়েকটি ঘরেও ক্লাস বসিত। রিডিং রুমের টেবিলের উপর প্রধান প্রধান সাময়িক পত্র, দৈনিক পত্র প্রভৃতি রক্ষিত হইত। আমি ক্লাস

বসিবার এক ঘণ্টা পূর্বে রিডিং রুমে যাইয়া ঐসব সাময়িক পত্র প্রভৃতি যতদূর পারি পড়িতাম।

এই সময় রুশ-তুর্ক যুদ্ধ বাধিয়াছিল। ওসমান পাশা প্লেভ্না এবং আহম্মদ মুক্তার পাশা কার্‌স কিভাবে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতেছিলেন জগৎবাসী, বিশেষতঃ, এসিয়াবাসীরা তাহা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছিল। দিনের পর দিন সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আমি যুদ্ধের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করিতাম। বলা বাহুল্য আমার সহানুভূতি সম্পূর্ণরূপে তুর্কদের প্রতিই ছিল, কেননা তাহারাই একমাত্র এসিয়াবাসী জাতি—যাহারা ইউরোপের উপর তখনও প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। মনে পড়ে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধের নৈতিক আদর্শ লইয়া আমার তুমুল তর্কবিতর্ক হইত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গ্ল্যাডস্টোনের বাক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এবং গ্ল্যাডস্টোনের অনুকরণ করিয়া বলিতেন—তুর্কীরা "অপাংক্তেয়" এবং তাহাদিগকে মালপত্র সমেত ইউরোপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত।

কৃষ্ণবিহারীর শিক্ষকতায় ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল। যাহারা কতকগুলি পদের প্রতিশব্দ দিয়া এবং কতকগুলি শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াই কর্তব্য শেষ করে, কৃষ্ণবিহারী সেই শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষক ছিলেন না। তাঁহার শিক্ষাদানের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তিনি যে বিষয়ে পড়াইতেন তৎসম্বন্ধে নানা নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিষয়টি চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতেন। একদিন পড়াইতে পড়াইতে তিনি বলিলেন যে, বায়রন স্কটকে Apollo's venal son এই আখ্যা দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমার কবি বায়রন সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা হইল। বায়রন গ্রীকদিগকে তুরস্কের বন্ধনশৃংখল ছিন্ন করিবার জন্য যে উদ্দীপনাময়ী বাণী শুনাইয়াছিলেন আমি ইতিপূর্বেই তাহা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। স্কটের Ivanhoe উপন্যাসে যে পরিচ্ছেদে লড়াই দ্বারা বিচার মীমাংসা করিবার বর্ণনা আছে, তাহাও আমি পড়িয়াছিলাম। আমি এখন আমাদের লাইব্রেরি হইতে বায়রন ও স্কটের অন্যান্য কাব্য গ্রন্থাবলী খুঁজিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বাল্যবয়সের আমার এই প্রয়াস যদিও বামন কর্তৃক দৈত্যের অস্ত্রসম্ভার হরণের মতই বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু আমি "English Bards and Scotch Reviewers" নামক রচনায় বায়রন এডিনবার্গের সাহিত্য সমালোচকদের প্রতি যে তীব্র শ্লেষ বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া বেশ আনন্দ উপভোগ করিলাম।

আমি আমার জীবনের এই অংশের কথা বিস্তৃতভাবেই বর্ণনা করিলাম, কেননা দুই এক বৎসরের পরেই এমন সময় উপস্থিত হইল, যখন আমাকে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দুইটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইল। আমি সাহিত্যের মায়া ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানেরই আনুগত্য স্বীকার করিলাম এবং বিজ্ঞান নিঃসংশয় একনিষ্ঠ সেবককেই চাহিল।

আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। আমার শিক্ষকদের আমার সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা ছিল। তাঁহারা আমার পরীক্ষার ফল দেখিয়া একটু নিরাশ হইলেন। কেননা

আমার নাম বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকার মধ্যে ছিল না। আমি নিজে এই বিষয় শান্তভাবেই গ্রহণ করিলাম। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিষ্করূপে মুহূর্তকাল উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া পরমুহূর্তেই নিবিয়া যায়, যাহারা আজ খুব যশের অধিকারী, কিন্তু কালই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইবে, সেরূপ ছেলেদের কথা মনে করিয়া আমি বরাবরই মনে মনে হাসি।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দ্বারা প্রকৃত মেধা বা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, এ বিষয় লইয়া অনেক লেখা যাইতে পারে। শিক্ষকের কার্যে আমার ৪৫ বৎসর ব্যাপী অভিজ্ঞতায়, আমি বহু ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছি। যাহারা বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় খুব কৃতিত্ব দেখাইয়া বৃত্তি প্রভৃতি পাইয়াছিল, তাহাদের অনেকের পরবর্তী জীবন ব্যর্থতার মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। এমন কি সেকালের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান) ছাত্রেরা পর্যন্ত জীবনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহারা অধিকাংশই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন অবশ্য প্রত্যুত্তরে আমাকে বলা হইবে অমুক অমুক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু এইজন এ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল বড় দরের কেরানী ভিন্ন আর কিছুই নহেন। নিউটনকে টাকশালের কর্তা করিয়া দিলে হয়ত তাঁহার পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের বলে তিনি টাকশালের বহু সংস্কার সাধন করিতে পারিতেন। রানী অ্যান যদি 'ক্যাল্‌কুলাসে'র আবিষ্কারকর্তাকে রাজস্বসচিব পদে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি যোগ্য নির্বাচন করিতেন? আমার আশঙ্কা হয়, কোষাধ্যক্ষের কর্তারূপে নিউটন ব্যর্থ হইতেন। যাঁহারা গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে কলিকাতা 'বারে' আইনজীবীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ছাত্রজীবন খুব কৃতিত্বপূর্ণ ছিল না। ডবলিউ সি ব্যানার্জী, মনোমোহন ঘোষ, তারকনাথ পালিত, সতীশরঞ্জন দাশ এবং আবও অনেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিশেষ কৃতিত্ব না দেখাইলেও, আইনজীবীরূপে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। প্রথম ভারতীয় 'র‍্যাংলার' এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধাবী আনন্দমোহন বসু ব্যারিস্টাররূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন নাই।

কোন একটি বিষয়ে জীবনব্যাপী নিষ্ঠা ও সাধনাই গৌরবের মূল। যে ছাত্র সকল বিষয়েই 'ভাল' সেই সাধারণতঃ পরীক্ষায় প্রথম হয়। কিন্তু কবি পোপ সত্যই বলিয়াছেন—একজন প্রতিভাশালীর পক্ষে একটি বিষয়ই যথেষ্ট।

যাহা হউক, এ বিষয়ে এখন আমি আর বেশী বলিতে চাই না। আমার পিতা এই সময়ে গুরুতর আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হইতেছিলেন। তাঁহার জমিদারি একটির পর একটি করিয়া বিক্রয় হইতেছিল। মহাজন হইতে দেনদারের অবস্থায় উপনীত হইতে বেশী সময় লাগে না। আমার পক্ষে গর্ব ও আনন্দের কথা এই যে, তাঁহার ঋণ "সম্মানের ঋণ" এবং তিনি তাহা একান্ত সততার সঙ্গে পরিশোধ করিয়াছিলেন।(৬) আমার এখনও সেই শোচনীয় দৃশ্য মনে পড়ে—

(৬) শ্রীযুত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি নিম্নলিখিত বিষয়টিব প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন (সম্ভবতঃ ইহা অক্ষয়বাবুর নিজেব লেখা)।

মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সম্পত্তির বিক্রয় কবালায় দস্তখত করিতেছেন। এই সম্পত্তি তাঁহারই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া কেনা হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহার স্ত্রীধন(৭) ছিল। আমাদের পরিবারের ব্যয় সঙ্কোচ করা এখন প্রয়োজন হইয়া পড়িল,—এবং ইহার ফলে আমাদের কলিকাতার বাসা উঠাইয়া লওয়া হইল। আমার পিতামাতা গ্রামের বাড়ীতে গেলেন এবং আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ ছাত্রাবাসে আশ্রয় লইলাম।

আমি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশানে ভর্তি হইলাম। উহার কলেজ বিভাগ নূতন খোলা হইয়াছিল। উচ্চশিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার মতই সুলভ করিবার সাহসপূর্ণ চেষ্টা ভারতে এই প্রথম। স্কুল বিভাগের মত কলেজ বিভাগের 'বেতন'ও তিনটাকা মাত্র ছিল। আমার বিদ্যাসাগরের কলেজে ভর্তি হইবার পক্ষে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশান জাতীয় প্রতিষ্ঠান—যাহাকে আমাদের নিজস্ব বস্তু বলিয়া মনে করা যাইতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ, এই কলেজে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি আমাদের সময়ে ছাত্রদের নিকট 'দেবতা' ছিলেন বলিলেই হয়) ইংরাজী গদ্য সাহিত্যের এবং প্রসন্নকুমার লাহিড়ী (প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক সেক্সপীয়র সাহিত্যে সুপণ্ডিত টনী সাহেবের প্রসিদ্ধ ছাত্র) ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। আমি কিন্তু ফার্স্ট আর্টস্ পড়িবার সময় রসায়নে এবং বি. এ. পড়িবার সময় পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন উভয় বিষয়ে, প্রেসিডেন্সি কলেজে বাহিরের ছাত্র হিসাবে অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিতাম। এফ্. এ. কোর্সে সেই সময় রসায়নশাস্ত্র অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল। মিঃ (পরে স্যার আলেকজাণ্ডার) পেড্লার গবেষণামূলক পরীক্ষাকার্যে (Experiment) বিশেষ দক্ষ ছিলেন। আমি প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। ক্লাসে 'এক্সপেরিমেণ্ট' দেখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া আমি এবং আমার একজন সহাধ্যায়ী বাড়ীতে একটি ছোটখাট 'লেবরেটরী' স্থাপন করিলাম এবং আমরা সেখানে কোন কোন 'এক্সপেরিমেণ্ট'ও করিতে লাগিলাম। একবার আমরা

---

*রামতারণ চট্টোপাধ্যায় ইষ্টার্ন ক্যানেল ডিভিসনের খুলনা জেলায় ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। সুরখালিতে তাঁহার কর্মস্থান ছিল। তিনি খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র এবং মুন্সেফ বলরাম মল্লিক, রাড়ুলি-কাটিপাড়ার জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায় (ডাঃ পি. সি. রায়ের পিতা) প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রথম বয়সে তাঁহার একমাত্র পুত্র অক্ষয়কুমার কলিকাতায় পড়িবার সময়ে হরিশ্চন্দ্রের বাসায় থাকিতেন। হরিশ্চন্দ্রের পরামর্শ ও সহায়তায় সুন্দরবন অঞ্চলে বিস্তর জমির মৌরসী ইজারা লইয়াছিলেন; ঐ জমি খুব লাভজনক সম্পত্তি হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের সাধুতার উপর বিশ্বাস করিয়া রামতারণ হরিশ্চন্দ্রকে অনেক টাকা বিনা দলিলে ধার দিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র যোগ্যপুত্রের পিতা ছিলেন। ....যখন তিনি রামতারণের ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা বোধ করিলেন, তখন তিনি নিজের বাড়ীর নিকটবর্তী একটি মূল্যবান সম্পত্তি রামতারণের নামে রেজেস্ট্রী দলিল দ্বারা কবালা করিয়াছিলেন। রামতারণ কিন্তু এবিষয়ে অনেকদিন পর্যন্ত কিছুই জানিতেন না। একদিন রামতারণের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের সাক্ষাৎ হইলে, হরিশ্চন্দ্র দলিলখানি রামতারণের হাতে দিয়া ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিলেন। ("বংশ পরিচয়" দ্বিতীয়খণ্ড, ৩৬৬ পৃঃ)

(৭) কমলাকর "বিবাদতাণ্ডবে" বলিয়াছেন—আইনজ্ঞেরা "স্ত্রীধন"এর অর্থ লইয়া তুমুল যুদ্ধ করেন। 'স্ত্রীধন' সম্বন্ধে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের **The Hindu Law of Marriage and Stridhana** দ্রষ্টব্য।

াধারণ টিনের পাত দিয়া একটি oxy-hydrogen blow-pipe তৈয়ারি করিয়াছিলাম। ই স্থলে যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিতে গিয়া একদিন উহা ভীষণ শব্দে ফাটিয়া ায়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আহত হই নাই। রস্কোর Elementary Lessons খন পাঠ্য থাকিলেও, আমি যতদূর সম্ভব আরও অনেকগুলি রসায়ন বিদ্যার বহি ড়িয়াছিলাম।

রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি আমার আকর্ষণের ফলে আমি "বি" কোর্স লইলাম। ি. এ. পরীক্ষায় তখন ইংরাজী অবশ্যপাঠ্য ছিল। গদ্য পাঠ্যতালিকার মধ্যে মর্লির Burke" এবং বার্কের Reflections on the French Revolution ছিল। ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব পাণ্ডিত্যের সহিত চিত্তাকর্ষক করিয়া এই সব বহি ড়াইতেন।

ছাত্রজীবনের এই সময়ে আমি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সংযত করিতে বাধ্য ইয়াছিলাম। কেননা অন্য অনেক প্রতিযোগী বিষয়ে আমাকে মন দিতে হইয়াছিল। আমি নিজের চেষ্টায় ল্যাটিন ও ফ্রেঞ্চ মোটামুটি শিখিয়াছিলাম; সংস্কৃত কলেজ-পাঠ্য হিসাবেই শিখিয়াছিলাম। এফ. এ. পরীক্ষায়—রঘুবংশের প্রথম সাত সর্গ এবং ভট্টিকাব্যের প্রথম পাঁচ সর্গ পাঠ্য ছিল। একজন পণ্ডিতের সহায়তায় কালিদাসের আর একখানি অপূর্ব কাব্য "কুমারসম্ভবম্"-এরও রসাস্বাদ আমি করিয়াছিলাম। এই সময়ে আমি "গিলক্রাইস্ট" বৃত্তি পরীক্ষা দিতে মনস্থ করিলাম। এই পরীক্ষা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের "ম্যাট্রিকুলেশন" পরীক্ষার অনুরূপ ছিল, এবং ইহাতে পাস করিতে হইলে ল্যাটিন, গ্রীক অথবা সংস্কৃত, ফরাসী বা জার্মান ভাষা জানা অপরিহার্য ছিল। আমি গোপনে এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং একজন গ্রামসম্পর্কীয় জ্যাঠতুতো ভাই ভিন্ন আর কেহ এ সম্পর্কে সংবাদ জানিতেন না। আমি বিশেষ ভাবে এই সংবাদ গোপন রাখিয়াছিলাম, কেননা পরীক্ষায় ব্যর্থ হইলে, সহাধ্যায়িগণের শ্লেষ ও বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল; এবং আমার একজন সহপাঠী—(যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন) বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, আমার নাম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারের বিশেষ সংস্করণে বাহির হইবে। পরীক্ষায় সাফল্যলাভের বিশেষ আশা আমি করি নাই এবং পরীক্ষার ফল বাহির হইতে কয়েক মাস অতীত হইল দেখিয়া আমি সকল আশা ত্যাগ করিলাম। একদিন কলেজে পড়া আরম্ভ হইবার পূর্বে 'স্টেটস্ম্যানে'র একটি প্যারাগ্রাফের প্রতি একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উহাতে সংবাদ ছিল "গিলক্রাইস্ট" বৃত্তি পরীক্ষায় দুইজন উত্তীর্ণ হইয়াছে, বাহাদুরজী নামক বোম্বায়ের জনৈক পার্শী এবং আমি। প্রিন্সিপাল একটু পরেই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া অভিনন্দিত করিলেন। "হিন্দু পেট্রিয়ট" (তখন কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদক) লিখিলেন—আমি ইনস্টিটিউশনের জন্য নূতন কীর্তি সঞ্চয় করিয়াছি। কিন্তু ঐ কলেজের পড়ার সঙ্গে আমার "গিলক্রাইস্ট বৃত্তি" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্বন্ধ কতটুকু তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

আমার পিতা তখন যশোহরে থাকিয়া যশোহর স্টেশনের নিকটবর্তী ধোপাখোলা পত্তনী তালুক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছিলেন; তাঁহার দেনা শোধের জন্য ইহা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আমার বিলাত যাওয়ার ইচ্ছায় সহজেই সম্মত হইলেন। আমি রাড়ুলিতে আমার একজন দূরসম্পর্কে খুড়তুতো ভাইকেও "স্টেটস্‌-ম্যানে"র কর্তিত অংশসহ একখানি ইংরাজী চিঠি লিখিলাম। চিঠির শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি ছিল,—উহা এখনও আমার স্মৃতিপটে মুদ্রিত আছে। "আমার মাতাকে এই সংবাদ জানাইবে। তিনি প্রথমে বিলাপ করিবেন, কিন্তু পরে আমার চার বৎসরের বিদেশবাসের ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন।"

এখানে বলা যাইতে পারে যে, সেকালে কলেজের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ইংরাজীতে পত্র লেখা 'ফ্যাশন' বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু বর্তমান সময়ে ঐরূপ পত্রলেখকের প্রতি লোকের মনে অবজ্ঞার ভাবই উদয় হইবে, এবং তাহাকে লোকে আত্মম্ভরী বলিবে।

আমার মাতা আমার বিলাত যাওয়ায় আপত্তি করিলেন না। তিনি আমার পিতার নিকট হইতে উদার ভাব পাইয়াছিলেন এবং বিলাত গেলে জা'ত যাইবে, তখনকার দিনের এই ধারণা তাঁহার মনে স্থান পাইল না। আমি মার নিকট বিদায় লইবার জন্য বাড়ীতে গেলাম। আমি মাকে খুব ভালবাসিতাম, সুতরাং বিদায় দৃশ্য অত্যন্ত করুণ হইল এবং আমি বিষণ্নচিত্তে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম যে, আমি যদি জীবনে সাফল্য লাভ করি, তবে আমি প্রথমেই পারিবারিক সম্পত্তির পুনরুদ্ধার এবং ভদ্রাসন বাটীর সংস্কার করিব। আমি স্বীকার করি যে, আমার মনের আদর্শ তদানীন্তন সামাজিক আবহাওয়ার প্রভাবে সঙ্কীর্ণ ছিল। বিধাতা অন্যরূপ ব্যবস্থা করিলেন এবং পরবর্তী জীবনে আমি এই শিক্ষাই লাভ করিলাম যে, ভূসম্পত্তিতে আবদ্ধ রাখা অপেক্ষা উপার্জিত অর্থ ব্যয় করিবার নানা উৎকৃষ্টতর উপায় আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইউরোপ যাত্রা—বিলাতে ছাত্রজীবন—ভারত বিষয়ক প্রবন্ধ (Essay on India) —'হাইল্যাণ্ডে' ভ্রমণ

আমি এখন বিলাত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম এবং হেয়ার স্কুলে আমার ভূতপূর্ব সহাধ্যায়ী দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ক্রয় করিলাম। জীবন যাপন প্রণালী সহসা এরূপ পরিবর্তিত হইতে চলিল যে, তাহা ভাবিয়া আমি প্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। শিক্ষানবিস হিসাবে আমি দুই একটা সস্তা রেস্তোরাঁতে গিয়া কিরূপে 'ডিনার' খাইতে হয় শিখিতে লাগিলাম। বখশিস পাইয়া তুষ্ট খানসামারা আমাকে দেখাইয়া দিত কিরূপে ছুরি কাঁটা ধরিতে হয় এবং কখন কিভাবে তাহা ব্যবহার করিতে হয়।

শীঘ্রই আমি জানিতে পারিলাম যে ডাঃ পি. কে. রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ রায় বিলাতে ডাক্তারি পড়িবার জন্য যাইতেছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। ঠিক হইল যে, আমরা দুইজনে এক জাহাজে বিলাত যাইব। পরিণামে ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

আমরা 'কালিফোর্নিয়া' নামক জাহাজে প্রত্যেকে ৪০০৲ টাকা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর সেলুন ভাড়া লইলাম। জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন 'ইয়ং' নামক জনৈক সাহেব। ঐ সময় পুরা 'মনসুনের' সময় এবং আমরা সরাসরি কলিকাতা হইতে লণ্ডন যাইতেছিলাম। সুতরাং জাহাজের যাত্রীসংখ্যা কম ছিল। আমার বন্ধুরা জাহাজে যাইয়া যখন আমাকে বিদায় দিলেন এবং জাহাজের উপরে উঠিলাম, তখন আমার মনে বেশ স্ফূর্তি হইল এবং একজন ইংরাজ যাত্রীর সঙ্গে আমি মহোৎসাহে গল্প জুড়িয়া দিলাম। যাত্রীটি বলিলেন যে, কথাবার্তায় আমি বড় বড় ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতেছি। আমি স্বীকার করি যে, সেকালে আমি জনসনের রচনারীতির একটু ভক্ত ছিলাম। আমাদের জাহাজ 'পাইলটের' নেতৃত্বে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ফল্তা হইতে কিছুদূর গেলেই, আমি আমার দেহে একটা নূতন রকমের অসুখ বোধ করিতে লাগিলাম। বমনোদ্রেক হইতে লাগিল। বস্তুতঃ আমি "সমুদ্ররোগে"র দ্বারা আক্রান্ত হইলাম। ডাঃ ডি. এন. রায় তাঁহার ভ্রাতার বাড়ীতে ইউরোপীয় জীবনযাপন প্রণালী অভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার "সমুদ্ররোগ" হইল না। তিনি জাহাজে আগাগোড়া বেশ সুস্থই ছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড ক্ষুধা ছিল এবং তিনি বেশ খাইতেও পারিতেন। 'সুপ' বা ঝোল, আলু ভাজা ও আলু সিদ্ধ এবং 'পুডিং' ইহাই ছিল আমার সম্বল। যখন আমি "সমুদ্ররোগের" জন্য খাবার টেবিলে বসিতে যাইতাম না, হেড স্টুয়ার্ড আমার উপর সদয় হইয়া আমার কেবিনে জমাট দুধ এবং পাঁউরুটি দিয়া আসিতেন।

৫।৬ দিন পরে আমাদের স্টীমার কলম্বো পৌঁছিল। ভূমি দেখিয়া আমাদের আনন্দ হইল এবং আমরা তীরে উঠিয়া শহরের দৃশ্যাদি দেখিলাম। আমার যতদূর স্মরণ হয়, এই স্থানে আমরা জানিতে পারিলাম যে, 'টেল-এল-কেবির'-এর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরবী পাশা বন্দী হইয়াছেন এবং সুয়েজখালের পথে আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। আমার মনে পড়ে, একখানি সিংহলী পত্রে সিংহলের ভূতপূর্ব গবর্নর স্যার উইলিয়ম গ্রেগরীকে ভর্ৎসনা করিয়া লেখা হইয়াছিল যে, মিশরী জাতীয়তার নেতা বলিয়া আরবী পাশাকে প্রশংসা করিয়া তিনি (গ্রেগরী) অন্যায় করিয়াছেন।

কলম্বো হইতে এডেন পর্যন্ত আমার পক্ষে আর একটা অগ্নিপরীক্ষা। এই সময়ে জাহাজ খুব দুলিতেছিল। কখন কখন মনে হইতেছিল—এইবার বুঝি সে সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যখন সমুদ্র শান্ত হইল, তখন অবিলম্বে আমার 'বিবমিষাও' দূর হইল। পরে আমার আর মনেই রহিল না যে, আমার কখনও "সমুদ্ররোগ" হইয়াছিল। স্টীমার এডেনে পৌঁছিল। আরব-বালকেরা জাহাজের নিকট ভিড় করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। "পয়সা দাও—ডুবিব" ইত্যাদি। কেহ কেহ কৌতূহলী হইয়া সমুদ্রের জলে সিকি দুয়ানি প্রভৃতি ফেলিয়া দিল—ডুবুরি বালকেরা তৎক্ষণাৎ তাহা জলে ডুবিয়া তুলিয়া আনিল। তীরে উঠিয়া দেখিলাম বাজারের দোকান প্রভৃতি প্রধানত বোম্বাইওয়ালাদের।

লোহিত সাগর ও সুয়েজখালের মধ্য দিয়া আমাদের জাহাজ নির্বিঘ্নেই পথ অতিক্রম করিল। ইসমালিয়াতে আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, তীর হইতে আমাদের জাহাজ লক্ষ্য করিয়া কেহ গুলি ছুঁড়িবে না। পোর্ট সৈয়দের অধিবাসীরা মিশ্রজাতি এবং তথাকার মিশরীরা ফরাসী ভাষায় বেশ কথা বলিতেছে। কিন্তু কতকগুলি দৃশ্য দেখিয়া আমাদের বড় ঘৃণা হইল। মাল্টার কথা আমার অল্প মনে পড়ে এবং জিব্রাল্টারে গিয়া আমাদের জাহাজ শেষবার পথিমধ্যে থামিল। এখানে ফেরিওয়ালারা আঙ্গুর বিক্রি করিতেছিল—দাম প্রতি পাউন্ড ওজনের এক গোছা এক পেনি। আমরা যখন অন্তরীপ ঘুরিয়া পার হইতেছিলাম তখন শুনিলাম যে, বিস্কে উপসাগরে জাহাজ চলাচল অত্যন্ত বিপদপূর্ণ। কয়েক বৎসর পরে (১৮৯২) ঐ কোম্পানিরই আর একখানি জাহাজ ঠিক ঐস্থানে এই কাপ্তেন ও বহু যাত্রীসহ ডুবিয়া গিয়াছিল। এই সব যাত্রীদের মধ্যে ময়ূর সেন্‌ট্রাল কলেজের অধ্যাপকের পত্নী মিসেস বাউটফ্লাওয়ার এবং তাঁহার সন্তানেরাও ছিলেন। অধ্যাপক বাউট-ফ্লাওয়ার 'স্টেটস্‌ম্যানে'র মিঃ পল নাইটের ভগিনীপতি ছিলেন।

সমুদ্রভ্রমণের সময় ডেক-চেয়ারে শুইয়া নানারূপ দিবাস্বপ্ন দেখা সময় কাটাইবার একটা প্রিয় উপায়।(১) কোন কোন যাত্রী 'সেলুনে'র লাইব্রেরি হইতে বই লইয়া

(১) যখন ভারত ও বিলাতের মধ্যে যাতায়াতে কয়েকমাস সময় লাগিত, তখন যাত্রীদের পক্ষে সময় কাটানো বড় কষ্টকর হইত। তাঁহারা তখন সময় কাটানোর নানা বিচিত্র উপায় অবলম্বন করিতেন। মেকলে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন; Essay on Warren Hastings দ্রষ্টব্য।

পড়েন। কিন্তু এইসব বইয়ের অধিকাংশই অসার ও লঘুপাঠ্য। সৌভাগ্যক্রমে আমি নিজে কয়েকখানি ভাল বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম। স্মাইল্‌সের 'Thrift" আমার প্রিয় সঙ্গী ছিল। বাল্যকাল হইতে আমি স্বভাবতঃই মিতব্যয়ী ছিলাম— 'স্মাইল্‌সে'র বই পড়িয়া আমার সেই অভ্যাস দৃঢ়তর হইয়াছিল। স্পেন্‌সারের Introduction to the Study of Sociology আমার মনের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাতচিন্তা'ও আমার সঙ্গে ছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্যজগতে পরিচিত হন নাই। আমার দুই বৎসর পূর্বে তিনি বিলাত গিয়াছিলেন এবং 'ইউরোপযাত্রীর ডায়েরী' নামক তাঁহার একখানি প্রকাশিত বহি সঙ্গে ছিল। সেলুনের লাইব্রেরিতে বসওয়েলের "জন্‌সনের জীবনচরিত"ও একখণ্ড ছিল—উহা পড়িয়া আমি মুগ্ধ হইতাম।

আমরা যথাসময়ে গ্রেভসেণ্ডে পৌঁছিলাম। কলিকাতা হইতে গ্রেভসেণ্ডে পৌঁছিতে আমাদের ৩৩ দিন লাগিয়াছিল। সেখান হইতে লণ্ডনের ফেন চার্চ স্ট্রীট স্টেশনে গেলাম। প্ল্যাটফর্মে জগদীশচন্দ্র বসু এবং সত্যরঞ্জন দাশ (ভারত গবর্নমেণ্টের ভূতপূর্ব আইনসচিব মিঃ এস. আর. দাশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ডি. এন. রায় এবং আমি প্রায় এক সপ্তাহ তাঁহাদের নিকট থাকিয়া লণ্ডনের অনেক দৃশ্য দেখিলাম। সিংহভ্রাতারা (পরলোকগত কর্নেল এন. পি. সিংহ আই. এম. এস এবং পরলোকগত লর্ড সিংহ) সৌজন্য সহকারে আমাদের পথপ্রদর্শক 'পাণ্ডা' হইলেন।

টেমস নদীর উপরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্য আমি আমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। এই শহর এতদূর ব্যাপিয়া যে, দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমরা রিজেণ্ট পার্কের নিকটে গ্লস্টার রোডে বাসা লইলাম। এই অঞ্চল রাস্তার গাড়ীঘোড়ার কোলাহল হইতে মুক্ত ছিল। এই রাস্তা এবং ইহার নিকটবর্তী রাস্তায় ঠিক একই ধরনে তৈয়ারী বাড়ী, দেখিতে ঠিক একই রকম। ল্যাণ্ডলেডী তোমাকে একটি বাহিরের দরজার চাবি দিবেন। কিন্তু তুমি যদি শহরে নবাগত হও, কিম্বা অনেক রাত্রিতে বাড়ীতে ফিরিবার পথে বাড়ীর নম্বর ভুলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার দুর্দশার শেষ নাই! যদি তোমাকে শহরের কোন দূরবর্তী স্থানে যাইতে হয়, তাহা হইলে তোমাকে Vade-mecum বা লণ্ডনের মানচিত্র দেখিতেই হইবে। এবং তারপর যথাস্থান ঠিক করিয়া নির্দিষ্ট বাস গাড়ী বা ভূ-নিম্নস্থ রেলগাড়ীতে চড়িতে হইবে। নতুবা তোমার গোলকধাঁধায় পড়িয়া হাবুডুবু খাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। ১৮৮২ সালের প্রথম ভাগেও লণ্ডনে 'টিউব' রেল ছিল না। লণ্ডনে যাঁহারা জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছেন, এমন কি যাঁহারা সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও লালিতপালিত হইয়াছেন, তাঁহারাও 'ম্যাপ' না দেখিয়া লণ্ডনের রাস্তাঘাট ঠিক করিতে পারেন না। সৌভাগ্যক্রমে লণ্ডন পুলিসম্যান সর্বদাই তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। বিদেশীর প্রতি সে বিশেষরূপ মনোযোগ দেয় ও সৌজন্য প্রদর্শন করে। তাহার পকেটে ম্যাপ থাকে এবং ঐ অঞ্চলের রাস্তাঘাট তাহার নখদর্পণে। তুমি যে

সংবাদই চাওনা কেন, তাহার জানা আছে। "এই পথে গিয়া বামদিকে তৃতীয় রাস্তার মোড় ঘুরিয়া সোজা গেলেই আপনি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবেন"। এই প্রসঙ্গে সেক্সপীয়রের "মার্চেন্ট অব ভেনিস্" নাটকে ল্যান্সেলট্ গোবের রাস্তার বর্ণনা স্বভাবতই আমাদের মনে আসে।

কখন লণ্ডন পুলিসম্যান তোমাকে ঠিক বাস গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে বলিবে এবং গাড়ী আসিলে ড্রাইভারকে বলিয়া দিবে তোমাকে যেন ঠিক জায়গায় নামাইয়া দেয়। আমার ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ ছিল—প্রায় স্কট-ল্যাণ্ড দেশের লোকসংখ্যার সমান। চতুর্থবার (১৯২০) আমি যখন বিলাত যাই, তখন দেখিলাম লণ্ডনের লোকসংখ্যা বাড়িয়া সত্তর লক্ষ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে শহরের আয়তনও বাড়িয়াছে। গ্রেটব্রিটেনের কয়েকটি বন্দর ও পোতাশ্রয়েরও বিরাট উন্নতি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লণ্ডন ছাড়া লিভারপুল, গ্লাসগো, গ্রীনক প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার দরকার নাই। লণ্ডন শহরে আমার অবস্থিতির প্রথম সপ্তাহেই আমার সঙ্কোচ ও ভয়ের ভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। কোন নূতন স্থানে প্রথম গেলে, অপরিচিত আবহাওয়ার মধ্যে লোকের মনে এইরূপ সঙ্কোচ ও ভয়ের ভাব আসে। আমি লণ্ডন হইতে এডিনবার্গ যাত্রা করিলাম। এডিনবার্গ বহুদিন হইতে বিদ্যাপীঠরূপে বিখ্যাত। মনস্তত্ত্ববিদ্যা এবং চিকিৎসা-বিদ্যা বিশেষতঃ শেষোক্ত বিদ্যা শিখিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে ছাত্রেরা এডিনবার্গে আসিত। কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাপক রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা অধ্যাপনা করিতেন। কতকগুলি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থী ভারতীয় ছাত্রের সহিত আমার পরিচয় হইল। এডিনবার্গে এরূপ ছাত্রের সংখ্যা খুব কম ছিল না। মিস ই. এ. ম্যানিংও এডিন-বার্গের কয়েকটি ভদ্রপরিবারের নিকট আমার জন্য পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। তখনকার দিনে লণ্ডনে ও বিলাতের অন্যান্য স্থানে যে সব ভারতীয় ছাত্র থাকিতেন, মিস্ ই. এ. ম্যানিং তাহাদের উপকার করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন।

এডিনবার্গ লণ্ডনের চারিশত মাইল উত্তরে, সুতরাং লণ্ডন অপেক্ষা এখানে বেশী শীত। আমার লণ্ডনের বন্ধুরা এডিনবার্গের আবহাওয়ার কথা জানিতেন, সুতরা তাঁহারা আমার সঙ্গে প্রচুর গরম জামা প্রভৃতি দিয়াছিলেন, একটি "নিউমার্কেট" ওভারকোটও তাহার মধ্যে ছিল। এই সময়ে বিলাতী দর্জি ও পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়, তাহা বেশ কৌতূহলপ্রদ। আমার সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদেয় জন্য টটেনহাম কোর্ট রোডের দর্জির দোকান চার্লস বেকার এণ্ড কোম্পানিতে গেলাম। কিন্তু সান্ধ্য সম্মিলন, ডিনার, বল নাচ প্রভৃতির জন্য আমাকে বিশেষ "সুট" তৈরি করিবার পরামর্শ দেওয়া হইল। সেই কুৎসিত "টেইল-কোট" আমি কিছুতেই পছন্দ করিতে পারিলাম না। ইংরাজদের সাধারণ বুদ্ধি ও সহজজ্ঞান যথেষ্ট আছে। তৎসত্ত্বেও তাহারা এই বর্বর পোশাকের 'ফ্যাশন' কেন যে ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এ বিষয়ে তাহাদের 'গেলিক' ভ্রাতাগণের জিদও আশ্চর্য। সৌন্দর্যবোধের জন্য বিখ্যাত

এবং চতুর্দশ লুইয়ের সময় হইতে 'ফ্যাশনের' পথ-প্রদর্শক ফ্রান্সের নিকট আমি এ সম্বন্ধে বেশী আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে নিরাশ হইতে হইল। ইংরাজেরা পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ডিনার (dinner) বিষয়ে যেভাবে ফরাসীদের অন্ধ অনুকরণ করে, তাহা আমার নিকট চিরদিনই নির্বুদ্ধিতা বলিয়া মনে হইয়াছে।

সে যাহা হউক, এখন আমার কাহিনী বলি। চোগা ও চাপকানযুক্ত ভারতীয় লম্বা পোশাক সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায় যাহা বিলাতে থাকিতে পরিতেন তাহাই ভারতীয়দের পক্ষে উপযোগী। আমাকে অক্সফোর্ড স্ট্রীটের চার্লস কীন এন্ড কোম্পানির দোকানে লইয়া যাওয়া হইল। বন্ধুদের নিকট ধার করিয়া একটা পোশাকের (চোগাচাপকানের) নমুনাও সঙ্গে লইলাম। দোকানে আমার গায়ের মাপ লইল এবং পোশাক তৈয়ারি হইলে পুনর্বার যাইয়া মাপ ঠিক করিয়া লইয়া আসিতে অনুরোধ করিল। পোশাক তৈরি হইলে আমাকে তাহারা সংবাদ দিল এবং দোকানে গেলাম। পোশাক পরিলে দেখা গেল যে যদিও মোটামুটি গায়ে লাগিয়াছে, তবুও স্থানে স্থানে একটু ঢিলা হইয়াছে। দর্জি প্রথমে আমাকে এই ত্রুটি দেখাইয়া দিয়া কৈফিয়ত স্বরূপ বলিল—"মশায়, আপনি এত সরু ও পাতলা যে আপনার শরীরের জন্য মাপসই জামা করা শক্ত।" কোন কোন পাঠক হয়ত আমার এই দুর্দশায় হাসিবেন। সম্ভবতঃ আমার চেহারা অনেকটা 'আইকাবড ক্রেনের' মত ছিল। আমি এপিকটেটাসের শিষ্য এবং ডাইওজিনিসের অনুরাগী,—কৌপীনধারী মহাত্মা গান্ধীও আমার শ্রদ্ধার পাত্র,—অনাড়ম্বর সরল জীবন এবং জ্ঞানচর্চাই জীবনের আদর্শ, সুতরাং এইরূপ লঘু বিষয়ের উল্লেখ করার জন্য পাঠকদের নিকট আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

আমি আমার পাঠ্যস্থান এডিনবার্গে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পৌঁছিলাম। শীতের সেসন আরম্ভ হইবার তখন কয়েকদিন বাকী আছে। এডিনবার্গ সুন্দর শহর, লন্ডনের আকাশ যেমন কুয়াশায় আচ্ছন্ন, এস্থান তেমন নহে। গ্লাসগোর মত এখানে কলকারখানা নাই, সুতরাং ধোঁয়ার উপদ্রবও কম, রাস্তায় যানবাহনের অত্যাচারও তেমন নাই। এডিনবার্গের চারিদিকেই সুন্দর দৃশ্য, এবং সমুদ্র খুব নিকটে, আমি একটি মাঠের নিকটে এবং "আর্থার্স সিট" হইতে অল্পদূরে বাসা করিলাম। ছুটির সময়ে "আর্থার্স সিট" আমার বড় প্রিয় স্থান ছিল। রবিবার দিন আমি পল্লীর মধ্য দিয়া হাঁটিয়া দূরবর্তী পাহাড়ে যাইতাম ও তাহার চূড়ায় উঠিতাম। সেই সময়ে সপ্তাহে ১২ শিলিং ৬ পেন্স দিলে, বেশ পছন্দসই একখানি বসিবার ঘর ও একখানি শয়নঘর পাওয়া যাইত। কয়লার জন্য অতিরিক্ত ভাড়া লাগিত না। কয়লা স্তূপাকার করা থাকিত এবং ইচ্ছামত "ফায়ার প্লেসে"* জ্বালানো যাইত। এক পেনিতে 'পরিজ' ও মিল্ক দিয়া পুষ্টিকর প্রাতরাশ মিলিত।

সৌভাগ্যক্রমে আমার "ল্যান্ড লেডী" বড় ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি, তাঁহার স্বামী ও সন্তানদের লইয়া বাড়ীর পিছনের অংশে থাকিতেন, রাস্তার ধারে সম্মুখের

* শীতপ্রধান দেশে আগুন জ্বালাইয়া রাখিবার চুল্লীবিশেষ।

অংশ ভাড়া দিতেন। অন্যান্য স্কচ 'ল্যান্ড-লেডী'দের মত তিনি খুব সৎ ছিলেন এবং আমার নিকট সিকি পয়সাও অতিরিক্ত লইতেন না। মোজা প্রভৃতি ধোপাবাড়ী হইতে যতবার ধুইয়া আসিত, ল্যান্ড-লেডীর মেয়ে প্রত্যেকবার মেরামত করিয়া দিতেন।

স্কচ 'ব্রথে'র তুলনা নাই,—ইহা যেমন সস্তা, তেমনি উৎকৃষ্ট। 'স্কচ ব্রথের' সম্পর্কে একটি ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। আমি একবার বড়দিনের সপ্তাহে সীমান্তে "বারউইক আপন টুইড" শহরে কাটাইয়াছিলাম। নিকটে জেডবার্গে পুরাতন গির্জার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলাম। তুষারাচ্ছন্ন পথে পায়ে হাঁটিয়া গেলাম। অতীতের ধর্মমন্দির দেখিয়া ফিরিবার পথে কোন রেস্তোরাঁর সন্ধান করিতে লাগিলাম। লোকে সামান্য একখানি ঘর আমাকে দেখাইয়া দিল এবং আমিও কতকটা দ্বিধা সঙ্কুচিত চিত্তে সেখানে প্রবেশ করিলাম। স্থানটি অনাড়ম্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমাকে এক প্লেট 'স্কচ ব্রথ' ও বড় একখণ্ড রুটি পরিবেশন করিল। আমার জলযোগের পক্ষে সেই যথেষ্ট। মাত্র এক পেনি মূল্য আমাকে দিতে হইল। আমার সময়ে অতীতের ছাত্রদের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শোনা যাইত। কৃষকের ছেলেরা বাড়ী হইতে হাঁটিয়া, অথবা শকটে চড়িয়া বহুদূরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত। বাড়ী হইতে সঙ্গে ওটমিল (জই), ডিম, মাখন প্রভৃতি আনিত, এবং সেগুলি ফুরাইয়া গেলে, মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে পুনর্বার আনাইয়া লইত। কার্লাইলের 'জীবনী' যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার ছাত্রাবস্থায়, এডিনবার্গে ছেলেরা কতদূর মিতব্যয়িতার সঙ্গে জীবনযাপন করিত। গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে এডিনবার্গে, এমন কি, কলিকাতায় পর্যন্ত ছাত্রজীবনের বহু পরিবর্তন হইয়াছে। সুতরাং সেকালের ছাত্রজীবনের বর্ণনামূলক নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ পাঠকের নিকট কৌতূহলপ্রদ বোধ হইতে পারে :—

"ইংরাজদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন বলিতে বুঝায় বড় বড় ইমারত, সুসজ্জিত গৃহ, বহু টাকার বৃত্তি; ১৯ বৎসর হইতে ২৩ বৎসর বয়স্ক তরুণ ছাত্রগণ; তাহাদের বাড়ী হইতে খরচের জন্য প্রচুর অর্থ আসে—জেমস কার্লাইলের জীবনের কোন এক বৎসরে যাহা সর্বোচ্চ আয় ছিল,—প্রত্যেক ছাত্র তাহার দ্বিগুণ অকাতরে ব্যয় করে। তখনকার দিনে টুইড নদীর উত্তর দিকের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে কোন আর্থিক পুরস্কার, ফেলোসিপ বা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল না—ছিল শুধু বিদ্যা শেখার ব্যবস্থা এবং আত্মত্যাগ ও দারিদ্র্যের ব্রত। এইখানে যাহারা যাইত, তাহাদের অধিকাংশেরই পিতামাতা কার্লাইলের পিতার মতই দরিদ্র ছিল। ছাত্রেরা জানিত কত কষ্ট করিয়া তাহাদের পড়িবার খরচ পিতামাতারা যোগাইতেন। এবং ছাত্রজীবনের সদ্ব্যবহার তথা জ্ঞানার্জনের দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়াই তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইত। বৎসরে পাঁচ মাস মাত্র তাহারা ক্লাসে পড়িতে পারিত, বাকী সময় ছেলে পড়াইয়া অথবা গ্রামে ক্ষেতের কাজ করিয়া নিজের পড়িবার ব্যয় সংগ্রহ করিত।

"সাধারণতঃ, যে সকল ছাত্র তাহাদের পরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মেধাবী হইত

এবং যাহাদের উপর পরিবারবর্গের যথেষ্ট আস্থা ছিল, চৌদ্দ বৎসর বয়সে সেই ছাত্রগণ এডিনবার্গ, গ্লাসগো প্রভৃতি শহরে প্রেরিত হইত। বাড়ী হইতে বাহির হইলে পথে অথবা গন্তব্য শহরে তাহাদের দেখাশুনা করিবার কেহ থাকিত না। যানের ভাড়া দিতে পারিত না বলিয়া তাহারা বাড়ী হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিত। কলেজে নিজেরাই নাম ভর্তি করাইত। নিজেরা বাসা ঠিক করিত এবং স্বভাব-চরিত্রের জন্য কেবলমাত্র নিজেদের উপরেই নির্ভর করিত। গ্রামের বাড়ী হইতে মাঝে মাঝে লোক আসিয়া ওট মিল (ছাতু), আলু, লবণাক্ত মাখন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য দিয়া যাইত। কখন কখন কিছু ডিমও দিত। তাহাদের মিতব্যয়িতার গুণে অন্য কোন খাদ্য আর তাহাদের দরকার হইত না। যাহারা খাদ্যদ্রব্য আনিত তাহাদের সঙ্গেই ময়লা পোশাক বাড়ীতে মায়েদের নিকট ধোয়া ও মেরামতীর জন্য পাঠাইত। বিষাক্ত আমোদ-প্রমোদের হাত হইতে দারিদ্র্যই তাহাদিগকে রক্ষা করিত। নিজেদের মধ্যে তাহারা বন্ধুত্ব করিত, পরস্পর পানভোজন ও ভাববিনিময় করিত। কথাবার্তা ও আলোচনার জন্য তাহাদের নিজেদের ক্লাবও থাকিত। "টারম্" শেষ বা কলেজ বন্ধ হইলে তাহারা দল বাঁধিয়া পদব্রজে বাড়ী যাইত, প্রত্যেক জেলারই ২।৪ জন ছাত্র সেই দলে থাকিত। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সুপরিচিত ছিল, পথে তাহাদের আতিথ্য এবং আদর অভ্যর্থনার অভাব হইত না।

"স্বাবলম্বনের শিক্ষা হিসাবে, এমন উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আর দেখা যাইত না।" (Froude's Life Carlyle).

তাহার পরে কয়েকবার আমি এডিনবার্গ ও অন্যান্য স্কচ শহরে গিয়াছি। কিন্তু শহরের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। হাইল্যান্ড এখন আর শান্তিপূর্ণ নির্জন স্থান নহে। ঔপন্যাসিক স্কটের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা, বিচিত্র পার্বত্য দৃশ্য, রেলওয়ে, মোটরবাস—এই সকলের ফলে দলে দলে ভ্রমণকারীরা এখন 'হাইল্যান্ডে' যায়, তাহাদের মধ্যে কোটিপতি আমেরিকাবাসীরাও থাকে। তাহারা প্রত্যেক 'সিজনে'র জন্য বাড়ীভাড়াও করে। স্কচেরা কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাহসিক ও পরিশ্রমী জাতি। পাটের কল, পাটের ব্যবসা ডাণ্ডিশহরের একচেটিয়া; হুগলী নদীর উপর প্রায় ৭০।৮০টি পাটের কল আছে, তাহার অধিকাংশ সুচতুর স্কচদের দ্বারাই পরিচালিত। গ্লাসগো লণ্ডনের পরেই গণনীয় শহর। গত ৫০ বৎসরে স্কটল্যাণ্ডের ঐশ্বর্য প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এডিনবার্গ শহরেরও দ্রুত পরিবর্তন হইয়াছে। এডিনবার্গ ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র নহে; কিন্তু প্রচুর পেন্সনভোগী অবসরপ্রাপ্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং বিদেশে প্রভূত ধনসঞ্চয়কারী ব্যবসায়ী প্রভৃতি এডিনবার্গে বাস করাই পছন্দ করেন।

এডিনবার্গ শহরের চারিদিকে সুন্দর বাসভবন গড়িয়া উঠিতেছে—নূতন শহর দ্রুত বিস্তৃত হইতেছে। অধিবাসীদের সরল মিতব্যয়ী জীবন অদৃশ্য হইয়াছে এবং বর্তমান যুগের বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন প্রণালী গ্রহণ করিতে তাহারা পশ্চাৎপদ হইতেছে না। স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় কবি বার্নস বিলাসিতার যে তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।

শীতের সেসনের প্রথমেই আমি ভর্তি হইলাম এবং প্রাথমিক বি. এস-সি. পরীক্ষার জন্য রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। গ্রীষ্ম সেসনের জন্য উদ্ভিদবিদ্যা রহিল, কেন না শরৎকালে ঐ দেশে গাছপালার পত্রপুষ্প সব ঝরিয়া পড়ে। শীতকালে গাছগুলি একেবারে পত্রশূন্য হয় এবং তাহাদের কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা অনেক সময় তুষারাচ্ছন্ন থাকে। অধ্যাপক টেইট পদার্থবিদ্যার মূল সূত্র চমৎকার বুঝাইতেন। কিন্তু আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে পদার্থবিদ্যার পাঠ্য হিসাবে টেইট ও টমসনের Natural Philosophy নামক যে পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল, তাহা একটু দুরূহ এবং আমার পক্ষে দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইত। আমি পর পর দুই সেসনে টেইটের দুইটি ধারাবাহিক বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম কিন্তু আমি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম রসায়নই আমার মনোমত বিদ্যা। কলিকাতায় থাকাতেই আমি এই বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হই। এক্ষণে আমি নিষ্ঠা সহকারে এই বিদ্যার সেবা করিতে লাগিলাম, যদিও অন্যান্য বিদ্যাও অবহেলা করি নাই।

আমাদের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার ক্রাম ব্রাউনের বয়স তখন ৪৪ বৎসর। জুনিয়র ক্লাসে ৪০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত medical ছাত্র থাকিত, তাহাদের প্রায় সকলেই পরীক্ষায় পাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইত। গৃহ হইতে সদ্য আগত স্কচ যুবকেরা স্বভাবতঃই তেজ ও উৎসাহে জীবন্ত; অধ্যাপক ক্লাসে আসিতেই তাহারা মহা আড়ম্বরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিত। তাঁহার আসিবার পূর্ব হইতেই তাহারা গান গাহিতে আরম্ভ করিত। এত বড় ক্লাস ঠিক রাখা শক্ত কাজ, ক্রাম ব্রাউনও ক্লাসে এতগুলি ছেলের সম্মুখে আসিয়াই একটু চঞ্চল হইয়া পড়িতেন। ছাত্রেরা তাঁহার এই দৌর্বল্য শীঘ্রই ধরিয়া ফেলিত, ফলে মাঝে মাঝে নাটকীয় ঘটনা এমন কি শোচনীয় ব্যাপারও ঘটিত। ক্রাম ব্রাউন যখনই চাঞ্চল্য দেখাইতেন, তখনই ছেলেরা তাহার সুযোগ লইত। তাহারা মেজের উপর বুট ঘষিত, মেজে ঠুকিত বা ঐরূপ আরও কিছু করিত। ইহার ফলে অধ্যাপকের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইত। "ভদ্রগণ, তোমরা এমন করিতে থাকিলে, আমি বক্তৃতা করিতে পারিব না।" এই আবেদনে সুফল হইত, ছেলেরা শান্ত হইত। ক্রাম ব্রাউন অমায়িক ও উদারমনা এবং খাঁটি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি চীনা ভাষাও কিঞ্চিৎ জানিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ মেধা জটিল গণিতের সমস্যা সহজেই সমাধান করিতে পারিত, শরীরতত্ত্বে কর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু নূতন দানও ছিল। তাঁহার সহযোগী টমাস ফ্রেজার ও তাঁহাকে 'ফার্মাকোলজী'র একটা নূতন শাখার প্রতিষ্ঠাতা রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। উচ্চতর ক্লাসে, Crystallography প্রভৃতি জটিল বিষয়ের অধ্যাপনাতেই তাঁহার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় ভাল করিয়া পাওয়া যাইত। তখনকার দিনে কেম্‌ব্রিজ, অক্সফোর্ড প্রভৃতি ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পারিশ্রমিকের তুলনায় এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পারিশ্রমিক "রাজোচিত" ছিল বলিলেই হয়। সমস্ত 'ফিস' অর্থাৎ ছাত্রদত্ত বেতন তাঁহারা পাইতেন। বেতনের পরিমাণ সাধারণ ক্লাসের জন্য ৪ গিনি এবং প্র্যাক্‌টিক্যাল বা ফলিত বিষয়ের জন্য ৩ গিনি ছিল।

ক্রাম ব্রাউন তখন মোটা ও অলস হইয়া পড়িতেছিলেন। তিনি চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন এবং জৈব রসায়নের ছাত্রেরা তাঁহার আবিষ্কৃত Graphic formula-র জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে, কেননা, ইহা রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতিতে বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে। তিনি ব্যবহারিক 'ক্লাসে' বা লেবরেটরীতে কাজ করিতেন না বটে, কিন্তু সেজন্য যোগ্য ডিমনস্ট্রেটর ও সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাঃ জন গিবসন ও ডাঃ লিওনার্ড ডবিনের নাম উল্লেখযোগ্য। গিবসন হাইডেলবার্গে প্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ বুনসেনের নিকট পড়িয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রণালী উক্ত জার্মান অধ্যাপকের রীতি অনুযায়ীই ছিল। আমার পড়াশুনা বেশ ভাল হইতে লাগিল—এই দুইজন ডিমনস্ট্রেটরের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হইল। কিরূপ আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে আমি আমার প্রিয় বিজ্ঞানসমূহ অধ্যয়ন করিতাম তাহা এই ৫০ বৎসর পরেও মনে পড়িতেছে। আমি জার্মান ভাষা মোটামুটি শিখিলাম, তাহার ফলে উক্ত ভাষায় লিখিত রসায়ন শাস্ত্র বুঝিতে পারিতাম। আমার একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন জেমস ওয়াকার (পরে স্যার জেমস ওয়াকার)। তিনি ডাণ্ডীর অধিবাসী ছিলেন। ক্রাম ব্রাউন অবসর গ্রহণ করিলে, ওয়াকারই ঐ পদ লাভ করেন। আমার সমসাময়িক 'জুনিয়র' ছাত্র আর দুইজন খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। একজন আলেকজাণ্ডার স্মিথ, ইনি পরে চিকাগো ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। অন্য একজন হিউ মার্শাল, ইনি 'কোবাল্ট অ্যালাম' আবিষ্কার এবং 'পারসালফারিক অ্যাসিড' সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য বিখ্যাত। মার্শাল মাত্র ৪৫ বৎসর (১৯১৩ খৃঃ) বয়সে মারা যান। ৫৭ বৎসর বয়সে (১৯২২ খৃঃ) স্মিথের মৃত্যু হয়।*

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলাম তখন এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহার দ্বারা আমার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন প্রভাবান্বিত হয়। সুতরাং ঐ ঘটনাটি এখানে উল্লেখযোগ্য। স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট ১৮৬৭—৬৮ সালে ভারতসচিব ছিলেন। ইনিই পরে লর্ড ইড্‌স্‌লি উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টররূপে ইনি ঘোষণা করেন যে "সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা" সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। তখন আমি লেবরেটরীতে বিশেষ পরিশ্রম করিতেছিলাম এবং বি এস-সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। তৎসত্ত্বেও আমি প্রবন্ধপ্রতিযোগিতায় যোগ দিলাম। আমার ইতিহাসচর্চার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পুনরায় জাগ্রত হইল এবং কিছুকালের জন্য রসায়নশাস্ত্রের স্থান অধিকার করিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি

* এস্থলে একটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। গত বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গবর্নর স্যার জন এণ্ডার্সন ও আমাকে (অন্যান্যদের মধ্যে) সম্মানসূচক উপাধি দেন। আমি ভাইস্‌চ্যান্সেলারের At home তে স্যার জনের ঠিক পাশেই উপবেশন করি এবং তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "আজ আমরা উভয়েই fellow graduate অর্থাৎ একই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী", তাহাতে স্যার জন বলেন, ইহা ঠিক নয়; আমরা বহুপূর্বেই fellow graduates অর্থাৎ তিনিও আমার অনেক পরে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ টেট ও ক্রাম ব্রাউনএর নিকট অধ্যয়ন করেন এবং Hope Prize (রসায়ন বিদ্যায়) লাভ করেন।

হইতে আমি ভারত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আনিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। রুসেলের "L'Inde des Rajas", Lanoye's "L'Inde contemporaine", "Revue des deux mondes"এ ভারত সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী প্রভৃতি ফরাসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থও এই উদ্দেশ্যে পড়িলাম। আমি শীঘ্রই দেখিলাম যে বাজেট আলোচনা এবং রাজস্বনীতি, বিনিময়নীতি প্রভৃতি বুঝিতে হইতে অর্থনীতি (Political Economy) কিছু জানা দরকার। আমি সেইজন্য ফসেটের Political Economy এবং Essays on Indian Finance গ্রন্থ পড়িলাম। এই অন্ধ অর্থনীতিবিৎ হ্যাকনীর প্রতিনিধিরূপে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন এবং ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাল্যকালে "হিন্দু পেট্রিয়টে" আমি পড়িয়াছিলাম, মিঃ ফসেট পার্লামেণ্টে ভারতের বহু উপকার করিয়া ভারতবাসীদের ভালবাসা লাভ করেন। জনসাধারণের নিকট হইতে তাঁহার ভারতপ্রীতির জন্য "Member for India" বা 'ভারতের প্রতিনিধি' এই আখ্যাও তিনি লাভ করেন। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভারত সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক গ্রন্থই আমি পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। "ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ", "কনটেম্‌পোরারি রিভিউ", 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত ভারত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আমার দৃষ্টি এড়াইত না। কতকগুলি প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক সমস্যা সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে তর্কবিতর্ক ও আলোচনাও আমি পুরাতন "হ্যানসার্ডে" (পার্লামেণ্টে ঐ বক্তৃতার রিপোর্ট) পড়িয়াছিলাম।

গ্রন্থ রচনায় বিশেষতঃ এই শ্রেণীর রচনায় আমি নূতন ব্রতী। কিন্তু ভারতবাসী হিসাবে আমি এই সুযোগ পরিত্যাগ করা সঙ্গত মনে করিলাম না। আমি বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এখন সেইগুলি সাজাইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের সার বস্তু গুছাইয়া বলিতে পারাতেই প্রবন্ধ লেখকের কৃতিত্ব। বহুভাষণ ও বহুবিস্তৃতি সর্বদা পরিহার করাই কর্তব্য। আমি আলোচ্য বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম। প্রথম ভাগে ৪টি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় ভাগে ৩টি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিলাম। আমার চিন্তাস্রোত দ্রুত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, "টেস্ট টিউবের" ন্যায় লেখনীও আমি বেশ সহজভাবে চালনা করিতে পারি।

যথাসময়ে আমি আমার প্রবন্ধ দাখিল করিলাম। উপরে একটি "মটো" থাকিল এবং সঙ্গে একটি সীলমোহর করা খামে আমার নাম রহিল। প্রবন্ধ পরীক্ষার ফল ঘোষিত হইলে আমি একপ্রকার "বিষাদ মিশ্রিত আনন্দ" অনুভব করিলাম। পুরস্কার আমি পাই নাই, অন্য একজন প্রতিযোগী তাহা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার এবং অন্য একজনের প্রবন্ধ proxime accesserunt অর্থাৎ আদর্শের কাছাকাছি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

আমার হাতের লেখা খারাপ, সেকালে টাইপরাইটারও ছিল না। এদিকে আমি প্রবন্ধের কোন নকলও রাখি নাই। আমি প্রবন্ধটি নিজব্যয়ে প্রকাশ করিব বলিয়া ফেরত চাহিয়া পাঠাইলাম। আবেদন গ্রাহ্য হইল। প্রবন্ধ ফেরত পাইলে দেখিলাম

উহাতে প্রবন্ধপরীক্ষকদের একজনের মন্তব্য লিপিবন্ধ রহিয়াছে। আমি তাহা হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি। কেন না কথাকয়টি আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে।

"আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ যেটিতে মটো আছে।.........ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ইহা শ্লেষপূর্ণ আক্রমণে পূর্ণ।" পরে আমি জানিতে পারি স্যার উইলিয়ম মুয়র এবং প্রোফেসার ম্যাসন প্রবন্ধপরীক্ষক ছিলেন। মুয়র একজন খ্যাতনামা আংলোইণ্ডিয়ান শাসক ছিলেন। তিনি যুক্ত প্রদেশের গবর্নরপদেও কিছুকাল সমাসীন ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর কিছুদিন ভারত সচিবের কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। · স্যার আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্টের মৃত্যুর পর তাঁহাকেই এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। মুয়র Life of Mahomet (মহম্মদের জীবনী) লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার আরবী ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৮৫ সালে সেসনের উদ্বোধন করিবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া মুয়র যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি অন্য দুইটি প্রবন্ধ ও আমার প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। আমি প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে ছাপাই। উহার সঙ্গে ছাত্রদের প্রতি একটি নিবেদনপত্রও ছিল। পরে সাধারণ পাঠকদের জন্যও আমি পুস্তকের একটি সংস্করণ প্রকাশ করি। তৎকালে "ভিক্ষা নীতি"তে আমি বিশ্বাসী ছিলাম এবং শিশুসুলভ সরলতার সহিত আমি ভাবিতাম যে, ভারতের দুঃখ-দুর্দশার কথা যদি ব্রিটিশ জনসাধারণের গোচর করা যায় তাহা হইলেই সেগুলির প্রতিকার হইবে। আমার এই মোহ ভঙ্গ হইতে বেশী দিন লাগে নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি দৃষ্টান্ত নাই যে, প্রভুজাতি স্বেচ্ছায় পরাধীন জাতিকে কোন কিছু অধিকার দিয়াছে। ইংলণ্ডের মত স্বাধীন দেশেও ব্যারনেরা কৃষকদের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজা জনের অনিচ্ছুক হস্ত হইতে "ম্যাগ্না কার্টা" কাড়িয়া লইয়াছিল। No taxation without representation— পার্লামেণ্টে নির্বাচনের অধিকার ব্যতীত দেশবাসীরা ট্যাক্স দিবে না—শাসনতন্ত্রের এই মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্রিটিশ জাতিকে গৃহযুদ্ধ করিয়া রক্তস্রোত বহাইতে হইয়াছিল। আমার বহিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি যে নিবেদন ছিল, তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"ভারত-ব্যাপারে ইংলণ্ডের গভীর অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ফলেই ভারতের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার উৎপত্তি; ইংলণ্ড এ পর্যন্ত ভারতের প্রতি তাহার পবিত্র কর্তব্য পালন করে নাই। তোমরা গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লাণ্ডের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ, ভারতে অধিকতর উদার, ন্যায়সঙ্গত ও সহৃদয় শাসননীতি অবলম্বনের জন্য তোমাদের দিকেই আমরা চাহিয়া আছি। সেই শাসননীতির উদ্দেশ্য কতকগুলি মামুলী বুলি হইবে না, তাহার উদ্দেশ্য হইবে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর মৈত্রীর বন্ধন স্থাপন। তোমাদের উপরই আমাদের সমস্ত আশা ভরসা।

শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যে তোমাদিগকেই সেই সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণের জন্য আহবান করা যাইবে—যে সাম্রাজ্যে সূর্য কখন অস্ত যায় না এবং যাহার রাষ্ট্রিক বলিয়া আমরা গৌরবান্বিত। অদূর ভবিষ্যতে তোমরাই ২৫ কোটি মানবের ভাগ্যবিধাতা হইবে। আমরা আশা করি যে তোমরা যখন রাজ্যশাসনের ক্ষমতা পাইবে, তখন বর্তমান অ-ব্রিটিশ নীতির অবসান হইবে এবং ভারতে এখনকার চেয়ে উজ্জ্বল ও সুখময় যুগের উদয় হইবে।"

আমি জন ব্রাইটের নিকট বহির একখণ্ড পাঠাইলাম। ঐ সঙ্গে একটি পত্রে ভারতের সঙ্গে ব্রহ্মদেশভুক্তি এবং তাহার ফলে ভারতবাসীদের উপর লবণশুল্ক বাবদ ট্যাক্সবৃদ্ধির অন্যায় নীতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। ব্রাইট সুন্দর একখানি পত্রে আমাকে প্রত্যুত্তর দিলেন। উহার সঙ্গে পৃথক একখানি কাগজে লেখা ছিল—"এই পত্র আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন।" আমি তৎক্ষণাৎ টাইম্‌স্‌ ও অন্যান্য সংবাদপত্রে জন ব্রাইটের পত্রের নকল পাঠাইয়া দিলাম। একদিন সকালে উঠিয়া দেখি যে, আমি কতকটা বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িয়াছি। খবরের কাগজের বড় বড় 'পোস্টারে' বাহির হইল—"ভারতীয় ছাত্রের নিকট জন ব্রাইটের পত্র"। রয়টারও ঐ পত্রের নিম্নলিখিত সারমর্ম ভারতে তার করিয়া পাঠাইলেন।

"আমি আপনারই মত লর্ড ডাফরিনের বর্মানীতির জন্য দুঃখিত এবং তাহার তীব্র নিন্দা করি। পুরাতন পাপ ও অপরাধের নীতির ইহা পুনরাবৃত্তি—যে নীতি চিরদিনের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম। ভারতে আমাদের প্রকৃত স্বার্থ কি, তৎসম্বন্ধে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে গভীর অজ্ঞতা —সঙ্গে সঙ্গে ঘোর স্বার্থপরতাও রহিয়াছে। সন্নীতি এবং প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতা হইতে ভ্রষ্ট হইলে আমাদের বিপদ ও ধ্বংস অনিবার্য এবং আমাদের বংশধরগণের ...র জন্য আক্ষেপ করিতে হইবে।"

অর্ধশতাব্দী পূর্বে লিখিত আমার Essay on India পুস্তিকা হইতে কয়েক-ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ঐ প্রবন্ধ ১৮৮৬ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আমার মনে হয়, পরবর্তীকালে আমার রচনাশক্তির অধোগতি হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্বে আমার রচনারীতি যেরূপ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। সম্ভবতঃ রাসায়নিক গবেষণায় নিমগ্ন থাকিবার জন্যই এইরূপ ঘটিয়াছে।

[Essay on India (ভারত বিষয়ক প্রবন্ধ) হইতে উদ্ধৃত]

"ইংলণ্ড ভারতের সামাজিক উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছে তাহা ইঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। রাশিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু ইংলণ্ড অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া সরকারী কলেজসমূহে লক, বার্ক, হ্যালাম এবং মেকলের গ্রন্থাবলী বিনা দ্বিধায় পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন এইরূপে নিয়মতন্ত্রের মূল সূত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকে এখন রাজনৈতিক

বুদ্ধির এক একটি কেন্দ্রস্বরূপ এবং তাহা হইতে নানারূপ চিন্তাধারা বিকীর্ণ হয় এবং অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত লোকেরা তাহা গ্রহণ করে। ভারতে এখন যে সব ঘটনা ঘটিতেছে, বিলাতের জনসাধারণকে তৎসম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। সমাজের উচ্চস্তরে যে সমস্ত চিন্তা ও ভাব বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা এখন নিম্নস্তরে প্রবেশ করিতেছে। জনসাধারণ তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেছে। ইহাকে নগণ্য বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে ইংলণ্ড এখন অপরিহার্য তথ্য ও যুক্তি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয় এবং ভারতের নব উদ্বোধিত জাতীয়তার ভাবকে সে পিষিয়া মারিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না। বিদেশী শাসনের স্বার্থপর কঠোর ও নিষ্ঠুর নীতির ফলে দেশবাসীর উপর নানারূপ অযোগ্যতা ও অক্ষমতার ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে মুহূর্তে কোন ভারতবাসী নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে, সেই মুহূর্তেই সে সম্ভবতঃ নিজের জন্য লজ্জা অনুভব করে। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সে আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখে। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কথা ও কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। দূরদৃষ্টি বলে পূর্ব হইতে সময়ের গতি বুঝা, অন্ততঃপক্ষে [illegible] অনুমান করা—এবং তদনুসারে কার্য করা বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের লক্ষণ। [illegible] বিপ্লব যে এত শক্তিশালী হইয়াছিল, তাহার কারণ তাহার মূলে ছিল মানসিক বিদ্রোহ। ভল্টেয়ার স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া একজন বিদেশী [illegible] অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি [illegible] মনের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। রুসোর জীবনই [illegible] কঠোরতম দারিদ্র্যও তাঁহার আত্মার শক্তি ও ভাবধারা [illegible] কার্লাইল বলিয়াছেন—'প্যারিসের গ্যারেটে (চিল [illegible], নির্বাসিত, [illegible] দুঃখময় চিন্তামাত্র সঙ্গী, স্থান হইতে স্থানান্তরে বিতাড়িত [illegible], নির্যাতিত হইয়া রুসো গভীরভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছিলেন যে [illegible] নহে, জগতের বিধিবিধানও তাঁহার সহায় নহে। তাহাকে গারদে বন্দী করা যাইত পারিত, উন্মাদ ভাবিয়া তাঁহাকে উপহাস করা যাইতে পারিত, বন্য পশুর মত খাঁচায় পুরিয়া তাঁহাকে অনাহারে শুকাইয়াও মারা যাইত, [illegible] সমস্ত [illegible] বিদ্রোহের অনল প্রজ্বলিত করিতে কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে [illegible] বিদ্রোহ রুসোর মধ্যেই তাহার প্রচারকের সন্ধান পাইয়াছিল।

"একদিকে রূঢ়, কঠোর, অনমনীয় ঔদ্ধত্য, অন্যদিকে হেয় আত্মসমর্পণ, এই দুয়ের মধ্যবর্তী কোন সম্মানজনক পন্থা কি নাই? আমরা অদ্ভুত যুগে বাস করিতেছি। শত শতাব্দীর পুরাতন প্রতিষ্ঠানও কয়েকদিনের মধ্যে "সুবিধাবাদীদের সুরক্ষিত দুর্গ" রূপে কলঙ্কিত হইতে পারে, অদূর ভবিষ্যতে আর একজন হাওয়ার্থ আবির্ভূত হইয়া ইণ্ডিয়া কাউন্সিল এবং সেই শ্রেণীর অন্যান্য 'ব্যুরো'কে যে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? জোড়াতালি বা গোঁজামিল দেওয়া সংশয়পূর্ণ নীতি অন্যত্র পরীক্ষিত ও ব্যর্থ হইয়াছে। ৫০ বৎসর ধরিয়া আয়র্লাণ্ডকে "অনুগ্রহ করিবার নীতি" তাহাকে অধিকতর বিদ্রোহ-

ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আয়র্লাণ্ডের শিক্ষা কি ভারত সম্বন্ধে কোনই কাজে লাগিবে না?

"আমরা দেখিতেছি, এক শ্রেণীর লেখক কোন কোন স্বেচ্ছাচারী ধর্মান্ধ মুসলমান রাজাকে খাড়া করিয়া তাহাদের শাসননীতির সঙ্গে বর্তমান ব্রিটিশ শাসনের তুলনা করিতে ভালবাসেন। ইহা ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত বটে! কিন্তু মুসলমান শাসন কি ব্রিটিশ শাসনের তুলনায় হীন প্রতিপন্ন হইবে? একথা ভুলিলে চলিবে না, যখন রানী মেরী ধর্মসম্বন্ধীয় মতভেদ ও গোঁড়ামির জন্য নিজের প্রজাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে বা কারাগারে নিক্ষেপ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে পরাক্রান্ত মোগল বাদশাহ আকবর সর্বধর্মের প্রতি উদারনীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং মৌলবী, পণ্ডিত, রাবি, এবং মিশনারীকে দরবারে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেহ হয়ত একথা বলিতে পারেন যে, আকবরের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাকে মোগলদের প্রতিনিধি গণ্য করা যাইতে পারে না। ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত কথা। ধর্মবিষয়ে উদারতা মোগল বাদশাহদের পক্ষে সাধারণ নিয়ম ছিল, বিরল ঘটনা ছিল না।"

উত্তর প্রদেশের প্রধান সংবাদপত্র "স্কটম্যান" এই প্রবন্ধ সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন,—"এই ক্ষুদ্র বহিখানি খুবই চিত্তাকর্ষক। ইহাতে ভারত সম্বন্ধে এমন অনেক তথ্য আছে, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থের প্রতি সকলের দৃষ্টি আমরা বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।" কিন্তু এই ঐতিহাসিক আলোচনার উৎসাহ আমাকে সংযত করিতে হইল। আমার শীঘ্রই বি. এস-সি. পরীক্ষা দিবার কথা, এবং রসায়নশাস্ত্রের দাবি রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য উপেক্ষা করা যায় না। আমি গভীরভাবে আমার প্রিয় রসায়নশাস্ত্রের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিলাম। বি. এস-সি. ডিগ্রী পাওয়ার পর আমাকে 'ডক্টর (D.Sc.,) উপাধির জন্য প্রস্তুত হইতে হইল; এজন্য কোন মৌলিক গবেষণা মূলক প্রবন্ধ দাখিল করা প্রয়োজন। লেবরেটরীতে গবেষণা এবং ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় লিখিত রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন—ইহাতেই আমার সময় কাটিতে লাগিল। ১৮৮৫—১৯২০ পর্যন্ত আমার সমগ্র সময় বলিতে গেলে রসায়নশাস্ত্রের চর্চাতেই ব্যয় হইয়াছে।

এডিনবার্গের শীতল, স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে আমাদের দেশের অপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করা যায়, অথচ কোন ক্লান্তি বোধ হয় না। লেবরেটরীতে কাজ শেষ হইবার পর গৃহে ফিরিবার পূর্বে আমি খুব খানিকটা বেড়াইয়া আসিতাম।

আমি সমাজে বড় বেশী মেলামেশা করিতাম না। কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু যে কারণেই হউক ঐ সমস্ত পরিবারের বয়স্ক পুরুষদের সঙ্গই তরুণীদের সঙ্গ অপেক্ষা আমার ভাল লাগিত। বয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে আমি নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিতাম। কিন্তু যখনই তরুণীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হইত, আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইত এবং মামুলী আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয়ে কথা বলিতে

পারিতাম না। ঐরূপে দুই চারিটা কথা শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইত এবং নূতন কোন বিষয় খুঁজিয়া না পাইয়া আমি অপ্রতিভ হইয়া পড়িতাম। আমার কোন কোন ভারতীয় বন্ধু নারীমহলে আলাপ পরিচয়ে বেশ সুপটু ছিলেন। ঘটনাক্রমে কোন সমাজের মধ্যে পড়িলে তাহার 'ধাত' বুঝিয়া আলাপ জমাইয়া তুলিবার মত দক্ষতা আমার ছিল না। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি নারীবিদ্বেষী ছিলাম অথবা নারী জাতির সৌন্দর্য ও মাধুর্য অনুভব করিবার শক্তি আমার ছিল না। বস্তুতঃ রসায়নশাস্ত্রের খ্যাতনামা প্রবর্তক ক্যাভেন্‌ডিশের চেয়ে এ বিষয়ে যে আমি সৌভাগ্যবান ছিলাম, এজন্য নিজকে ধন্য মনে করি।

ডাঃ এবং মিসেস কেলী (ক্যাম্পো ভার্ডি, টিপারলেন রোড) প্রতি শনিবারে ভারতীয় ও অন্যান্য বিদেশী ছাত্রদের স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিতেন। প্রবীণ দম্পতীর সঙ্গে আমার বেশ সৌহার্দ্য ছিল। একবার আমার পুরাতন ব্যাধি উদরাময়ে আমি ভুগিতেছিলাম। তখন সেই সহৃদয় দম্পতী আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং আমার জন্য বিশেষভাবে লঘুপাচ্য অথচ সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। একথা আজ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি। আমি কোন কোন অভিজাত ও 'ফ্যাশন'ওয়ালা লোকদের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম, এমন কি, কখন কখন 'বলনাচে'ও যোগ দিয়াছিলাম। আমার ভারতীয় পোশাক বন্ধুরা অনেকেই চাহিয়া লইত। একবার একজন উত্তর ভারতীয় মুসলমান বন্ধু তাঁহার জমকাল পোশাক ও পাগড়ি দ্বারা আমাকে সাজাইয়াছিলেন। তাহার ফলে আমি সকলেরই লক্ষ্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। খুব সম্ভব লোকে আমাকে কোন ভারতীয় প্রিন্স বা রাজকুমার বলিয়া মনে করিয়াছিল। 'ফ্যাশনেবল' সমাজের সঙ্গে পরিচিত হইতে গিয়া আমি দুই একবার এইরূপ কঠিন পরীক্ষায় পড়িয়াছিলাম।

যথাসময়ে আমি আমার 'থিসিস্‌' বা মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করিলাম, একটা বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষাও দিতে হইল। আমার পরীক্ষকগণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং 'ডক্টর' উপাধির জন্য আমাকে সুপারিশ করিলেন। এরূপ যে হইবে, তাহা পূর্ব হইতেই আমি জানিতাম। ঐ বৎসর আমিই একমাত্র ডক্টর উপাধিপ্রার্থী ছিলাম এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁহাদের চোখের উপর তাঁহাদেরই পরিচালনাধীনে আমি রসায়ন শাস্ত্রে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি এবং আমার মৌলিক গবেষণার মূল্য কি, তাহা তাঁহারা ভালই জানিতেন।

এই সময়ে রসায়নশাস্ত্রের প্রতি আমি এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলাম যে, আমি আরও এক বৎসর এডিনবার্গে থাকিয়া মনোমত উহার চর্চা করিব, স্থির করিলাম। আমি হোপ প্রাইজ স্কলারশিপ পাইয়াছিলাম, গিলক্রাইস্ট এনডাউমেণ্টের ট্রাস্টিরাও আমার বৃত্তি শেষ হইলে আরও ৫০ পাউণ্ড আমাকে সানন্দে পুরস্কার দিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বিজ্ঞানে 'ডক্টর' উপাধি খুব কম লোকেই পাইত, এখনকার মত তাহাদের সংখ্যা এত বেশী ছিল না। সমাজে আমার একটু প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া আমার বোধ হইল। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলাম এবং প্রেসিডেণ্টের (অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন) অনুপস্থিতিতে সভায়

আমিই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতাম।* আমার ছয়মাস পূর্বে ওয়াকার "ডক্টর" উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি তখন হইতেই ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ বিজ্ঞানের তখন কেবল চর্চা সুরু হইয়াছিল। ওয়াকার জার্মানীতে গিয়া ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রীর তিনজন প্রবর্তকের অন্যতম অস্‌টোয়াল্ডের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত বিজ্ঞানের অন্য দুইজন প্রবর্তকের নাম,—ভাণ্ট হফ এবং আরেনিয়াস্‌। জার্মানী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ইংলণ্ডে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রী চর্চার প্রধান প্রবর্তক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। গ্লাসগোর অধ্যাপক ডিট্‌মার, এক সময়ে ক্রাম ব্রাউনের সহকারী ছিলেন। তিনি আমাদের লেবরেটরী পরিদর্শন করিতে প্রায়ই আসিতেন। আমি তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করি, আমিও ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রীর চর্চা আরম্ভ করিব কি না? ডিট্‌মার উত্তর দেন—"আগে কেমিক্যাল কেমিস্ট হও!"

এখানে একটি ঘটনা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য; আকস্মিক ঘটনাও অনেক সময়ে কিরূপে বিজ্ঞানের উন্নতিতে সহায়তা করে, ইহার দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু যাহাদের মন পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকে, তাহারাই কেবল এইরূপ আকস্মিক ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। হোপ প্রাইজ স্কলার হিসাবে আমাকে লেবরেটরীতে অধ্যাপককে সাহায্য করিতে হইত, ইহাকে বিশেষ সুবিধারূপে গণ্য করা যাইতে পারে, কেননা ইহার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনার কাজও শেখা যায়। হিউ মারশাল জুনিয়র ছাত্র ছিলেন এবং আমি তাঁহাকে অনেক সময়ে গবেষণা বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দিতাম। একবার আমি তাঁহাকে কতকগুলি লবণের নমুনা দিই, উদ্দেশ্য তাঁহার বিশ্লেষণ শক্তি পরীক্ষা করা এবং নিজের পরীক্ষিত বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া। লবণগুলি আমি ডক্টরের থিসিসের জন্য তৈরি করিয়াছিলাম। একটির মধ্যে ডবল সালফেট অব কোবাল্ট, কপার ও পোটাশিয়াম ছিল। ম্যারশাল ইলেকট্রোলিটিক্যাল প্রণালী অবলম্বনে বিশ্লেষণ করেন। তিনি দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন যে নীচে একরকম নূতন দানাদার (Crystalline) পদার্থ জমিয়া গিয়াছে। বিশ্লেষণ করিয়া বুঝা গেল উহা 'কোবাল্ট অ্যালাম'। প্রতিক্রিয়ায় যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইল, 'পার সালফ্যারিক অ্যাসিড' তাহার অন্যতম। এইরূপে একদিনেই বহুদিনের প্রত্যাশিত একটা নূতন পদার্থের আবিষ্কর্তারূপে যুবক ম্যারশাল বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অনেক সমসাময়িক এবং পূর্বগামী তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন।

---

* সেসন—১৮৮৭-৮৮

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির কর্মাধ্যক্ষগণ

প্রেসিডেণ্ট—প্রোঃ এ. ক্রাম ব্রাউন. এফ. আর. এস।
ভাইস প্রেসিডেণ্ট—পি. সি. রায়., ডি. এস সি.; র‍্যাল্‌ফ্‌ স্টকম্যান এম. ডি।
সেক্রেটারী—অ্যানড্রু কিং। কোষাধ্যক্ষ——হিউম্যারশাল বি. এস-সি.।
লাইব্রেরিয়ান—লিওনার্ড ডবিন., পি. এইচ-ডি., এফ. আর. এম. ই. এফ. আই. সি.।
কমিটির সদস্যগণ—টি. এফ. বারব্যুর; ডি. বি. ডট্‌. এফ. আর এস. ই; এফ. মেটল্যাণ্ড গিবসন; জে. গিবসন পি. এইচ-ডি. এফ. আর এস. ই. এফ. আই সি; এ. শ্যাণ্ড।

ইনঅরগ্যানিক কেমিস্ট্রী বা অ-জৈব রসায়নে ডক্টর উপাধি পাওয়ার পর আমি জৈব রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পড়িতে লাগিলাম। এই বিষয়ে আমি লেবরেটরীতে গবেষণাতেও প্রবৃত্ত হইলাম। ১৮৮৮ সালে শীতের সেসন শেষ হওয়ার পর দেশে ফিরিবার কথা আমি ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু এডিনবার্গ ত্যাগ করিবার পূর্বে হাইল্যাণ্ডের দৃশ্যাবলী দেখিবার জন্য আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করিতে সংকল্প করিলাম। আমি বার্ষিক এক শত পাউন্ড বৃত্তি পাইতাম, ইহারই মধ্যে মিতব্যয়িতার সঙ্গে আমাকে চালাইতে হইত। বাড়ী হইতে মাঝে মাঝে সামান্য কিছু টাকা পাইতাম।

লম্বা গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে আমি ফার্থ অব ক্লাইড, রোথসে এবং ল্যামল্যাশের সুলভ অথচ মনোরম সমুদ্রাবাসে বেড়াইতে যাইতাম। এই সমুদ্র উপকূল ভ্রমণে পার্বতীনাথ দত্ত প্রায়ই আমার সঙ্গী হইতেন। তিনি পরে ভারতীয় জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন। মিতব্যয়িতার জন্য আমরা উভয়ে একত্র থাকিতাম ও আহারাদি করিতাম, এমন কি, অনেক সময় এক শয্যায় শয়ন করিতাম। ইংলন্ডের ব্রাইটন প্রভৃতি 'ফ্যাশনেবল' সমুদ্রাবাসের তুলনায় রোথসে, বিশেষতঃ ল্যামল্যাশ খুবই সুলভ জায়গা এবং সেখানকার দৃশ্যও সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। প্রাতর্ভোজনের পর কিছু পড়াশুনা করিয়া আমরা পকেটে স্যান্ডউইচ পুরিয়া দীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িতাম। পানীয় জলের কখনই অভাব হইত না, কেননা ঐ অঞ্চলে প্রাকৃতিক প্রস্রবণ অনেক আছে। আমার বন্ধু ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণারও বহু সুযোগ পাইতেন এবং আমাকে পর্বতের স্তর বিভাগ প্রভৃতি দেখাইতেন। সমস্তদিন ব্যাপী এই ভ্রমণ যেমন উপভোগ্য, তেমনি স্বাস্থ্যকর বোধ হইত। ইহার সঙ্গে সমুদ্রস্নান অধিকতর আনন্দদায়ক। ৪৫ বৎসর পরে এখনও সেই সমুদ্রতীরে ভ্রমণের কথা মনে পড়িলে, আমার মনে যেন যৌবনের উৎসাহ ফিরিয়া আসে। রোথসে হইতে নিকটবর্তী নানাস্থানে স্টীমারে ভ্রমণ করা যায়। এক শিলিং ব্যয় করিয়া আমি ইনভারারে (ডিউক অব আর্গাইলের দুর্গ ও আবাসভূমি) বা আয়ারশায়ারে (এইখানে কবি বার্নসের স্মৃতিস্তম্ভ) যাইতে পারিতাম।

আমি হাইল্যাণ্ডে পদব্রজে ভ্রমণের সংকল্প করিলাম। আমার সংগী হইলেন একজন মুসলমান বন্ধু। তিনি হায়দ্রাবাদ নিজাম রাজ্যের অধিবাসী, বিলাতে গিয়া মেডিক্যাল ডিগ্রী লইয়াছিলেন। আমরা প্রথমে স্টার্লিং গিয়া একটি সাধারণ কৃষকের গৃহে বাসা লইলাম এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে ভ্রমণ করিলাম। ব্যানাকবার্নের যুদ্ধক্ষেত্র, স্টার্লিং দুর্গ এবং ওয়ালেসের স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি আমরা দেখিলাম। স্কটের "লেডী অব দি লেকে" বর্ণিত স্থানগুলির মধ্য দিয়া আমরা ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আমার পকেটে ঐ বই একখানি ছিল এবং পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে স্কটের কবিতা আমার মনে পড়িতে লাগিল—

Bend against the steepy hill thy breast
And burst like a torrent from the crest.

লক ক্যাট্রাইনে সাঁতার দিয়া আমি আনন্দ উপভোগ করিলাম। লক লমন্ডের

তীরে ইনভারস্নেইডের একটি হোটেলে আমরা একরাত্রি যাপন করিলাম। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ এই স্থানে থাকিবার সময়ই তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "To a Highland Girl" (একটি হাইল্যান্ড বালিকার প্রতি) লিখিয়াছিলেন। আমরা ক্যালেডোনিয়ান খালের তীর ধরিয়া চলিলাম এবং ফোর্ট উইলিয়মে একটি কুটীরে কয়েকদিন অবস্থান করিলাম। একদিন সকালে আমরা ইতিহাস-বিখ্যাত হত্যাকাণ্ডের স্থান গ্লেনকোতে যাত্রা করিলাম এবং একটানা ১৮ মাইল ভ্রমণ করিলাম। আমার বন্ধুর পিপাসা লাগাতে একটি হাইল্যান্ড বালিকার স্টল হইতে এক গ্লাস দুধ চাহিয়া খাইলেন। বিদেশী ভ্রমণকারীর প্রতি আতিথ্যের চিহ্নস্বরূপ বালিকা দুধের জন্য কোন দাম লইল না। চারিদিকের দৃশ্য অতুলনীয়, মনোমুগ্ধকর, ছবির মত সুন্দর। আমরা বেন নেভিসের গিরিশৃঙ্গে উঠিলাম। ইহাই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ, উচ্চতা ৪৪০০ ফুট। এখানে একটি 'অবজারভেটরী' বা মানমন্দির আছে।

আমরা তথা হইতে ইনভারনেসে গেলাম। সুন্দর শহর। আমি বহু পূর্বেই শুনিয়াছিলাম যে লণ্ডনের শিক্ষিত সমাজের চেয়েও এখানকার শিক্ষিত লোকেরা ভাল ইংরাজী বলে। জিনি ডিন্‌সের সময়েও গেলিক মিশ্রিত স্কচ ভাষা লণ্ডন সমাজে প্রায় গ্রীক ভাষার ন্যায়ই দুর্বোধ্য ছিল। প্রথম জেমস্‌ তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখাইতে ভালবাসিতেন এবং সেজন্য তাঁহার দরবারের পরিষদবর্গ তাঁহাকে লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিত। কাউণ্ট সালি তাঁহার উপাধি দিয়াছিলেন the most learned fool in Christendom অর্থাৎ খ্রীষ্টান জগতে সব চেয়ে বড় নির্বোধ। দ্রুত যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে এবং হাইল্যান্ডবাসীদের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চল-বাসীদের সর্বদা মিশ্রণের ফলে কথ্য ভাষার বিভিন্নতা প্রায় লোপ পাইয়াছে। অধ্যাপক জন স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকির দেশপ্রেম প্রণোদিত প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও (ইঁহার চেষ্টায় এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলিক ভাষার অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল), গেলিক ভাষার লোপ অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষিত লোকদের ভাষা কোথাও আমার বুঝিতে কষ্ট হয় নাই। কেবল স্কচদের উচ্চারণে একটু পার্থক্য আছে এই মাত্র।

ইনভারনেস হইতে আমরা চিরস্মরণীয় 'কালোডেন মুর' যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতে গেলাম। মৃত ব্যক্তিদের গোষ্ঠী অনুসারে কবরের উপরে প্রস্তরফলক স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা সেই ভীষণ দিনে হতভাগ্য প্রিন্স চার্লির পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। "কসাই" কাম্বারল্যাণ্ডের নিষ্ঠুরতার স্মৃতিও সেই গোষ্ঠীর স্মৃতিতে এখনও জাজ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছে।

এডিনবার্গে ফিরিয়া আমি ক্রাম ব্রাউন ও স্যার উইলিয়ম মুয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। ক্রাম ব্রাউন রসায়নশাস্ত্রে পারদর্শিতা সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিয়া আমাকে একখানি সুপারিশপত্র দিলেন। কয়েকখানি পরিচয়পত্রও দিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার পূর্ববর্তী রসায়নের অধ্যাপক লর্ড প্লেফেয়ারের নিকট একখানি। স্যার উইলিয়ম মুয়র আমাকে স্যার চার্লস বার্নার্ডের নিকট একখানি পরিচয়পত্র দিলেন। স্যার চার্লস বার্নার্ড বর্মার প্রথম গবর্নরের পদ হইতে অবসর লইয়া ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বার্নার্ড অতি ভদ্রলোক, সহৃদয় এবং

উদারপ্রকৃতি ছিলেন। আমি পরে জানিতে পারি যে তিনি একাধিকবার আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয় ছাত্রদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। স্যার চার্লস আমাকে জলযোগের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে আমাকে নিয়োগ করাইবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। লর্ড প্লেফেয়ারও তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড ক্রসকে আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে নানা বাধা ছিল। সেই যুগে এবং তাহার পর বহু বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদগুলি (ভারত সচিবই এই সব পদে লোক নিয়োগ করিতেন,) ভারতবাসিগণের পক্ষে দুর্লভ ছিল। দুই একটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ব্যতিক্রম মাত্র।

বার্নার্ড আমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। আমি দুই মাসকাল লণ্ডনের শহরতলি হ্যানওয়েলে থাকিলাম। এই সময়ে আমি কেমিক্যাল সোসাইটির লাইব্রেরিতে অধ্যয়ন করিতাম এবং রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গ্রন্থ, বিশেষতঃ, জার্মান সাময়িক পত্র হইতে বিস্তৃত 'নোট' লইতাম। এগুলি যে কলিকাতায় পাওয়া যাইবে না, তাহা আমি জানিতাম।

ভারতসচিব যে আমাকে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে নিয়োগ করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বোধ হইল।' আমার অর্থসম্বলও ফুরাইয়া আসিতেছিল। সুতরাং আর বেশী দিন ইংলণ্ডে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। স্যার চার্লস বার্নার্ড আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আমাকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আর কত দিন এখানে থাকিতে পারিবেন?" তিনি আমাকে আর্থিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। কিন্তু ধন্যবাদসহকারে তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলাম। দৃশ্যটা কিন্তু বড়ই করুণ। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলে আমি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলাম। ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে কোন কাজ পাইবার আশা নাই জানিয়া আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করাই স্থির করিলাম। অন্ধকারের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে একটু আলোর রেখা দেখা গেল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ সি. এইচ. টনী এই সময় ছুটি লইয়া বিলাতে ছিলেন। তিনি স্যার চার্লস বার্নাডের কুটুম্ব এবং তাঁহার বাড়ীতেই ছিলেন। আমার লণ্ডন ত্যাগের পূর্বে স্যার চার্লস আমাকে ব্রেকফাস্টে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং টনী সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। টনী সাহেব বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার স্যার আলফ্রেড ক্রফটের নিকট একখানি পরিচয়-পত্র দিলেন। টনী সাহেবের পত্রের শেষে আমার যতদূর স্মরণ আছে এই কথাগুলি ছিল। "ডাক্তার রায়কে নিয়োগ করিলে তিনি যে শিক্ষাবিভাগের অলঙ্কার স্বরূপ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

আমি স্বদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। গিলক্রাইস্ট ট্রাস্ট আমার বৃত্তির শর্তানুসারে ৫০ পাউণ্ড জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি পথের ব্যয় বাবদ দিলেন। আমি পি. এণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে ব্রিন্দিসি হইতে ৩৭ পাউণ্ড মূল্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি টিকিট কিনিলাম। অবশিষ্ট অর্থে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

এবং লণ্ডন হইতে ব্রিন্দিসি পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর একখানি রেল গাড়ীর টিকিট কিনিলাম। ইতিপূর্বে 'কনটিনেণ্টে' ভ্রমণ করিবার আমার কোন সুযোগ হয় নাই। সুতরাং এইবারে রেলের পথে যতদূর সম্ভব কতকগুলি স্থান দেখিয়া যাইব বলিয়া স্থির করিলাম। এই উদ্দেশ্যে একখানি অগ্রগামী 'ওমনিবাস' যাত্রী গাড়ীতে উঠিলাম। প্যারিস দেখিয়া আমি দক্ষিণ ফ্রান্সের ভিতর দিয়া আল্পস পর্বতশ্রেণী পার হইলাম। বহু 'টানেল', দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রভৃতি আমার চোখে পড়িল। আমাদের গাড়ী দুই ঘণ্টার জন্য পিসা শহরে থামিল—আমি সেই অবসরে বিখ্যাত (Leaning Tower) দেখিয়া আসিলাম। ইটালী দেশে রেলওয়ে স্টেশনে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় না। কিন্তু প্রচুর সস্তা ও হালকা মদ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আমাকে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য স্টেশনের জলের কলের নিকট প্রায়ই দৌড়াইতে হইত। রোমে গাড়ী থামিলে আমি শহরের রাস্তায় ঘুরিয়া 'ক্যাপিটল' প্রভৃতি দেখিলাম।

ইটালীবাসীরা সদানন্দ লোক, কথাবার্তা বেশী বলে। ইংরাজদের মত স্বল্পভাষী নয়। ফরাসী ভাষায় আমার সামান্য জ্ঞান লইয়া আমি কোনরূপে কথাবার্তার কাজ চালাইতে লাগিলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে যাত্রীদের মধ্যে একজন অস্ট্রিয়ান ছিলেন। তিনি ভাল ইংরাজী বলিতে পারিতেন। আমার সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। তিনি ট্রিস্টে যাইতেছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে আমি ব্রিন্দিসিতে মেল স্টীমার ধরিব তখন তিনি টাইম টেবিল দেখিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িলেন। কহিলেন "আমার আশঙ্কা হয়, আপনি 'মেল' ধরিতে পারিবেন না, কেন না এই গাড়ী একদিন পরে ব্রিন্দিসিতে যাইয়া পৌঁছিবে।" তিনি আমার জন্য অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন এবং একটি স্টেশনে গাড়ী বেশীক্ষণ থামিলে তিনি স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। স্টেশনমাস্টার বলিলেন যে, রেলওয়ে মেলগাড়ী শীঘ্রই পৌঁছিবে। এবং আমাকে আর কিছু অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটখানি বদলাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি টিকিট লইতে হইবে। এই অতিরিক্ত ভাড়ার পরিমাণ প্রায় ৩ পাউণ্ড। ইহার পর আমার পকেটে মাত্র কয়েক শিলিং থাকিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৃহে প্রত্যাগমন—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত

ঠিক ছয় বৎসর পরে ১৮৮৮ সালের অগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি কলিকাতা পেঁছিলাম। এডিনবার্গ থাকিবার সময়ে আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ১৫ দিন অন্তর পোস্টকার্ডে একখানি করিয়া পত্র লিখিতাম (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডায়মণ্ড-হারবারের উকিল ছিলেন)। তিনি বাড়ীতে পিতা মাতাকে আমার খবর লিখিয়া পাঠাইতেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার আসিবার নির্দিষ্ট তারিখ, স্টীমারের নাম প্রভৃতি জানাই নাই, কেন না আমার জন্য যে তাঁহারা অনাবশ্যক ব্যয় বহন করিবেন, ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না। আমার মনে মনে বরাবরই আশঙ্কা ছিল, পিতার আর্থিক অবস্থা পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী শোচনীয় হইয়াছে। আমি আমার লগেজ ক্যাবিনে রাখিয়া আসিলাম এবং জাহাজের 'হেড পার্সারের' নিকট আট টাকা ধার করিলাম, কেন না আমার তহবিলে এক পয়সাও ছিল না। কলিকাতায় আমার অনেক বন্ধু ছিলেন, আমি তাঁহাদের একজনের বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। আমার প্রথম কাজই হইল—ধুতি ও চাদর ধার করিয়া লইয়া পরা এবং বিদেশী পরিচ্ছদ ত্যাগ করা। দুই একদিন কলিকাতায় থাকিয়া আমি স্বগ্রামে গেলাম। শিয়ালদহ হইতে খুলনা এই আমি প্রথম রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিলাম। ১৮৮২ সালে যখন আমি বিলাত যাত্রা করি, তখন ঐ রেলপথের জন্য জরিপ প্রভৃতি হইতেছিল এবং প্রসিদ্ধ ধনী রথচাইল্ড উহার মূলধন জোগাইবেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। আমি আর এখন যশোহরবাসী নহি, খুলনাবাসী। যশোহর, ২৪ পরগনা এবং বরিশালের কিছু কিছু অংশ লইয়া নূতন খুলনা জেলা গঠিত হইয়াছিল।

মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমার কনিষ্ঠা সহোদরা আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আর ইহজগতে উপস্থিত ছিল না। এইখানে আমি একটি ঘটনা বলিব, যাহার মূল্য পাঠকগণ নিজেরাই বিচার করিবেন। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—'ভবিষ্যতের ঘটনা বর্তমানের উপর ছায়াপাত করে'। আমার বর্ণিত ঘটনাকে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপও গণ্য করা যাইতে পারে। এডিনবার্গে একদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্বে আমি অবিকল পূর্বোক্ত ঘটনা (আমার গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং কনিষ্ঠা ভগিনীর জন্য মাতার বিলাপ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, আমি স্বপ্নদর্শনের তারিখ লিখিয়া রাখি নাই। রাখিলে অতি-প্রাকৃত দর্শন সম্বন্ধে আর একটা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিতাম।(১)

কয়েকদিন বাড়ীতে থাকিয়া আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম এবং আমার

---

(১) ইটালীর স্বাধীনতার যোদ্ধা গ্যারিবল্ডী আমেরিকা থাকিবার সময় তাঁহার মাতার মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ অতি-প্রাকৃত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

বন্ধু ডাঃ অমূল্যচরণ বসু এম. বি.-এর গৃহে উঠিলাম। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা পরে বলিব। আমি এখন বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ পাইবার জন্য ব্যগ্র হইলাম এবং সেই উদ্দেশ্যে ক্রফ্ট্ এবং পেড্লারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। আমি দার্জিলিংয়ে গিয়া লেঃ গবর্নর স্যার স্টুয়ার্ট বেলীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলাম।

এদেশের কলেজসমূহে রসায়ন শাস্ত্রের আদর তখনও হয় নাই। একমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে নিয়মিত ভাবে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। লেবরেটরীতে 'এক্সপেরিমেণ্ট' (পরীক্ষা) করা হইত। বেসরকারী কলেজের সংখ্যা খুব কম ছিল। এবং তাহাদের তেমন সঙ্গতি না থাকাতে বিজ্ঞান বিভাগ তাহারা খুলিতে পারে নাই। কিন্তু এই সব কলেজের ছাত্রেরা নামমাত্র "ফি" দিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাসে অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিতে পারিত। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহা কর্তৃক ১৮৭৬ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত Indian Association for the Cultivation of Science বা ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতিতেও পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সাধারণে ইহাতে নামমাত্র ফি দিয়া যোগ দিতে পারিত। আমার স্মরণ হয়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার গবর্নমেণ্টের নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের ক্লাশে বেসরকারী কলেজের ছাত্রদের যোগদানের যে ব্যবস্থা আছে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক নতুবা বিজ্ঞান সমিতির বক্তৃতা-গৃহ শূন্য পড়িয়া থাকিবে। ইহাতে বিজ্ঞান সমিতির উপর কোন দোষারোপ করা হয় নাই, বরং সাধারণ ভারতীয় যুবকদের মনের পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছে। পরীক্ষার জন্য যদি কোন পাঠ্য বিষয় নির্দিষ্ট না করা হয়, তবে কোন ছাত্র তাহার জন্য পরিশ্রম করিবে না। গবর্নমেণ্টেরও শীঘ্রই এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইত, কেন না বিজ্ঞান ক্লাশে ছাত্র-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল এবং "বি" কোর্স (বিজ্ঞান) ক্রমেই ছাত্রদের নিকট অধিক প্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। গত শতাব্দীর আশির কোঠায় রসায়ন শাস্ত্রের বিরাট পরিবর্তন হইয়াছিল এবং শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ে বক্তৃতা দিলেই চলিবে না, পরীক্ষাগারে গবেষণা ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এই সমস্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া পেড্লার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরকে লিখিলেন তিনি যেন বাংলা গবর্নমেণ্টকে একজন অতিরিক্ত অধ্যাপক মঞ্জুর করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ঠিক এই সময়ে আমি এডিনবার্গ হইতে আসিয়া ঐ অধ্যাপকের পদের জন্য প্রার্থী হইলাম।

উচ্চতর সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঐ বিষয়ে সদিচ্ছা ও বড় বড় প্রতিশ্রুতির অভাব নাই। কিন্তু কার্যতঃ বিশেষ কিছুই ঘটে না। ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নূতন সনদ প্রদান উপলক্ষে যে আলোচনা হয়, তাহা পাঠ করিলে দেখা যাইবে অনেক উদারভাবপূর্ণ কথা বলা হইয়াছিল। ১৮৩৩ সালে মেকলের বক্তৃতা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে গণ্য হইয়া থাকে। মেকলে ১৮৩৪ সালে

ভারত গবর্নমেণ্টের আইন সচিব হইয়া আসিলে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সম্ভবতঃ লণ্ডনে বিখ্যাত সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারতীয় মেধা কতদূর শক্তিশালী হইতে পারে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নূতন সনদ প্রদান উপলক্ষে পার্লামেণ্টে তিনি যে আবেগময়ী বক্তৃতা করেন, তাহাতে নিম্নোদ্ধৃত চিরস্মরণীয় কথাগুলি আছে :—

"আমাদের শাসননীতিতে ভারতবাসীদের মন এতদূর প্রসারিত হইতে পারে যে শেষে ঐ নীতিকে সে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। সুশাসনের দ্বারা আমরা এদেশের জনসাধারণকে অধিকতর উন্নত গবর্নমেণ্ট পরিচালনার উপযোগী করিয়া তুলিতে পারি। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইয়া তাহারা ভবিষ্যতে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যই দাবি করিতে পারে। এমন দিন কখনও আসিবে কি না, আমি জানি না। কিন্তু ঐ দিন আসিবার পথে আমি কখনই বাধা দিব না বা উহাকে বিলম্বিত করিব না। যখন ঐ দিন আসিবে তখন উহা ব্রিটিশ ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় দিবস বলিয়া গণ্য হইবে।"

দই হইতে সর তুলিয়া লইলে যেমন খেলো জিনিস হইয়া পড়ে, সেইরূপ মেকলের সদিচ্ছাপূর্ণ বক্তৃতাও ইণ্ডিয়া আফিস ও আমলাতন্ত্রের দপ্তরের মধ্যে কেবল মাত্র শূন্য প্রতিধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। ভারতের কবি-বড়লাট লর্ড লিটন তাঁহার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পিতার বহু গুণ পাইয়াছিলেন। লর্ড লিটন অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবেই ভারতসচিবকে এ বিষয়ে লিখিয়াছিলেন। ফলে একটা আপস হয় এবং তাহার ফলেই "স্ট্যাটুটরী সিভিল সার্ভিসের" সৃষ্টি হয়।(২)

যোগ্যতা-সম্পন্ন এবং আভিজাত্য-পন্থী ভারতীয়দিগকে "স্ট্যাটুটরী" সিভিল সার্ভিসে লওয়া হইল, তবে শর্ত থাকিল যে তাহারা আসল সিভিল সার্ভিসের গ্রেডের তিন ভাগের দুই ভাগ বেতন পাইবে। বিলাতে যে প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হইবে, তাহা কেবল ব্রিটিশদের জন্য (আইরিশরাও তাহার অন্তর্ভুক্ত) উন্মুক্ত থাকিবে। শিক্ষা-বিভাগেও এই নিয়ম প্রবেশ করিল। আমার তিন বৎসর পূর্বে জগদীশচন্দ্র বসু বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি লণ্ডন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও স্বদেশে শিক্ষা-বিভাগে উচ্চতর পদ লাভের চেষ্টায় পদে পদে বাধা পাইতে হইয়াছিল। শেষে তাঁহাকে এই শর্তে উচ্চতর বিভাগে লওয়া হইল যে তিনি—ঐ 'গ্রেডের' পুরা বেতন দাবি করিতে পারিবেন না। মাত্র তাহার দুই-তৃতীয়াংশ পাইবেন। সবে দুই একটি ক্ষেত্রে ভারতবাসীরা উচ্চতর সার্ভিসে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাহার দ্বারা অবস্থাটা আরও বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ যোগ্য ভারতবাসীরাও সার্ভিসের নিম্নস্তরে মাত্র প্রবেশ করিতে পারিতেন। এই ভাবে ভারতীয়গণকে

---

(২) লর্ড লিটন 'স্ট্যাটুটরী সিভিল সার্ভিস' প্রবর্তনের কারণ প্রদর্শন করিয়া ভারতসচিবকে এই পত্র লিখেন।

উচ্চতর পদ হইতে বঞ্চিত করাতে ভারতে এবং ভারতবন্ধু ইংরাজগণ কর্তৃক ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আলোচনা হইতে লাগিল এবং তাহার কিছু ফলও হইল। লর্ড ডফারিনের গবর্নমেণ্ট ভারত সচিবের পরামর্শে একটি "পাবলিক সার্ভিস কমিশন" নিযুক্ত করিলেন। এই কমিশনের উদ্দেশ্য, ভারতবাসীদিগকে কি ভাবে সরকারী কার্যে অধিকতর সংখ্যায় গ্রহণ করা যায়, তাহার উপায় নির্ধারণ করা। কমিশন যে সিদ্ধান্ত করিলেন তাহা কতকটা পূর্বতন নীতির সহিত আপস রফা। ভারতবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য যাহাই করা যাক না কেন, প্রভুজাতির স্বার্থ ও সুবিধা যাহাতে অব্যাহত থাকে তাহা সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে। "ইম্পিরিয়াল" ও "প্রভিন্‌সিয়াল" এই দুই শ্রেণীর পদের সৃষ্টি হইল,—প্রথম শ্রেণীর পদ ব্রিটিশদের জন্য এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ ভারতীয়দের জন্য। ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের বেতনের পরিমাণ কার্যতঃ প্রভিন্‌সিয়াল সার্ভিসের দ্বিগুণ করা হইল।

১৮৮৮ সালের অগস্ট হইতে ১৮৮৯ সালের জুনের শেষ পর্যন্ত আমার কোন কাজ ছিল না। ঐ সময় আমার বড় অস্বস্তি বোধ হইয়াছিল। আমি টনীকে বলিয়াছিলাম, শ্যামসনের চুলের অভাবে যে দশা হইয়াছিল, লেবরেটরী না থাকিলে রসায়নবিদেরও ঠিক সেই দশা হয়, তাহার কোনই ক্ষমতা থাকে না। এই সময়ে আমি প্রায়ই ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু এবং তাঁহার পত্নীর আতিথ্য গ্রহণ করিতাম। রসায়ন শাস্ত্র ও উদ্ভিদবিদ্যা চর্চা করিয়া প্রধানতঃ আমার সময় কাটিত। কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে আমি কয়েক প্রকার উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। অবশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজের জন্য একটি অধ্যাপকের পদ মঞ্জুর হইল এবং আমি ২৫০্ টাকা বেতনে অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইলাম। স্থানীয় গবর্নমেণ্টের এর বেশী বেতন মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা ছিল না।

আমি স্বীকার করি যে, ছয় বৎসর বিলাতে থাকিয়া এবং সেখানকার স্বাধীন আবহাওয়ায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমার মধ্যে যথেষ্ট তেজস্বিতা ছিল এবং আমার দেশবাসীর অধিকার সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা মনে পোষণ করিয়াছিলাম। আমি সোজা দার্জিলিংয়ে গেলাম এবং ক্রফ্‌ট সাহেবকে আমার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, তাহা বলিলাম। আমার মত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্রিটিশ রাসায়নিককে যদি আনিতে হইত তবে ভারত সচিব তাঁহাকে একেবারে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে নিয়োগ করিতেন এবং ভারতে আসিবার জন্য জাহাজ ভাড়া পর্যন্ত দিতেন; ক্রফ্‌ট ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনার জন্য জীবনে অনেক পথ খোলা আছে। কেহ আপনাকে এই পদ গ্রহণ করিবার জন্য বাধ্য করিতেছে না।" আমি যথাসম্ভব প্রশান্ত ভাবে এই অপমান হজম করিলাম। ক্রফ্‌টের অনুকূলে এই কথা বলা উচিত হইবে যে তাঁহার ক্রোধ কতকটা বাহ্যিক, আন্তরিক নহে। তিনি বেশ জানিতেন যে তিনি গবর্নমেণ্টের নির্মম শাসনতন্ত্রের একটা অংশমাত্র এবং তাঁহার পক্ষে আদেশ পালন করাই একমাত্র কর্তব্য, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না। প্রায় দুই বৎসর পরে ঘটনাক্রমে আমি জানিতে পারি যে, ক্রফ্‌ট নিজে অন্ততঃ

আমাকে ইম্পিরিয়াল বিভাগে লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার একজন দূর আত্মীয় সেক্রেটারিয়েটের জনৈক—"কন্ফিডেন্শিয়াল" কেরানীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাকে এক টুকরা কাগজ দেন, উহাতে শিক্ষা বিভাগের কর্তার রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত কয়েক লাইন উদ্ধৃত করা ছিল ঃ—"মল্লিক ও বেলেটের অবসর গ্রহণের পর ইম্পিরিয়াল বিভাগে আরও দুইটি পদ খালি হইবে। তাহার একটি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে দিতে হইবে। মিঃ পেডলার ইঁহার খুব প্রশংসা করিয়াছেন।" ইহা হইতে দেখা যাইবে, যদিও আমি মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে "unclassified" তালিকায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে যথাসময়ে ভারত সচিবের অনুমোদনক্রমে ইম্পিরিয়াল বিভাগে লইবার উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। এই সময়ে স্যার চার্লস ইলিয়ট বাংলা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সভয়ে দেখিলেন যে আরও কয়েকজন বাঙালী কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাকে যদি ইম্পিরিয়াল বিভাগে লওয়া হয়, তবে আদর্শটা বড় খারাপ হইবে এবং অন্য সকলকে বিমুখ করা কঠিন হইবে। সুতরাং শিক্ষা বিভাগে "অবাঞ্ছনীয়" লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করিয়া বিভ্রাট ঘটাইতে না পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। তিনি একটি ফতোয়া জারী করিলেন যে, ভারত সচিব যত দিন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রস্তাবাবলী অনুমোদন না করেন, ততদিন পর্যন্ত ভারতীয়দিগকে ইম্পিরিয়াল বিভাগে গ্রহণ করা স্থগিত রহিল।

কিন্তু ভারত সচিবের দপ্তরে আমাদের জন্য তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত করিবার জন্য মাথাব্যথা ছিল না। ব্রিটিশ কর্মচারীদের একচেটিয়া সিভিল বা মিলিটারী সার্ভিসের পক্ষে ক্ষতিকর কোন ব্যাপার যদি হইত, তবে ভারত সচিবের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিত, পার্লামেণ্টে তাঁহাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হইত। ডেপুটেশানের পর ডেপুটেশান যাইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিত। লণ্ডন "টাইমস" আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিতেন, ভারতসচিবকে ভীতি প্রদর্শন করিতেন। আধুনিক কালের "লী কমিশনের" ব্যাপার অনুধাবন করিলেই কথাটা বুঝা যাইবে। যাহোক, এখন আমি এ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ রাখিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার অধ্যাপক জীবনের কথাই বলিব।

আমি ১৮৮৯ সালে সেসনের প্রথমে কাজে যোগদান করি। আমার পক্ষে সত্যই এ আনন্দের কথা। লেবরেটরীতে গবেষণার কাজই আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন এবং ইহার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। রসায়ন বিভাগ তখন একটি একতলা দালানে ছিল। ১৮৭২ সালে বর্তমানের নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার পূর্বে হেয়ার স্কুল ঐ একতলা বাড়ীতে ছিল। রসায়ন বিভাগের বর্তমান বাড়ীতে যে স্থান, তাহার তুলনায় অতি সামান্য স্থানই পুরাতন একতলা বাড়ীতে ছিল। এই বিজ্ঞান শাস্ত্র কতটা উন্নতি করিয়াছে, উপরোক্ত ঘটনা হইতে তাহাও

অনুমান করা যাইতে পারে।(৩) একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ১৮৭০ সালে প্রথম যখন আমি হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করি, তখন যে স্থানে বেঞ্চের উপর বসিতাম, এখন আমার নিজের বসিবার ঘরে চেয়ারখানা ঠিক সেই স্থানেই পাতা হইয়াছিল।

যাহারা রসায়নশাস্ত্র প্রথম শিখিতেছে, এমন সব ছাত্রের শিক্ষকতায় সাফল্যলাভ করিতে হইলে, 'এক্সপেরিমেণ্ট' বা পরীক্ষার কাজে নৈপুণ্য চাই। এমনভাবে এক্সপেরিমেণ্ট সাজাইতে হইবে যে তাহা একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক হইবে, অন্যদিকে বিষয়টিও সহজে বুঝা যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব বিবেচনা করিয়া অনেক সময় অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়। কোন পদপ্রার্থী হয়ত গবেষণায় প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। কিন্তু এই সব ব্যক্তি অধ্যাপকের কাজে সকল সময়ে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আমি দেখিয়াছি। রসায়নের লেকচারারের পক্ষে সহকারীরূপে কিছুদিন শিক্ষানবিসি করা অত্যাবশ্যক। যাঁহারা এটর্নি বা উকিল হইতে চান, তাঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোন এটর্নির কার্যে বা প্রবীণ উকিলের নিকটে কিছুকাল শিক্ষানবিসি করিতে হয়। তারপর স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে পারেন। কোন "থিসিস" বা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া যাঁহারা বিজ্ঞানে 'মাস্টার' বা "ডক্টর" উপাধি লাভ করেন, তাঁহাদিগকে যদি অকস্মাৎ ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতে হয়, তবে তাঁহারা হয়ত মুশকিলে পড়িবেন। লেবরেটরীতে অতি সাধারণ পরীক্ষা কার্যেও তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে হয়। একটা সঙ্কোচের ভাব আসে, ফলে তাঁহারা ঐ সব 'পরীক্ষা' বাদ দিয়াই যান এবং কেবলমাত্র যন্ত্রটি দেখাইয়া অথবা তদভাবে বোর্ডের উপর চিত্র আঁকিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগে পূর্ব হইতেই একটা বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পেডলার বাষ্প (গ্যাস্) বিশ্লেষণে বিশারদ ছিলেন এবং পরীক্ষা কার্যে তাঁহার অসীম দক্ষতা ছিল। তাঁহার হাতের নৈপুণ্যও আমাদের সকলের প্রশংসার বিষয় ছিল। দুই একজন সহকারীকে তিনি বেশ শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষানবিসরূপে প্রথমে কাজ আরম্ভ করেন। অধ্যাপনায় সাফল্যলাভেই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সুতরাং সেজন্য মিথ্যা গর্ব আমি ত্যাগ করিলাম। বিলাতফেরত গ্রাজুয়েটদের মনে কোন কোন স্থলে বেশ একটু অহমিকার ভাব থাকে। তাহারা মনে করে যে সহকারী বা অধীনস্থদের নিকট হইতে কিছু শিখিতে হইলে তাহাদের জাত যাইবে বা মর্যাদা নষ্ট হইবে। আমার সৌভাগ্যক্রমে এরূপ কোন দৌর্বল্য আমার মনে ছিল না। আমি চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী এবং পেড্লারের সহায়তা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতাম না। এইরূপেই আমি অধ্যাপক জীবন আরম্ভ করিলাম। ক্লাসে কিরূপে নিপুণতার সহিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে হয়, আমি পুনঃ পুনঃ তাহার মহড়া

(৩) Fifty years of Chemistry at the Presidency College "Presidency College Magazine" vol. 1. 1914, p. 106.

দিতে লাগিলাম। শীঘ্রই আমি সঙ্কোচের ভাব কাটাইয়া উঠিলাম এবং পরবর্তী সেসন আরম্ভ হইলে দেখিলাম, আমি আমার দায়িত্ব পালনে অপটু নহি।

লেবরেটরীর কাজে এবং ব্যবহারিক ক্লাস চালাইতে আমার অন্যের নিকট শিখিবার বিশেষ কিছু ছিল না। কেননা এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। "হোপ প্রাইজ স্কলার"রূপে অধ্যাপকের সহকারীরূপে আমাকে কাজ করিতে হইয়াছে, ইহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। প্রথম তিনমাস আমাকে খুব পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আমার আনন্দই হইয়াছিল। ক্লাসে যাইয়া বক্তৃতা করিবার পূর্বে প্রায়ই বক্তৃতার সারমর্ম লিখিয়া লইতাম। এই নূতন কাজে আমার খুব আগ্রহ ও উৎসাহ হইল, কেননা এই কাজ আমার পক্ষে বেশ স্বাভাবিক এবং মনোমত বলিয়া বোধ হইল। আমাদের দেশের যুবকেরা জীবনের বৃত্তি অবলম্বনে অনেক সময় বিষম ভুল করিয়া বসে। যাহা পরে আর সংশোধন করা যায় না। কোনরূপ চিন্তা না করিয়া তাহারা একটা পথ অবলম্বন করে এবং অনেক পরে বুঝিতে পারে যে, তাহারা ভুল পথে গিয়াছে। এই শোচনীয় ব্যাপারের জন্য অভিভাবকরাই বেশী দায়ী, এমারসন একস্থলে যথার্থই বলিয়াছেন যে, অভিভাবকরা তাঁহাদের সাবালক সন্তানদের উপর বেশী রকম মনোযোগ দিয়া তাহাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী করেন। একটা চৌকা ছিদ্রের মধ্যে হাতুড়ি পিটিয়া একটা গোলমুখ পেরেক বসাইতে যে অবস্থা হয়, এ ঠিক সেইরকম। সেসনের প্রথম তিনমাস অর্থাৎ জুলাই, অগস্ট ও সেপ্টেম্বরের পর পূজার ছুটি আসিল। পেডলার তিন মাসের ছুটি লইয়া বিলাতে গেলেন এবং রসায়ন বিভাগের সমস্ত ভার আমার উপর পড়িল। এক হিসাবে আমার শিক্ষক জীবনে সর্বাপেক্ষা কার্য-বহুল সময় এই,—কখনও কখনও আমাকে পর পর তিনটি ক্লাসে বক্তৃতা করিতে হইত। কিন্তু কাজেই ছিল আমার আনন্দ এবং যেহেতু এই কাজে আমি এক নূতন উন্মাদনা বোধ করিলাম, সেইজন্য এই গুরুভার বহন করিতে আমার কোন ক্লান্তি হইল না।

শিক্ষকরূপে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসহ বক্তৃতা দেওয়াতেও একটু নৈপুণ্য লাভ করিলাম। এখন আমি অবসর সময়ে গবেষণা-কার্য করিতে লাগিলাম। বর্তমান সভ্যতার একটা আনুষঙ্গিক ব্যাধি খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। ঘি এবং সরিষার তেল, বাঙালীর খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে এই দুইটাই বলিতে গেলে কেবল স্নেহপদার্থ। বাজারে ঘি ও তেল বলিয়া যাহা বিক্রয় হয়, বিশুদ্ধ নহে। বাজারে বিক্রীত এই সব দ্রব্যে ভেজাল পদার্থ কতটা পরিমাণে আছে তাহা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণয় করা সহজ কাজ নহে।

আমি এই শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। বিশ্বাসযোগ্য স্থান হইতে এই সব দ্রব্য সংগ্রহ করিলাম। নিজের তত্ত্বাবধানেও তৈরি করাইয়া লইলাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমার সাক্ষাতে গরু ও মহিষ দোহন হইল এবং সেই দুধ হইতে আমি মাখন তৈরি করিলাম। সরিষা ভাঙাইয়া তেল তৈরি করাইয়া লইলাম, এবং যে সব তেল সরিষার তেলের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া

হয়, তাহাও সংগ্রহ করিলাম। এদেশের গরুর দুধ হইতে যে মাখন হয় তাহার স্নেহ উপাদান ব্রিটিশ গরুর দুধের মাখনের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র রকমের। সেই কারণে ইংরাজী খাদ্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ঐ দেশের মাখনের যে বিশ্লেষণাদির পরিচয় থাকে, তাহা আমাদের পক্ষে নির্ভরযোগ্য নহে। কয়েক প্রকারের তেলের নমুনাও বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিলাম। এই কাজ হাতে লইয়া আমাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইল। আমি তিন বৎসর পর্যন্ত এই কার্যে ব্যাপৃত ছিলাম এবং আমার গবেষণার ফলাফল "জার্নাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" পত্রিকায় (১৮৯৪), "কয়েক প্রকার ভারতীয় খাদ্যদ্রব্যের রাসায়নিক পরীক্ষা—প্রথম ভাগ,—চর্বি ও তেল" এই নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।*

সমাজ সেবা কার্যেও আমার বেশ উৎসাহ ছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হিসাবে আমি উহার সব কাজে আন্তরিকতার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলাম। "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" ও তাহার "সান্ধ্যসম্মিলনী" গঠন করিবার ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল, ইহার উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মসমাজের সদস্যগণকে একত্রিত করা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাকে "commonwealth of church of God" বলা যাইতে পারে। ভগবানের এই মন্দিরে সকলেরই সমান অধিকার। আমি ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সমিতির (Executive Committee) একজন সদস্য নির্বাচিত হইলাম এবং কয়েক বৎসর সেই পদে কাজ করিলাম।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সেসনের প্রথমে আমি পুনর্বার সেই পুরাতন অনিদ্রারোগে আক্রান্ত হইলাম এবং ক্রমাগত তিন মাস ভুগিলাম। শান্তিদায়িনী নিদ্রা আমার চক্ষুকে পরিত্যাগ করিল এবং রাত্রির পর রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় শয্যায় এপাশ ওপাশ করিয়া আমি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। দূরে গির্জার ঘণ্টা বাজিত—আমি গণিতাম। কার্লাইল এবং হার্বার্ট স্পেনসারের মত দার্শনিকরাও অনিদ্রা-রোগে ভুগিয়াছেন, একথা মনে করিয়া আমি সান্ত্বনা পাইলাম না; এবং তাহাতে আমার যন্ত্রণাও কমিল না। কলিকাতার রাস্তার ফুটপাতে যে দিন-মজুর গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রাত্রি কাটায় তাহার সৌভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করিতে লাগিলাম। এক রাত্রি সুনিদ্রার পর প্রভাতে জাগরণ—আমার নিকট সে কি দুর্লভ বিলাস বলিয়া মনে হইত! অমর কবি সেক্সপীয়রের সেই চিরস্মরণীয় পংক্তিগুলির মর্ম আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম—

"How many thousands of my poorest subjects
Are at this hour asleep ! O sleep, O gentle sleep

* * * *

Uneasy lies the head that wears a Crown."

আমার ব্যাধি অবশ্য রাজমুকুটের জন্য নহে, অজীর্ণের দরুন! অক্টোবর মাসে পূজার ছুটির সময় আমি দেওঘরে হাওয়া বদলাইতে গেলাম। কলিকাতার

* এখন খাদিপ্রতিষ্ঠানে এই সকল খাঁটি দ্রব্য সরবরাহ করিবার ভার লওয়া হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত নিকটে ঐ স্থান স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৯১ সালে বেশি লোক ছুটি কাটাইবার জন্য সেখানে যাইত না। বাসগৃহের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। যে ২।৪ খানি ছিল, তাহাও খুব দূরে দূরে অবস্থিত ছিল। খোলা জায়গা যথেষ্ট ছিল। আমার জনৈক বন্ধু আমার জন্য একখানি খড়ো বাড়ী ঠিক করিলেন; উহার জরাজীর্ণ অবস্থা। পূর্বে একজন বাগিচাওয়ালা ঐ বাড়ীতে থাকিতেন। কিন্তু আমি ঐ বাড়ী পাইয়া খুব খুশী হইলাম। কেননা উহার চারিদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্র। রাজনারায়ণ বসু তখন দেওঘরবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সহস্র সহস্র যাত্রী এই পথে বৈদ্যনাথের মন্দিরে মহাদেবকে দর্শন করিতে যাইত। শিক্ষিত বাঙালীদের নিকট দেওঘরও এক প্রকার তীর্থক্ষেত্র ছিল। তাঁহারা সাধু রাজনারায়ণ বসুকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে আসিতেন। রাজনারায়ণ পারিবারিক জীবনে শোক পাইয়াছিলেন। বয়সেও তিনি অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথাবার্তা সরস ও বিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ ছিল।

আমাদের বন্ধু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র দেওঘরে আসিয়া শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। দেওঘর স্কুলের হেড মাস্টার যোগেন্দ্রনাথ বসু আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তখন মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতের উপাদান সংগ্রহ করিতেছিলেন। এই অপূর্ব জীবনচরিত পরে তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ করিয়াছে। রাজনারায়ণ ও মধুসূদনের মধ্যে যে সব পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, জীবন-চরিতের তাহা একটা প্রধান অংশ। রাজনারায়ণ বাবু এগুলি চরিতকার যোগেন্দ্র-বাবুকে দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে শিশিরকুমার ঘোষও তাঁহার বাংলোতে বাস করিতেছিলেন। তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদকীয় দায়িত্ব হইতে সে সময় বস্তুতঃ অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমি সৎসঙ্গ লাভ করিলাম। আমরা সকলে মিলিয়া নিকটবর্তী পাহাড়গুলিতে বেড়াইতে যাইতাম। যোগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতের পাণ্ডুলিপি হইতে অনেক সময় আমাকে পড়িয়া শুনাইতেন। এখানে একটি করুণ রস মিশ্রিত কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেওঘরের সর্বত্র "ভেলার" গাছ। একদিন আমি ঐ গাছের একটি ফল চিবাইয়া খাইলাম। উদ্ভিদ-তত্ত্ব অনুসারে ভেলা আমের জাতীয়, সুতরাং আমি উহাকে অনিষ্টকর মনে করি নাই। তখনই আমার কিছু হইল না। কিন্তু পরদিন আমার মুখ খুব ফুলিয়া গেল, এমন কি চোখ পর্যন্ত ঢাকা পড়িল। বন্ধুরা বিষম শঙ্কিত হইলেন। স্থানীয় চিকিৎসক আমাকে বেলেডোনা ঔষধের প্রলেপ দিলেন। তাহাতেই আমি ভাল হইলাম। এক পর্যায়ের উদ্ভিদের মধ্যে অনেক সময় নির্দোষ ও অনিষ্টকর দুই রকমই থাকে, সে কথা আমার স্মরণ থাকা উচিত ছিল। যথা, আলু, বেগুন, লঙ্কা, বেলেডোনা প্রভৃতি একই উদ্ভিদ পর্যায়ের অন্তর্গত।

পূজার ছুটির পর আমি শহরে ফিরিলাম। ইহার এক বৎসর পূর্বে আমি ৯১নং অপার সার্কুলার রোডের বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলাম। পরবর্তী ২৫ বৎসর

উহাই আমার বাসস্থান ছিল। এইখানেই বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ আরম্ভ করিবার কিছু দিন পর হইতেই বিজ্ঞান বিভাগে বাংলা সাহিত্যের দারিদ্র্য দেখিয়া আমার মন বিচলিত হয় এবং রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক পুস্তিকা লিখিবার আমি সঙ্কল্প করি। স্বভাবতঃ প্রথমেই রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে পুস্তক লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কিছুদূর পর্যন্ত বইখানি লিখিয়া আমি উহা হইতে বিরত হইলাম। আমার মনে হইল প্রাকৃতিক বিষয় অধ্যয়নই বালক বালিকাদের চিত্ত বেশি আকর্ষণ করিবে এবং প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ এই আলোচনার বিপুলক্ষেত্র। জীবজন্তুর গল্প, তাহাদের জীবনযাপন প্রণালী, স্বভাব, বিশেষত্ব, এই সমস্ত বালক বালিকাদের মন মুগ্ধ করে। ইংরাজীতে এক একটি জীব-গোষ্ঠী সম্বন্ধেই অনেক গ্রন্থ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বানর পরিবারের অন্তর্গত গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং আউটাং প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। ঐ সমস্ত গ্রন্থই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানলব্ধ তথ্য লইয়া লিখিত। কৃত্রিম উপায়ে অর্কিডের প্রজনন সাধন (fertilization) প্রভৃতির কৌশলময় বৈচিত্র্য দেখিয়া মন বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হয়। কীটের রূপান্তর জীবজগতের একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। এখানে সত্য ঘটনা গল্পের চেয়েও মনোমুগ্ধকর। বাংলা দেশ প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। বৃক্ষলতা এখানে প্রাচুর্যের গৌরবে ভরপুর। ইংলন্ডে প্রকৃতি কঠোর, রুক্ষ, তুহিনাচ্ছন্ন, কিন্তু বাংলা দেশে শীতকালেও প্রকৃতি তাহার ঐশ্বর্যের মহিমায় বিকশিত হয়।

শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ার বৃক্ষলতার জীবন্ত নমুনা সংগ্রহ করা কি কঠিন ব্যাপার! ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কনজারভেটরী বা রক্ষণাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার প্রমাণ একবার 'কিউ গার্ডেনে' গেলেই দেখা যায়। আর বাংলাদেশে প্রকৃতি মুক্তহস্ত হইয়া তাহার অজস্র দান চারিদিকে বিতরণ করে। কলিকাতা ছাড়িয়া দিলে, বাংলার সমস্ত স্থানেই গ্রাম এবং যাহারা এই কলিকাতা শহরে বাস করে, তাহারা মানিকতলার সেতু পার হইলে বা গঙ্গা পার হইয়া শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলেই ইচ্ছামত বৃক্ষলতার নমুনা সংগ্রহ করিতে পারে। বাংলার নদীসমূহ বিচিত্র প্রকারের মৎস্যে পূর্ণ এবং বনজঙ্গলে বিচিত্র রকমের জীবজন্তুর বাস। এক কথায়—সমস্ত বাংলা দেশটাই একটা বীক্ষণাগার বিশেষ। তরুণবয়স্কদিগকে প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার একটা প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাদের অন্তর্নিহিত পর্যবেক্ষণ শক্তিকে উদ্বোধিত করা এবং বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুর জীবন-ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাতে এই উদ্দেশ্য সুন্দররূপে সিদ্ধ হয়। বাহ্য আকারপ্রকারে কুকুর হইতে বিড়ালের পার্থক্য কি? আর একটু ভিতরে তলাইয়া এই দুই প্রাণীর নখ, দাঁত প্রভৃতি পরীক্ষা করা যাক। আরও ভিতরে নামিয়া তাহাদের স্বভাব ও অভ্যাস, মুখভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, থাবা প্রভৃতি পরীক্ষা করা যাইতে পারে, যথা রন্ধনশালায় দুধের সর, মাছভাজা, প্রভৃতি রাখিয়া পোষা বিড়ালকেও কি বিশ্বাস করা যায়? এইদিকে আরও

অনেক আলোচনা করা যাইতে পারে। বিড়াল ও কুকুর পর্যায়ের যে সব মাংসাশী প্রাণী বনে থাকে তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি, কোন্ কোন্ অঞ্চলে তাহাদের বাস ইত্যাদি। মোট কথা, জীবজন্তুর কাহিনী তরুণবয়স্কদের চিত্ত সহজেই অধিকার করে এবং সচিত্র প্রাণিবিজ্ঞানের বহি তাহাদের নিকট গল্পের চেয়েও মনোরম।

এই সব কথা ভাবিয়া বাংলাভাষার প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি একখানি প্রাথমিক গ্রন্থ লিখি। বি. এস-সি. পড়িবার সময় আমি এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা কাজে লাগিল, কিন্তু এবিষয়ে আরও আমাকে পড়িতে হইল। প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি বহু প্রামাণিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলাম এবং জীবজন্তুদের কার্যকলাপ ও অস্থিসংস্থান পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রায়ই পশুশালা এবং জাদুঘরে যাইতাম। আমার বন্ধু নীলরতন সরকার এবং প্রাণকৃষ্ণ আচার্য তখন নূতন ডাক্তারি পাস করিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্যে আমি কয়েকটি প্রাণীর দেহব্যবচ্ছেদও করিলাম। আমার স্মরণ আছে, একদিন প্রাতর্ভ্রমণের সময় আমি একটি 'ভাম' (Indian Palm Civet) রাস্তার ধারে দেখিতে পাইলাম। বোধ হয় শহরের প্রান্তভাগে কোন বাড়ীতে নিশীথ অভিযান করিতে গিয়া সে নিহত হইয়াছিল। আমি এই "নমুনাটি" সংগ্রহ করিয়া বিজয়গৌরবে বাড়ী লইয়া গেলাম এবং তৎক্ষণাৎ আমার পূর্বোক্ত ডাক্তার বন্ধুদ্বয়কে উহা ব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম। আমরা একটি "নেচার ক্লাব"ও খুলিলাম। ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ব্যতীত রামব্রহ্ম সান্যাল (আলিপুর পশুশালার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট), প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং ডাঃ বিপিনবিহারী সরকার ঐ ক্লাবের সদস্য ছিলেন। আমরা নিয়মিতভাবে মাসে একবার করিয়া সভা করিতাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের বাড়ীতে গিয়া আমি কয়েকটা গোখুরা সাপ ধরাইলাম এবং তাহাদের বিষদাঁত পরীক্ষা করিলাম। ফেয়ারের Thana Tophidia এর সাহায্যে সর্পদংশনের রহস্য সম্বন্ধেও আলোচনা করিলাম।

এই সময়ে (১৮৯১—৯২) আর একটি বিষয় গুরুতর ভাবে আমার চিত্ত অধিকার করিল। আমাদের দেশের যুবকেরা কলেজ হইতে বাহির হইয়াই কোন আরামপ্রদ সরকারী চাকরি, তদভাবে, ইউরোপীয় সওদাগরদের আফিসে কেরানীগিরি খোঁজে। আইন, ডাক্তারি প্রভৃতি বৃত্তিতেও খুব ভিড় জমিতে আরম্ভ হইয়াছিল। কেহ কেহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে পাস করিয়া বাহির হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারাও অসহায়ভাবে চাকরি খুঁজিত।

এই অবসরে কর্মকুশল, পরিশ্রমী অ-বাঙালীরা বিশেষভাবে রাজপুতানার মরুভূমি হইতে আগত মাড়োয়ারীরা, কেবল কলিকাতায় নয়, বাংলার অভ্যন্তরে সুদূর গ্রাম পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছিল, আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ের সমস্ত ঘাঁটি তাহারা দখল করিয়া বসিতেছিল; সংক্ষেপে কঠোর প্রতিযোগিতায় বাঙালীরা পরাস্ত হইতেছিল এবং যে সব ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদের দখলে ছিল, ক্রমে ক্রমে সেগুলির অধিকার ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের সরিয়া পড়িতে হইতেছিল। কলেজে শিক্ষিত বাঙালী যুবকেরা সেক্সপিয়রের বই হইতে মুখস্ত বলিতে পারিত এবং

মিল ও স্পেন্সারও খুব দক্ষতার সঙ্গে আওড়াইতে পারিত, কিন্তু জীবনযুদ্ধে তাহারা পরাস্ত হইত। তাহাদের চারিদিকে অনাহারের বিভীষিকা। তবু হাই-স্কুলের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতেছিল এবং ব্যাঙের ছাতার মত কলেজ গজাইয়া উঠিতেছিল। এই সমস্ত যুবকদের লইয়া কি করা যাইবে? বিজ্ঞান শিক্ষা ক্রমে ক্রমে যুবকদের প্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু যুবকদের এবং তাহাদের অভিভাবকদের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, লজিক, দর্শনশাস্ত্র বা সংস্কৃতের পরিবর্তে রসায়ন বা পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শিখিলে তাহারা কোন না কোন প্রকারে ব্যবসা-বাণিজ্য ফাঁদিয়া বসিতে পারিবে, অন্ততঃ জীবিকার জন্য চাকরি খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল, এই ধারণা ভুল। গত শতাব্দীর ৯০এর কোঠায় যাহারা রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. পড়িত (এম. এস-সি. ডিগ্রী তখনও হয় নাই) তাহারা সঙ্গে সঙ্গে আইনও পড়িত। আমি প্রায়ই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতাম, রসায়নের সঙ্গে আইনের সম্বন্ধ কি? অধিকাংশস্থলে উত্তর পাওয়া যাইত যে, "আর্ট কোর্সে" বহু বই মুখস্থ করিতে হয়। কিন্তু রসায়ন শাস্ত্রে কম বই পড়িতে হয়। লেবরেটরীর কষ্টকর কার্যেও তাহাদের আপত্তি নাই! অবশ্য কেহ কেহ রসায়ন শাস্ত্র ভালবাসিত বলিয়াই উহা পড়িত। এ সম্বন্ধে আমি একটি বিশেষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। একজন বি. এল. উপাধিধারী ছাত্র রসায়নে এম. এ. পড়িত, আদালতে সে কিছু দিন ওকালতিও করিয়াছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে আদালত ছাড়িয়া কলেজে আসিল কেন? ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল "আমি এম. এ. পাস করিলে আমার নামের শেষে এম. এ. বি এল. উপাধি যোগ করিতে পারিব এবং তাহার ফলে আমার 'মুন্সেফী' চাকরি পাইবার যোগ্যতা বাড়িবে।" আমি বেদনাহত চিত্তে বলিয়া ফেলিলাম—"হায়, রসায়ন শাস্ত্র, কি উদ্দেশ্যে তোমাকে ব্যবহার করা হইতেছে!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস—তাহার উৎপত্তি

ইউরোপে শিল্প ও বিজ্ঞান পাশাপাশি চলিয়াছে। উভয়েরই এক সঙ্গে উন্নতি হইয়াছে। একে অপরকে সাহায্য করিয়াছে। বস্তুতঃ আগে শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার পরে আসিয়াছে বিজ্ঞান। সাবান তৈয়ারি, কাচ তৈয়ারি, রং এবং খনি হইতে ধাতুর উৎপত্তি বিগত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া লোকে জানিত। রসায়ন শাস্ত্রের সঙ্গে ঐ সমস্ত শিল্পের সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইবার বহুপূর্ব হইতেই ঐগুলির উদ্ভব হইয়াছিল। অবশ্য, বিজ্ঞান শিল্পকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্পের যে বিরাট উন্নতি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে বীক্ষণাগারে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। বাংলাদেশে কতকগুলি "টেক্‌নোলজিক্যাল বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত করাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় নহে, সফল ব্যবসায়ী বা শিল্পপ্রবর্তক হইতে হইলে যে সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কর্মকৌশলের প্রয়োজন, বাংলার যুবকদের পক্ষে তাহাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কলেজে শিক্ষিত যুবক এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়াছে, তাহার মধ্যে কার্যপরিচালনার শক্তি নাই,—বড় জোর সে অন্যের হাতের পুতুল বা যন্ত্রদাসরূপে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকরূপে প্রবেশ করিয়া এই সব চিন্তা আমার মনকে বিচলিত করিয়াছিল। বাংলার সর্বত্র প্রকৃতির যে অজস্র দান ছড়াইয়া আছে, তাহাকে কিরূপে শিল্পের উপাদান রূপে ব্যবহার করা যায়? মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনাহার-ক্লিষ্ট যুবকদের মুখে অন্ন যোগাইবার ব্যবস্থা করা যায় কিরূপে? এই উদ্দেশ্যে লেবুর রস বিশ্লেষণ করিয়া সাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিলাম। কিন্তু কলিকাতার বাজারে লেবু এমন প্রচুর পরিমাণে বা সস্তায় পাওয়া যায় না, যাহাতে সাইট্রিক অ্যাসিড বিক্রয় করিয়া লাভ হইতে পারে! সুতরাং আমি এমন সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিলাম যাহা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ উৎপাদন করা যায়—এবং বাজারে সহজে কাট্‌তি হয়। এই ব্যবসায়ে বেশী মূলধন লাগিলে চলিবে না এবং আমার অন্য কাজেও ইহাতে ব্যাঘাত হইবে না। কয়েকবার চেষ্টা করিয়া শেষে ভেষজ বা ঔষধ সংক্রান্ত দ্রব্য প্রস্তুত করাই উপযোগী বলিয়া স্থির হইল। কলিকাতার ঔষধের দোকানগুলি আমি পরীক্ষা করিলাম এবং ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার ঔষধগুলি কি পরিমাণ এদেশে আমদানি হয়, তাহাও আমদানিকারকদের নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম। মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং তখন (বোধহয় এখনও) সর্বপ্রধান ঔষধব্যবসায়ী এবং তাঁহাদের ব্যবসা খুব বিস্তৃত ছিল। এই ফার্মের প্রাণস্বরূপ পরলোকগত ভূতনাথ পাল আমাকে ভরসা দিলেন যে যদি ঠিক জিনিস সরবরাহ করা যায় তবে ক্রেতার অভাব হইবে না।

এডিনবার্গে বিশ্ববিদ্যালয় কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য রূপে আমরা বিবিধ রাসায়নিক কারখানা দেখিতে যাইতাম—যথা পুলরস ডাই ওয়ার্কস (পার্থ), ম্যাক ইউয়েনস ব্রুয়ারী (এডিনবার্গ), ডিসটিলেশন অব শেলস (বার্নটিসল্যান্ড) ইত্যাদি। কিন্তু আমাদিগকে কোন ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে (ঔষধ তৈরির কারখানা) প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না, যদি কোন ব্যবসাঘটিত গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই আশঙ্কা। প্রথম দৃষ্টিতে এই ঈর্ষা নিন্দনীয় বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু তবু ইহা ক্ষমার যোগ্য। এই সমস্ত ফার্ম বিপুল অর্থ ব্যয় ও বহু বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তবে হয়ত এমন কোন প্রণালী আবিষ্কার করে, যাহার বলে তাহারা প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিতে পারে। সুতরাং আমি ঐ সকল যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা কোন কাজে লাগিল না। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে রাসায়নিক কারখানাগুলি খুব বড় আকারে চালানো হয়। উহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য শিল্প থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ বর্তমান। আমি পাঠ্যগ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে সালফিউরিক অ্যাসিড, অন্যান্য সমস্ত শিল্পের মূল স্বরূপ। সেন্ট রোলক্স (গ্লাসগোতে) টেনাণ্ট এণ্ড কোম্পানির বিরাট সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানা দেখিয়া আমি ঐ কথা বেশ বুঝিতে পারিলাম।

আমি যখন এই কাজে প্রথম প্রবৃত্ত হই, তখন আমার পশ্চাতে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। আমার পথপ্রদর্শকও কেহ ছিল না। তাহার পর শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ অতীত হইয়াছে। আমদানি রপ্তানির কাজ আশ্চর্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে—কিন্তু এই সময়ের মধ্যে রাসায়নিক শিল্পে বাংলায় খুব কম উন্নতিই হইয়াছে! আমি 'সাল্‌ফেট অব আয়রন' (হীরাকস) লইয়া কাজ আরম্ভ করিলাম। কলিকাতার বাজারে ইহার চাহিদা ছিল। কুচা লোহ (Scrap Iron) প্রচুর পরিমাণে প্রায় বিনামূল্যে পাওয়া যাইত এবং আমি সালফিউরিক অ্যাসিড সম্বন্ধে সন্ধান করিলাম। কলিকাতায় কলেজে পড়িবার সময় পরীক্ষা কার্যের জন্য আমি স্থানীয় জনৈক ঔষধ-ব্যবসায়ীর নিকট সালফিউরিক অ্যাসিড সংগ্রহ করিতাম। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, বিদেশ হইতে সালফিউরিক অ্যাসিড আমদানি করিতে হয় না, কেন না কাশীপুরের ডি. ওয়াল্‌ডি এণ্ড কোং প্রচুর পরিমাণে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন অনুসন্ধান করিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, ডি. ওয়াল্‌ডির কারখানা ব্যতীত কলিকাতার আশেপাশে আরও ৩।৪টি কারখানায় সালফিউরিক অ্যাসিড তৈয়ারি হয়। এই সব কারখানার মালিক কার্তিকচন্দ্র সিংহ, মাধবচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি। ইউরোপ ও আমেরিকায় সালফিউরিক অ্যাসিড কি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, ইহা যাঁহারা জানেন, কলিকাতার এই সব কারখানার প্রস্তুত সালফিউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ শুনিয়া তাঁহাদের মনে অবজ্ঞার ভাবই আসিবে। এখানে গড়ে এক একটি কারখানায় দৈনিক ১৩ হন্দরের (cwts) বেশী সালফিউরিক অ্যাসিড তৈয়ারি হইত না। সালফিউরিক অ্যাসিড হইতে আর দুইটি ধাতব অ্যাসিড—নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক তৈয়ারি হইত। এগুলি মাটির কলসীতে চোয়ানো হইত। এই প্রাথমিক ধরনে অ্যাসিড

তৈয়ারির ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে বিরক্তি হইল। এই সব ধাতব অ্যাসিড 'বিপজ্জনক পদার্থ' বলিয়া জাহাজে আমদানি করিতে খুব বেশী খরচা পড়িত, সেই কারণেই এ দেশে প্রস্তুত অ্যাসিড বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ হইত। আমার যে কিছু সালফিউরিক অ্যাসিড দরকার হইত, ডি. ওয়াল্‌ডির নিকট হইতেই তাহা আনাইতাম। কিন্তু এই সময় একটি অচিন্তিতপূর্ব ঘটনায় আমার কার্যের পরিধি বিস্তৃত হইল।

আমার গ্রামবাসী যাদবচন্দ্র মিত্র আলিপুর ফৌজদারী আদালতে মোক্তারি করিতেন। তিনি এই শ্রেণীর একটি সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানা কিনিয়াছিলেন। আসগর মণ্ডল নামক একব্যক্তি কারখানাটির প্রতিষ্ঠাতা। টালিগঞ্জের প্রায় তিনমাইল দক্ষিণে সোদপুর নামক গ্রামে বাঁশবনের মধ্যে এই কারখানা অবস্থিত ছিল। মিত্র আমাকে কারখানা দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে আমার রাসায়নিক জ্ঞানের দ্বারা আমি ইচ্ছা করিলে কারখানাটির উন্নতি সাধন করিতে পারি। আমার সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের ডিমনোস্ট্রেটার চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীকে লইলাম। চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় একটা সহজ প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি ছিল। চন্দ্রভূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুলভূষণ ভাদুড়ীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কুলভূষণ রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন।

৩৭ বৎসর পরে আমি এই বিবরণ লিখিতেছি। কিন্তু এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে একদিন শনিবার অপরাহ্নে ছুটির পর কলেজ হইতেই আমরা কারখানা দেখিতে রওনা হইলাম। ১০×১০×৭ ফুট এই মাপের দুইটি সিসার কামরা লইয়া কারখানা। বলা বাহুল্য এরূপ কারখানাতে 'গ্লোভার' বা 'গেলুসাকের' টাওয়ার বসাইবার কোন উপায় ছিল না। যে অশিক্ষিত মিস্ত্রী কারখানা তৈরি করিয়াছিল, তাহার এসব জ্ঞানও ছিল না। আমরা খুব ভাল করিয়া কারখানাটি পরীক্ষা করিলাম এবং কি উপায়ে উহার উন্নতি করা যায়, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। এইটি এবং অন্যান্য কয়েকটি ছোট ছোট অ্যাসিডের কারখানায় যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আমার মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইল। মনে মনে ক্ষোভ ও গ্লানি অনুভব করিলাম, এমন কথাও বলিতে পারা যায়। ইউরোপের যন্ত্রশিল্প এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এক একজন লোক কি বিপুল বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া কাজ করিয়াছে এবং শেষে আপনার অক্লান্ত সাধনার ফল জগৎকে দান করিয়া শিল্পজগতে হয়ত যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, অথচ তাহাদের প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। লে ব্ল্যাংক বিদেশে হাসপাতালে দারিদ্র্যের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক 'অ্যালকালির' (alkali) তিনিই আবিষ্কর্তা, জেমস ওয়াট, স্টিফেনসন, আর্করাইট, হারগ্রিভ্‌স, বার্নাড পলিসি প্রভৃতি সকলেরই দরিদ্রের ঘরে জন্ম। কিন্তু তবু তাঁহারা পর্বত-প্রমাণ বাধাকে জয় করিয়া অবশেষে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। স্মাইল্‌সের "ইঞ্জিনিয়ারদের জীবন চরিত" গ্রন্থে দেখি, ঐ সব ইঞ্জিনিয়ারদের প্রায় কেহই ধনীর

ঘরে জন্মেন নাই। সাধারণ গৃহস্থের সন্তান তাঁহারা। রাস্তানির্মাতা জন মেটকাফ গরীব মজুরের ছেলে, ছয় বৎসর বয়সে তিনি অন্ধ হন। মিনাই সেতুর নির্মাতা টেলফোর্ড এক বৎসর বয়সে অনাথ হন এবং তাঁহার বিধবা মাতাকে সংসারের সঙ্গে বিষম সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

আমি ইহার পর সাজিমাটি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম এবং ইহা হইতে কার্বনেট অব সোডা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিলাম। উত্তর ভারতে সাজিমাটি স্মরণাতীত কাল হইতে বস্ত্র প্রভৃতি পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমি দেখিলাম যে ইহাতে খরচ পোষায় না, কেননা তাহা অপেক্ষা ভাল সাজিমাটি সস্তায় বিক্রয় হয়। ব্রানার মণ্ড এণ্ড কোম্পানির কারখানায় এই সোডা তৈয়ারি হইত। ঔষধ-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, এই ফার্ম কার্যতঃ এসিয়ার বাজার একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। চীন ও জাপানেও ইহাদের সোডাই চালান যাইত।

ফস্‌ফেট অব সোডা এবং সুপার ফস্‌ফেট অব লাইম লইয়া পরীক্ষা করিলাম। এই সব দ্রব্য বিদেশ হইতে কেন আমদানি করিতে হয়! অথচ যে উপকরণ (গবাদি পশুর হাড়) হইতে এই সব দ্রব্য তৈয়ারি হয়, তাহা তো প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা হইতেছে! আমার তখনকার কাজের জন্য মাত্র ১০।১৫ মণ হাড়ের গুঁড়ার প্রয়োজন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে আমারই বাসস্থানের নিকটে রাজাবাজারে যে সব কসাইয়ের দোকান আছে, ঠিকাদারেরা সেখান হইতে গাড়ী বোঝাই করিয়া হাড় লইয়া যায়। রাজাবাজারে বহু অশিক্ষিত পশ্চিমা মুসলমান থাকিত এবং গোমাংস ইহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। কয়েক বস্তা কাঁচা হাড় সংগ্রহ করিয়া আমার বাড়ীর ছাদে শুকাইতে দেওয়া হইল। তখন শীতকাল, বাংলাদেশে সাধারণতঃ এই সময়ে আকাশ পরিষ্কার থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বৎসর জানুআরি মাসে পনর দিন ধরিয়া ক্রমাগত বৃষ্টি হইল। তাহার ফলে হাড়ের সংলগ্ন মাংস পচিয়া দুর্গন্ধ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই পচা মাংসে সূতার মত পোকা দেখা দিল। সন্ধান পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে কাকের দল আমার গৃহ আক্রমণ করিল এবং মনের আনন্দে পচা মাংস ও পোকা ভোজন করিতে লাগিল এবং হাড়গুলি টানাটানি করিয়া আমার প্রতিবাসীদের গৃহেও ছড়াইতে লাগিল। আমার বাড়ীর চারিদিকেই নিষ্ঠাবান-হিন্দুদের বাস। তাঁহারা সানুনয়ে আমাকে হাড়গুলি অন্যত্র সরাইতে বলিলেন। এমন আভাসও দিলেন যে, আমি স্বেচ্ছায় না সরাইলে তাঁহারা করপোরেশনের হেল্‌থ অফিসারের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। সুতরাং হাড়গুলি আমাকে তৎক্ষণাৎ সরাইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে, আমার পরিচিত একজন নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবসায়ী আমার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। মুরারিপুকুরের(১) নিকট মানিকতলায় তিনি একখণ্ড জমি ইজারা লইয়াছিলেন। আমাকে হাড়গুলি সেই স্থানে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন।

(১) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে বিপ্লবীদের বোমার কারখানা ছিল বলিয়া মুরারিপুকুর প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

হাড়গুলি সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং ইঁটের পাঁজার মত স্তূপাকার করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল। মধ্যরাত্রিতে সেই হাড়ের স্তূপ জ্বলিয়া উঠিল। স্থানীয় বিটের পুলিস ব্যাপার সন্দেহজনক মনে করিয়া "ইয়া ক্যা লাস জলতা হ্যা" বলিতে বলিতে দৌড়াইয়া আসিল। তাহার ভ্রম দূর করিবার জন্য একটা লম্বা বাঁশ দিয়া ভিতর হইতে কতকগুলি হাড় টানিয়া বাহির করিয়া তাহাকে দেখানো হইল। পুলিস কনেস্টবল সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। হাড়ের ভস্ম এখন কাজে লাগানো হইল। সালফিউরিক অ্যাসিড যোগে উহা সুপার ফস্‌ফেট অব লাইমে পরিণত হইল এবং তাহার পর সোডার প্রতিক্রিয়ায় ফস্‌ফেট অব সোডা হইল।

ছাত্রদিগকে আমার অধ্যাপনার প্রণালী সম্বন্ধে এইখানে একটু বলিব। আমি টেবিলের উপরে পোড়ানো হাড়ের গুঁড়ার নমুনা রাখিতাম। যে উপকরণ হইতে ইহা প্রস্তুত তাহার সঙ্গে এখন আর কোন সম্বন্ধ নাই। গরু, ঘোড়া অথবা মানুষের কঙ্কাল হইতেও উহার উৎপত্তি হইতে পারিত। হাড়ভস্ম রাসায়নিক হিসাবে বিশুদ্ধ মিশ্রপদার্থ, রাসায়নিকদের নিকট ইহা "ফস্‌ফেট অব ক্যালসিয়ম" এবং চূর্ণ আকারে ইহা স্নায়বিক শক্তিবর্ধক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়; আমি অনেক সময় খানিকটা হাড়ভস্ম আমার মুখে ফেলিয়া দিতাম এবং চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতাম এবং ছাত্রদেরও তাহাই করিতে বলিতাম। কেহ কেহ বিনা দ্বিধায় আমার অনুকরণ করিত; কিন্তু অন্য কেহ কেহ আবার ইতস্ততঃ করিত, তাহাদের মন হইতে গোঁড়ামির ভাব দূর হইত না। অল্পদিন পূর্বে আমাব একজন ভূতপূর্ব ছাত্রের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং এখন মাড়োয়ারী সমাজের অলঙ্কার, রাজনীতিক, অর্থনীতিবিৎ এবং ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাতনামা। তিনি হাসিতে হাসিতে কলেজ-জীবনের এই পুরাতন কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন (শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান)।

যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি হয়, তাহার কতকগুলি এই দেশেই প্রস্তুত করিবার সমস্যা সমাধান করিয়া, আমি ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার ঔষধ তৈয়ারির দিকে মনোযোগ দিলাম। Syrup Ferri Iodidi, Liquor Arsenicalis প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধ প্রস্তুত করা একজন শিক্ষিত রাসায়নিকের পক্ষে শক্ত নহে, ইহা দেখিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম। ইথার তৈয়ারি করিতেও আমি প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ঐ কার্য করিতে করিতে ভীষণ বিস্ফোরণে কাচপাত্র ভাঙিয়া চুরমার হইল দেখিয়া আমি সতর্ক হইলাম। বাজারের সোরাকেও বিশুদ্ধ করিয়া পটাশ নাইট্রেস বি. পি. তে পরিণত করা গেল।

পুরাতন বোতল, শিশি প্রভৃতি বহুবাজারের বিক্রিওয়ালাদের নিকট হইতে যত ইচ্ছা সংগ্রহ করা যায়, আমি তাহাদের গুদাম পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার প্রয়োজনের মত জিনিস যে এখান হইতেই সংগ্রহ করা যাইবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

এই সমস্ত গোড়ার কথা ঠিক করিয়া একটি ঔষধের কারখানা খুলিবার জন্য আমি মনস্থ করিলাম। এই কারখানার কি নাম হইবে, তাহা লইয়া বহু চিন্তার

পর অবশেষে বর্তমান নামটি (বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্) দেওয়াই স্থির করিলাম। নামটি একটু লম্বা, কিন্তু রাসায়নিক ও ভেষজ উভয় প্রকার পদার্থের পরিচয়ই নামের মধ্যে থাকা চাই, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল। নামটি যে ঠিকই হইয়াছিল, তাহা সময়ে প্রমাণিত হইয়াছে। অন্ততঃপক্ষে এই নামের সম্বন্ধে কেহ কোন আপত্তি করে নাই।

এখন আমার প্রস্তুত ঔষধাদি বাজারে কিরূপে চালানো যায়, সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি একজনকে 'দালালের' কাজে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলাম। সে আমার ঔষধ তৈয়ারির জন্য কাঁচামাল কিনিত এবং আমার প্রস্তুত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিত। একটি যুবক আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার (ডাক্তার) নিকট কম্পাউন্ডারের কাজ করিত। বর্তমানে সে বসিয়া ছিল। আমি তাহাকে গ্রাম হইতে লইয়া আসিলাম। ডিস্পেন্সারিতে যে সব সাধারণ ঔষধ ব্যবহৃত হয়, সেগুলির নাম সে জানিত। তাহার নিকট আমি আমার ঔষধ তৈয়ারির কল্পনার কথা বলিলাম। যুবকটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত পড়িয়াছিল, লেখাপড়া সামান্য শিখিয়াছিল,— ইংরাজীও কিঞ্চিৎ জানিত। তাহার দ্বারা আমার কাজ বেশ চলিতে লাগিল। তখনকার দিনে ম্যাট্রিক পাস ছেলে বেশি ছিল না, যাহারা ইংরাজী স্কুলের উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িত, অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে কোন কলেজের দরজা পার হইত, তাহাদের একটা ভ্রান্ত মর্যাদাজ্ঞান জন্মিত এবং এই জাতিভেদের দেশে, তাহাদের মনে এক নূতন জাত্যভিমানের সৃষ্টি হইত। আমার নির্বাচিত যুবকটির এসব দোষ ছিল না। সে আমার সঙ্গেই থাকিত এবং সামান্য পারিশ্রমিক লইত। তবে জিনিস বিক্রয়ের উপর তাহাকে কিছু কমিশন দিব বলিয়াছিলাম। সে তরুণবয়স্ক, সুতরাং তাহার মধ্যে উৎসাহ বা আদর্শবাদের অভাব ছিল না। আমার মনের ছোঁয়াচও তাহার লাগিয়াছিল। লোহার উপর সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রতিক্রিয়ায় সবুজ রঙের দানাদার ফেরি সালফ (বি. পি.) হইতে দেখিয়া সে একদিন উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়াছিল—"ভগবান, কি আশ্চর্য এই রসায়ন বিজ্ঞান! আবার দুর্গন্ধময় গলিত হাড় হইতে সোডি ফস্ফ (বি. পি.)-এর উদ্ভব দেখিয়া সে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। আমার প্রস্তুত ঔষধগুলি ইউরোপীয় কায়দায় বোতলে পুরিয়া লেবেল আঁটা ও প্যাক করা হইত। সেগুলি লইয়া আমার দালাল এখন ঔষধের বাজারে ঘুরিতে লাগিল।

স্থানীয় ঔষধবিক্রেতাগণের সাধারণতঃ রসায়নশাস্ত্রে কোন জ্ঞান নাই। তাহারা বড়জোর হিসাব করিয়া ব্যবসায়ে লাভ ক্ষতি গণনা করিতে পারে। তাহারা আমার প্রস্তুত ঔষধ দেখিয়া প্রশংসা করিল, কিন্তু মাথা নাড়িয়া বলিল,—"বড় বড় নামজাদা বিলাতী ফার্মের ঔষধ সহজেই বিক্রয় হয়, কিন্তু দেশী ঔষধ লোকে চায় না।" সুতরাং গোড়া হইতেই আমাদিগকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।

এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহা কেবল যে আমার প্রচেষ্টায় নূতন শক্তি সঞ্চার করিল তাহা নহে,—আমাদের ব্যবসায়ের উপরও উহার ফল বহুদূরপ্রসারী হইল।

একদিন আমার এক পুরাতন সতীর্থ আমার এই নূতন প্রচেষ্টার কথা শুনিরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার মনে খুব স্বদেশানুরাগ ছিল এবং তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, আমাদের যুবকদের জন্য যদি নূতন নূতন জীবিকার পথ উন্মুক্ত না হয়, তবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারসমস্যা প্রবল হইয়া আর্থিক ধ্বংস ও জাতীয় দুর্গতি আনয়ন করিবে। ইনিই ডাঃ অমূল্য-চরণ বসু। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি তখন বেশ সাফল্যলাভ করিয়াছেন এবং এই সময় হইতে আমাদের নূতন ব্যবসায়ে যোগ দিয়া তিনি অনেক কাজ করিয়াছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভিতরের দিকের ঘরে লইয়া গেলাম, যেখানে বড় বড় কটাহ ও ভাটিতে ফেরি সাল্‌ফ, সোডি ফস্‌ফ এবং অন্যান্য কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য দানা বাঁধিতেছিল। আমার নূতন ব্যবসায়ের প্ল্যান আমি তাঁহাকে বলিলাম এবং তাহা যে সম্ভবপর তাহাও বুঝাইয়া দিলাম। অমূল্যচরণ উৎসাহী লোক ছিলেন। তিনি আমার কথায় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং সাগ্রহে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন।

তাঁহার সহযোগিতা আমাদেব পক্ষে খুবই মূল্যবান হইল। তিনি যে কেবল ব্যবসায়ে মূলধন হিসাবে আর্থিক সাহায্যই করিলেন তাহা নয়, আমাদের প্রস্তুত ঔষধগুলি যাহাতে ডাক্তারদের সহানুভূতি লাভ করিতে পারে, তাহার জন্যও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সোদপুরের অ্যাসিডের কারখানা যাদব মিত্র লাভজনক ব্যবসারূপে চালাইতে পারিলেন না, কেন না যে লোকটির উপর তিনি এই কারখানার ভার দিয়াছিলেন, তাহার বেতন অতি সামান্য ছিল, কাজও সে কিছু বুঝিত না। যাদব মিত্র এক হাজার টাকায় আমাকে এই কারখানা বিক্রয় করিতে চাহিলেন। কিন্তু টাকা কোথায় পাওয়া যায়? তিন বৎসর চাকরি করিয়া ব্যাঙ্কে আমার ৮০০৲ টাকা জমিয়াছিল, সে টাকা গোড়ার দিকে পরীক্ষার কাজেই ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। মিত্র আমার আর্থিক অবস্থা ভালই জানিতেন। আমি যদি টাকার জন্য হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিই তাহা হইলেই তিনি কাবখানা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইবেন। দুই এক মাস পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত পরীক্ষক হিসাবে আমার প্রায় ছয় শত টাকা পাওয়ার কথা। অবশিষ্ট টাকা আমি কয়েক কিস্তিতে শোধ করিতে পারিব। এই সমস্ত ভাবিয়া আমি মিত্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চুক্তি পাকা করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ অ্যাসিডের কারখানার দখল লইলাম। কিন্তু আর একটা নূতন বাধা উপস্থিত হইল। আমার বাসস্থান হইতে এই কারখানা ছয় মাইল দূরে, স্থানটিও সুগম নয়। সুতরাং কারখানার কাজ কিরূপে চালানো যাইবে। চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীরও এ বিষয়ে উৎসাহ ছিল, আমি তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। তিনি আমাব সঙ্গে একমত হইলেন। ১৮৯৩ সালের গ্রীষ্মের ছুটি কেবল আরম্ভ হইয়াছে, মে ও জুন এই দুই মাস ছুটি। চন্দ্রভূষণ, তাঁহার ভ্রাতা কুলভূষণ এবং তাঁহাদের একজন আত্মীয়, সোদপুরের এই দুর্গম স্থানে গেলেন। যেখানে তাঁহারা বাসা লইলেন সে একটা মাটির কুটীর। নিকটে কোন বাজার ছিল না, কোন মাছ তরকারিও পাওয়ার উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁহাদিগকে কয়েক বস্তা চাল এবং আলু সংগ্রহ করিয়া

লইয়া যাইতে হইয়াছিল। এই দিয়া বাঁশবনে তাঁহারা মহানন্দে চড়ুইভাতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অ্যাসিডের ঘরগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলেন এবং এই 'আদিম' প্রণালীতে কার্য করাতে কাঁচামালের যে পরিমাণ অপচয় হইতেছে, তাহা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। এইরূপে একটি ছোট কারখানা যদি কোন মূলধনী নিজে চালায় এবং সমস্ত খুঁটিনাটি দেখাশুনা করে, তাহা হইলে লাভজনক হইতে পারে। কিন্তু কোন সুশিক্ষিত রাসায়নিকের এরূপ স্থানে কোন কাজ নাই।

ভাদুড়ীভ্রাতাগণ জুলাই মাসে কলেজ খুলিতেই সোদপুর হইতে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু কিরূপে আধুনিক প্রণালীতে একটি অ্যাসিডের কারখানা স্থাপন করা হয়, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা রিপোর্ট আমাকে দিলেন। কিন্তু তখনও ঐরূপ কোন কারখানা স্থাপনের সময় হয় নাই। আমি প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলাম না এবং ঔষধ প্রস্তুতের দিকেই আমাকে সমস্ত অবসর সময় ব্যয় করিতে হইত। ইহার দশ বৎসর পরে বৃহদাকারে কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানা কার্যে পরিণত করা হইল। তাহার সঙ্গে একটি অ্যাসিড তৈরির বিভাগও যুক্ত হইল।

ইতিমধ্যে আমি ঔষধ প্রস্তুতের কাজে ডুবিয়া গেলাম। 'ফার্মাসিউটিক্যাল জার্নাল', 'কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট' প্রভৃতি সাময়িক পত্র হইতে এই বিষয়ে খুব সাহায্য পাওয়া যাইত। আমার নিজের চেষ্টাতেই নানা কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে হইত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি যে সিরাপ অব আইওডাইড অব আয়রন প্রস্তুত করিতাম তাহা কিছুদিন রাখিলে ঈষৎ পীতাভ হইত। বিলাত হইতে যে ঔষধ আমদানি হইত তাহাতে অনেকদিন পর্যন্ত ঈষৎ সবুজ রং থাকিত। কিরূপে এই সমস্যার সমাধান করা যায়? একদিন পূর্বোক্ত সাময়িক পত্রগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে আমি ইহার সমাধানের পন্থা খুঁজিয়া পাইলাম। ফেরাস আইওডাইড প্রস্তুত হইলে, তাহার সঙ্গে একটু হাইপো ফস্‌ফরাস অ্যাসিড যোগ করিলেই উহাতে যতদিন ইচ্ছা ঈষৎ সবুজ রং থাকিবে। এইরূপে আমি ঔষধ প্রস্তুতের কাজে অভিজ্ঞতা লাভ করিতাম এবং কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে, তাহার সমাধানে তৎপর হইতাম।

এই সময়ে আমাদের জিনিস বাজারে বেশ চলিতে আরম্ভ করিল, এবং স্থানীয় ঔষধ বিক্রেতাদের আলমারিতে স্থান পাইল। প্রথম প্রথম ঔষধের নমুনা লইয়া যাওয়া মাত্র অনেকে আমাদের বিরুদ্ধতা করিতেন, আমাদের কাজের সম্বন্ধে শ্লেষ বিদ্রূপ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও এখন মত পরিবর্তন হইতে লাগিল এবং তাঁহারা আমাদের তৈয়ারী জিনিসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবু তাঁহারা তাঁহাদের গ্রাহকদের এই বলিয়া নিন্দা করিতে ত্রুটি করিতেন না যে, তাঁহাদের দেশী জিনিসের উপর আস্থা নাই। ইতিমধ্যে অমূল্যচরণ ডাক্তার-মহলে আমাদের জিনিসের জন্য খুব প্রচারকার্য করিতে লাগিলেন। একটা প্রবাদ আছে, "চোর ধরিবার জন্য চোরকেই লাগাও"। প্রবাদটির মূলে কিছু সত্য আছে। পরলোকগত রাধাগোবিন্দ কর, অমূল্যচরণ বসু প্রভৃতিকে কারমাইকেল মেডিক্যাল

কলেজের প্রবর্তকরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। তাঁহাদিগকে আমাদের পক্ষে আনা কঠিন হইল না। তাঁহাদের সমব্যবসায়ী অন্যান্য উদীয়মান চিকিৎসকগণ—নীলরতন সরকার, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রভৃতিও স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া ক্রমে আমাদের প্রস্তুত এট্‌কিন্‌স্‌ সিরাপ, সিরাপ অব হাইপোফস্‌ফাইট অব লাইম, টনিক গ্লিসেরোফসফেট্‌, প্যারিস কেমিক্যাল ফুড প্রভৃতিও ব্যবহারের ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন।

স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের কবিরাজেরা যে সব দেশী ভেষজ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, অমূল্যচরণ ও রাধাগোবিন্দের সে সমস্তের উপর একটা সহজ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। যে সমস্ত ডাক্তারী ঔষধ প্রচলিত ছিল, আমি সেইগুলিই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি, কিন্তু অমূল্যচরণ আমাদের ব্যবসায়ে নূতন পথ প্রদর্শন করিলেন। তিনি কয়েকজন কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আয়ুর্বেদীয় ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী সংগ্রহ করিলেন। কালমেঘের সার, কুর্চির সার, বাসকের সিরাপ, জোয়ানের সার প্রভৃতি ভেষজের প্রস্তুত-প্রণালী তিনি আমার নিকট উপস্থিত করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজে এই সমস্ত দেশীয় ভেষজের জন্য প্রচারকার্য করিতে লাগিলেন। ডাক্তারদিগকে তিনি বলিতেন যে, এই সমস্ত ঔষধের গুণ বাংলার ঘরে ঘরে বহুবৎসরব্যাপী ব্যবহারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে। এখন কেবল আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহাদের ভেষজ শক্তিকে কাজে লাগাইতে হইবে এবং ডাক্তারদিগকে উহা ব্যবহার করিতে হইবে। অমূল্যচরণ নিজে ঐ সব দেশীয় ঔষধ ব্যবহার করিয়া পথ প্রদর্শন করিলেন। ধীরে ধীরে এই সব দেশীয় ঔষধের উপকারিতা স্বীকৃত হইতে লাগিল। তখনকার দিনে 'টলুর সিরাপ' ব্যবহার করা সর্বত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল, বাসকের সিরাপ উহা অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ। আমাদের নবপ্রবর্তিত দেশীয় ভেষজ এইভাবে নিজের গুণেই সর্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৪১ সালে ও, সোগনেসী দেশীয় ভেষজ ব্যবহারের কথা বলেন; তারপর কানাইলাল দে, মদীন শেরিফ, উদয়চাঁদ দত্ত ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার কতকগুলি দেশীয় ভেষজ অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করেন। অর্ধশতাব্দী পরে ঐ সমস্ত চিকিৎসকগণের প্রস্তাবের প্রতি চিকিৎসকগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। ১৮৯৮ সালে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইল, তাহাতে আমরা একটি স্টল খুলিয়া আমাদের প্রস্তুত দেশীয় ভেষজ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত ডাক্তারদের দৃষ্টি উহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। ডাঃ কানাই লাল দে তখন মৃত্যুর দ্বারে অতিথি বলিলেও হয়। কিন্তু তাঁহারই অনুপ্রেরণায় মেডিক্যাল কংগ্রেসের কাউন্সিল কতকগুলি দেশীয় ভেষজকে গ্রহণ করিবার জন্য চিকিৎসকসঙ্ঘের নিকট আবেদন করিলেন। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার কর্তারা অবশেষে সে আবেদন গ্রাহ্য করিলেন এবং দেশীয় ভেষজ ফার্মাকোপিয়ার 'পরিশিষ্টে' স্থান লাভ করিল।

বাজারে এখন আমরা প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইলাম। পাইকারী ব্যবসায়ীরা

আমাদের জিনিস সম্বন্ধে খোঁজ করিতে লাগিলেন। দেশী জিনিস প্রচলন করিবার বিরুদ্ধে একটা প্রধান বাধা ছিল এই যে, কলিকাতার ঔষধের বাজার প্রধানতঃ অশিক্ষিত স্থানীয় এবং পশ্চিমা মুসলমানদের হাতে ছিল। ইহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র স্বদেশপ্রীতি ছিল না এবং ইহারা স্থানীয় ভেষজপ্রস্তুতকারকদের উপর অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করিতে ছাড়িত না। 'দেশী চিজ'-এর বাজারে চাহিদা ছিল না, সুতরাং মূল্য না কমাইলে, তাহারা ঐ সব জিনিস বাজারে চালাইতে চাহিত না। মূল্য কমাইলেও, নগদ দাম তাহারা দিত না, অনির্দিষ্ট কালের জন্য টাকা ফেলিয়া রাখিতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে বাঙালীদের পরিচালিত দুই একটি ফার্ম প্রথম হইতেই আমাদের প্রস্তুত জিনিসের আদর করিতেন। একদিন আমরা বেশী পরিমাণে কতকগুলি কাঁচামাল খরিদ করিয়াছিলাম—যথা আইওডিন, টলু, বেলে-ডোনা প্রভৃতি। কলিকাতার প্রধান ঔষধ ব্যবসায়ী মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল অ্যান্ড কোম্পানির পরলোকগত ভূতনাথ পাল, আমরা এত অধিক পরিমাণে আইওডিন কিনিতেছি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। আমরা ৭ পাউন্ড আইওডিন কিনিয়াছিলাম। কলিকাতার বা মফঃস্বলের কোন সাধারণ ঔষধালয় মাসে, এমন কি বৎসরে এক পাউণ্ডের বেশি আইওডিন কিনিত না। ভূতনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা একবারে এত বেশি আইওডিন কিনিয়া কি করিবেন?" আমরা যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে আইওডিন হইতে 'সিরাপ ফেরি আইওডাইড' প্রস্তুত হইবে, তখন তাঁহার কৌতূহল বর্ধিত হইল। তাঁহার কাছে আমাদের জিনিসের 'অর্ডার' দেওয়ার জন্য পূর্বেই অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উহাতে তেমন গুরুত্ব দান করেন নাই, কেন না স্বভাবতঃই আমাদের প্রচেষ্টার উপর তাঁহার বিশ্বাস জন্মে নাই, কিন্তু এখন তাঁহার চোখ খুলিল। ৭ পাউন্ড আইওডিন এবং টলু প্রভৃতির দ্বারা ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার ঔষধ তৈয়ারি হইবে, ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়! পাল তৎক্ষণাৎ এক হন্দর সিরাপ ফেরি আইওডাইডের জন্য অর্ডার দিলেন এবং আমার যতদূর স্মরণ হয়, এক হন্দর ফেরি সাল্‌ফের জন্যও তিনি অর্ডার দিয়াছিলেন।

যখন আমার হাতে এই অর্ডার আসিল, আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না। কলেজ হইতে ফিরিয়া প্রত্যহ অপরাহ্ণে (প্রায় ৪৷৷০টার সময়) আমি পূর্বদিনের প্রাপ্ত অর্ডারগুলি দেখিতাম এবং যাহাতে ঐ সব জিনিস শীঘ্র সরবরাহ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতাম। কলেজ লেবরেটরী হইতে আমার ফার্মেসীর লেবরেটরীতে যাওয়া আমার পক্ষে বিশ্রামের মতই ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার নূতন কাজে প্রবৃত্ত হইতাম এবং অপরাহ্ণ ৪৷৷০টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খাটিয়া কাজ শেষ করিতাম। কাজের সঙ্গে আনন্দ থাকিলে তাহাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না। যে সমস্ত ঔষধ বিদেশ হইতে আমদানি হইত, তাহাই এদেশে প্রস্তুত করিতে পারিতেছি, এই ধারণাই আমার মনে বল দিত। সিরাপ ফেরি আইওডাইড, স্পিরিট অব নাইট্রিক ইথর, টিংচার অব নক্সভমিকা প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে লেবরেটরীতে তৈরি হয়, কেন না ঐগুলি প্রস্তুত করিতে শিক্ষিত রাসায়নিকের প্রয়োজন। প্রত্যেকটি নমুনার জন্য গ্যারাণ্টি দিতে হইবে, ইহার জন্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা চাই।

এই সময় আমার পক্ষে একটি বিষম অনর্থপাত হইল। অমূল্যের ভগিনীপতি সতীশচন্দ্র সিংহ রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. পাস করিয়া আইনের পড়াও শেষ করে। মামুলী প্রথায় আইন পরীক্ষার পাস করিয়া সে হয়ত ওকালতি আরম্ভ করিত। কিন্তু অমূল্যের আদর্শে তাহার চিত্ত অনুপ্রাণিত হইল, সে নিজের রাসায়নিক জ্ঞান কাজে লাগাইতে ইচ্ছুক হইল এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের নূতন ব্যবসায়ে যোগ দিল। একটা নূতন ব্যবসায়, ভবিষ্যতে যাহার দ্বারা বিশেষ কিছু লাভের আশা নাই, তাহার কাজে এইভাবে আত্মোৎসর্গ করা কম আত্মবিশ্বাস ও সৎসাহসের পরিচায়ক নহে। এরূপ কাজে কঠোর পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত হইতে হয় এবং কিছুকালের জন্য লাভের কোন আশাও মন হইতে দূর করিতে হয়। যুবক সতীশ আমার একজন প্রধান সহকারী হইল, সে কিছু মূলধনও ব্যবসায়ে দিয়াছিল। রাসায়নিক কাজে এ পর্যন্ত বলিতে গেলে আমি এককই ছিলাম এবং আমার পক্ষে অত্যন্ত বেশী পরিশ্রমও হইত। তাছাড়া যে অবসর সময়টুকুতে আমি অধ্যয়ন করিতাম, তাহাও লোপ হইয়াছিল, আমি সতীশকে আমার উদ্ভাবিত নূতন প্রণালীর রহস্য বুঝাইতে লাগিলাম এবং সে শিক্ষিত রাসায়নিক বলিয়া শীঘ্রই এ কাজে পটুতা লাভ করিল। আমরা দুইজন একসঙ্গে প্রায় দেড় বৎসর উৎসাহসহকারে কাজ করিলাম এবং আমাদের প্রস্তুত বহু দ্রব্যের বাজারে বেশ চাহিদা হইল। কোন কোন চিকিৎসক তাঁহাদের ব্যবস্থাপত্রে যতদূর সম্ভব আমাদের ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা আমাকে ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। একদিন বৈকালে আমি অভ্যাসমত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। রাত্রি ৮৷৷৹টার সময় বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম, সতীশ আর নাই। বজ্রাঘাতের মতই এই সংবাদে আমি মুহ্যমান হইলাম। দৈবক্রমে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হাস-পাতালের দিকে ছুটিলাম। সেখানে সতীশের মৃতদেহ স্ট্রেচারের উপরে দেখিলাম। আমি নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির মত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—বহুক্ষণ পরে প্রকৃত অবস্থা আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম। এই তরুণ যুবক জীবনের আরম্ভেই কালগ্রাসে পতিত হইল, পশ্চাতে রাখিয়া গেল তাহার শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতামাতা এবং তরুণী বিধবা পত্নী। অমূল্য ও আমার মানসিক যন্ত্রণা বর্ণনার ভাষা নাই। আমাদের বোধ হইল, আমরাই যেন সতীশের মৃত্যুর কারণ। সেই ভীষণ দুর্ঘটনার পর ৩২ বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও এই সমস্ত কথা লিখিতে আমার সমস্ত শরীর যেন বিদ্যুৎস্পর্শে শিহরিয়া উঠিতেছে।

কিছুকালের জন্য মনে হইল যে আমাদের সমস্ত আশা ভরসা চূর্ণ হইয়া গেল। প্রথম শোকের উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে, অমূল্য ও আমি সমস্ত অবস্থা ভাবিয়া দেখিলাম; "ভগবান যাহাকে দিয়াছিলেন, ভগবানই তাহাকে ফিরাইয়া লইলেন" এই কথা ভাবিয়া আমি সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিলাম। আমি আর পশ্চাতে ফিরিতে পারি না। পুনর্বার আমাকেই সমস্ত গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল।

কঠোর দৃঢ়সংকল্পের সংগে আমি সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

সৌভাগ্যক্রমে কর্মের বৈচিত্র্যই আমার পক্ষে বিশ্রাম, জীবনের সান্ত্বনাস্বরূপ ছিল। ফরমাইস মত দ্রব্য যোগাইতেই হইবে। বস্তুতঃ এক একটা বড় অর্ডার কাজের উৎসাহ বৃদ্ধি করিত। এবং সে সময়ে কঠোর পরিশ্রম করিয়াও আমার স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হইত না। সকালবেলা দুই ঘণ্টা আমি রসায়ন শাস্ত্র এবং সাধারণ সাহিত্য সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিবার জন্য নির্দিষ্ট রাখিতাম। যদি ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে পড়াশুনার কোন ব্যাঘাত হইত তাহা হইলে আমি আর্তস্বরে বলিতাম—"একটা দিন নষ্ট হইল!" রবিবার এবং ছুটির দিনে আমি একাদিক্রমে ১০।১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতাম। মাঝে কেবল একঘণ্টা স্নানাহারের জন্য ব্যয় করিতাম। কাজ অনেকটা বাঁধাধরা ছিল, মস্তিষ্ক চালনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কখনও কখনও আমি আরাম কেদারায় শুইয়া থাকিতাম এবং আমার নির্দেশ মত ২।১ জন কম্পাউণ্ডার বিভিন্ন উপাদান ওজন করিয়া একত্র মিশাইয়া নির্দিষ্ট ঔষধ প্রস্তুত করিত, আমি মাঝে মাঝে নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম এবং বিশ্লেষণের পর সেগুলির 'স্টাণ্ডার্ড' ঠিক করিয়া দিতাম। ঔষধ প্রস্তুতকারকদের পরামর্শ অনুসারে এবং ঐ সম্বন্ধে বিপুল সাহিত্য ঘাঁটিয়া আমি আমার লেবরেটরীতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় তরল সার এবং সিরাপ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আমাকে একশত পাউণ্ড 'এট্‌কিনের সিরাপ' প্রস্তুত করিতে হইত, তবে কেবল মাত্র নির্দিষ্ট ওজন অনুসারে তরল সার ও প্রয়োজনীয় সিরাপ মিশাইয়া লইতে হইত এবং এইভাবে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি ফরমাইসমত জিনিস যোগাইতে পারিতাম।

যাহাতে যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, এমন কোন সমস্যা যদি কোন রাসায়নিকের হাতে পড়ে, তবে তাহার পক্ষে অনেক সুযোগ আছে। সে কখনই বিচলিত হয় না, যে কোন বাধাবিঘ্নই উপস্থিত হোক না কেন, সে তাহা অতিক্রম করিতে পারে। সে নূতন নূতন কার্যপ্রণালী আবিষ্কার করিতে পারে, যাহা তাহার পক্ষে ব্যবসায়ের গুহ্যকথা হিসাবে খুবই মূল্যবান হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের পক্ষে বড় একটা বাধা ছিল। এ পর্যন্ত আমরা যে মূলধন খাটাইয়াছিলাম, তাহার পরিমাণ তিন হাজার টাকার বেশী হইবে না। আমার মাহিনা হইতে আমি বিশেষ কিছুই জমাইতে পারিতাম না। অমূল্যের ভাল পসার হইতেছিল, কিন্তু সে একটি বৃহৎ একান্নবর্তী হিন্দুপরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম লোক ছিল,—তাহার উপর তাহার আবার পরোপকার প্রবৃত্তিও যথেষ্ট ছিল। সুতরাং সেও বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিতে পারে নাই। আমরা যে মূলধন দিয়াছিলাম, তাহার কতকাংশ যন্ত্রপাতি, শিশি, বোতল এবং অন্যান্য মালমসলা, সরঞ্জাম প্রভৃতিতেই ব্যয় হইয়াছিল। ওদিকে সোদপুরের সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানাটির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে দৈনিক গড়ে দশ মনের বেশী অ্যাসিড প্রস্তুত হইত না এবং কলিকাতা হইতে অত দূরে উহাকে লাভজনক ব্যবসায়রূপে চালাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

১৮৯৪ সালের গ্রীষ্মের ছুটির সময় আমি আমার পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বাড়ী ছুটিলাম। আমাদের যে ভূসম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহা দেনার দায়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। খুলনা লোন আফিস এবং অন্যান্য মহাজনদের সঙ্গে একটা আপস করিলাম; কতক ঋণ কিস্তিবন্দি হিসাবে শোধের ব্যবস্থা হইল এবং অবশিষ্ট ঋণ কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পরিশোধ করিলাম। এইরূপে এক সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত কাজ মিটাইয়া আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম এবং গ্রীষ্মের ছুটির যে ছয় সপ্তাহ বাকী ছিল,—সেই সময়ের জন্য সোদপুরে অ্যাসিডের কারখানাতেই প্রধান আড্ডা করিলাম,—উদ্দেশ্য স্বচক্ষে কারখানার অবস্থা দেখিব। কিন্তু প্রত্যহ আমাকে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কলিকাতা যাইতে হইত এবং ৩।৪ ঘণ্টা সদর আফিসের কাজকর্ম দেখিতে হইত। সোদপুরে বিশ্রাম সময়ে আমি আমার প্রিয় গ্রন্থ Kopp's History of Chemistry (জার্মান) পড়িতাম। ছুটি শেষ হইলে আমাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে এরূপ ছোট আকারে একটা অ্যাসিডের কারখানা লাভজনক হইতে পারে না এবং অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আমাকে ঐ কারখানা ছাড়িয়া দিতে হইল। পুরাতন সিসার পাতগুলি বেচিয়া মাত্র ৩।৪ শত টাকা পাওয়া গেল। এই ব্যাপাবে আমার কিছু লোকসান হইল বটে, কিন্তু যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম তাহা কয়েক বৎসর পরে কাজে লাগিয়াছিল।

ইহার কিছু পরে আমাদের নূতন ব্যবসায়েব পক্ষে আর এক বিপত্তি ঘটিল। অমূল্য একজন বিউবনিক প্লেগগ্রস্ত রোগীকে চিকিৎসা করিয়াছিল। এই রোগ সংক্রামক এবং অমূল্য চিকিৎসা করিতে গিয়া নিজেও এই রোগে আক্রান্ত হইল। একদিন রবিবার অপরাহ্নে (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) আমি আফিসে বসিয়া ঔষধের তালিকা মিলাইতেছিলাম, এমন সময় সংবাদ পাইলাম যে, অমূল্য আর ইহলোকে নাই এবং তাহার মৃতদেহ সৎকারার্থে নিমতলা শ্মশানঘাটে লইয়া গিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ কাজ ছাড়িয়া উঠিলাম এবং একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া নিমতলার দিকে ছুটিলাম, সেখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া গভীর শোক কোনরূপে সংযত করিয়া আবাব আফিসে ফিরিয়া আসিলাম এবং অসমাপ্ত কার্য শেষ করিলাম। অমূল্যের মৃত্যুর পর আমাকেই সমস্ত কাজের ভার লইতে হইল। এই ইতিহাস আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পাঁচ বৎসর পরে ব্যবসায়টি লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করা হইল এবং কার্যের প্রসারের জন্য সদর আফিস হইতে তিন মাইল দূরে শহরতলিতে ১৩ একর জমি খরিদ করিয়া কারখানা নির্মিত হইল।

ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের প্রথম ডিরেক্টর ডাঃ ট্রাভার্স এই রাসায়নিক কারখানা নির্মাণের সময় (১৯০৪-৭) উহা দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট একটি রিপোর্টে লিখিয়াছেন ঃ—

"প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের ভূতপূর্ব ছাত্রগণই এই কারখানা নির্মাণ ও পরিচালনা করিতেছেন। সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতের যন্ত্র এবং অন্যান্য ঔষধ প্রস্তুতের যন্ত্রের নির্মাণ ও পরিকল্পনার মূলে প্রভূত গবেষণার পরিচয়

আছে এবং উহার দ্বারা এদেশের সবিশেষ উপকার হইবে। যাঁহারা এই বিরাট কার্য করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা।”

মিঃ (পরে স্যার জন) কামিং বলিয়াছেন—

“বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড বাংলার একটি শক্তিশালী নব্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি. এস-সি. এফ. সি. ১৫ বৎসর পূর্বে অপার সার্কুলার রোডের একটি গৃহে ব্যক্তিগত ব্যবসায়রূপে ইহা আরম্ভ করেন এবং দেশীয় উপাদান হইতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে থাকেন। ছয় বৎসর পূর্বে দুই লক্ষ টাকা মূলধনসহ লিমিটেড কোম্পানিতে ইহা পরিণত হয়। কলিকাতার বহু বড় বড় রাসায়নিক ইহার অংশীদার। বর্তমানে ৯০, মানিকতলা মেন রোডে এই কোম্পানির সুপরিচালিত বৃহৎ কারখানা আছে। সেখানে প্রায় ৭০ জন শ্রমিক কার্য করে। ম্যানেজার শ্রীযুত রাজশেখর বসু, রসায়নশাস্ত্রে এম. এ.। লেবরেটরীর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যাহার জন্য ধাতু ও কাঠের শিল্পকার্যে অভিজ্ঞ লোকের দরকার তাহাও এখানে নির্মিত হইতেছে। অধুনা গন্ধদ্রব্যও প্রস্তুত করা হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠান যে কার্যশক্তি ও ব্যবসাবুদ্ধির পরিচয় দিতেছে, তাহা এই এদেশের ধনী ব্যবসায়ীদের পক্ষে অনুকরণযোগ্য।” (Review of the Industrial Position and Prospects in Bengal in 1908, pp. 30-31). এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু ও পরলোকগত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী এই সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে পাণিহাটিতে যে নূতন আর একটি শাখা-কারখানা হইয়াছে, তাহা ৬০ একর জমি লইয়া। এখানে যে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতের যন্ত্র এবং “গ্লোভার্স ও গে-লুসাক্‌স টাওয়ার” নির্মিত হইয়াছে, তাহা ভারতে একটি বৃহৎ অ্যাসিড কারখানা বলিয়া গণ্য। এই কোম্পানিতে বর্তমানে দুই হাজার শ্রমিক কার্য করে এবং ইহার মোট সম্পত্তির মূল্য প্রায় অর্ধ কোটি টাকা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নূতন কেমিক্যাল লেবরেটরী—মার্কিউরাস নাইট্রাইট—হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস

পুরাতন একতলা গৃহে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগ অবস্থিত ছিল। কিন্তু এখন কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, ঐ গৃহে আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। এফ. এ. পরীক্ষায় রসায়ন বিদ্যায় ব্যবহারিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না বটে; কিন্তু বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় রসায়নশাস্ত্রে ছাত্রের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছিল। লেবরেটরীতে অনিষ্টকর গ্যাস নিষ্কাষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না,—বায়ু চলাচলেরও ভাল ব্যবস্থা ছিল না। বস্তুতঃ যদিও ব্যবহারিক ক্লাস পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল, তথাপি গৃহের বায়ু, বিশেষতঃ বর্ষাকালে, ধূম ও গ্যাসে আচ্ছন্ন হইয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর হইয়া উঠিত।

একদিন আমি প্রিন্সিপ্যাল টনীকে লেবরেটরীতে ডাকিয়া আনিলাম এবং চারিদিকে ঘুরিয়া গৃহের বায়ুতে কয়েক মিনিট নিঃশ্বাস লইতে অনুরোধ করিলাম। টনীর ফুসফুস স্বভাবতঃই একটু দুর্বল ছিল। তিনি দুই মিনিট লেবরেটরীতে থাকিয়া উত্তেজিতভাবে বাহির হইয়া গেলেন এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরকে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া একখানি কড়া চিঠি লিখিলেন। তিনি ইহাও লিখিলেন যে, শহরের হেল্‌থ অফিসার যদি একথা জানিতে পারেন, তবে কলেজের কর্তৃপক্ষকে ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিপন্ন করিবার অপরাধে অভিযুক্ত করিলেও অন্যায় কিছু করিবেন না।

পেড্‌লার সাহেবও বুঝিতে পারিলেন যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ একটি নূতন লেবরেটরী নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি ক্রফ্‌টকে সব কথা বুঝাইয়া স্বমতে আনয়ন করিলেন এবং বাংলা গবর্নমেণ্টের নিকটও নূতন লেবরেটরীর জন্য লিখিলেন। ১৮৯২ সালের জানুআরি মাসে একদিন ক্রফ্‌ট ও স্যার চার্লস ইলিয়ট রসায়ন বিভাগ দেখিতে আসিলেন এবং নূতন লেবরেটরী সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিলেন। আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিলাম যে গবর্নমেণ্ট নূতন লেবরেটরীর প্ল্যান মঞ্জুর করিয়াছেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গবেষণাগারের একখানি বর্ণনাপত্র আমার নিকট ছিল, তাহাতে ঐ সম্পর্কে বহু নক্‌শা ও চিত্রাদি ছিল। আমাদের নূতন গবেষণাগারের প্ল্যানে উহা হইতে কোন কোন জিনিস গ্রহণ করা হইয়াছিল। পেড্‌লার জার্মানির কয়েকটি লেবরেটরীর প্ল্যানও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী বর্তমান গবেষণাগারের প্ল্যান তৈয়ারির কাজে পেড্‌লারকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৯৪ সালে আমরা নূতন বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করিলাম। শীঘ্রই ভারতের

বিভিন্ন স্থান হইতে এই নূতন বিজ্ঞানাগার দেখিবার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আসিতে লাগিলেন এবং এই ১৮৯৪ সাল হইতেই আমার রাসায়নিক গবেষণাকার্যে নূতন শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। আমি কতকগুলি দুর্লভ ভারতীয় ধাতু বিশ্লেষণ করিতেছিলাম, আশা ছিল যে যদি দুই একটি নূতন পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি। মিঃ (এখন স্যার) টমাস হল্যান্ড "জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া" বিভাগের একজন সহকর্মী এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূতত্ত্বের লেকচারার ছিলেন। তিনি অনুগ্রহপূর্বক কতকগুলি ধাতুর নমুনা আমাকে দিতে চাহিলেন। আমি এই বিষয়ে নূতন গবেষণা আরম্ভ করিলাম। Crookes' Select Methods in Chemical Analysis সেই সময়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল এবং তাহারই অনুসরণ করিয়া আমি গবেষণা করিতে লাগিলাম। আমি গবেষণা কার্যে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় আমার রাসায়নিক জীবনে এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটিল।

মার্কিউরাস্ নাইট্রাইটের আবিষ্কার দ্বারা আমার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল। যেরূপ অবস্থায় এই অবিষ্কার হইল, তাহা এ বিষয়ে প্রকাশিত প্রথম বিবৃতির ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"সম্প্রতি পারদের উপর অ্যাসিডের ক্রিয়ার দ্বারা মার্কিউরাস্ [illegible] প্রস্তুত করিতে গিয়া, আমি নিচে এক প্রকার পীতবর্ণের দানা পড়িতে দেখিয়া কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মিত হইলাম। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা কোন 'বেসিক সল্ট' বলিয়া মনে হইল। কিন্তু এরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ শ্রেণীর 'সল্টের' উৎপত্তি সাধারণ অভিজ্ঞতার বিপরীত। যাহা হউক, প্রাথমিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা মার্কিউরাস্ সল্ট এবং নাইট্রাইট উভয়ই প্রমাণিত হইল। সুতরাং এই নূতন মিশ্র পদার্থ গবেষণার যোগ্য বিষয় মনে হইতেছে।"

মার্কিউরাস্ নাইট্রাইট ও তাহার আনুষঙ্গিক বহুসংখ্যক পদার্থ এবং সাধারণ ভাবে মার্কিউরাস্ নাইট্রাইট সম্বন্ধে গবেষণার প্রকৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন এখানে নাই, কেন না তৎসম্বন্ধে শতাধিক নিবন্ধ রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। একটির পর একটি নূতন মিশ্র পদার্থ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, আর আমি অসীম উৎসাহে তাহা লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। নব্য রসায়নী বিদ্যার অন্যতম প্রবর্তক অমরকীর্তি শীলের ভাষায় আমিও বলিতে পারিতাম—"গবেষণা হইতে যে আনন্দ হয়, তাহার তুলনা নাই, ইহা হৃদয়কে উৎফুল্ল করে।" এই নবোন্মুক্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিচরণ করা এবং তাহার অজ্ঞাত স্থানসমূহ আবিষ্কার করা, ইহাতে প্রতি মুহূর্তেই মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইত। শিকারীরা জানেন যে শিকারকে হাতের মধ্যে পাওয়ার চেয়ে শিকারের অনুসরণ করাতেই অধিক আনন্দ। রস্কো, ডাইভার্স, বার্থেলো, ভিক্টর মেয়ার, ফলহার্ড এবং অন্যান্য বিখ্যাত রাসায়নিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্বর্ধনাজ্ঞাপক পত্রাবলী আমার মনে যে কেবল উৎসাহের সঞ্চার করিল তাহা নহে, আমার কর্মেও অধিকতর প্রেরণা দান করিল।

এই সময়ে অধ্যয়ন ও লেবরেটরীতে গবেষণা—এই দুইভাগে আমি আমার

সময়কে বণ্টন করিয়া লইলাম। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের জন্যও কতকটা সময় নির্দিষ্ট থাকিল। অনিদ্রা রোগের জন্য, আমাকে অধ্যয়ন-স্পৃহা সংযত করিতে হইত। গত ৪৫ বৎসরের মধ্যে সন্ধ্যার পর আলোতে আমি কোন পড়াশুনা বা মানসিক পরিশ্রমের কার্য করিতে পারি নাই। এইরূপ কোন চেষ্টা করিলেই তাহার ফলে আমাকে অনিদ্রায় কাটাইতে হইত। "সকাল সকাল শয়ন করা ও সকাল সকাল ওঠা" এই নিয়ম আমি চিরদিন পালন করিয়াছি এবং আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখিয়াছি যে, সকালবেলা একঘণ্টা অধ্যয়ন সন্ধ্যার পর বা রাত্রিকালে দুইঘণ্টা বা ততোধিক সময় অধ্যয়নের তুল্য; বিশেষতঃ যাহাকে দিনের অধিকাংশ সময় রুদ্ধ-বায়ু লেবরেটরীতে কাটাইতে হয়, স্বাস্থ্যরক্ষার্থ তাহার পক্ষে প্রত্যহ অন্ততঃ দুইঘণ্টাকাল খোলাবাতাসে থাকা উচিত। শীতপ্রধান দেশে অবস্থা বিশেষে এই নিয়মের অবশ্য পরিবর্তন করিতে হইবে। এডিনবরা বা লণ্ডনে শীতকালে সন্ধ্যার সময় দুই ঘণ্টাকাল লঘু সাহিত্য পাঠ করা আমার পক্ষে কিছুই ক্ষতিকর হইত না।

এই সময়ে আমি আমার প্রিয় বিষয় রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস এবং প্রসিদ্ধ রসায়নাচার্যদের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। কপের "ইতিহাস" দুরূহ গ্রন্থ, ইহার কঠিন সমাসযুক্ত লম্বা লম্বা পদগুলি পাঠ করা সুখকর নহে, কিন্তু বিষয়টি এমনই চিত্তাকর্ষক যে আমি ঐ গ্রন্থ নিয়মিত ভাবে পড়িতাম। আমি আমার মূল্যবান সকালবেলা এই গ্রন্থ পাঠে ব্যয় করিতাম। আমি বেশ জানিতাম, আমাদের কবিরাজগণ বহু ধাতব ঔষধ ব্যবহার করিতেন; উদয়চাঁদ দত্তের Materia Medica of the Hindus নামক গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে। এই গ্রন্থে যে সমস্ত মূল সংস্কৃত গ্রন্থের নাম করা হইয়াছে, আমি কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তাহার কয়েকখানি পড়িলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত Berthelot's L'Alchimistes Grecs নামক গ্রন্থও পড়িলাম। তাহাতে আমার কৌতূহল আরও বর্ধিত হইল। এই সময়ে উক্ত প্রসিদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক বার্থেলোর সঙ্গেই আমার পত্র ব্যবহার হইল। আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, তিনি বোধ হয় জানেন না যে, প্রাচীন ভারতবর্ষেও 'আলকেমী' শাস্ত্রের বিশেষ চর্চা হইত এবং এ বিষয়ে সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ আছে। তিনি আমাকে যে উত্তর দেন, তাহা তাঁহারই যোগ্য। আমি নিম্নে ঐ পত্রের অংশবিশেষের ইংরাজী অনুবাদ দিলাম।* বড়ই দুঃখের বিষয় এই সময়ে বহু প্রসিদ্ধ রসায়নবিদের নিকট হইতে আমি যে সব পত্র পাইয়াছিলাম, তাহা রক্ষা করি নাই। বার্থেলোর পত্রখানি ঘটনাক্রমে নষ্ট হয় নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার বিশ্রামগৃহে জঞ্জালাধারে কতকগুলি কাগজ আমার চোখে পড়ে। উহারই মধ্যে বার্থেলোর পত্র ছিল।

এই পত্র আমার মনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিল। এই একজন শীর্ষস্থানীয় রসায়নবিৎ জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, অথচ যৌবনের

---

* "আপনার গবেষণার চিত্তাকর্ষক ফলাফলের সংবাদে পুলকিত হইলাম। ইউরোপ এবং আমেরিকার ন্যায় এসিয়া খণ্ডেও যে বিজ্ঞানের সার্বভৌম এবং নৈর্ব্যক্তিক রূপের সমাদর ও চর্চা চলিয়াছে তাহা জানিয়া আনন্দ হইল"—

উৎসাহে রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহান্বিত, আর আমি যুবক হইয়াও যথোচিত উৎসাহ সহকারে কাজে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না! আমার শরীরে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল এবং কার্যে নূতন উৎসাহ আসিল।

বার্থেলোর অনুরোধে আমি 'রসেন্দ্রসারসংগ্রহের' ভূমিকার উপর নির্ভর করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিলাম এবং তাঁহার নিকট উহা পাঠাইয়া দিলাম। আরও বেশী আলোচনার ফলে আমি দেখিতে পাইলাম যে হিন্দু রসায়ন শিক্ষার্থীদের পক্ষে 'রসেন্দ্রসারসংগ্রহ' খুব বেশী মূল্যবান নহে। বার্থেলো আমার প্রবন্ধ অভিনিবেশ সহকারে পড়িলেন এবং তাহা অবলম্বন করিয়া Journal des Savants পত্রে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিলেন। তিনি ঐ মুদ্রিত প্রবন্ধের এক কপি এবং সিরিয়া, আরব ও মধ্য যুগের রসায়ন সম্বন্ধে তিন খণ্ডে সমাপ্ত তাঁহার বিরাট গ্রন্থও একখানি পাঠাইলেন। আমি সাগ্রহে ঐ গ্রন্থ পড়িলাম এবং সংকল্প করিলাম যে ঐ আদর্শে হিন্দু রসায়নের ইতিহাস আমাকে লিখিতেই হইবে। আরও একটি কারণে আমার মনে উৎসাহ বর্ধিত হইল। একদিন সন্ধ্যাকালে এসিয়াটিক সোসাইটির সভায় যোগ দিয়াছিলাম। সভাগৃহে টেবিলের উপর একখানি Journal des Savants দেখিতে পাইলাম এবং তাহাতে বার্থেলোর লিখিত একটি প্রবন্ধের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

পড়িয়া রোমাঞ্চিতকলেবর হইলাম। আমি একজন রসায়নশাস্ত্রের নবীন অধ্যাপক। সহকারী অধ্যাপক বলিলেই ঠিক হয়। আমার কোন খ্যাতিও নাই। অপর পক্ষে বার্থেলো একজন শীর্ষস্থানীয় রাসায়নিক এবং রসায়ন শাস্ত্রের বিখ্যাত ইতিহাসকার। অথচ তিনি আমাকে Savant বা মনীষী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। আমার মনে এই ধারণা হইল যে কোন উচ্চতর সৃষ্টি কার্যের জন্য আমার জীবন বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে।* আমার কার্যের বিপুলতার কথা ভাবিয়া আমি বিচলিত হইলাম না। রসায়ন বিষয়ে হস্তলিখিত পুঁথির সন্ধানে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। Aufrecht's Catalogus catalogorum, ভাণ্ডারকর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বার্নেলের সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ পাঠ করিলাম। ভারতবর্ষের বড় বড় লাইব্রেরি সমূহ এবং লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া আফিসের লাইব্রেরির কর্মকর্তাদের নিকটও পুঁথির খোঁজ করিলাম। পণ্ডিত নবকান্ত কবিভূষণ প্রত্যহ ৪।৫ ঘণ্টা করিয়া এই কার্যে আমাকে সাহায্য করিতেন। তাঁহাকে আমি কাশীতে সংস্কৃত পুঁথির সন্ধানে পাঠাইলাম। ভারতবর্ষে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন উই এবং অন্যান্য কীট উহার উপর কি অত্যাচার করে। বাংলার আর্দ্র আবহাওয়ায় পুঁথি বেশী দিন টিকে না। এক একখানি তন্ত্রের ৪।৫ খানি করিয়া পুঁথি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কেন না ভূমিকা অথবা

---

* ফ্রুডের কৃত কার্লাইলের জীবনচরিতে আছে যে কার্লাইলের আর্থিক অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয়, তাঁহার Sartor Resartus গ্রন্থ কোন প্রকাশকই লইতে চাহিতেছিলেন না। সেই সময়ে মহাকবি গ্যেটের একখানি পত্র পাইয়া তাঁহার মনে নূতন বল ও উৎসাহের সঞ্চার হইল।

উপসংহার পোকায় কাটিয়াছিল। ইহা ছাড়া বিভিন্ন পুঁথির মধ্যে পাঠের অনৈক্য আছে। পাঠককে ব্যাপারটা বুঝাইবার জন্য Bibliotheca Indica তে "রসার্ণব" তন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে।† হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস পুস্তকের প্রথম ভাগের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র গ্রন্থ প্রণয়নে আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবে—

"স্যার উইলিয়ম জোন্সের সময় হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় সুধী গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলে আমরা বহু তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং তাহা হইতে সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ, পাটিগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদের জ্ঞানের কিছু পরিচয় আমরা পাইয়াছি। চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়েও কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু একটি বিষয় এপর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, জটিলতার জন্যই এতাবৎ এই ক্ষেত্রে কেহ অগ্রসর হন নাই।"

হিন্দু রসায়নের ইতিহাস পাঠ করিলেই যে কেহ বুঝিতে পারিবেন, কার্যটি কিরূপ বিরাট এবং দুরূহ। কিন্তু স্বেচ্ছায় আমি এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। এবং কাজে যখন আনন্দ পাওয়া যায়, তখন তাহাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না, বরং উৎসাহ বর্ধিত হয়। আমার পক্ষে বড়ই আনন্দের বিষয়, প্রথম ভাগ বাহির হইবামাত্র ভারতে ও বিদেশে সর্বত্র এই গ্রন্থ অশেষ সমাদর লাভ করিল। ভারতীয় সংবাদপত্রের ত কথাই নাই,—ইংলিশম্যান, পাইওনিয়ার, টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতিও এই গ্রন্থের প্রশংসাপূর্ণ সুদীর্ঘ সমালোচনা করিলেন। একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল যে এই গ্রন্থ monumental labour of love অর্থাৎ হৃদয়ের প্রীতি হইতে উৎসারিত অক্লান্ত সাধনার ফল। Knowledge, Nature এবং American Chemical Journal প্রভৃতিতেও এই গ্রন্থের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। বার্থেলো স্বয়ং Journal des Savants পত্রে ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন (জানুআরি, ১৯০৩)।

১৯০৩ সালের মার্চ মাসের Knowledge পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল—"অধ্যাপক রায়ের গ্রন্থ বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে মহৎ দান এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাঠকগণ হিন্দু রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ পাঠে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন।"

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার সম্পাদিত Calcutta Journal of Medicine, (১৯০২, অক্টোবর) পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"সাময়িক পত্রের চিরাচরিত নিয়ম এই যে, যে সব গ্রন্থ সমালোচনার্থ সম্পাদকদের নিকট প্রেরিত হয়, কেবল সেই সব গ্রন্থেরই সমালোচনা করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছি। কেন না এ ক্ষেত্রে আমাদের স্বদেশ-

---

† The Rasarnavam or the Ocean of Mercury and other Metals and Minerals—Ed. by P. C. Ray and H. C. Kaviratna, published by the Asiatic Society of Bengal, 1910.

প্রেম সম্পাদকীয় মর্যাদার বাধা মানে নাই। এই শ্রেণীর গ্রন্থের সমালোচনা করা আমরা কর্তব্য মনে করি। বর্তমানকালে যে বিজ্ঞানের যথার্থ উন্নতি হইয়াছে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে সেই বিজ্ঞানের কিরূপ অবস্থা ছিল, তৎসম্বন্ধে ঐ বিজ্ঞানে পারদর্শী কোন পণ্ডিত কর্তৃক ঐতিহাসিক গবেষণা বস্তুতঃই আমাদের দেশে দুর্লভ। সুতরাং এরূপ গ্রন্থের কথা উল্লেখ না করা আমাদের পক্ষে কর্তব্যচ্যুতি হইত।

"ভারতবাসীদিগকে এই অপবাদ দেওয়া হয় যে, তাহারা অত্যুক্তিপ্রিয়। তাহাদের ঐতিহাসিক বোধ নাই। সুতরাং এই বহুবিনিন্দিত ভারতবাসীরা যে ঐতিহাসিক গবেষণা আরম্ভ করিয়াছে, বিশেষতঃ তাহাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা এ যুগের একটি বিশেষ লক্ষণ। এইরূপ সত্যানুসন্ধান ও হিসাবনিকাশ দ্বারাই জাতি নিজের অভাব, ত্রুটি, অক্ষমতা প্রভৃতি বুঝিতে পারে এবং তাহার সংস্কারের পন্থাও নির্ধারিত হয়, এবং পার্থিব সমস্ত বিষয়ে জাতির ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, উন্নতি ও অবনতির হিসাবনিকাশ ইতিহাসই করে। এই কারণে আমরা কেবল কর্তব্যবোধে নয়, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি. এস-সি. কৃত 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস, প্রথম ভাগ' গ্রন্থের উল্লেখ করিতেছি। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতেছিলেন।"

ইংরাজ রাসায়নিকেরা সাধারণতঃ রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের প্রতি উদাসীন এবং টমসনের পর আর কেহ ইংরাজী ভাষায় রসায়ন শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কোন ইতিহাস লিখেন নাই। তাঁহারা অন্য ভাষা হইতে লেডেনবার্গ বা মায়ারের গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াই সন্তুষ্ট আছেন। তবে আমার গ্রন্থের জন্য বিলাতে বরাবরই কিছু চাহিদা ছিল,—ইহাতে মনে হয়, অন্ততপক্ষে কতকগুলি লোক এই বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত। ১৯১২ সালে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আমাকে সম্মান-সূচক ডি. এস-সি. উপাধি দেওয়ার সময় ভাইস্‌চ্যান্সেলার বলেন,—

"তিনি (আচার্য রায়) গবেষণা কার্যে সুদক্ষ এবং ইংরাজী ও জার্মান বৈজ্ঞানিক পত্রসমূহে তাঁহার বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্তি 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস'। কেবল বিজ্ঞানের দিক দিয়া নয়, ভাষা-জ্ঞানের দিক দিয়াও এই গ্রন্থে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। এবং এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে যে ইহার সিদ্ধান্তগুলিতে কোন অস্পষ্টতা নাই এবং শেষ কথা বলা হইয়াছে।"

সুখের বিষয়, গ্রন্থ প্রকাশের পর হইতে এখন পর্যন্ত ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পত্রাদিতে এই গ্রন্থ প্রশংসার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হারমান সেলেঞ্জ তাঁহার Geschichte der pharmazie (1904) গ্রন্থে হিন্দু রসায়নের ইতিহাস হইতে তির্যকপাতন, ঊর্ধ্বপাতন প্রভৃতির বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতেও যে ঐ সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী ভারত-বাসীরা জানিত, এজন্য বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার বাটেক (বোহিমিয়া) ১৯০৪ সালে লিখিয়াছেন—"আমি আমার মাতৃভাষাতে আধুনিক প্রাকৃত বিজ্ঞান সমূহের ইতিহাস, ছোট ছোট বক্তৃতার আকারে সংক্ষেপে লিপিবন্ধ করিতেছি। এই সম্পর্কে আপনার গ্রন্থ 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' হইতেও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।"

সাণ্টে আরেনিয়স্ তাঁহার Chemistry in Modern Life (লিওনার্ড কৃত ইংরাজী অনুবাদ) গ্রন্থে 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' হইতে বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ধাতব, বিশেষ করিয়া পারদ সংক্রান্ত ঔষধ ব্যবহারে হিন্দুরাই পথ প্রদর্শক একথা বলিয়াছেন।

এই গ্রন্থের অধুনাতন সমালোচনা ইটালীয় ভাষায় লিখিত Archives for the History of Science-এ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার কিয়দংশের ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল ঃ—

"সমস্ত সভ্যদেশেই আজকাল বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে। যদিও ইহার ফলে অনেক সময় অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থাদি প্রণীত ও প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেও তথ্যপূর্ণ মূল্যবান গ্রন্থেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সকল দেশেই এমন কতকগুলি লোক দেখা যায়, যাহারা কেবল নকলনবিস, অথবা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা হইতে যাহারা মনে করে যে বিজ্ঞান কেবলমাত্র একটি দেশে অর্থাৎ তাহাদের নিজের দেশেই উন্নতি লাভ করিয়াছে। আবার এমন লোকও আছেন যাঁহাদের পাণ্ডিত্য এবং তথ্যানুসন্ধানে যোগ্যতা আছে, যাঁহারা বিচার বিশ্লেষণ করিতে পারেন এবং যদিও তাঁহারা নিজের দেশের কথা গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে বলেন, তাঁহাদের মন সংস্কারের বশবর্তী নহে, তাঁহারা উদার দূরদৃষ্টির অধিকারী। এই শ্রেণীর লোকের লিখিত গ্রন্থ পড়িবার ও আলোচনা করিবার যোগ্য। ভারতে রসায়নবিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে স্যার পি. সি. রায় এই সম্মানের আসনের যোগ্য। তিনি বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু রায়ের যে গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে, উহা হইতেছে 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' নামক বিরাট গ্রন্থ; ইহাতে প্রাচীনকাল হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' লিপিবন্ধ হইয়াছে।"

ভন লিপম্যান তাঁহার Entstehung und Ausbreitung der Alchemie (বার্লিন, ১৯১৯) গ্রন্থে হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস দুই খণ্ডের সারাংশ বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসের প্রথম ভাগ প্রণয়ন করিতে আমাকে এত কঠোর ও দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল যে, আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিতে আমি সময় পাই নাই। অথচ আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র ইতিমধ্যে দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। এই সময়ে রেলে ও র‍্যামজে Argon আবিষ্কার করেন এবং তাহার পরই Neon, Xenon ও Krypton আবিষ্কৃত হয়। বেকেরেল, রাদারফোর্ড ও সডী কতকগুলি কম্পাউণ্ড ও খনিজ

পদার্থের আলোক বিকিরণের ক্ষমতা সম্বন্ধে পরীক্ষা ও আলোচনা করেন এবং কুরী-দম্পতী রেডিয়ম আবিষ্কার করিয়া এই বিষয়ে গবেষণার পূর্ণতা সাধন করেন। রামজে দেখাইলেন যে, রেডিয়ম হইতে বিকিরণই গ্যাস হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় এবং পদার্থের রূপান্তরের ইহাই অকাট্য প্রমাণ। ডেওয়ার এই সময়ে বায়ুকে তরল পদার্থে পরিণত করিলেন। হাইড্রোজেনকে তরলীকৃত করা আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার। যখন একটির পর একটি এই সমস্ত যুগান্তরকারী আবিষ্কার হইতেছিল, সেই সময়ে আমি প্রাচীন হিন্দুদের রসায়নজ্ঞানের গবেষণা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। সুতরাং আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের সঙ্গে সংযোগ হারাইয়াছিলাম। এই কারণে হিন্দু রসায়নের ইতিহাসের প্রথম ভাগ শেষ করিয়া আমি পুরাতত্ত্বের গবেষণায় কিছুকাল বিরত হইলাম এবং কয়েক বৎসরের জন্য হিন্দু রসায়নের ইতিহাস দ্বিতীয়ভাগ প্রণয়ন ও প্রকাশ স্থগিত রাখিলাম। আমি এখন নব্য রসায়ন বিদ্যার সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইলাম। এখানে বলা যাইতে পারে যে, আমার গবেষণাগারের কাজ কখনও স্থগিত হয় নাই। বস্তুতঃ এই সময়ে, বৈজ্ঞানিক পত্রিকাসমূহে, বিশেষভাবে লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রে, 'নাইট্রাইট' সম্বন্ধে আমার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

গোখেল ও গান্ধীর স্মৃতি

এই স্থানে আমার জীবনকাহিনীর বর্ণনা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখিয়া জি. কে. গোখেল এবং এম. কে. গান্ধীর সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা বলিতে চাই। দুই-জনের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। আমি কেবল এই দুইজন মহৎ ব্যক্তির কথাই এখানে উল্লেখ করিতেছি। আমি যে সমস্ত মহচ্চরিত্র ভারতবাসীর সংস্পর্শে আসিয়াছি, তাঁহাদের কথা বলিতে গেলে আর একখণ্ড বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং ইঁহাদের দুইজনকে আমি গুরুর মত শ্রদ্ধা করিতাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আমি কত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, তাহাও এখানে উল্লেখ করিব না।

১৯০১ সালে বড়লাটের ব্যবস্থাপরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য গোপালকৃষ্ণ গোখেল কলিকাতায় আসেন। একদিন সকালবেলা ডাঃ নীলরতন সরকার আমার নিকটে আসিয়া বলেন যে, প্রসিদ্ধ মারাঠা রাজনীতিক গোখেল কলিকাতায় আসিতেছেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাওড়া স্টেশনে যাইতে হইবে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই গোখেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইল। গোখেলের সঙ্গে তাঁহার অবৈতনিক প্রাইভেট সেক্রেটারী জি. কে. দেওধর ছিলেন। ইনি এখন সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি বা ভারত সেবক সমিতির অধ্যক্ষ। আমাদের দুইজনের প্রকৃতির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। এই কারণে আমরা দুইজন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতে পারিতাম।

তথ্য এবং সংখ্যাসংগ্রহ বিদ্যায় গোখেল অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিলেই হয়, এবং পর পর কয়েক বৎসর ভারত গবর্নমেণ্টের বার্ষিক বাজেট সমালোচনা করিয়া তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দাম্ভিক লর্ড কার্জন পর্যন্ত তাঁহার অকাট্য যুক্তিপূর্ণ তীক্ষ্ম সমালোচনাকে ভয় করিতেন এবং তাঁহার সম্মুখে বিচলিত হইতেন। কিন্তু গোখেলকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার জন্য লর্ড কার্জন মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। লর্ড কার্জন স্বহস্তে গোখেলকে একখানি পত্র লিখেন, গোখেল আমাকে উহা দেখাইয়াছিলেন। পত্রের উপসংহারে গোখেলের প্রতি নিম্নলিখিতরূপ উচ্চ প্রশংসাপত্র ছিল—"আপনার ন্যায় আরও বেশী লোকের ভারতের প্রয়োজন আছে।" ১৯১৫ সালে গোখেলের অকালমৃত্যু হয়। বড়লাটের ব্যবস্থাপরিষদে এ পর্যন্ত তাঁহার স্থান কেহ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। গোখেলের বক্তৃতা সুযুক্তিপূর্ণ, ধীর এবং সংযত হইত। সেই জন্য উচ্চ রাজকর্মচারীদেরও

তিনি প্রিয় ছিলেন। বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে তিনি ভালবাসিতেন এবং এখানে তাঁহার বহু বন্ধু ছিল। ১৯০৭ সালে বাঙালীদিগকে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া তিনি ব্যবস্থাপরিষদে যে বক্তৃতা দেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

৯১ নং অপার সার্কুলার রোডে আমার বাসস্থানে গোখেল মাঝে মাঝে আসিতেন। এই বাড়ীতেই তখন বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের আফিস ও কারখানা ছিল। আমাকে তিনি "বৈজ্ঞানিক সন্ন্যাসী" বলিতে আনন্দবোধ করিতেন। তখনকার দিনে কলেজের গবেষণাগার এবং আমার নিজের শয়নঘর ও পাঠগৃহ—ইহাই আমার কার্যক্ষেত্র ছিল।

"সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির" অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা এবং পুণা ফার্গুসান কলেজের অধ্যাপকদের ন্যায় তিনিও স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মাসিক মাত্র ৭৫৲ টাকা বেতন লইয়া ফার্গুসান কলেজে কাজ করিতেন। তিনি নিজেকে দাদাভাই নৌরজীর 'মানসিক পৌত্র' বলিয়া অভিহিত করিতেন। দাদাভাই নৌরজীই ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন। দাদাভাই নৌরজীর পর মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়েও ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনায় আত্মনিয়োগ কবেন। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়েকে দাদাভাই নৌরজীর শিষ্যরূপে গণ্য করা যায় এবং গোখেল ছিলেন এই রাণাড়ের শিষ্য—সুতরাং এই দিক দিয়া গোখেল নৌরজীর 'মানসিক পৌত্র' ছিলেন বলা যায় এবং ইহা তিনি সগর্বে বলিতেন।

গোখেল আমার কয়েক বৎসরের ছোট ছিলেন এবং প্রাচ্যরীতি অনুসারে আমি কনিষ্ঠের মতই তাঁহাকে সস্নেহ ব্যবহার করিতাম। একদিন আমি এক টুকরা কাগজে পেন্সিল দিয়া কবি বায়রনের অনুকরণে লিখিলাম—"রাজনীতি ভূপেনের জীবনের একাংশ মাত্র, কিন্তু গোখেলের জীবনের সর্বস্ব।" প্রকৃতপক্ষে গোখেলের জীবনকালে এবং তাহার বহু পরে পর্যন্ত, ফিরোজ শা মেহতা, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী, মনমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি আমাদের রাজনৈতিক নেতারা আইন ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন। রাজনীতি তখন কতকটা বিলাসের মত ছিল। এমন কি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অধ্যাপক ও সাংবাদিকের কাজ করিতেন। জাতীয় কংগ্রেসকে তখন লোকে বড়দিনের সময়কার 'তিনদিনের তামাসা' বলিত।

গোখেলই প্রথম রাজনীতিক যিনি তাঁহার জীবনের শেষভাগে সমস্ত সময় ও শক্তি রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, তিনি অর্থনীতি, রাজনৈতিক ইতিহাস, স্ট্যাটিস্টিকস (সংখ্যা সংগ্রহ) প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্বাচিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন—যাহাতে 'ভারত সেবক সমিতির' ভবিষ্যৎ সদস্যেরা ঐ সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে। একবার তিনি শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে আমার নিকট লইয়া আসেন এবং তাঁহাকে একজন দরিদ্র স্কুল মাস্টার বলিয়া আমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। সেই সময় আমার কানে কানে তিনি বলেন—শাস্ত্রীকে তিনি তাঁহার কার্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে

করেন। বলা বাহুল্য, গোখেলের এই দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে। এই দুইজন বিখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিক—যাঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে সর্বত্র শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন—তাঁহারা জীবনের প্রথম ভাগে আমারই মত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন—একথা ভাবিতে আমার আনন্দ হয়।

১৯১২ সালের ১লা মে আমি তৃতীয়বার বোম্বাই হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করি। ঘটনাচক্রে গোখেল জাহাজে আমার সহযাত্রী ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গ আমার পক্ষে আনন্দদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। একটি ঘটনা আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। একজন ইংরাজ বণিক যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন। প্রাচ্যদেশে তাঁহার ব্যবসা ছিল এবং স্বদেশে ফিরিতেছিলেন। একদিন সকালবেলা, ভারত গবর্নমেণ্ট শিক্ষার জন্য কত টাকা ব্যয় করেন সেই কথা উঠিল। ইংরাজ বণিকটি কিঞ্চিৎ উদ্ধতভাবে বলিলেন—"আমরা কি শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছি না?" গোখেল উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"মহাশয়, 'আমরা' এই শব্দ দ্বারা আপনি কি বলিতে চাহেন? ইংলণ্ড চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে এবং কৃপাপূর্বক সেই অর্থ ভারতের শিক্ষার জন্য দানখয়রাত করে—ইহাই কি বুঝিতে হইবে? আপনি কি জানেন না যে, ঐরূপ কিছু করা দূরে থাকুক, ইংলণ্ড ভারতের রাজস্বের নানা ভাবে অপব্যয় করে এবং সামান্য কিছু অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে?" গোখেল ধীর গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিছুতেই উত্তেজিত হইতেন না। এই একবার মাত্র আমি তাঁহাকে ধৈর্যচ্যুত হইতে দেখিয়াছি। প্রাতর্ভোজনের টেবিলে ইহার ফলে জাদুমন্ত্রের কাজ হইল। সকলেই নীরব হইলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে ডেকে গেলে কয়েকজন ভদ্রলোক আমার নিকট ইংরাজ বণিকটির ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, ইংরাজ বণিকটি যদি জানিতেন যে কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই এমন সরফরাজি করিতেন না।

১৯০১ সালের শেষ ভাগে গোখেলের অতিথিরূপে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি কলিকাতায় আসেন—ইনিই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বলা বাহুল্য, প্রথম হইতেই তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমাদের দুইজনের প্রকৃতির মধ্যে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল—ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা। এই কারণেও তাঁহার প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহার পর বহু বৎসর অতীত হইয়াছে এবং মহাত্মাজীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও তাঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাও সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত হইয়াছে।

মহাত্মাজী তাঁহার আত্মজীবনীতে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ দিয়াছেন, সুতরাং তাহা আর এখানে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ২৫ বৎসর পরেও আমাদের কথাবার্তা সমস্তই তাঁহার স্মরণ আছে। একটি প্রয়োজনীয় বিষয়, তাঁহার মনে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশার মর্মস্পর্শী কাহিনী তাঁহার মুখেই আমি প্রথম শুনি। আমি ভাবিলাম এবং গোখেলও আমার সঙ্গে একমত হইলেন যে, যদি কলিকাতায় একটি সভা আহ্বান করা যায় এবং শ্রীযুত গান্ধী সে সভার প্রধান বক্তা হন, তাহা হইলে

উপনিবেশ-প্রবাসী ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশার কথা আমাদের দেশবাসী ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যে, প্রধানতঃ আমার উদ্যোগে অ্যালবার্ট হলে একটি জনসভা আহূত হইল এবং 'ইণ্ডিয়ান মিররের' প্রধান সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন তাহার সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। "ইংলিশম্যান" সংবাদপত্রও গান্ধীর পক্ষ উৎসাহের সহিত সমর্থন করিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিলেন।' ২০শে জানুআরি, ১৯০২, সোমবারের 'ইংলিশম্যান' হইতে—ঐ সভার একটি বিবরণ উদ্ধৃত হইল :—

দক্ষিণ আফ্রিকা সমস্যায় মিঃ এম. কে. গান্ধী

"গতকল্য সন্ধ্যাকালে অ্যালবার্ট হলে মিঃ এম. কে. গান্ধী তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। সভায় বহু জন-সমাগম হইয়াছিল। মিঃ নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাজা প্যারীমোহন মুখার্জি, মাননীয় প্রোঃ গোখেল, মিঃ পি. সি. রায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, জে. ঘোষাল, অধ্যাপক কাথাভাতে প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিঃ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে বর্ণনা করিয়া সেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, নেটালে ইমিগ্রেশন রেস্ট্রিকশান অ্যাক্ট, লাইসেন্স সম্বন্ধীয় আইন এবং ভারতীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারই প্রধান সমস্যা। ট্রান্সভালে ভারতীয়েরা কোন ভূসম্পত্তির মালিক হইতে পারে না এবং দুই একটি বিশেষ স্থান ব্যতীত কোথাও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারে না। তাহারা ফুটপাথ দিয়া হাঁটিতে পর্যন্ত পারে না। অরেঞ্জ নদী উপনিবেশে, ভারতীয়েরা মজুর ব্যতীত অন্য কোন ভাবে প্রবেশ করিতে পারে না, সেজন্যও বিশেষ অনুমতি লইতে হয়। বক্তা বলেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া যে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা নহে, বুঝিবার ভুলের দরুনই এরূপ হইয়াছে। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ভারতীয়দের অভাবে দুই জাতির মধ্যে এই বুঝিবার ভুল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত অভিযোগ দূর করার জন্য তাঁহারা (ভারতীয়েরা) দুইটি নীতি অনুসারে কার্য করিতেছেন, প্রথমতঃ সকল অবস্থাতেই সত্যকে অনুসরণ করা, দ্বিতীয়তঃ প্রেমের দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা। বক্তা শ্রোতাগণকে এই উক্তি কেবলমাত্র কথার কথা বলিয়া গণ্য না করিতে অনুরোধ করেন। এই নীতি কার্যকরী করিবার জন্য তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় 'নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' নামে একটি সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। এই সঙ্ঘ তাহার কার্য-দ্বারা নিজের শক্তি প্রমাণ করিয়াছে এবং গবর্নমেণ্টও ইহাকে অপরিহার্য মনে করেন। গবর্নমেন্ট কয়েকবার এই সঙ্ঘের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। দুঃস্থ ও অনাহার-ক্লিষ্টদের জন্য এই সঙ্ঘ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। বক্তা এই বলিয়া উপসংহার করেন যে, সভার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র দুই জাতির সৎবৃত্তিগুলিরই সাধারণের সম্মুখে আলোচনা করা। নিকৃষ্ট বৃত্তিও আছে, কিন্তু সৎবৃত্তির আলোচনা করাই শ্রেয়ঃ। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স' দল এই ভাবের উপরেই গঠিত হইয়াছে। যদি

তাহারা ব্রিটিশ প্রজার অধিকার দাবি করে, তবে তাহার দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হইবে। এই অ্যাম্বুলেন্স দলে ভারতীয় শ্রমিকরা অবৈতনিক ভাবে কাজ করিয়া থাকে এবং জেনারেল বুলার তাঁহার 'ডেস্‌প্যাচে' ইহার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

"রাজা প্যারীমোহন মুখার্জি বক্তাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করেন এবং মাননীয় অধ্যাপক গোখেল তাহা সমর্থন করেন। মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং মাননীয় অধ্যাপক গোখেলও সভায় বক্তৃতা করেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার পর সভাভঙ্গ হয়।"

এইরূপে কলিকাতার জনসভায় গান্ধীজীর প্রথম আবির্ভাবের জন্য আমিই বস্তুতঃ উদ্যোক্তা। উপরোক্ত বিবৃতি হইতে দেখা যাইবে যে, যে সত্যাগ্রহ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পরবর্তীকালে জগতে একটি প্রধান শক্তিরূপে গণ্য হইয়াছে, এই শতাব্দীর প্রথমেই তাহার উন্মেষ হইয়াছিল।

গান্ধীজীর সঙ্গে এই সময়ে আমার প্রায়ই কথাবার্তা হইত এবং তাহা আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে। গান্ধীজী তখন ব্যারিস্টারিতে মাসে কয়েক সহস্র মুদ্রা উপার্জন করিতেন। কিন্তু বিষয়ের উপর তাঁহার কোন লোভ ছিল না। তিনি বলিতেন—"রেলে ভ্রমণ করিবার সময় আমি সর্বদা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চড়ি, উদ্দেশ্য—যাহাতে আমার দেশের সাধারণ লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানিতে পারি।"

এই ত্রিশ বৎসর পরেও কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছে। যে সত্য কেবলমাত্র বাক্যে নিবদ্ধ, তদপেক্ষা যে সত্য জীবনে পালিত হয় তাহা ঢের বেশী শক্তিশালী।

দশম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয়বার ইউরোপ যাত্রা—বঙ্গভঙ্গ—বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ

আমি এখন ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করিব স্থির করিলাম। আমার উদ্দেশ্য, সেখানে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি গবেষণাগার দেখিব এবং আধুনিক গবেষণা প্রণালীর সংস্পর্শে আসিয়া নূতন অনুপ্রেরণা লাভ করিব। প্রভাবশালী মনীষী ও আচার্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে না মিশিলে এরূপ অনুপ্রেরণা লাভ করা অসম্ভব। একটা সরকারী সার্কুলার ছিল যে, বৈজ্ঞানিক বিভাগের কোন ইউরোপীয় কর্মচারী ছুটি লইয়া বিলাত গেলে, এই শর্তে তাঁহাকে রাহাখরচ ভাতা ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে যে, তিনি ছুটির কিয়দংশ গবেষণাকার্যে নিয়োগ করিবেন। আমার সহকর্মী জে. সি. বসু, (আচার্য জগদীশ-চন্দ্র) ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের লোক ছিলেন বলিয়া, কিন্তু প্রধানত "হার্জিয়ান ওয়েভ্‌স্" (বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়)-এর গবেষণাক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, এই সুবিধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আমার পক্ষে এই নিয়মের সুযোগ লাভে কিছু বাধা ছিল, কেন না আমি 'প্রভিন্‌সিয়াল সার্ভিসের' লোক ছিলাম। তথাপি আমি শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের (পেড্‌লার) নিকট আমার ইউরোপীয় গবেষণাগার সমূহ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখি। কয়েকমাস চলিয়া গেল, কোনই উত্তর পাইলাম না। একদিন কার্জন, কিচনার প্রভৃতির স্বাক্ষরযুক্ত সপরিষৎ গবর্নর জেনারেলের একটি মন্তব্যলিপি পাইয়া আমি সত্যই বিস্মিত হইলাম। মন্তব্যলিপির সারমর্ম এই যে, কোন ভারতবাসী যদি মৌলিক গবেষণা-কার্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে, তবে কেবলমাত্র প্রভিন্‌সিয়াল সার্ভিসের লোক বলিয়াই তাহার পক্ষে Study Leave বা অধ্যয়ন গবেষণা প্রভৃতির জন্য সুবিধাজনক শর্তে ছুটি পাওয়ার বাধা হইবে না। আমি এখন ইউরোপ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু যাত্রার পূর্বে আমি পেড্‌লারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমার ইউরোপ যাত্রায় তিনি যে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। কথাবার্তা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার দেরাজ হইতে, আমার জন্য তিনি যে 'নোট' বা মন্তব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা বাহির করিলেন। ঐ মন্তব্য পড়িতে পড়িতে আমি একটু বিব্রত বোধ করিলাম। কেন না পেড্‌লার উহাতে আমার খুব উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমার রাসায়নিক গবেষণা এবং হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসের কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন।

১৯০৪ সালে অগস্ট মাসের মধ্যভাগে আমি কলিকাতা হইতে লণ্ডন যাত্রা করিলাম—প্রথম বিলাত যাত্রার ঠিক বাইশ বৎসর পরে। আমার সঙ্গে কয়েকজন ইংরাজ সহযাত্রী ছিলেন। তাঁহারা কলম্বোতে নামিলেন। তখন-মনসুনের পূর্ণাবস্থা।

আরব সমুদ্রে ১১।১২ দিন ধরিয়া আমাকে বড়ই বেগ পাইতে হইল। ঐ সময়ের কথা আমার বেশ মনে আছে। অসুস্থ হইয়া পড়াতে বাধ্য হইয়া অধিকাংশ সময়ই উপরের সেলুনে আমাকে শুইয়া থাকিতে হইত। এই অবস্থায় জাহাজের স্টুয়ার্ড আমাকে খাওয়াইত। তখন জাহাজে আমিই একমাত্র যাত্রী ছিলাম, সুতরাং সমগ্র সেলুনটা আমার দখলে ছিল। পোর্ট সৈয়দ এবং মাল্টাতে কয়েকজন যাত্রী উঠিলেন। তার মধ্যে একজন খুব রসিক লোক ছিলেন। ফুটবল খেলার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, উহাতে দুই পক্ষের বাইশজন খেলোয়াড়েরই কোন শারীরিক ব্যায়ামের সুযোগ হয়। কিন্তু যে হাজার হাজার লোক খেলা দেখে তাহাদের কি?(১)

এই জাহাজযাত্রা আমার পক্ষে বড় ক্লান্তিজনক হইল। আমি উদরাময়ে ভুগিতে লাগিলাম, তৎপূর্বে প্রায় পনর দিন যাবৎ আমি ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করিতেছিলাম। আমার পাকস্থলী বড়ই দুর্বল এবং তাজা খাদ্যদ্রব্য না পাইলে উহা বিগড়াইয়া যায়। সাধারণতঃ, মাংস, মাছ এবং শাকসবজি "কোল্ড স্টোরেজে" রাখা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের গুণের কিছু হ্রাস হয় এবং বলিতে গেলে 'বাসি' হইয়া যায়। ঐ সব খাদ্য খাইলে আমার পরিপাক-শক্তির বিকৃতি ঘটে। আমি অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলাম, এ আশঙ্কাও হইল যে লণ্ডনে গিয়া আমার অবস্থা আরও খারাপ হইবে। কিন্তু লণ্ডনে পৌঁছিয়া ২৪ ঘণ্টা হোটেলে থাকিবার পরই আমি পেটের অসুখের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। তারপরেও কয়েকবার আমি ইংলণ্ডে গিয়াছি, কিন্তু প্রতিবারেই সমুদ্রবক্ষে জাহাজে আমার ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। ফলে আমাকে বাধ্য হইয়া বোম্বাই হইতে মার্সেলিস পর্যন্ত ডাকজাহাজে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, উদ্দেশ্য জাহাজে যতদূর সম্ভব কম সময় থাকা।

লণ্ডনে কয়েকদিন থাকিবার পর আমার মনে অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। শহরের নানারূপ দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইবার জন্য আমার মনে কোন আকর্ষণ ছিল না। বস্তুতঃ ছাত্রজীবনের আমি এই বিশাল লণ্ডন শহরে কয়েকমাস মাত্র কাটাইয়াছি। দৈনিক কয়েকঘণ্টা করিয়া লেবরেটরীতে কাজ করিতে যাহারা অভ্যস্ত, হাতে কাজ না থাকিলে সময় কাটানো তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং আমি কোন লেবরেটরীতে গবেষণা করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। জগদীশচন্দ্র বসু পূর্বে ডেভি-ফ্যারাডে রিসার্চ লেবরেটরীতে কাজ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন এবং স্যার জেমস্ ডেওয়ারের সাহায্যে আমিও সহজে ঐ লেবরেটরীতে কাজ করিবার সুযোগ লাভ করিলাম। আমি এখন কাজে মগ্ন হইয়া পড়িলাম। মাঝে মাঝে ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এবং ইউনিভার্সিটি কলেজের লেবরেটরীগুলি দেখিয়া আসিতাম। ডেওয়ার কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার যুগান্তকারী গ্যাস সম্বন্ধীয় গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। ঐ সময় তিনি, আর্গন, নিওন এবং জেননকে

(১) সম্প্রতি (১৯২৬) যাঁহারা এ বিষয়ে বলিবার অধিকারী এমন কোন কোন ব্যক্তিও উক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—যথা "আমরা খেলিবার পরিবর্তে খেলা দেখি"—এম. এন. জ্যাকসন, হেডমাস্টার, মিল হিল।

কিরূপে বায়ু হইতে পৃথক করা যায়, তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছিলেন। আমি তাঁহার এই সমস্ত পরীক্ষাকার্য দেখিবার সুযোগ লাভ করিলাম।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লেবরেটরীতে স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে বায়ুর উল্লিখিত উপাদানসকল পৃথকীকরণের জন্য তাঁহার ও ডাঃ ট্রাভার্স কর্তৃক পরিকল্পিত যন্ত্রের কার্য আমাকে দেখাইলেন। এইরূপে আমি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রাসায়নিকগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইলাম। ১৯০৪ সালে বড়দিনের ছুটির সময় এডিনবার্গে কাটাইলাম এবং তথায় কয়েকজন পুরাতন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলাম। ভারতীয় ছাত্রেরা কালেডোনিয়ান হোটেলে একটি সভা করিয়া আমাকে সম্বর্ধনা করিলেন। অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন ঐ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।(২) রয়েল সোসাইটি অব এডিনবার্গ আমাকে একটি ভোজসভায় আমন্ত্রণ করিলেন। স্যার জেমস্ ডেওয়ার সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন। অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন স্যার জেমসের স্বাস্থ্যকামনা করিবার সময় আমার নামও সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিলেন। স্যার জেমসের পরে উত্তর দিতে উঠিয়া আমি কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িলাম, যাহা হউক, কোনরূপে যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিলাম।

এডিনবার্গ হইতে আমার বন্ধু ও সহপাঠী জেমস ওয়াকারের লেবরেটরী দেখিবার জন্য আমি ডাণ্ডীতে গেলাম। তারপর দক্ষিণে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে লিড্‌স, ম্যানচেস্টার এবং বার্মিংহামের লেবরেটরীসমূহ দেখিলাম এবং অধ্যাপক স্মিথেল্‌স্, কোহেন, ডিক্সন, পার্কিন, ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড এবং অন্যান্য রাসায়নিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহারা সকলেই সানন্দে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া আমি প্রায় একমাস কাল গবেষণার কাজ করিলাম, তারপর ইউরোপে যাত্রা করিলাম। র‍্যামজে অনুগ্রহপূর্বক ইউরোপের বিশিষ্ট রাসায়নিকদের নিকট পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। আমি বার্লিনের নিকট চার্লোটেনবার্গে এক সপ্তাহ থাকিলাম এবং বিখ্যাত 'টেক্‌নিসে হক্‌সিউল' ও 'রাইক্‌সনস্টল্ট' দেখিলাম। এর্ডম্যান 'হক্‌সিউলে' অজৈব রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সমস্ত দেখাইলেন। ভ্যাণ্ট হফ্ এবং তাঁহার লেবরেটরীও দেখিলাম। এই বিখ্যাত ডচ রাসায়নিক তখন 'সাল্‌জবিলডাং' (salzbildung) সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলেন। স্টাস্‌ফার্টে সামুদ্রিক লবণ হইতে যে অবস্থায় পটাশিয়ম ও সোডিয়ম লবণের বিপুল স্তর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই নাম "সাল্‌জ-বিল্‌ডাং"। মেয়ার হোফারও ভ্যাণ্ট হফের সহযোগিরূপে কাজ করিতেছিলেন। ভ্যাণ্ট হফ ইংরাজী ভাল বলিতে পারিতেন, সুতরাং আমি তাঁহার সঙ্গে ইংরাজীতেই কথাবার্তা বলিতাম।(৩) রূঢ় ও অপ্রিয় প্রশ্ন হইতে পারে জানিয়াও, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে থাকিয়া গবেষণাকার্য করায়

(২) সম্প্রতি (১৯৩১ সালে) আমি জানিতে পারিয়াছি যে, ডাঃ আনসারী ঐ সভায় ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন।

(৩) আমি পরে জানিতে পারি যে, ভ্যাণ্ট হফ তাঁহার প্রথম বয়সে ইংরাজী সাহিত্য/ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। বায়রন, বার্টন এবং বাক্‌লের গ্রন্থ তাঁহার খুব প্রিয় ছিল।

একজন দিনেমারের স্বদেশপ্রেমে আঘাত লাগে কি না?(৪) তিনি উত্তর দিলেন যে, জার্মান সম্রাট তাঁহার কাজের জন্য সর্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার জন্য একটি স্বতন্ত্র লেবরেটরী দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র একঘণ্টা বক্তৃতা করিতে হয়, অবশিষ্ট সময় তিনি গবেষণাকার্যে ব্যয় করিতে পারেন। ভ্যাণ্ট হফ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার স্বদেশবাসী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে(৫) আমি চিনি কি না? নামের প্রত্যেক অক্ষর তিনি সুস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। অঘোরনাথ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে "ডক্টর" ডিগ্রী লাভ করেন। তৎপূর্ব বৎসর ভ্যাণ্ট হফ এবং লে বেল প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে অথচ একই সময়ে Asymmetric carbon- এর মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। আমার মনে হয়, অঘোরনাথ এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের "ভ্যান্স ডানলপ" বৃত্তি লাভ করেন, এবং ইউরোপে রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিবার জন্য গমন করেন। তিনি অতীব মেধাবী ছিলেন এবং তাঁহার মনে বড় বড় কাজের কল্পনা ছিল। খুব সম্ভব অঘোরনাথ ভ্যাণ্ট হফের (তৎকালে ২৩ বৎসর বয়স্ক যুবক) সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার সঙ্গে নূতন থিওরির ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, অঘোরনাথের মহৎ প্রতিভার দান হইতে ভারতবর্ষ, বলিতে গেলে বঞ্চিত হইয়াছে। অন্ততপক্ষে রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি চেষ্টা করিলে অনেক-কিছু করিতে পারিতেন।

অঘোরনাথ দেশে ফিরিয়া হায়দ্রাবাদ রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রাজনৈতিক দলাদলিতে লিপ্ত হন। ঐ সময়ে হায়দ্রাবাদ রাজ্যে সংগৃহীত মূলধন দ্বারা চান্দোয়া রেলওয়ে নির্মাণ করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং অঘোরনাথ এই জাতীয় আন্দোলনের নেতা হন। তদানীন্তন পলিটিক্যাল এজেণ্টের নিকট ইহা ভাল লাগে নাই। উক্ত এজেণ্ট মহাশয় বোধ হয় মনে করিতেন যে, কেবল ব্রিটিশ ভারত নহে, দেশীয় রাজ্যও ব্রিটিশ শোষণনীতির কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত। সুতরাং ক্রুদ্ধ রেসিডেণ্ট বাঙালী যুবক অঘোরনাথকে হায়দ্রাবাদ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন এবং তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজামের রাজ্য ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। আমার স্মরণ হয়, বাল্যকালে আমি 'হিন্দু পেট্রিয়টে' সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের লেখা একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। তাহাতে স্কুলমাস্টার 'অঘোরনাথকে রাজনীতির সংস্পর্শ ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

আমি এমিল ফিসার এবং তাঁহার লেবরেটরীও দেখিলাম। তিনি এই সময়ে তাঁহার "Purine group" সম্বন্ধে গবেষণা শেষ করিয়াছেন মাত্র। প্রোটিন হইতে উৎপন্ন—'আমিনো-অ্যাসিডস্' সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন।

---

(৪) ভ্যাণ্ট হফের জীবনীতে আছে—ভ্যাণ্ট হফের স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বার্লিন যাত্রার ফলে হল্যাণ্ডে বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল। তাঁহাকে দেশদ্রোহীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছিল। ডচ "পাঞ্চ" পর্যন্ত তাঁহাকে রেহাই দেন নাই।

(৫) প্রসিদ্ধ দেশসেবিকা এবং বিশ্ববিখ্যাত কবি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।

বার্লিন হইতে আমি বার্ন, জেনেভা এবং জুরিচে গেলাম, শেষোক্ত স্থানে আমি খুব যত্ন সহকারে 'পলিটেকনিক' বিদ্যালয় দেখিলাম। অধ্যাপক রিচার্ড লোরেঞ্জ একটি বৈদ্যুতিক বিভাগের কর্তা ছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে পূর্বেই কয়েকবার পত্র ব্যবহার করিয়াছিলাম। কেননা তিনি জার্মান জার্নাল অব ইনরগ্যানিক কেমিস্ট্রীর সম্পাদক ছিলেন, এবং আমার কয়েকটি প্রবন্ধ ঐ জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে আমি 'ফ্র্যাঙ্কফার্ট-অন-মেইন' হইয়া প্যারী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ফ্র্যাঙ্কফার্টে গাইড আমাকে মহাকবি গ্যেটের স্মৃতিজড়িত একটি গৃহ দেখাইয়াছিলেন।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীকে আমি তীর্থক্ষেত্র রূপে গণ্য করিতাম। নব্য রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস এই নগরীর সঙ্গে জড়িত। এইখানেই ল্যাভোসিয়ারের গবেষণার ফলে এমন সমস্ত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যাহাতে পুরাতন "ফ্লোজিস্টন মতবাদ" নিরাকৃত হয় এবং এই স্থানেই একে একে বহু কৃতী রাসায়নিক তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হন এবং তাঁহার মতবাদ গ্রহণ করেন। আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতার (ল্যাভোসিয়ার) নামের সঙ্গে বার্থেলো, ফোরক্রয়, গ্যয়টন ডি মর্ভোর নাম চিরদিনই উল্লিখিত হইবে।(৬) প্যারী নগরী গেলুসাক, থেনার্ড, ক্যাভেণ্টো এবং পেলেটিয়ার (কুইনিনের আবিষ্কর্তাগণ) এবং আরও অনেক বৈজ্ঞানিকের কর্মক্ষেত্র। ইহারা সকলেই রসায়ন বিজ্ঞানের প্রথম যুগে জ্ঞানরূপ আলোক-বর্তিকা হস্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্যারী সম্বন্ধে আডলফ্, ওয়ার্জের গর্বোক্তি সত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিত।(৭)

প্যারীতে পৌঁছিয়া প্রথমেই আমি মঁসিয়ে সিলভ্যাঁ লেভির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। আমার 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসে' সিলভ্যাঁ লেভিকে আমি বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং প্রামাণিক ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে তাঁহার সঙ্গে আমি পত্র ব্যবহারও করিয়াছিলাম। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে তিনি পতঞ্জলির "মহাভাষ্য" (সম্ভবতঃ গোল্ডস্টুকারের সংস্করণ) অধ্যয়নে নিমগ্ন আছেন। স্থির হইল যে পরদিন সকালে আমি "কলেজ ডি ফ্রান্সে" তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব এবং তিনি তাঁহার সহাধ্যাপক মঁসিয়ে বার্থেলোর সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিবেন। আমি নির্দিষ্ট সময়ে 'কলেজ ডি ফ্রান্সে' উপস্থিত হইলাম এবং ঘটনাক্রমে কয়েক মিনিট পরেই বার্থেলো প্রাঙ্গণের বিপরীত দিক দিয়া তাঁহার গবেষণাগারে প্রবেশ করিলেন। অধ্যাপক লেভি উক্ত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন, আমার সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। মনে হইল আমি অবশেষে সেই বিখ্যাত মনীষী এবং বিজ্ঞান-

---

(৬) যাহারা এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত রূপে জানিতে চান, তাঁহারা মৎকৃত Makers o Modern Chemistry গ্রন্থ পড়িতে পারেন।

(৭) রসায়নবিদ্যা ফরাসী বিজ্ঞান, ইহার প্রতিষ্ঠাতা অমরকীর্তি ল্যাভোসিয়ার।

আচার্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি যিনি সমস্ত জীবন পাশ্চাত্য রসায়ন বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ইতিহাসের রহস্য ভেদ করিতে ব্যয় করিয়াছেন এবং যিনি "সিনথেটিক রসায়ন শাস্ত্রের"—অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য।

বার্থেলো আমাকে তাঁহার লেবরেটরীতে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার আবিষ্কৃত কাচাধারে রক্ষিত যন্ত্রাদি সযত্নে দেখাইলেন। অর্ধশতাব্দী পূর্বে 'সিনথেটিক কমপাউন্ড' সমূহ বিশ্লেষণের জন্য তিনি এই সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার আমন্ত্রণে তাঁহার বাড়ীতে আমি গেলাম। 'একাডেমি অব সায়েন্সের' তিনি স্থায়ী সেক্রেটারী ছিলেন এবং সেই হিসাবে ইনস্টিটিউটেরই একাংশে তাঁহার বাস-স্থান নির্দিষ্ট ছিল। বার্থেলো পূর্ব হইতেই তাঁহার এক পুত্রকে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পুত্র কিছুদিন বিলাতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং ইংরাজীতে বেশ কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। সুতরাং তাঁহার সাহায্যে বার্থেলোর সঙ্গে আমি প্রায় এক ঘণ্টাকাল কথাবার্তা বলিলাম। বার্থেলো আমাকে একাডেমীর অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার জন্যও নিমন্ত্রণ করিলেন। ৭১ বৎসর বয়স্ক প্রেসিডেণ্ট প্রসিদ্ধ রাসায়নিক মঁসিয়ে ট্রুস্টের সঙ্গেও তিনি আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। 'লা নেচার' পত্রে ঐ অধিবেশনের যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল তাহাতে আমার সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল। প্যারীতে থাকিবার সময় আমি মঁসিয়ে সিলভ্যাঁ লেভির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তিনি আমাকে একটি সান্ধ্য বৈঠকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং আমার হোটেলে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কবেন। এই স্থানে মঁসিয়ে পামির কর্ডিয়ারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ইনি ফরাসী চন্দননগরে কয়েক বৎসর কাজ করেন এবং তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখেন। আমার যতদূর মনে পড়ে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহযোগে তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় আমার পরিচয় হয়।

আমি বৈজ্ঞানিক ময়সানের লেবরেটরীও দর্শন করি। সাধারণের নিকট তিনি কারবাইড অব ক্যালসিয়ম এবং কৃত্রিম হীরকের আবিষ্কর্তারূপেই অধিকতর পরিচিত। উক্ত প্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম হীরকের কণা-সমূহ আমাকে দেখাইয়াছিলেন। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, ময়সান তাঁহার অজৈব রসায়ন সম্বন্ধীয় সুবৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থে (এনসাইক্লোপিডিয়া) মৎকৃত মার্কিউরাস নাইট্রাইট বিষয়ক গবেষণার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

বার্থেলো এবং তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে আমার প্যারী-দর্শনের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল তিনি রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রধান কর্মী ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত গ্রন্থসমূহের নামের তালিকা প্রকাশ করিতেই ফরাসী "জার্নাল অব কেমিস্ট্রীর" এক সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি অক্লান্তকর্মী ছিলেন এবং জ্ঞানেও অগাধ ও সর্বতোমুখী ছিলেন। 'সিনথেটিক কেমিস্ট্রীর' তিনি একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহাকে থার্মো-কেমিস্ট্রীরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার

প্রতিদ্বন্দ্বী কোপেনহেগেনের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টমসনের সঙ্গে সমান গৌরবের অধিকারী। রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধেও তিনি একজন প্রামাণিক আচার্য এবং এই বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কৃষি-রসায়ন সম্বন্ধেও তিনি অনেক মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ফরাসী সেনেটের আজীবন সভ্য এবং দুইবার মন্ত্রিসভার সদস্যের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। সমগ্র রসায়ন জগতে আমি এমন একজন ব্যক্তিও দেখি না, যাঁহার জ্ঞানের পরিচয় এত বিপুল, প্রতিভা এমন বহুমুখী এবং মানবসভ্যতার ভাণ্ডারে যিনি এত বিচিত্র দান করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বার্থেলোর সঙ্গে রেনানের বন্ধুত্ব ফ্রান্সের মনীষার ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায়। সুতরাং ১৯০১ সালে বার্থেলোর অধ্যাপক জীবনের ৫০তম বার্ষিক স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে প্রধানতঃ তাঁহার কৃতী শিষ্য ময়সানের চেষ্টায় যে অপূর্ব অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। সমগ্র ফরাসী জাতি তাহাদের প্রেসিডেণ্টের নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিল, এবং ইউরোপীয় ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক সমিতিসমূহের প্রতিনিধিরাও উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া তাঁহার সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও জাতীয় ভাবেই হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের "নেচার" নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা এই উপলক্ষে লিখেন—"গত সোমবার মঁসিয়ে বার্থেলোর অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে যে জাতীয় অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে প্যারীতে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। এদেশে (ইংলণ্ডে) সেরূপ অনুষ্ঠান হইবার এখনও বহু বিলম্ব আছে। ফরাসী গবর্নমেণ্ট এবং জনসাধারণ তাঁহাদের একজন দেশবাসীর মহত্ত্বের পূজা বিরাট ভাবেই করিয়াছিলেন। এদেশে (ইংলণ্ডে) রাজনীতিকগণ ও জনসাধারণ প্রতিভার মহত্ত্বকে খুব কম সম্মানই করেন। বার্থেলো যদি ফ্রান্সে না জন্মিয়া ইংলণ্ডে জন্মিতেন, তবে বৈজ্ঞানিক জগৎ তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিত বটে, কিন্তু গবর্নমেণ্ট জাতীয় অনুষ্ঠানরূপে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি যোগ্য সম্মান করিতেন না। কেন না আমাদের রাজনীতিকরা জানেন না যে জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় উন্নতির উপর বৈজ্ঞানিকদের কার্যের প্রভাব কত বেশি, তাঁহাদের ধারণা এই যে, বৈজ্ঞানিকেরা বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে এক স্বতন্ত্র জগতে বাস করেন, এবং সেখানে নিজেদের কার্যাবলীই তাঁহাদের একমাত্র পুরস্কার।"—(বার্থেলো, জন্ম—১৮২৭, মৃত্যু—১৯০৭; নেচার, ২৮শে মার্চ, ১৯০৭, ৫১৪ পৃষ্ঠা)।

কলিকাতায় ফিরিয়া আমি নূতন উৎসাহের সঙ্গে কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি রসায়ন বিজ্ঞানের কয়েকজন প্রসিদ্ধ আচার্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম এবং তাঁহারা তাঁহাদের লেবরেটরীতে যে সমস্ত মূল্যবান গবেষণা করিতেছিলেন, তাহারও পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি এখন যতদূর সাধ্য তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মনে কিছু নিরাশার সঞ্চারও হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিতে আমি তরুণ বৃদ্ধ সকলকেই প্রাণবন্ত ও শক্তিমান দেখিয়াছি। তাহারা কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা কখনই অর্ধসমাপ্ত রাখে না, সেই কাজই

লাগিয়া থাকে এবং শেষ না দেখিয়া ক্ষান্ত হয় না। অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ভিন্ন প্রকার। এখানে যুবকরাও দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে কার্যে অগ্রসর হয়। প্রাথমিক যে কোন বাধা-বিপত্তিতে তাহারা হতাশ হইয়া পড়ে। তাহাদের জীবনপথ কেহ কুসুমাস্তীর্ণ করিয়া রাখে, ইহাই যেন তাহাদের ইচ্ছা। পক্ষান্তরে ইংরাজ যুবক বাধা-বিপত্তিতে আরও দৃঢ়সংকল্প হইয়া উঠিবে। তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ইহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। বাঙালীরা নিরানন্দ জাতি, জীবনকে উপভোগ করিতে জানে না। তাহারা স্বপ্নাচ্ছন্ন এবং আধাঘুমন্ত জীবন যাপন করিতে ভালবাসে। সাধারণ বাঙালীকে দেখিলে টেনিসনের 'কমলবিলাসী' (Lotus Eaters) কবিতার কথা মনে পড়ে।

বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই দৌর্বল্যের কথা ভাবিতেছিলাম—এমন সময় এমন একটা ব্যাপার ঘটিল, যাহা ভাগবত ইচ্ছা বলিয়া মনে হইল। অন্ততঃ তখনকার মত ইহা জীবন্মৃত বাঙালীর দেহে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার করিল। আমি লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের কথাই বলিতেছি।

আমার অনেক সময়েই বিশেষ করিয়া মনে হইয়াছে যে, বাংলা, আসাম ও উড়িয়া, জাতির দিক হইতে না হইলেও, ভাষার দিক হইতে এক। বাংলা, আসামী ও উড়িয়া ভাষা একই মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত। ইহা কতকটা আশ্চর্যের বিষয়। কেন না পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র এই দুই বড় বড় নদী, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনে উড়িষ্যাই তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল এবং উড়িষ্যার সম্রাট প্রতাপরুদ্র তাঁহার ধর্মমত গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং বাংলা কীর্তনের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উড়িষ্যায় জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। অপর পক্ষে যে কোন বাঙালী একটু চেষ্টা করিলেই আসামী ভাষা বুঝিতে পারে। বস্তুতঃ ভাষার দিক হইতে এই তিন প্রদেশকে একই বলা যাইতে পারে।

লর্ড কার্জন সাম্রাজ্যবাদের দূতরূপে শঙ্কিত হৃদয়ে দেখিলেন, বাংলা দেশে জাতীয় ভাব দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙালীর সাহিত্য ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহা ভারতের সমগ্র ভাষার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বাঙালীরা পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষ যত্নসহকারে চর্চা করিয়াছে এবং বাংলার সন্তানেরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। একটা জাতিগঠনের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা নীরবে ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। 'ভেদনীতি' রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের একটা প্রিয় নীতি ছিল এবং কার্জন তাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া ভারতে রোমক নীতি চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাংলা দেশের মানচিত্র সর্বদা তাঁহার চোখের সম্মুখে ছিল এবং এমন একটা ভীষণ অস্ত্র নির্মাণ করিয়া তিনি বাঙালী জাতির উপর নিক্ষেপ করিলেন, যাহার আঘাত সামলাইতে তাহাদের বহুদিন লাগিবে। ম্যাকিয়াভেলির দুষ্ট বুদ্ধি ও নিষ্ঠুর দূরদর্শিতার সঙ্গে তিনি বাংলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। এমন

ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে উত্তর-পূর্ব ভাগে মুসলমান সংখ্যাধিক্য হয়। তিনি তাঁহার মোহমুগ্ধ পরিষদবর্গের সাহায্যে মুসলমান জনসাধারণের, বিশেষভাবে তাহাদের নেতাদের সম্মুখে, নানা প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, যাহাতে তাহারা হিন্দুদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বাংলাদেশের হৃদয়ে এমন এক শাণিত অস্ত্র সন্ধান করা হইল, যাহার ফলে বাঙালী জাতির সংহতি শক্তি নষ্ট হয়, হিন্দু-মুসলমানে চির বিরোধ উপস্থিত হয় এবং বাংলার জাতীয়তা ধ্বংস হয়।

কৌশলী সাম্রাজ্যবাদী গোপনে যে অস্ত্র শানাইয়া প্রয়োগ করে, অধঃপতিত জাতি তাহার পরিণাম ফল প্রায়ই ভাবিতে ও বুঝিতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে, বাংলা দেশে তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে কয়েকজন শক্তিমান নেতা ছিলেন। দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদের প্লাবন বহিয়া গেল এবং দিন দিন উহা ক্রমেই বিরাট আকার ধারণ করিতে লাগিল। ইতিহাসে এই প্রথম বাঙালী জাতির অন্তঃস্থল মথিত ও আন্দোলিত হইয়া উঠিল। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই এই আন্দোলনে যোগদান করিল। যাহারা ঘুমাইয়াছিল, তাহারাও দীর্ঘনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল এবং কার্জন পরোক্ষভাবে বাঙালী জাতির জাগরণে সহায়তা করিলেন।

সরকারী কর্মচারী হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিবার উপায় আমার ছিল না। কিন্তু আমার গবেষণাগার হইতে আমি এই আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, এই আন্দোলন আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। এই নব জাগরণের ফলে বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান-সাধনার আদর্শ জাতির সম্মুখে উপস্থিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাংলায় জ্ঞানরাজ্যে নব জাগরণ

হিন্দুদের প্রতিভা অতীব সূক্ষ্ম এবং তাহাদের মনের গতি দার্শনিকতার দিকে। জেমস্ মিলের নিম্নলিখিত কথাগুলিতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নাই : "কোন একটি দার্শনিক সমস্যার আলোচনায় হিন্দু বালকরা আশ্চর্য বুদ্ধির খেলা দেখাইতে পারে, কিন্তু একজন ইংরাজ বালকের নিকট তাহাই দুর্বোধ্য প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়।" কিন্তু কেবলমাত্র দার্শনিক বিদ্যা দ্বারা যে হিন্দুজাতির উন্নতি হইবে না, ইহা বহু-দিন হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। এক শতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে রাজা রামমোহন রায় বড়লাট লর্ড আমহার্স্টের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহাতে তিনি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ—

"আমরা দেখিতেছি যে, গবর্নমেণ্ট হিন্দু পণ্ডিতদের শিক্ষকতায় সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। এদেশে যেরূপ শিক্ষা প্রচলিত আছে, তাহাই এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিখাইবার ব্যবস্থা হইবে। ইউরোপে লর্ড বেকনের অভ্যুদয়ের পূর্বে যেরূপ বিদ্যালয় ছিল, ইহা ঠিক সেই শ্রেণীর এবং ইহাতে যে ব্যাকরণের কূটতর্ক এবং দার্শনিক সূক্ষ্মতত্ত্ব শিখান হইবে, তাহা ঐ বিদ্যার অধিকারী বা সমাজের পক্ষে কোন কাজে লাগিবে না। দুই হাজার বৎসর পূর্বে যাহা জানা ছিল, এবং পরে তাহার সঙ্গে তার্কিক লোকেরা আরও যে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিতর্ক যোগ করিয়াছেন, ছাত্রেরা তাহারই জ্ঞান লাভ করিবে। ভারতের সর্বত্র এখন সাধারণতঃ এইরূপ শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়া থাকে।......ব্রিটিশ জাতিকে যদি প্রকৃত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা থাকিত, তবে পাদরিদের প্রচারিত বিদ্যার পরিবর্তে বেকন কর্তৃক প্রচারিত বিদ্যা তাহাদিগকে শিখিতে দেওয়া হইত না। কেন না পাদরিদের প্রচারিত বিদ্যার দ্বারা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে চিরদিনের জন্য আচ্ছন্ন রাখা যাইতে পারিত। ঠিক সেইভাবে সংস্কৃত বিদ্যার দ্বারা ভারতকে চির-দিনের জন্য অজ্ঞতায় নিমজ্জিত রাখা যাইতে পারে—তাহাই যদি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অভিপ্রায় হয়। কিন্তু গবর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য এদেশবাসীর উন্নতিসাধন করা, সুতরাং তাঁহাদের অধিকতর উদার এবং উন্নত শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করা উচিত। ইহাতে গণিত, প্রাকৃতদর্শন, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতিষ এবং অন্যান্য কার্যকরী বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। সংস্কৃত বিদ্যা শিখাইবার জন্য যে অর্থব্যয়ের প্রস্তাব হইতেছে, ঐ অর্থ দ্বারা যদি ইউরোপে শিক্ষিত কয়েকজন যোগ্য পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সমন্বিত একটি কলেজ স্থাপন করা হয়, তাহা হইলেই ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

নব্য বাংলা, তথা নব্য ভারতের প্রবর্তক বিখ্যাত সংস্কারক রাজা রামমোহন নিজে

সংস্কৃত বিদ্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, এই কথা স্মরণ রাখিলে, আমরা উদ্ধৃত পত্র-খানির মূল্য বুঝিতে পারিব। রাজা রামমোহনই বাংলা দেশে প্রথম উপনিষদ আলোচনার পথ প্রদর্শন করেন। তিনি নিজে বাংলা ও ইংরাজীতে কয়েকখানি উপনিষদের অনুবাদ করেন। যদিও বেদান্তশাস্ত্রে রাজা রামমোহনের গভীর জ্ঞান ছিল, তথাপি তিনি যে নব্য ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাকৃতবিজ্ঞানই প্রধান স্থান গ্রহণ করিবে।

ষাট বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার "আনন্দমঠে" ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগ্যগঠনের ব্যাপারে প্রাকৃতবিজ্ঞানের স্থান নির্ণয় করিতে ভুলেন নাই। যে যুগে ষড়দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল, ভারতের সে যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল—'চিন্তার সরলতা।' কিন্তু সে যুগ বহুদিন হইল অতীত হইয়াছিল। হিন্দু প্রতিভা টোলের পণ্ডিতদের প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং চুলচেরা বিচার বিতর্কই ছিল, তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তখন যে বিদ্যা প্রচলিত ছিল, বাক্‌লের ভাষায় তৎসম্বন্ধে বলা যায়—"যাহারা যত বেশী পণ্ডিত হইত, তাহারা তত বেশী মূর্খ হইয়া দাঁড়াইত।"

ভারতের সৌভাগ্যক্রমে রামমোহন ঠিক সময়েই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, চারিদিকের দুর্ভেদ্য অন্ধকাররাশির মধ্যে সুদক্ষ নাবিকের ন্যায় তিনি দিকনির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন। মেকলের প্রসিদ্ধ মন্তব্যলিপি (১৮৩৫) ভারতের জ্ঞানরাজ্যে নব জাগরণের মূলে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। নব্য হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা উঁহার কোন কোন মন্তব্যে যতই ক্ষুব্ধ হউন না কেন, প্রাচ্যশিক্ষাবাদীদের সহিত সংঘর্ষে পাশ্চাত্যশিক্ষাবাদীদের এই জয়লাভ, বর্তমান ভারতের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করিয়াছে। বাংলার যুবকগণ কিরূপ উৎসাহের সঙ্গে পাশ্চাত্যবিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহা এখানে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সেক্সপিয়র ও মিল্টন, বেকন, লক, হিউম এবং আডাম স্মিথ; গিবন ও রলিন্স, নিউটন ও ল্যাপ্লেস, তাহাদের চক্ষে এক নব জগতের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। এই নূতন মদিরাপানে তাহারা যে মত্ত, এমন কি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

সৌভাগ্যক্রমে পাশাপাশি আর একটি ভাবের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছিল এবং তাহাতে এই উত্তেজনা ও উন্মাদনাকে ধীরে ধীরে সংযত করিয়া তুলিতেছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু,-যদিও পাশ্চাত্য সরস্বতীমন্দিরের উপাসক ছিলেন, তবুও প্রাচ্যভাব একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। হিন্দু কলেজের আর একজন পুরাতন ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ের ফল এবং রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য। ব্রাহ্মসমাজের এই প্রথম পতাকাবাহীর জীবনে বেদান্তদর্শন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষ অনেক সময় অদ্ভুত ফল প্রসব করে, কিন্তু মোটের উপর পরিণাম কল্যাণকরই হয়। গর্বিত রোম পরাজিত গ্রীসের পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে লজ্জা বোধ করে নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গমস্থল আলেকজেন্দ্রিয়া "নিওপ্লেটনিজমে"র জন্মভূমি এবং তাহার বিপণীতে কেবল পণ্যবিনিময়ই হইত না, চিন্তা ও ভাবেরও আদানপ্রদান হইত।

এরাসমাস, স্কেলিগার ভ্রাতৃদ্বয়, বাড এবং আরও বহু পণ্ডিত সহস্র বৎসর ধরিয়া বিস্মৃতির গর্ভে প্রোথিত, প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জ্ঞানভাণ্ডার আবিষ্কারে কম সাহায্য করেন নাই। যে জ্ঞানের আলোক কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের মঠের অন্ধকার কক্ষে স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছিল, তাহাই এখন সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হইল। ইটালীয় পেট্রার্ক এবং বোকাসিওর রচনাবলী ইংরাজ কবি চসারের কাব্যসাহিত্যের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। মিল্‌টন দান্তের নিকট বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন। তিনি (মিল্‌টন) অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ইটালী দেশেও গিয়াছিলেন, তাঁহার কবিতায় ভালামব্রোসা নদীর বর্ণনা হইতে তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

মোলিয়ারের belles letters-এ ল্যাটিনই খুব বেশী, গ্রীকও কিছু আছে, কিন্তু ফরাসী ভাষা একেবারেই নাই। তখনকার দিনে মার্জিতরুচি পণ্ডিতদের সাহিত্যে মাতৃভাষার স্থান ছিল না। এই অমরকীর্তি প্রহসনকারের প্রথম জীবনের রচনায় ইটালীয়-স্পেনীশ প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার পরিণত বয়সের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহে 'গেলিক' প্রভাব স্পষ্টই পড়িয়াছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। নব্য বাংলার কাব্যসাহিত্যের 'জনক' পুরাতন হিন্দুস্কুলের ছাত্র এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অবজ্ঞা ছিল। দান্তে ও মিলটনের কাব্যরসেই তিনি আনন্দ পাইতেন এবং তাঁহার প্রথম কাব্য "দি ক্যাপটিভ লেডী" তিনি ইংরাজী ভাষাতেই রচনা করেন। মিল্‌টনও প্রথমে ল্যাটিন কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারেন। মেকলে যথার্থই বলিয়াছেন যে, কোন মৃত ভাষায় কবিতা রচনা করা, এক দেশ হইতে আনীত চারাগাছ অন্য দেশে ভিন্ন মাটিতে লাগানোর মত। বিদেশে নূতন জমিতে সে গাছ কিছুতেই স্বাভাবিকরূপে শক্তিশালী হইতে পারে না। যে দেশে এইরূপ 'বিদেশী কবিতা' রচিত হয়, সেখানে মাতৃভাষায় কোন শক্তিশালী কাব্যের সৃষ্টি হইতে পারে না। যেমন ফুলগাছের টবে ওক বৃক্ষ জন্মে না।

মিল্‌টনের ন্যায় মধুসূদন দত্তও শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, সাহিত্যে স্থায়ী আসন এবং যশোলাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে মাতৃভাষাতেই কাব্য রচনা করিতে হইবে। তাহার ফলে তিনি বাংলা ভাষায় তাঁহার অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ' দান করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, এই অমর কাব্যে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা এবং কয়েকটি চরিত্র চিত্রনে আমরা হোমর, ভার্জিল, দান্তে, তাসো, মিল্‌টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের ভাবের ছায়াপাত দেখিতে পাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্রকে পরবর্তী যুগের লোক বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারও ইংরাজী ভাষার প্রতি ঐরূপ মোহ ছিল এবং তাঁহার প্রথম উপন্যাস Rajmohan's Wife (রামমোহনের পত্নী) তিনি ইংরাজী ভাষাতেই রচনা করেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারেন এবং বিদেশী ভাষা ত্যাগ করিয়া মাতৃভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

অন্য সাহিত্য হইতে কিছু গ্রহণ করার অর্থ কেবলই অন্ধ অনুকরণ বা মৌলিকতার

অভাব নয়। এমার্সন বলিয়াছেন—"সর্বপ্রধান প্রতিভাও অন্যের নিকট অশেষ-রূপে ঋণী।...এমন কথাও বলা যায় যে প্রতিভার শক্তি আদৌ মৌলিক নয়।" অন্যত্র এমার্সন বলিয়াছেন,—"সেক্সপিয়র তাঁহার অন্যান্য সাহিত্যিক সহকর্মীদের ন্যায় অপ্রচলিত পুরাতন নাটকের দোষগুণ বিচার করিয়া তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেন না এরূপ ক্ষেত্রেই যথেচ্ছ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ চলিতে পারে।" দৃষ্টান্তস্বরূপ 'হ্যামলেট' নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। খুব সম্ভব, ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কীড নামক জনৈক নাট্যকার কর্তৃক ঐ বিষয়ে একখানি নাটক রচিত হইয়াছিল। জাতির নবজাগরণের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রচুর অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে, চিন্তা ও ভাবের গ্রহণ ও সমীকরণ চলিতে থাকে এবং ইহা শীঘ্রই জাতীয় সাহিত্যের অংশ হইয়া উঠে।

আরব সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। রক্ষণশীল উমায়েড খলিফাগণ মানসিক শক্তির দিক হইতে অলস বলা যাইতে পারে। এই সময়ে আরবে সাহিত্য বলিতে বিশেষ কিছু ছিল না। বেদুইনদের জীবনের ঘটনাবলীই প্রধানতঃ আরবীয় কবিতার বিষয় ছিল। কিন্তু আবাসিদদের শাসনকালে আরব সাহিত্যে মোসলেম জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ দেখা যায়। প্রধানতঃ গ্রীক সাহিত্যের অনুকরণ করিয়াই এই আরব সাহিত্য ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল। খলিফা মনসুর ও মামুনের সময়ে আরব সাহিত্যের উপর গ্রীক সাহিত্যের প্রভাব পূর্ণরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। এ্যারিস্টটল, প্লেটো, গ্যালেন, টোলেমী এবং নব্য প্লেটোনিস্ট প্লোটিনাস ও পোরফিরির গ্রন্থাবলী মূল গ্রীক এবং সীরিয় ভাষা হইতে অনূদিত হইয়াছিল। ফালাসিফা-পন্থীদের (অর্থাৎ যাঁহারা মূল গ্রীক ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন) মধ্যে আলকিন্ডী, আল ফোরাবি, ইবন সিনা, আল রাজি এবং স্পেনীয় দার্শনিক ইবু রসদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানরাজ্যেরও প্রসার হইতে লাগিল—প্রাচ্যে তৎপূর্বে যাহা কখনও দেখা যায় নাই। বোধ হইল যেন খলিফা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই শিক্ষার্থী এবং সাহিত্যের উৎসাহদাতা হইয়া উঠিল। জ্ঞানের অন্বেষণে লোকে তিনটি মহাদেশ ভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিত। মধুমক্ষিকা যেমন নানা স্থান হইতে মধু আহরণ করিয়া আনে, ইহারাও তেমনি নানা দেশ হইতে অমূল্য বিদ্যা আহরণ করিয়া আনিত,—শিক্ষার্থীদের দান করিবার জন্য। কেবল তাহাই নহে,—তাহারা অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে বিরাট বিশ্বকোষসমূহ সঙ্কলন করিতে লাগিল—যেগুলি বলিতে গেলে অনেকস্থলে বর্তমান বিজ্ঞানের জন্মদাতা।" (নিকলসন, আরব সাহিত্যের ইতিহাস, ২৮১ পৃঃ)। মধ্যযুগে আরবেরা গণিত ও দর্শনের জ্ঞানভাণ্ডারে যাহা দান করিয়াছিল,—এখানে তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আরবেরা যে আবার গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যার জন্য ভারতের নিকট ঋণী, সে কথাও এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন।(১)

(১) 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস'—৬ষ্ঠ অধ্যায়, 'ভারতের নিকট আরবের ঋণ',—দ্রষ্টব্য।

আরবদের চরম উন্নতির সময়ে, তাহারা মধ্যযুগের ইউরোপে জ্ঞানের প্রদীপ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং ল্যাটিন সাহিত্যের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জ্ঞানরাজ্যে এসিয়া ও ইউরোপের পরস্পর আদানপ্রদানের উপর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই লেখা যাইতে পারে।

উইলিয়ম কেরী ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যগোষ্ঠীর সময় হইতে (১৮০০-২৫) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই সময়ে যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্যের অনুবাদ, কতকগুলি আবার সংস্কৃত, পারসী এবং উর্দু গ্রন্থের অনুবাদ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম বয়সের লেখা "বেতাল পঞ্চবিংশতি" হিন্দী গ্রন্থ এবং তাঁহার পরিণত বয়সের লেখা "শকুন্তলা" ও "সীতার বনবাস" কালিদাস ও ভবভূতির গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "কথামালা" "ঈসপস্ ফেবলস্"-এর আদর্শে রচিত। তাঁহার "জীবন-চরিত" বহুলাংশে চেম্বার্সের "বাইওগ্রাফির" অনুবাদ।

সেক্সপিয়রের নাটকাবলীও বাংলাতে অনূদিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথমে জ্যোতিষ ও প্রাকৃত বিজ্ঞানের গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিদ্যা কল্পদ্রুম"-এর নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত সংগ্রহগ্রন্থ। মূল ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট অংশসমূহ বাছিয়া বাংলা অনুবাদসহ ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছিল। এইরূপ হওয়াই উচিত। প্লুটার্কের গ্রন্থ যদি নর্থ ইংরাজীতে অনুবাদ না করিতেন, তবে সেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার', 'কোরিওলেনাস', এবং 'অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা' নাটক লিখিত হইত না। দিনেমার লেখক গ্র্যামাটিকাসের গ্রন্থ যদি ইংরাজীতে অনূদিত না হইত, তবে জগৎ হয়ত "হ্যামলেট" নাটক হইতে বঞ্চিত হইত। আমাদের সাহিত্যের পূর্বাচার্যগণ পরবর্তী লেখকদের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম বয়সে বিদেশী ধাত্রীর স্তন্যপান করিয়া শিশু ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। শেষে তাহার পক্ষে আর বাহিরের খাদ্যের প্রয়োজন ছিল না। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ ও অনুকরণের যুগের পর মৌলিক প্রতিভার যুগ আসিল। 'আলালের ঘরের দুলাল' মৌলিক প্রতিভায় পূর্ণ; ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙালী সমাজের নিখুঁত চিত্র। ইহাতে প্রথম যুগের বাংলা গদ্যের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে শব্দালঙ্কারের আড়ম্বর নাই—প্যারীচাঁদ মিত্রের সরল সহজ শক্তিশালী চলিত ভাষা। শ্লেষ ও বিদ্রূপবাণ প্রয়োগেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনিও হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সহাধ্যায়ী ছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সঙ্ঘর্ষে বাংলার জ্ঞানরাজ্যে এক আশ্চর্য নব জাগরণের বিকাশ দেখা গিয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, সামাজিক বৈষম্য

বিলোপ এবং নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিয়া তাহাদের কল্যাণসাধন। বিশাল হিন্দুসমাজ যদিও ব্রাহ্ম মত ও কার্যধারা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিত না, তবু তাহার হৃদয়ের যোগ ঐ আন্দোলনের সঙ্গে ছিল এবং হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই।

চারিদিকেই ভাববিপ্লব দেখা যাইতেছিল। একটা নূতন জগতের দ্বার খুলিয়া গিয়াছিল, নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল। বহুযুগের সুপ্তি ও আলস্য জাগ্রত হইয়া নব্য বাংলা অনুভব করিতে লাগিল, হিন্দু জাতির মধ্যে ভবিষ্যতের একটা বিপুল সম্ভাবনা আছে। এই সময়ের সাহিত্য দেশপ্রেমের মহৎভাবে পূর্ণ। লোকের মনের রুদ্ধভাব প্রকাশ এবং অধীন জাতির অভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করিবার জন্য সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক সভা-সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎসাহ ও আনুকূল্যে দেশের নানাস্থানে স্কুল ও কলেজসমূহ স্থাপিত হইতেছিল। তৎসত্ত্বেও বিজ্ঞান তাহার যোগ্য মর্যাদা পায় নাই। কতকগুলি সরকারী কলেজে উদ্ভিদ্ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা এবং পদার্থ বিদ্যা পড়ান হইত বটে, কিন্তু বিজ্ঞান তখনও তাহার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিজ্ঞানের অনুশীলন কেবল বিজ্ঞানের জন্যই করিতে হইবে, এবং তাহার জন্য সানন্দে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, এমন লোকের প্রয়োজন। কেবল তাহাই নহে, জাতীয় সাহিত্যে বিজ্ঞান তাহার যোগ্য স্থান লাভ করিবে, এবং তাহার আবিষ্কৃত সত্যসমূহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজে লাগিবে। বিজ্ঞান জাতীয় সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সহায়স্বরূপ হইবে। মানুষ ও পশু উভয়েই যে সব ব্যাধির আক্রমণে কাতর, বিজ্ঞান তাহা দূর করিবার ব্রত গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক উন্নতিশীল জাতির সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ এবং তাহার কর্মক্ষেত্র ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। এককথায় বিজ্ঞানকে মানুষের সেবায় নিযুক্ত করা হইয়াছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, হিন্দু মস্তিষ্কক্ষেত্র বহুকাল অকর্মণ্য অবস্থায় থাকিয়া নানা আগাছা কুগাছায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় বিজ্ঞান পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু হিন্দু যুবক গতানুগতিক ভাবে বিজ্ঞান শিখিত, ইহার প্রতি তাহাদের প্রকৃত অনুরাগ ছিল না। তাহার উদ্দেশ্য কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ছাপ' নেওয়া, যাহাতে ওকালতি, কেরানীগিরি, সরকারী চাকুরি প্রভৃতি পাইবার সুবিধা হইতে পারে। ইউরোপে গত চার শতাব্দী ধরিয়া বিজ্ঞানের এমন সব সেবক জন্মিয়াছেন, যাঁহারা কোনরূপ স্বার্থিক লাভের আশা না করিয়া বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান চর্চা করিয়াছেন। এমন ক সময়ে সময়ে তাঁহারা বিজ্ঞানের জন্য 'ইন্‌কুইজিশান' বা প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'ধর্মের অত্যাচার' সহ্য করিয়াছেন। প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কার করিবার অপরাধে রোজার বেকন (১২১৪—১২৮৪) কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কোপারনিকস তাঁহার অমর গ্রন্থ চল্লিশ বৎসর প্রকাশ করেন নাই, পাছে পাদরিরা উহা আগুনে পোড়াইয়া ফেলে এবং তাঁহাকেও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কেপ্‌লার একবার সক্ষোভে লিখিয়াছিলেন—"আমি আমার গ্রন্থের পাঠকলাভের জন্য একশত বৎসর অপেক্ষা করিতে

পারি, কেন না স্বয়ং ভগবান আমার মত একজন সত্যানুসন্ধিৎসুর জন্য ছয় হাজার বৎসর অপেক্ষা করিয়াছেন।" ইংলণ্ডের জ্ঞানরাজ্যে নবজাগরণের পর, এলিজাবেথীয় যুগে বহু প্রতিভাশালী কবি এবং গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টাই কেবল জন্মগ্রহণ করেন নাই, আধুনিক বিজ্ঞানের বিখ্যাত প্রবর্তকও অনেকে ঐ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গিলবার্ট ডাক্তারি করিয়া জীবিকার্জন করিতেন, এবং অবসর সময়ে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। হার্ভে রক্তসঞ্চালনের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ফ্র্যান্সিস বেকনের কৃতিত্ব অতিরঞ্জিত হইলেও, তাঁহাকে নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়।

প্যারাসেলসাস (১৪৯৩—১৫৪১) ধাতুঘটিত ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া রসায়ন বিজ্ঞানের চর্চায় উৎসাহ দিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার সময় হইতে রসায়ন বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি হইতে থাকে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ইহা একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান রূপে গণ্য হয়। এগ্রিকোলার (১৪৯৪—১৫৫৫) ধাতুবিদ্যা এবং খনিবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ De Re Metallica দ্বারা ব্যবহারিক রসায়নশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

কিন্তু ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার। হিন্দু জাতি প্রায় সহস্রাধিক বৎসর জীবন্মৃত অবস্থায় ছিল। ধর্মের সজীবতা নষ্ট হইয়াছিল এবং লোকে কতকগুলি বাহ্য আচার অনুষ্ঠান লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল। দুই হাজার বৎসর পূর্বে ঐ সকলের হয়ত কিছু উপযোগিতা ছিল, কিন্তু এ যুগে আর নাই। হিন্দুর মস্তিষ্ক সুপ্ত ও জড়বৎ হইয়া ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষদের মৌলিক চিন্তাশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধভাবে নবদ্বীপের রঘুনন্দন কর্তৃক ব্যাখ্যাত শাস্ত্রের অনুসরণ করিতেছিলেন। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুসমাজে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে আমাদের জাতির মনোভাবের পরিবর্তন হইয়া বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইতে বহু সময় লাগিয়াছিল।

গত শতাব্দীর সত্তরের কোঠায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় দেশপ্রেমিক ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করেন এবং "ভারত বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতি" (Indian Association for the Cultivation of Science) প্রতিষ্ঠিত করেন। সন্ধ্যাকালে ঐ সমিতির গৃহে রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান এবং পরে উদ্ভিদ বিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। প্রথমে এই সমিতিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করিবার অভিপ্রায় ছিল না। যে কেহ কিছু দক্ষিণা দিলে সমিতিগৃহে যাইয়া পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে পারিত। সমিতির প্রথম অবৈতনিক বক্তাদের মধ্যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ফাদার লাফোঁ এবং তারাপ্রসন্ন রায় ছিলেন। ১৮৮০-৮১ সালে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্তি হইলেও, অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য ঐ দুই বিষয়ে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশানের বক্তৃতা শুনিবার জন্য যোগদান করিয়াছিলাম। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, ডাঃ সরকারের চেষ্টা তেমন সফল হয় নাই। সম্ভবতঃ ঐরূপ চেষ্টা করিবার সময় তখনও আসে নাই, দেশে বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার স্পৃহাও জাগ্রত হয় নাই। সেই সময়ে বেসরকারী কলেজ অর্থাভাবে বিজ্ঞানবিভাগ

খুলিতে পারিত না, তাহারা কেবলমাত্র 'আর্টস্' বা সাহিত্যশিক্ষার কলেজ মাত্র ছিল। যে সমস্ত ছাত্র ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন বা পদার্থবিজ্ঞান লইতে চাহিত, তাহারাই সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশানে বক্তৃতা শুনিতে যাইত। গত ২৫ বৎসরের মধ্যে বেসরকারী কলেজসমূহ নিজেদের বিজ্ঞানবিভাগ খুলিয়াছে এবং তাহার ফলে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশানের ক্লাস ছাত্রশূন্য হইয়াছে বলিলেই হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ অথবা সাধারণ কলেজসমূহে ছাত্রেরা বৈজ্ঞানিক বিষয় অধ্যয়ন করিত, যেহেতু উহা তাহাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত এবং পরীক্ষায় পাস করিয়া উপাধিলাভের জন্য অপরিহার্য ছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে, বিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রকৃত স্পৃহা ছিল না—অথবা সোজা কথায় জ্ঞানলাভের আগ্রহ ছিল না। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে, আর্ল অব কর্কের পুত্র দি অনারেবল রবার্ট বয়েল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার নিজের গবেষণাগারে কেবল যে পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধেই নানা যুগান্তকারী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার Sceptical Chymist গ্রন্থে নব্য রসায়ন শাস্ত্র কিভাবে উন্নতি লাভ করিবে, তাহারও পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এক শতাব্দী পরে, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ডেভনশায়ার বংশের জনৈক কৃতী সন্তান, ১ মিলিয়ান স্টার্লিং (বর্তমান মুদ্রামূল্যে অন্ততঃপক্ষে ৬।৭ কোটি) ব্যাঙ্কে জমা থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার নিজের সুসজ্জিত লেবরেটরীতে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণায় তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং জগৎকে তাঁহার জ্ঞানের অপূর্ব অবদান উপহার দিয়া অমর কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন সমসাময়িক—যথা প্রিস্টলে এবং শীল দারিদ্র্যের মধ্যে কোনরূপে জীবিকা নির্বাহ করিয়া, এমন সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যাহার ফল বহুদূর-প্রসারী। তাঁহাদের কোন মূল্যবান যন্ত্রপাতি ছিল না, ভাঙা কাচের নল, মাটির তৈরী তামাকের পাইপ, বিয়ারের খালি পিপা—এই সবই তাঁহাদের যন্ত্র ছিল, কিন্তু সেই সময়ে বাংলাদেশে চারিদিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

বাংলার সমাজ কি ঘোর অবনতির গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছিল জনৈক চিন্তাশীল লেখক তাহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের সময়ে বাংলার সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায়ের বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায়। হিন্দু সমাজ সে সময়ে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।(২) দেশের সর্বত্র কুসংস্কারের রাজত্ব চলিতেছিল। নৈতিক ব্যভিচার করিয়াও কোন শাস্তিভোগ করিতে হইত না, পরন্তু তাহারা সমাজে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে রামমোহনের মত একজন প্রখর প্রতিভাশালী, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং অশেষ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহা বাস্তবিকই দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়। যে হিন্দু মনোবৃত্তি দুই হাজার বৎসর ধরিয়া কেবল দার্শনিকতার স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার

(২) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় :—নবাবী আমল (অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা)।

গতি ফিরাইয়া দেওয়া বড় সহজ কাজ নহে এবং ঐ কার্য একদিনে হইবার নহে। কেবল মাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই প্রায় দুই হাজার শাখা উপশাখা আছে, তাহারা কেহ কাহারও সঙ্গে খায় না, পরস্পরের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বিবাহও দেয় না। বাংলার ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের মধ্যে নানা সামাজিক উচ্চনীচ স্তরভেদ আছে; উহাদের মধ্যে কেহ জল-আচরণীয় অথবা উচ্চবর্ণদের জল যোগাইবার অধিকারে অধিকারী। হিন্দুর মনে পাশ্চাত্য ভাবের বীজ বপন করিয়া অন্ততঃপক্ষে দুই পুরুষ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল এবং তাহার পরে মৌলিক বিজ্ঞানচর্চার যুগ আসিয়াছিল। ক্ষেত্র বহুদিন পতিত থাকিয়া উচ্চচিন্তার জন্ম দিবার অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই জন্য প্রথমে নূতন ফসলের আবাদ করিবার পূর্বে তাহাতে ভাল করিয়া 'সার' দিতে হইয়াছিল। আমি এতক্ষণ প্রকৃত বিষয় হইতে দূরে চলিয়া গিয়া, অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছিলাম। যাহাতে বাংলায় নব যুগের আবির্ভাব পাঠকগণ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহার জন্যই আমি এই সমস্ত কথা বলিতেছিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নবযুগের আবির্ভাব—বাংলাদেশে মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা—ভারতবাসীদিগকে উচ্চতর শিক্ষাবিভাগ হইতে বহিষ্করণ

জগদীশচন্দ্র বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বি. এ. উপাধিধারী। ১৮৮০ সালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিলাতের প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করেন। সেখানে জগদীশচন্দ্র লর্ড র‍্যালের পদতলে বসিয়া বিজ্ঞান অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন । ১৮৮৫ সালে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। স্যার জন ইলিয়ট পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তারপর বার বৎসরের মধ্যে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের নাম জগৎ জানিতে পারে নাই। তাঁহার ছাত্রেরা অবশ্য তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। কিন্তু তিনি এই সময়ে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন না। তাঁহার শক্তিশালী প্রতিভা নূতন সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত ছিল এবং হার্জিয়ান বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৯৫ সালে এসিয়াটিক সোসাইটিতে The Polarisation of Electric Ray by a Crystal বিষয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। মনে হয়, এই নূতন গবেষণার মূল্য তিনি তখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। এই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিয়া লর্ড র‍্যালে ও লর্ড কেলভিনের নিকট প্রেরিত হয়। পদার্থ বিজ্ঞানের এই দুই বিখ্যাত আচার্য বসুর গবেষণার মূল্য বুঝিতে পারেন এবং লর্ড র‍্যালে "ইলেক্‌ট্রিসিয়ান" পত্রে উহা প্রকাশ করেন। লর্ড কেলভিনও বসুর উচ্চপ্রশংসা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই সময়ে আমিও 'মার্কিউরাস নাইট্রাইট' সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কার করি এবং ঐ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ১৮৯৫ সালে এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি—বসু সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্ব একটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং প্রথম পথপ্রদর্শকের ন্যায় প্রভূত খ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই বিষয়ে একটির পর একটি নূতন নূতন প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন, অধিকাংশই লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির কার্যবিবরণে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার যশ এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলা গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে ইউরোপে পাঠাইলেন। ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশানের সভায় তিনি তাঁহার গবেষণাগারে নির্মিত ক্ষুদ্র যন্ত্রটি প্রদর্শন করিলেন। তখন বৈজ্ঞানিক জগতে অপূর্ব সাড়া পড়িয়া গেল। এই যন্ত্র দ্বারা তিনি বৈদ্যুতিক তরঙ্গের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতেন। বসু পরে উদ্ভিদের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন, অথবা জড়জগৎ সম্বন্ধে যে যুগান্তকারী সত্য আবিষ্কার করেন, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিবার স্থান এ নহে। সে বিষয়ে

কিছু বলিবার যোগ্যতাও আমার নাই। এখানে কেবল একটি বিষয়ে বলাই আমার উদ্দেশ্য, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগৎ কর্তৃক কি ভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং নব্য বাংলার মনের উপর তাহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

স্বাধীন দেশে যুবকগণের বুদ্ধি জীবনের সর্ববিভাগে বিকাশের ক্ষেত্র পায়, কিন্তু পরাধীন জাতির মধ্যে উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষার পথ চারিদিক হইতেই রুদ্ধ হয়। সৈন্যবিভাগে ও নৌবিভাগে তাহার প্রবেশ করিবার সুযোগ থাকে না। বাংলার মস্তিষ্ক এ পর্যন্ত কেবল আইন ব্যবসায়ে স্ফূর্তিলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, সেই কারণে বাঙালীদের মধ্যে বড় বড় আইনজ্ঞের উদ্ভব হইয়াছিল। যাঁহারা নব্য-ন্যায়ের জন্ম দিয়াছিলেন, এবং তর্কশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরেরা স্বভাবত আইন ব্যবসায়ে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তর্ক-শাস্ত্র এবং আইনের কূট আলোচনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং গাঙ্গেয় উপকূলের মেধাবী অধিবাসীরা ইংরাজ আমলে স্থাপিত আইন আদালতে আইন ব্যবসায়কে যে তৎপরতার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। সমস্ত তীক্ষ্মবুদ্ধি মেধাবী ছাত্রই এই পথ অবলম্বন করিত। যদিও আইন ব্যবসায় শীঘ্রই জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল এবং নব্য উকিলেরা বেকার অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিল, তথাপি শীর্ষস্থানীয় মুষ্টিমেয় আইনব্যবসায়ীরা প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন বলিয়া, এই ব্যবসায়ের প্রতি লোকে বহ্নিমুখে, পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হইত। প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে "বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার" নামক পুস্তিকায় আমি দেশবাসীর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করি; এবং দেখাইয়া দেই যে কেবলমাত্র একটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উন্মাদের মত ধাবিত হইয়া এবং জীবনের অন্য সমস্ত বিভাগ উপেক্ষা করিয়া বাংলার যুবকরা নিজেদের এবং দেশের কি ঘোর সর্বনাশ করিতেছে! একজন বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতা—বাংলা কাউন্সিলে একবার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, আইন এদেশের বহু প্রতিভার সমাধিক্ষেত্র স্বরূপ হইয়াছে।

বাঙালী প্রতিভার ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে বসুর আবিষ্ক্রিয়া সমূহ বৈজ্ঞানিক জগতে সমাদর লাভ করিল। বাঙালী যুবকদের মনের উপর ইহার প্রভাব ধীরে ধীরে হইলেও, নিশ্চিতরূপে রেখাপাত করিল। এযাবৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকরা শিক্ষা-বিভাগকে পরিহার করিয়াই চলিত। শিক্ষাবিভাগের উচ্চস্তর ইউরোপীয়দের এক-চেটিয়া ছিল। দুই একজন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী প্রসিদ্ধ ভারতীয় প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিক্ষাবিভাগকে এখন পুনর্গঠন করা হইল এবং একটি স্বতন্ত্র নিম্নস্তরের শাখা ভারতবাসীদের জন্য সৃষ্ট হইল। কিন্তু উচ্চস্তর কার্যতঃ ইউরোপীয়দের জন্যই সুরক্ষিত থাকিল। ইহার ফলে প্রতিভাশালী মেধাবী ভারতবাসীরা শিক্ষাবিভাগ যথাসাধ্য বর্জন করিতে লাগিল। আমি এখানে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ কৃতী ছাত্র ছিলেন। অল্প-

বয়সেই গণিত শাস্ত্রে তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন। সেই কারণে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট তাঁহাকে ডাকিয়া একটি সহকারী অধ্যাপকের পদ দিতে চাহেন। উহার বেতন মাসিক ২০০৲ হইতে ২৫০৲ টাকা। স্থানীয় গবর্নমেণ্টের উহার বেশি মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা ছিল না। আশুতোষ যদি মুহূর্তের দৌর্বল্যে ঐ পদ গ্রহণ করিতেন, তবে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হইত। তিনি যথা-নিয়মে প্রাদেশিক সার্ভিসের উচ্চতম স্তর পর্যন্ত উঠিতে পারিতেন। ২৫ বৎসর কাজ করিবার পর, মাসিক সাত আট শত টাকা মাহিয়ানাও হইত। কিন্তু বেতনের পরিমাণ এখানে বিবেচনার বিষয় নহে। সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাঁহার স্বাধীনতা প্রথম হইতেই সংকুচিত হইত এবং প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ মিলিত না। পরবর্তী জীবনে তিনি যে পৌরুষ ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমলাতন্ত্রের প্রভাব হইতে যেটুকু স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতেছে, তাহা ভবিষ্যতের স্বপ্নে পর্যবসিত হইত। বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ, এ সমস্ত সম্ভবপর হইত না।

১৮৯৬ সালে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির দ্বাদশ অধিবেশন হয়। উহাতে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন;—"এই কংগ্রেস ভারত সচিবের অনুমোদিত শিক্ষাবিভাগের পুনর্গঠন ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেছে। যেহেতু ইহার উদ্দেশ্য ভারতবাসীকে শিক্ষাবিভাগের উচ্চস্তর হইতে বঞ্চিত করা।" আনন্দমোহন এই প্রস্তাব উপলক্ষে যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিতেছি।

"এই প্রস্তাবের প্রবর্তকদিগকে আমি বলিতে চাই যে, তাঁহারা অত্যন্ত অসময়ে দেশের শিক্ষাবিভাগে এইরূপ অধোগতিসূচক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। যদি মহারানীর ঘোষণার মহৎ বাণী অবজ্ঞা করিতেই হয়—জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমব্যবহার করিবার যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়াছিলেন, তাহা যদি ভঙ্গ করিতেই হয়, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বের ষষ্টিতম বার্ষিক উৎসবের বৎসরে উহা করা উচিত ছিল না। মহারানীর উদার সুশাসনের ষষ্টিতম বর্ষে এই নিকৃষ্ট নীতি প্রবর্তন করা অত্যন্ত অদূরদর্শিতার কার্য হইবে। আর একটি কারণে আমি বলিতেছি এই বৎসরে এরূপ অশোভন চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে উচিত হয় নাই। 'লণ্ডন টাইমস' সেদিন বলিয়াছেন ১৮৯৬ সাল ভারতের প্রতিভার ইতিহাসে নব-যুগের সূচনা করিয়াছে। আমরা সকলেই জানি একজন বিখ্যাত ভারতীয় অধ্যাপকের অদৃশ্য আলোকের ক্ষেত্রে—তথা ইথর তরঙ্গের রাজ্যে—অপূর্ব গবেষণা ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিনেরও বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। আমাদের আর একজন স্বদেশবাসী গত সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা আরও জানি যে,—রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের আর একজন স্বদেশবাসীর প্রতিভা ও অধ্যবসায় বৈজ্ঞানিক জগতে সমাদর লাভ করিয়াছে। সুতরাং বর্তমান বৎসরে প্রমাণ হইয়াছে যে, ভারত তাহার অতীত

গৌরবের অবদান বিস্মৃত হয় নাই,—সে তাহার ভবিষ্যতের মহৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য মনীষীরাও তাহার এই দাবি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আর এই বৎসরই এইরূপ নিকৃষ্ট নীতি প্রবর্তনের কি যোগ্য সময়? আমরা বিনা প্রতিবাদে এইরূপ ব্যবস্থা কখনই মানিয়া লইব না। ভদ্রমহোদয়গণ, এই ভাবে বর্ণ-বৈষম্যমূলক নূতন অপরাধ সৃষ্টি করা ও মহারানীর উদার ঘোষণার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আর একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমি এই অবনতি-সূচক অ-ব্রিটিশ কার্য-নীতির কথা আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং সরকারী ইস্তাহারে উল্লিখিত কয়েকটি শব্দের প্রতি আপনাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা আমি প্রয়োজন মনে করি। সেই শব্দগুলি এই—'অতঃপর যে সমস্ত ভারতবাসী শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ভারতবর্ষে এবং প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইবেন।' এই সরকারী প্রস্তাবের রচয়িতাগণ হয়ত মনে করিয়াছেন যে, 'সাধারণতঃ' এই শব্দের একটা বিশেষ গুণ আছে। কিন্তু এই 'সাধারণতঃ' শব্দের পরিণাম কি হইবে, তৎসম্বন্ধে আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতে চাই। আমি যে ভবিষ্যদ্‌বক্তার শক্তি পাইয়াছি, তাহা নহে। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতেই ভবিষ্যৎ অনুমান করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠে। সেই অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমরা মিলাইয়া দেখিব। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাংলা-দেশের কথাই আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি এবং সেই বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে আমরা কি দেখিতেছি? আমি সভার শোতৃগণকে দূর অতীতে লইয়া যাইব না। কিন্তু কংগ্রেসের জন্মের পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কি ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, গত বার বৎসরের মধ্যে ইউরোপে শিক্ষিত ছয়জন যোগ্য ভারতবাসী শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ছয়জন শিক্ষিত ভারতবাসী সকলেই ভারতবর্ষেই কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যে ইংলণ্ডে নিয়োগলাভ করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে। এই ছয়জন ভারতবাসী ব্রিটিশ ও স্কচ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উপাধিলাভ করিয়া এবং বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়া (যে সমস্ত ইংরাজ শিক্ষাবিভাগে আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা ইঁহাদের যোগ্যতা কোন অংশেই কম নহে, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি) ইংলণ্ডে ভারতসচিবের দপ্তর হইতে নিয়োগলাভ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বহুদিন অধীরহৃদয়ে অপেক্ষা করিবার পর তাঁহাদিগকে সত্বর ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে এবং সেইখানেই গবর্নমেণ্টের নিকট কাজের চেষ্টা করিতে বলা হইল। সুতরাং এই 'সাধারণতঃ' শব্দ থাকা সত্ত্বেও, অতীতে যাহা হইয়াছে, ভবিষ্যতেও যে তাহা হইবে, ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। বর্তমানে যে অবনতিসূচক ধারাটি নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা পূর্বে না থাকা সত্ত্বেও কার্যতঃ এইরূপ ঘটিয়াছে। সুতরাং ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ধরিয়া লইতে পারেন যে 'সাধারণতঃ' শব্দের অর্থ এখানে অপরিহার্যরূপে', এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষে এখন শিক্ষাবিভাগের উচ্চস্তরে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ।

"আমি আর বেশিক্ষণ বলিতে চাই না, আমার বক্তৃতা করিবার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমি কেবল একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। কংগ্রেসের সদস্যগণের নিকট শিক্ষার চেয়ে প্রিয় বিষয় আর কিছু হইতে পারে না— ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারাই সেই শিক্ষার ও জাতীয় মনের মহৎ জাগরণের ফলস্বরূপ। ইহা কি সম্ভব যে, আমাদের ভারত ও ইংলণ্ডস্থিত বন্ধুদের তথা সকল স্থানের মানবসভ্যতার উন্নতিকামীগণের সাহায্যে আমাদের স্বদেশবাসিগণ শিক্ষাবিভাগের উচ্চস্তর হইতে বহিষ্কৃত না হয়, তজ্জন্য আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন না? ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতবাসীদের নিয়োগের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়া থাকে, সত্য হোক মিথ্যা হোক, সেই সমস্ত কথা শিক্ষাবিভাগের সম্বন্ধে খাটে না। সুতরাং এই ব্যাপক বহিষ্কার নীতির পক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে? ভদ্রমহোদয়গণ, আমি ভারতের প্রতিভায় বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে,—কয়েক শতাব্দী পূর্বে ভারতে যে বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয় না! আমি বিশ্বাস করি, সেই বহ্নির স্ফুলিঙ্গ এখনও বর্তমান এবং তাহাতে সহানুভূতির বাতাস দিলে এবং যত্ন করিলে আবার গৌরবময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইতে পারে। সেই প্রদীপ্ত বহ্নি অতীতে কেবল ভারতে নয় জগতের সর্বত্র জ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়াছিল এবং শিল্প, সাহিত্য, গণিত, দর্শনের আশ্চর্য সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহা এখন পর্যন্ত জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এখনও চেষ্টা করিলে তাহার পুনরাবির্ভাব হইতে পাবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যে আপনারা দ্বিগুণ উৎসাহে সংগ্রাম করুন এবং তাহা হইলে ভগবানের কৃপায়, ন্যায় ও নীতি জয়যুক্ত হইবে এবং এই প্রাচীন দেশের অধিবাসীদের ললাটে যে কলঙ্কের ছাপ অঙ্কিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা ব্যর্থ হইবে।"

এস্থলে আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করিব, যাহা আমার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বহু-প্রত্যাশিত "পুনর্গঠন ব্যবস্থা" ভারত সচিব কর্তৃক অবশেষে অনুমোদিত হইল এবং আমি শিক্ষাবিভাগের নির্দিষ্ট "গ্রেডে" স্থান লাভ করিলাম। আমি উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন সিনিয়র অফিসার ছিলাম,—এইজন্য আমাকে আমার কর্মক্ষেত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিয়া রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিতে বলা হইল। একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের অধ্যক্ষপদ এবং বিনা ভাড়ায় কলেজের সংলগ্ন প্রশস্ত আবাসবাটী অনেকের পক্ষে লোভনীয়। শাসন-ক্ষমতা পরিচালনা করিবার মোহ মানবপ্রকৃতির মধ্যে এমনভাবে নিহিত যে বহু সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিককে ইহার জন্য নিজের কর্মজীবন নষ্ট করিতে দেখা গিয়াছে। তৎকালে মফঃস্বল কলেজগুলিতে গবেষণা করিবার উপযুক্ত লেবরেটরী, যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছু ছিল না। তাহা ছাড়া, রাজধানীর বাহিরে "বিদ্যার আবেষ্টনী" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ছিল না। আমি তখন 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসে'র জন্য উপাদান ও তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলাম, সুতরাং এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি আমার পক্ষে অপরিহার্য ছিল। কিন্তু আমার সর্বপ্রধান আপত্তি ছিল শাসনকার্যের প্রতি বিতৃষ্ণা, রাশি রাশি চিঠিপত্র দেখা, ফাইল ঘাঁটা কিংবা কমিটির সভায় যোগ

দেওয়া; এই সমস্ত কাজে এত সময় ও শক্তি ব্যয় হয় যে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য অবসর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে আমি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ মার্টিনকে জানাইলাম যে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক, এখানে বরং আমি জুনিয়র অধ্যাপক রূপেও সানন্দে কাজ করিব। আমার অনুরোধে ফল হইল। কয়েকদিন পরেই কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইল।

"ডাঃ মার্টিন মনে করেন যে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে, তাহার পরিণাম অপ্রীতিকর হইবে। তিনি ডাঃ পি. সি. রায়কে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে,—তাঁহাকে (ডাঃ রায়কে) প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিতে হইবে। এই সংবাদে ডাঃ রায় শঙ্কিত হইলেন। ডাঃ মার্টিন জানেন যে ডাঃ রায় একজন প্রথিতযশা রাসায়নিক এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। সুতরাং সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করাই সমীচীন মনে করেন। লেঃ গবর্নরও মনে করেন যে কয়েকজন কর্মচারীর পক্ষে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম প্রয়োগ করা সংগত হইবে না।" গবর্নমেণ্টের প্রস্তাব, ১২৪৪নং তারিখ ২৬-৩-১৮৯৭।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের শ্রেষ্ঠ যুবকগণ আইন ব্যবসায়েই নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে লোকের ভিড় অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছিল এবং তাহাতে সাফল্য লাভের আশা খুব কমই ছিল। যদিও বৈষয়িক হিসাবে শিক্ষাবিভাগে ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখিবার সুযোগ ছিল না, তাহা হইলেও এখন প্রমাণিত হইল যে কোন একটি বিজ্ঞানের ঐকান্তিক সাধনার ফলে নূতন সত্যের আবিষ্কার এবং যশোলাভ করা যাইতে পারে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মৌলিক গবেষণা—গবেষণা বৃত্তি—ভারতীয় রাসায়নিক গোষ্ঠী (Indian School of Chemistry)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্রমশঃ ভারতের বাহিরে সমাদৃত হইতেছিল। বাংলা গবর্নমেণ্ট কর্তৃক "গবেষণাবৃত্তি" স্থাপনের ফলে বিজ্ঞানচর্চায় কিয়ৎপরিমাণে উৎসাহদান করা হইল। কোন ছাত্র যোগ্যতার সহিত এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, এবং কোন বিশেষ বিজ্ঞানের চর্চায় অনুরাগ দেখাইলে,—অধ্যাপকের সুপারিশে তিন বৎসরের জন্য একশত টাকার মাসিক বৃত্তি লাভ করিতে পারিত। ১৯০০ সাল হইতে আমার বিভাগে একজন বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র সর্বদাই থাকিত। শিক্ষানবিসির প্রথম অবস্থায় সে আমার গবেষণাকার্যে সহায়তা করিত, কিন্তু পরে প্রতিভার পরিচয় দিলে, সে নিজের উদ্ভাবিত পন্থায় বিশেষ কোন বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিতে পারিত। এই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া "ডক্টর" উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি'ও পাইয়াছেন। ই'হারা আবার সহজেই শিক্ষাবিভাগে অথবা ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের কোন টেকনিক্যাল বিভাগে কাজ পাইতেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের লিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ ইংলণ্ড, জার্মানি ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইত, ইহাও রাসায়নিক গবেষণায় উৎসাহ ও প্রেরণার অন্যতম হেতু ছিল।

আমার নিকটে প্রথম গবেষণাবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেন। তিনি 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি' লাভ করেন। 'মার্কিউরাস নাইট্রাইটের' গবেষণায় তিনি আমার সহযোগিতা করেন। তিনি পরে পুসার কৃষি ইনস্টিটিউটে প্রবেশ করেন এবং যথাসময়ে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে স্থান লাভ করেন।

১৯০৫ সালে পঞ্চানন নিয়োগী আমার নিকটে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। তাহার কিছু পরে আসেন আমার সহকারী অধ্যাপক, অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অতুলচন্দ্রের শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল এবং তিনি তাঁহার দৈনিক কাজের পরেও কঠোর পরিশ্রম করিতে পারিতেন। তিনি অপরাহ্ণ ৪½টার সময় আমার সঙ্গে কাজ করিতে আরম্ভ করিতেন এবং সন্ধ্যার পর পর্যন্ত তাহা করিতেন। ছুটির সময়েও তিনি প্রায়ই আমার সঙ্গে থাকিয়া কাজ করিতেন। অতুলচন্দ্র-ঘোষ নামে আর একজন যুবক রিসার্চ স্কলাররূপে আমার কাজে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তিনি পরে লাহোরে দয়াল সিং কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অতুলচন্দ্র অকালে পরলোকগমন করেন। অধ্যাপক শান্তিস্বরূপ ভাটনগর "ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রী"তে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন

যে অতুলচন্দ্র ঘোষের নিকট তিনি রসায়নশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। সুতরাং "প্রশিষ্য" বলিয়া দাবি করেন।(১)

এইভাবে রাসায়নিক গবেষণার ফল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকাসমূহের বিষয়সূচী এবং লেখকদের নাম দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

১৯০৪ সালে একজন আইরিশ যুবক (কানিংহাম) শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের সহযোগী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বাংলা দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রভূত সহায়তা করেন। তিনি উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার মনে কোন ঈর্ষা বা সংকীর্ণতা ছিল না। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে তিনি 'জুনিয়র' হইয়াও 'ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসের' লোক হিসাবে সিনিয়র বলিয়া গণ্য হইবেন, ইহা খুবই অদ্ভুত কথা। যিনি তাঁহার 'জুনিয়র' বলিয়া গণ্য, তাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি (কানিংহাম) শিক্ষালাভ করিতে পারেন। তিনি প্রকাশ্যে এবং কার্যতঃ ভারতবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম অনুসারে বি. এস-সি. এবং এম. এস-সি. উপাধি তখন সবে প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং তিনি কেবল প্রেসিডেন্সি কলেজে নয়, বাংলার সমগ্র কলেজে লেবরেটরীতে ছাত্রদের শিক্ষাদান প্রণালীর উন্নতি সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে শিক্ষা বিষয়ে বহু পরামর্শ দিয়া সাহায্য করেন এবং বাংলার বহু শিক্ষক ও রাজনীতিকের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের কারখানা তখন মানিকতলা মেন রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং উহার নির্মাণকার্য তখনও চলিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁহার মতে দেশীয়দের প্রতিভা ও কর্মোৎসাহের ইহা জীবন্ত প্রতিমূর্তি। দুর্ভাগ্যক্রমে উৎসাহের আতিশয্যবশতঃ কখন কখন তাঁহার বুদ্ধির ভুল হইত এবং এই কারণে তিনি শেষে বিপদগ্রস্ত হইলেন।

একবার তিনি বিলাতে তাঁহার বন্ধু জনৈক পার্লামেণ্টের সদস্যকে ব্যক্তিগত ভাবে একখানি পত্র লিখেন। পত্রে পূর্ববঙ্গে, বিশেষ ভাবে গবর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের শাসননীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা ছিল। উক্ত বন্ধু বুদ্ধির ভুলে ভারতবাসীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অন্য কয়েকজন পার্লামেণ্টের সদস্যকে ঐ পত্র দেখান, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের একজন সদস্য (জনৈক অবসরপ্রাপ্ত অ্যাংলো

---

(১) অধ্যাপক ভাটনগর তাঁহার অননুকরণীয় সরস ভাষায় বলেন,—

"আমি একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে স্যার পি. সি রায়ের ছাত্র হইতে পারি নাই। স্যার পি. সি. রায় সেজন্য নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করেন নাই। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ আমি বলিতে পারি যে আমি অনেক পরে এ পৃথিবীতে আসিয়াছি, সুতরাং আমি তাঁহার রাসায়নিক "প্রশিষ্য" হইয়াছি। স্যার পি. সি. রায়ের ভূতপূর্ব ছাত্র মিঃ অতুলচন্দ্র ঘোষের নিকট আমি রসায়নশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছি।" (১৯২৮ সনে জানুআরিতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়নশাখায় প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ)

ইণ্ডিয়ান) উহার একখানি নকল সংগ্রহ করিয়া ভারত-সচিবকে দেখান। ব্যাপারটি যথা সময়ে বাংলার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর স্যার আর্কডেল আর্লের নিকট আসিল।

স্যার আর্কডেল কানিংহামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং শাসনবিধি ভঙ্গের জন্য তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। তাঁহাকে বলা হইল যে তিনি যে কাজ করিয়াছেন, তাহাতে অবিলম্বে তাঁহাকে কার্যচ্যুত করা উচিত এবং তাঁহাকে তাঁহার বর্তমান কর্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করাই সর্বাপেক্ষা লঘু শাস্তি। কানিংহামকে অনুন্নত প্রদেশ ছোটনাগপুরে স্কুল ইন্স্পেক্টর রূপে বদলি করা হইল। ১৯১১ সালে রাঁচিতে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাণত্যাগ করিলেন। বেকার লেবরেটরীতে তাঁহার বন্ধু ও গুণমুগ্ধগণ তাঁহার নামে একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন।

১৯০৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান হইল। লর্ড ক্যানিং ১৮৫৮ সালে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সনন্দ দেন। ১৯০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশৎ বার্ষিক জুবিলী উৎসব মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইল এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদত্ত হইল: ইঁহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম।

এই সময়ে আমার মনে হইল যে "হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের" প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা আমার পক্ষে কর্তব্য। তদনুসারে আমি তন্ত্র সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন সংগৃহীত পুঁথি পাঠ করিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহযোগিতা লাভেও আমি সমর্থ হইলাম। ডাঃ শীলের জ্ঞান সর্বতোমুখী, তিনি প্রাচীন হিন্দুদের 'পরমাণু তত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি অধ্যায় লিখিয়া দিলেন। এই অংশ পরে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করিয়া ডাঃ শীল তাঁহার "Positive Sciences of the Ancient Hindus" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা হইতে নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি পড়িলেই বুঝা যাইবে, আমার এই স্বেচ্ছাকৃত দায়িত্বভার হইতে মুক্ত হইয়া আমার মনোভাব কিরূপ হইয়া-ছিল। বলা বাহুল্য, এই গুরুতর কর্তব্য পালন করিতে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা আমার পক্ষে প্রীতি ও আনন্দপ্রদই ছিল।

"গত ১৫ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া আমি যে কর্তব্য পালনে নিযুক্ত ছিলাম, তাহা হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে আমার মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ জাগ্রত হইতেছে। রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাসকারের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, ইহা অনকটা সেইরূপ। সুতরাং যদি এডমণ্ড গিবনের ভাষায় আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করি, পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। 'এই কার্য হইতে অবশেষে মুক্তিলাভ করিয়া আমার মনে যে আনন্দ হইতেছে, তাহা আমি গোপন করিতে চাই না।...কিন্তু আমার গর্ব শীঘ্রই খর্ব হইল, যে কার্য আমার পুরাতন সঙ্গী ছিল এবং আমাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া আনন্দ দান করিয়াছে, তাহার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাবনায় একটা শান্ত বিষাদ আমাকে আচ্ছন্ন করিল।'

"হিন্দুর অতীত গৌরবময়, তাহার অন্তরে বিরাট শক্তির বীজ নিহিত আছে, সুতরাং তাহার ভবিষ্যৎ আরও গৌরবময় হইবে, আশা করা যাইতে পারে, এবং যদি এই ইতিহাস পড়িয়া আমার স্বদেশবাসীদের মনে জগৎসভায় তাহাদের অতীত গৌরবের আসন লাভ করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।"

অধ্যাপক সিল্‌ভাঁ লেভি 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে'র দ্বিতীয় খণ্ড সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন—"তাঁহার গবেষণাগার ভারতের নব্য রাসায়নিকগণের সূতিকাগৃহ। অধ্যাপক রায় সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী।...পাশ্চাত্যের ভাষাসমূহেও তাঁহার দখল আছে,—ল্যাটিন, ইংরাজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়।"

রসায়ন শাস্ত্রের চর্চায় আমার সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োগ করিবার অবসর আমি পুনর্বার লাভ করিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজ লেবরেটরী হইতে যে সমস্ত মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সূচী পড়িলেই যে কেহ দেখিতে পাইবেন, ঐ সময় হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ আমার ও আমার সহকর্মী ছাত্রদের যুগ্ম নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। পরে এই রীতিই প্রধান হইয়া উঠে। অন্য কাহাকেও সহকর্মী করা হইলে তাঁহার উপরে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করাই উচিত এবং কার্যের ফলভোগী হইবার সুযোগও তাঁহাকে দেওয়া উচিত। সহকর্মী শীঘ্রই প্রধান কর্মীর সঙ্গে আপনার লক্ষ্যকে একীভূত করিতে শিখেন এবং কাজে সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দেন। আরও ভাবিবার কথা আছে। বিষয়টি নানাদিক দিয়া দেখা যাইতে পারে। যিনি অন্যের সাহায্য না লইয়া একাকীই কাজ করেন, এবং অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করা বা অন্যের অভিমত গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন না, তিনি খামখেয়ালী হইয়া উঠিতে পারেন, কিংবা কোন একটি বিশেষ ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইতে পারে। যদি তিনি তাঁহার সহকর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অনেক ভ্রমের হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন। সহকর্মীও যদি বুঝিতে পারেন যে, প্রভুর তাঁহার প্রতি বিশ্বাস আছে, তাহা হইলে কার্যে তাঁহার দায়িত্ববোধ জন্মে। কেবলমাত্র উপরওয়ালার আদেশ পালন করাই যেখানে রীতি, সেখানে এই দায়িত্ব-বোধ জন্মিতে পারে না। বস্তুতঃ, সেরূপ স্থলে প্রভু ও সেবকের মধ্যে সম্বন্ধ প্রাণহীন হইয়া উঠে। আমি অবশ্য সাধারণ লোকের কথাই বলিতেছি, অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের কথা বলিতেছি না। বিরাট প্রতিভা অথবা অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে সাধারণ লোকের বুদ্ধি ও মেধা বিকাশ লাভ করিতে পারে না। উপমা দিতে বলা যায়, বহু শাখা বিশিষ্ট বিরাট বটবৃক্ষের ছায়াতলে অন্য কোন গাছপালা বড় হইতে পারে না, বৈষয়িক জগতেও সেই একই নিয়ম খাটে। এবং যাহা বৈষয়িক জগতে ঘটে, মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রেও অল্পাধিকতর তাহাই ঘটে। বিরাট প্রতিভা-শালী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসিয়া কিরূপে বহু বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা কিরূপে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অনেক কথা লেখা যাইতে পারে। মৎকৃত 'নব্যরসায়নশাস্ত্রের

স্রষ্টাগণ' (Makers of Modern Chemistry) নামক গ্রন্থ হইতে এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"গে-লুসাকের বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন থেনার্ড। থেনার্ড (১৭৭৭—১৮৫৭) সাধারণ কৃষকের ছেলে। সতর বৎসর বয়সে তিনি চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে প্যারীতে আসেন। ছাত্র হিসাবে কোন লেবরেটরীতে প্রবেশ করিবার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না, সুতরাং ভকেলিনের নিকট কোন লেবরেটরীর ভৃত্য হিসাবে থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। "থেনার্ডস্ ব্লু" নামক সুপরিচিত মিশ্র পদার্থ আবিষ্কার করিয়া থেনার্ড খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার আর একটি আবিষ্কার 'হাইড্রোজেন পারক্সাইড'। আশি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সময়ে তিনি ফ্রান্সের একজন 'পীয়ার' এবং প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইয়াছিলেন। ভকেলিনের দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে মাইকেল ইউজেন শেভ্রেল (১৭৮৬—১৮৮৯) একজন। তিনি এক শতাব্দীরও অধিক বাঁচিয়া ছিলেন এবং এই হেতু নব্যরসায়নকারগণ এবং সেকালের জৈব রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে তিনি যোগসূত্র স্বরূপ ছিলেন। Fatty Acids অর্থাৎ চর্বি-সম্ভূত অ্যাসিড সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা বিজ্ঞানজগতে সুবিদিত।

অগাস্ট লরাঁ (১৮০৭-৫৩) একজন সাধারণ কৃষকের ছেলে। ১৮২৬ সালে তিনি খনিবিদ্যালয়ে 'বাহিরের ছাত্র' রূপে প্রবেশ লাভ করেন এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে Ecole Centrale des Arts et Métiers -এ সহকারীর পদ লাভ করেন। ঐ প্রতিষ্ঠানে ডুমা অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁহারই লেবরেটরীতে লরাঁ তাঁহার প্রথম গবেষণা করেন; ১৮৩৮ সালে লরাঁ বোর্ডোতে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন, ১৮৪৬ সালে তিনি প্যারীতে ফিরিয়া আসেন এবং টাকশালের ধাতু-পরীক্ষক বা অ্যাসেয়র হন। কিন্তু তাঁহার আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং কাজ করিবার সুযোগ খুব সামান্য ছিল এবং সর্বদাই তিনি অর্থকষ্ট ভোগ করিতেন। ১৮৫৩ সালে তিনি যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার জীবনীকার গ্রিমো লিখিয়াছেন : "লরাঁ নিঃস্বার্থ ভাবে সত্যের সন্ধান গবেষণা করিয়া প্রাণপাত করিয়াছেন তবু তিনি বিদ্বেষান্ধ সমালোচকদের কুৎসিত আক্রমণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। সুখ, সৌভাগ্য, সম্মান কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না, যে সব তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য তিনি অক্লান্ত ভাবে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেগুলির সাফল্যও তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।"

প্রতিভাশালী ব্যক্তি অথবা বিশেষজ্ঞের সংস্পর্শে আসিলেই অথবা তাঁহার অধীনে কাজ করিবার সুযোগ পাইলেই যে বৈজ্ঞানিক গড়িয়া উঠে, এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। বিদ্যার্থীর মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি চাই এবং সেই শক্তির বিকাশে সহায়তা করিতে হইবে। গ্রে'র Elegy (বিষাদ-সঙ্গীত) কবিতায় নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে মূল্যবান সত্য আছে : "সমুদ্রের অন্ধকার অতল গর্ভে বহু উজ্জ্বল রত্ন লুকাইয়া আছে। মরুভূমির বুকে বহু ফুল ফুটিয়া লোক-লোচনের অন্তরালে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে।"

কিন্তু যে যন্ত্র শব্দ-তরঙ্গ ধারণ করিবে তাহারও একই সুরে বাঁধা হওয়া চাই নতুবা সে সাড়া দিতে পারিবে না।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাসায়নিক গবেষণার ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল, ঐ বৎসর কয়েকজন মেধাবী ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহারা সকলেই পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, মানিক লাল দে, সত্যেন্দ্র নাথ বসু এবং পুলিন বিহারী সরকার আই. এস-সি. ক্লাসে ভর্তি হন, রসিক লাল দত্ত এবং নীলরতন ধর বি. এস-সি. উপাধির জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। মেঘনাদ সাহাও ঢাকা কলেজ হইতে আই. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই সময়ে ঘোষ, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে বি. এস-সি. ক্লাসে যোগদান করেন। রসিক লাল দত্ত, মানিক লাল দে এবং সত্যেন্দ্র নাথ বসু কলিকাতাতেই পৈতৃক গৃহে লালিত পালিত। ঘোষ, মুখোপাধ্যায়, সরকার, সাহা এবং ধর মফঃস্বল হইতে আসিয়াছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের সংলগ্ন ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকিতেন। তাঁহাদেব মধ্যে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল, যাহা সচরাচর দুর্লভ। তাঁহারা পরস্পরের সুখদুঃখে আপদে বিপদে সঙ্গী ছিলেন। তাঁহাদের চরিত্রে এমনই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে আমি তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার সঙ্গে তাঁহাদেব একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র স্থাপিত হইল। আমি তাঁহাদের হোস্টেলে প্রায়ই যাইতাম এবং বিকালে তাঁহারা প্রায়ই আমার সঙ্গে ময়দানে বেড়াইতেন।

ইঁহাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ রসিকলাল রসায়নবিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইলেন এবং যে সময়ে এম. এস-সি. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন "নাইট্রাইট্‌স্‌" সম্বন্ধে গবেষণায় আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি স্বতন্ত্র পথ বাছিয়া লইলেন এবং শেষ উপাধি পরীক্ষার জন্য মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিল করিলেন। ঐ প্রবন্ধ যথাসময়ে লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১০ সাল হইতে পর পর কতকগুলি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনিই সর্বপ্রথম 'ডক্টর অব সায়েন্স' (ডি. এস-সি.) উপাধি লাভ করেন।

১৯১০ সালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে এবং আমি একটি রত্ন লাভ করি। জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে বি. এস-সি. পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য হন। তিনি প্রচলিত পরীক্ষাপ্রণালী এবং উপাধিলাভের অস্বাভাবিক স্পৃহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসৃষ্ট কোন কলেজে ছাত্ররূপে প্রবেশ কবিতে পাবিলেন না, সুতরাং 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদে'র রাসায়নিক লেবরেটরীতে কিছুদিন কাজ কবিতে লাগিলেন। ব্যবহারিক রসায়ন বিজ্ঞান তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। কয়েকখণ্ড পবিত্যক্ত কাচের নল হইতে তিনি এমন সব যন্ত্র তৈরি করিতে পারিতেন যাহা এতদিন জার্মানি বা ইংলণ্ডের কোন ফার্ম হইতে আনাইতে হইত। জনৈক বন্ধু তাঁহার কৃতিত্ব ও দক্ষতার কথা আমাকে জানান। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম এবং শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম তিনি একজন দুর্লভ গুণসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক কর্মী। 'অ্যামাইন নাইট্রাইট্‌সের' সংশ্লেষণকার্যে তিনি আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় একাদি-

ক্রমে ৯ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করিতেন। শীতের দেশে ইহা সাধারণ হইলেও এই অসহ্য গ্রীষ্মের দেশে বড়ই কঠিন কাজ। তিনিও শীঘ্রই মৌলিক গবেষণায় যোগ্যতার পরিচয় দিলেন এবং তাহার ফলে সরকারী আফিম বিভাগে বিশ্লেষক রূপে প্রবেশ করিলেন।

১৯১০-১১ সালে আমার একটি অপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়। বর্ষার সময়ে বাংলার নিম্নাংশের অনেকখানি বন্যার জলে প্লাবিত হয়। সাধারণতঃ এই বন্যাপ্লাবিত স্থানগুলি ম্যালেরিয়া হইতে মুক্ত থাকে। বস্তুতঃ, এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যেস্থানে বেশী বন্যার প্লাবন হয়, সেই স্থানগুলিই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পায়। যেকগুলি স্থানে বন্যা হয় না কিন্তু উপযুক্ত জলনিকাশের অভাবে খানা ডোবা খাল পুকুর প্রভৃতিতে রুদ্ধ জল জমিয়া থাকে। বর্ষার শেষে এই সমস্ত রুদ্ধ জলাশয় ম্যালেরিয়াবাহী মশকের জন্মস্থান হইয়া দাঁড়ায়, পচা গাছপালা উদ্ভিজ্জ হইতে একরকম বিষাক্ত গ্যাসও বাহির হইতে থাকে। বরাবর আমার একটা নিয়ম এই ছিল যে, আমি গ্রীষ্মাবকাশের কতকাংশ (মে মাসে) আমার স্বগ্রামে কাটাইতাম। ইহার দ্বারা আমি পল্লীজীবনের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম এবং গ্রামবাসী ও কৃষকদের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইত। ঐ বৎসর (১৯১০-১১) দৈবক্রমে বর্ষা একটু আগেই হইয়াছিল। আমাদের গ্রামের স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভায় যোগদান করিবার জন্য আমি ১৫ই জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করিলাম। পরদিনই আমি কলিকাতা যাত্রা করিলাম এবং কলিকাতা পৌঁছিয়াই ম্যালেরিয়ার পালাজ্বরে আক্রান্ত হইলাম। এক বৎসর এইভাবে কাটিল। চিররুগ্ণ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণ বেশী দিন সহ্য করা কঠিন। বন্ধুগণ আমার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং ডাঃ নীলরতন তাঁহার দার্জিলিঙের বাড়ীতে আমাকে পাঠাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তিনবার করিয়া কুইনাইন সেবন করিবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। দার্জিলিঙের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে আমার শরীর ভাল হইল। এই ঘটনাটি আমি প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু বাংলা বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকা "প্রকৃতি"তে একখানি পুরাতন পত্র প্রকাশিত হওয়াতে এই ঘটনা আমার মনে পড়িয়াছে। পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি।

দার্জিলিঙ, গ্লেন ইডেন
১৪।৬।১১

প্রিয় জিতেন,

তোমার ১২ই তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমিই তোমার কাজ সম্বন্ধে জানিবার জন্য তোমাকে পত্র লিখিব বলিয়া মনে করিতেছিলাম। হেমেন্দ্রকে তুমি বলিতে পার যে, 'মেথিল ইথর' সম্বন্ধে তাহার গবেষণাযোগ্য সমাদর লাভ করিবে।

আহত সেনাপতি দূর হইতে যেমন দেখেন ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে এবং তাঁহার বিজয়ী সৈন্যগণ অভিযান করিতেছে, আমার মনের ভাবও কতকটা সেইরূপ।

ভগবানের কৃপায় আমার রোগের বৎসরে বহু অপ্রত্যাশিত এবং গৌরবময় সাফল্যলাভ হইয়াছে। তোমরা এইভাবে ভারতীয় প্রতিভার জীবন্ত শক্তির নিদর্শন জগতের নিকট প্রদর্শন করিতে থাকিবে।

রসিকের কার্যও যে অগ্রসর হইতেছে, ইহা জানিয়া আমি সুখী হইলাম। আশা করি আমি শীঘ্রই তাহার নিকট হইতে তাহার গবেষণার ফলাফল জানিতে পারিব।

গত শুক্রবার ও শনিবার আবহাওয়া বেশ রৌদ্রোজ্জ্বল ছিল। কিন্তু তারপর তিন দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়াছে। গত কল্য হইতে আকাশ আবার পরিষ্কার হইয়াছে।

আমি ভাল আছি। ধীরেন্দ্র জার্মানি হইতে আমাকে পত্র লিখিয়াছে। সে পি-এইচ. ডি. উপাধির জন্য তাহার মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করিবার অনুমতি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছে। কিন্তু আমি আশা করি, তুমি, হেমেন্দ্র ও রসিক কার্যতঃ প্রমাণ করিতে পারিবে যে, এদেশে থাকিয়াও অনুরূপ উচ্চাঙ্গের গবেষণা করা যাইতে পারে।

ভবদীয়
(স্বাঃ) পি. সি. রায়

জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত,
বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্
৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এই পত্রে কি লিখিয়াছিলাম তাহা আমার আদৌ স্মরণ ছিল না। ভারতীয় রসায়ন গোষ্ঠী ধীরে ধীরে কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এই পত্র হইতে তাহারও যোগসূত্রের সন্ধান পাইয়াছি।

এই সময়ে আর একজন যুবক আমার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সিটি কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন, রসায়নবিদ্যা তাঁহার অন্যতম পাঠ্যবিষয় ছিল। উহার প্রতি অনুরাগ বশতঃ তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নশাস্ত্রে এম. এ. পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বিমল বুদ্ধি ছিল এবং রসায়ন শাস্ত্রে শীঘ্রই প্রবেশলাভ করিলেন। তাঁহার আর একটি যোগ্যতা ছিল যাহা আমাদের বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার দখল ছিল এবং টেস্ট টিউবের মত লেখনী ধারণেও তিনি সুপটু ছিলেন। এই কারণে আমার সাহিত্যচর্চায় তিনি অনেক সময়ে সহায়তা করিতে পারিয়াছিলেন। ইনি হেমেন্দ্রকুমার সেন। **Tetra-methylammonium hyponitrite** সম্বন্ধে গবেষণায় তিনি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংসৃষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার যোগ্যতার বিশেষ পরিচয় দেন। পূর্বোক্ত পদার্থের বিশ্লেষণ করিবার জন্য তিনি নিজে একটি প্রণালী উদ্ভাবন করেন। সেনের আর একটি কৃতিত্বের পরিচয় এই যে, তিনি জীবিকার জন্য ছাত্র পড়াইতেন এবং পরে সিটি কলেজে আংশিকভাবে অধ্যাপকের কাজও করিতেন। তাঁহার ছাত্রজীবন গৌরব-

মগ্ন ছিল। এম. এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং প্রেমচাঁদ বৃত্তিও পান। ইহার ফলে তিনি লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্সে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ঐ কলেজেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং অধ্যাপকেরা তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধির জন্য তিনি যে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিল করেন, তাহা খুব উচ্চাঙ্গের। পরে উহা 'কেমিক্যাল সোসাইটি'র জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হেমেন্দ্রকুমারের সহপাঠী আর একজন যুবক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি স্বল্পভাষী, গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন। চলিত কথায় বলে, "স্থির জলের গভীরতা বেশী"—তিনি তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি এম. এস-সি. পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং সেনের সঙ্গে একযোগে কিছু গবেষণাও করেন। কিন্তু তাঁহার বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় পরে পাওয়া যায়। ইঁহার নাম বিমানবিহারী দে। দে এবং সেনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতাম এবং অনেক সময় তাঁহাদিগকে রহস্য করিয়া "হ্যামলেট ও হোরাশিও" অথবা "ডেভিড ও জোনাথান" বলিতাম। দে সেনের দুই বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং 'ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্সে' জৈব রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যথা সময়ে 'ডক্টর' উপাধি পান।

এই সময়ে নীলরতন ধর "ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রী" সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া এম. এস-সি. ডিগ্রী পান। তিনি যে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, তাহা বলা বাহুল্য।

যদিও অজৈব রসায়ন শাস্ত্রেই আমি অধ্যাপনা করিতাম, তথাপি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিবার পর হইতেই, আমি জৈব রসায়নে যে সব নূতন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছিল, সেগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিতে চেষ্টা করিতাম। ১৯১০ সালের পর হইতে জৈব রসায়ন সম্বন্ধে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের আমি অধ্যাপনা করিতাম। বিশেষ ভাবে ইহার ঐতিহাসিক বিকাশই আমার আলোচ্য বিষয় ছিল। রসায়ন শাস্ত্রের এত দ্রুত উন্নতি হইতেছিল এবং ইহার নানা বিভাগ এত জটিল হইয়া উঠিতেছিল যে, একজন লোকের পক্ষে তাহার দুই একটি বিভাগেও অধিকার লাভ করা কঠিন হইয়া পড়িতেছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'স্পেকট্রাম' বিশ্লেষণের কথাই ধরা যাক। বুনসেন এবং কার্চফের পর আংস্ট্রম এবং থেলেন, ক্রুক্স্ এবং হার্টলী প্রভৃতি তাঁহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ এই কার্যে ব্যয় করিয়াছেন। কুরী দম্পতি কর্তৃক রেডিয়াম আবিষ্কারের পর হইতে রসায়নশাস্ত্রের একটি নূতন শাখার উৎপত্তি হইল। বহু বৈজ্ঞানিক এই নূতন বিষয়ের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে বিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি যখন এডিনবার্গে ছাত্র ছিলাম, তখন ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রীর ভ্রূণাবস্থা বলিতে হইবে। কিন্তু অস্টোয়াল্ড, ভ্যাণ্ট হফ এবং আরেনিয়াসের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে এই বিজ্ঞান বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। এবং

ইহারই এক প্রশাখা Colloid Chemistry —অস্টোয়াল্ড, সিগমণ্ডি এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়(২) প্রভৃতির ন্যায় বৈজ্ঞানিকদের হাতে অদ্ভুত উন্নতি সাধন করিয়াছে।

আমি যখন এডিনবার্গে ছাত্র ছিলাম, তখন ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রী কেবল গড়িয়া উঠিতেছিল। এই সময়ে এই বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা আরেনিয়াস স্টকহলম শহরে গবেষণা করিতেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে যে, ঐ সময়ে এই সুইডিশ বৈজ্ঞানিককে গোঁড়া প্রাচীনপন্থী বৈজ্ঞানিকেরা কিভাবে বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন। যথা সময়ে আরেনিয়াসের বৈজ্ঞানিক তথ্য জগতে স্বীকৃত ও গৃহীত হইল। তাঁহার বিদ্রূপকারীরাই তাঁহার প্রধান অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। আমি তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে ২৫ বৎসর পরে আমারই প্রিয় ছাত্র জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এই বিজ্ঞানের বহুল উন্নতি করিবেন, এমনকি আরেনিয়াসের আবিষ্কৃত নিয়মও কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্তিত করিবেন।

১৯১০ সালে 'ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রী' বৈজ্ঞানিক জগতে স্থায়ী আসন লাভ করিল। কিন্তু ১৯০০ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডেও এই বিজ্ঞানের জন্য কোন স্বতন্ত্র অধ্যাপক ছিল না। ভারতে এই বিজ্ঞানের অনুশীলন ও অধ্যাপনাব প্রবর্তক হিসাবে নীলরতন ধরই গৌরবের অধিকারী। তিনি কেবল নিজেই এই বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন নাই; জে. সি ঘোষ, জে. এন মুখাজী এবং আরও কয়েক জনকে তিনি ইহার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। নীলরতন সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া ইউরোপে যান এবং ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্সে ও সোরবোনে শিক্ষালাভ করেন। তিনি উচ্চাঙ্গের মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া লণ্ডন ও প্যারী এই উভয় বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতেই ডক্টর উপাধি লাভ করেন।

১৯১২ সালে লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট আমাকে এবং দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি করেন।

লণ্ডনে থাকিবার সময় আমি অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। তাহাতে রসায়নজগতে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ইংলণ্ডে আসিবার পূর্বে কলিকাতায় থাকিতেই এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া আমি সাফল্যলাভ করি। সৌভাগ্যক্রমে নীলরতন ধর আমার সহযোগিতা করেন এবং তিনকড়ি দে নামক আর একটি যুবকও আমার সঙ্গে ছিলেন। এই গবেষণায় প্রায় দুইমাস সময় লাগিয়াছিল, কোন কোন সময়ে একাদিক্রমে ১০।১২ ঘণ্টা পরীক্ষাকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। কিন্তু বিষয়টি এমনই কৌতূহলপ্রদ যে কাজ করিতে করিতে আমাদের সময়ের জ্ঞান থাকিত না। প্রত্যহ পরীক্ষাকার্যের পর নীলরতন ধর যখন ফলাফল হিসাব করিতেন, তখন আমি অধীর আনন্দে প্রতীক্ষা করিতাম।

লণ্ডনে আমি কেমিক্যাল সোসাইটির সভায় এই প্রবন্ধ পাঠ করি। সভায় বহু

---

(২) ১৯২০ সালের ৪ঠা নভেম্বরের 'নেচার' (৩২৭-২৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন—ফ্যারাডে এবং ফিজিক্যাল সোসাইটির যুক্ত অধিবেশনে কোলয়েড সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মিঃ জে. এন. মুখার্জীর প্রবন্ধই প্রধান, কেননা ইহাতে বহু নূতন তত্ত্বের উল্লেখ ছিল।'

সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধটি রাসায়নিকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে আমাকে সানন্দে অভিনন্দিত করেন। ডাঃ ভেলী তাঁহার বক্তৃতায় উচ্চ প্রশংসা করেন।

"ডাঃ ভি. এইচ. ভেলী অধ্যাপক রায়কে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলেন 'তিনি (অধ্যাপক রায়) সেই আর্যজাতির খ্যাতনামা প্রতিনিধি—যে জাতি সভ্যতার উচ্চস্তরে আরোহণ করতঃ এমন এক যুগে বহু রাসায়নিক সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যখন এদেশ (ইংলণ্ড) অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অধ্যাপক রায় অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট সম্বন্ধে যে সত্য প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা প্রচলিত মতবাদের বিরোধী।' উপসংহারে ডাঃ ভেলী ডাঃ রায় এবং তাঁহার ছাত্রগণকে অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভাপতিও ডাঃ ভেলীর উক্তি সমর্থন করিয়া ডাঃ রায় এবং তাঁহার ছাত্রগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।"—The Chemist and Druggist.

এই সময়ে রস্কোর বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল, তিনি কোন সভা সমিতিতে যাইতেন না। কিন্তু তিনি যখন এই গবেষণার ফল শুনিলেন, তখন বলিলেন "বেশ হইয়াছে!"

বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেস লর্ড রোজবেরী কর্তৃক উদ্বোধিত হয় এবং স্যার জোসেফ টমসন প্রথমদিনের আলোচনা আরম্ভ করেন। কয়েকজন প্রসিদ্ধ বক্তা তাহার পর আলোচনায় যোগদান করেন। সর্বাধিকারী আমার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম এবং বলিলাম যে বৃহৎ সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিলে আমি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি। তাঁহার (সর্বাধিকারীর) বাগ্মিতা আছে, সুতরাং তিনিই বক্তৃতা দিবার ভার গ্রহণ করুন, আমি নীরব হইয়াই থাকিব। সর্বাধিকারী অটল-সঙ্কল্প। তিনি বলিলেন যে আলোচ্য বিষয়ে বক্তৃতা করিবার যোগ্যতা আমারই আছে এবং আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই তিনি একটুকরা কাগজে আমার নাম লিখিয়া সভাপতির নিকট দিলেন। আমাকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করা হইলে, আমি সভাপতির আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলাম এবং যথাসাধ্য বক্তৃতা করিলাম। আমি মাত্র ৫ মিনিট বক্তৃতা করিয়াছিলাম এবং আমার সেই বক্তৃতা সভার কার্যবিবরণী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপনিবেশ হইতে আগত প্রতিনিধিগণ অধ্যাপক এইচ. বি. অ্যালেন (মেলবোর্ন) এবং অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক অ্যালেন (মানিটোবা) যে সব মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহা আমি সমর্থন করিতেছি।

"ভারতীয় গ্রাজুয়েট ও ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-গ্রাজুয়েট অবস্থায় অধ্যয়ন ও গবেষণা করিতে আসিলে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। ভারতীয় গ্রাজুয়েটের যোগ্যতা অধিকতর উদারতার সহিত স্বীকার করা হইবে, ইহাই আমি প্রার্থনা করি। আমার আশঙ্কা হয়, কেবলমাত্র ভারতীয় ছাত্র বলিয়াই তাহাকে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা হয়। রসায়ন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা বলিবার আমার কিছু

অধিকার আছে। সম্প্রতি কলিকাতায় বহু প্রতিভাবান ছাত্র রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে পোস্ট-গ্রাজুয়েট অধ্যয়ন অবস্থায়ও গবেষণা করিতেছেন। তাঁহাদের লিখিত মৌলিক প্রবন্ধ ব্রিটিশ জার্নালসমূহে স্থান পাইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের কিছু যোগ্যতা আছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত গবেষণাকারী ছাত্র যখন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও উপাধিলাভের জন্য আসে, তখন তাহাদিগকে সেই পুরাতন রীতি অনুসারে প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়। ইহার ফলে আমাদের যুবকদের মনে উৎসাহ হ্রাস পায়। পূর্ববর্তী জনৈক বক্তা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এইরূপ ছাত্রকে নিজের নির্বাচিত কোন অধ্যাপকের অধীনে শিক্ষানবিস থাকিতে হইবে এবং উক্ত অধ্যাপক তাহার কার্যে সন্তুষ্ট হইলে, তাহার মৌলিক প্রবন্ধ বিচার করিয়া তাহাকে সর্বোচ্চ উপাধি দেওয়া হইবে। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

"স্যার জোসেফ টমসন বলিয়াছেন যে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রকে উৎসাহ দিবার জন্য যোগ্য বৃত্তি প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ কতকগুলি ইতিমধ্যেই স্থাপন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি করিবেন, আশা করা যায়। কিন্তু আমি ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাগত প্রতিনিধিদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ভারতে আমরা স্মরণাতীত যুগ হইতে উচ্চ চিন্তা ও সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের আদর্শ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি এবং অপেক্ষাকৃত সামান্য বৃত্তি ও দানের সাহায্যেই আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যথেষ্ট উন্নতির আশা করিতে পারি।

"মাননীয় সভাপতি মহাশয়, ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষাও সেইরূপ উচ্চশ্রেণীর একথা আমি বলিতে চাই না, বস্তুতঃ আমরা আপনাদের নিকট অনেক বিষয় শিখিতে পারি কিন্তু যথেষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতি ও অভাব সত্ত্বেও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এমন অনেক লোককে গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহারা দেশের গৌরব ও অলঙ্কারস্বরূপ। কলিকাতার সর্বপ্রধান আইনজ্ঞ,—যাঁহার আইনজ্ঞানের গভীরতা ভারতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। কলিকাতার তিনজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক—যাঁহারা ব্যবসায়ে অসামান্য সাফল্য অর্জন করিয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলর—যিনি উপর্যুপরি বড়লাট কর্তৃক ভাইস্-চ্যান্সেলর মনোনীত হইয়াছেন—সেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট।

"মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে পুনর্বার আমাদের দেশের কলেজসমূহে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, আপনাদিগকে তাহার অধিকতর সমাদর করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

আমার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সুফল হইয়াছিল, মনে হয়। অধিবেশন শেষ হইলে, মাস্টার অব্ ট্রিনিটি ডাঃ বাটলার সর্বাধিকারী ও আমার সঙ্গে পরিচয় করিলেন এবং

বলিলেন, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার সময় আমরা যেন তাঁহার অতিথি হই।

আমি প্রথমেই এই ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় (কেম্‌ব্রিজ) দেখিতে গেলাম। সর্বাধিকারী আমার একদিন পূর্বে গিয়াছিলেন। আমি কেম্‌ব্রিজে পৌঁছিলে, সর্বাধিকারীকে সঙ্গে করিয়া মাস্টার অব্‌ ট্রিনিটি স্টেশনে আসিলেন এবং আমাকে গাড়ীতে করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। কিছু জলযোগের পর তিনি আমাদিগকে ট্রিনিটি কলেজের একটি ছোট ঘরে লইয়া গেলেন। ঘরটি একটি ছোটখাট মিউজিয়মের মত, বহু প্রাচীন ও মূল্যবান নিদর্শন সেখানে রক্ষিত আছে। আমার যতদূর মনে হয়, 'লালে গ্রো'র (L' Allegro) পাণ্ডুলিপির কয়েকপাতা আমি সেখানে দেখিয়াছি। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন যে সমস্ত যন্ত্রপাতি লইয়া জ্যোতিষ ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহাও একটি মানমন্দির বা গবেষণাগারে রক্ষিত আছে।

ডাঃ বাটলার প্রাচীন সাহিত্যে সুপণ্ডিত, মধুর প্রকৃতির লোক। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতদের কথা আমার মনে পড়িল। তিনি গল্প করিলেন, সেকালে জজেরা যখন কেম্‌ব্রিজে আদালত বসাইতেন, তাঁহাদের দলবল ট্রিনিটি কলেজের রসুইখানা ইত্যাদি দখল করিয়া লইত। আমার বিশ্বাস, এখনও ঐ প্রাচীন প্রথা আছে। ইংলণ্ডের রাজা এখনও প্রতি বৎসর যখন কেম্‌ব্রিজে 'রিভিউ' দেখিতে আসেন, তখন তিনি ট্রিনিটি কলেজের অতিথি হন। মাস্টার আমাদের থাকিবার জন্য ঘর ঠিক করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে দেখাইলেন, পাশের একটি ঘর রাজার অভ্যর্থনার জন্য সাজানো হইতেছে।

বাহির হইতে কংগ্রেসে আগত প্রতিনিধিগণ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার জন্য বাছিয়া লইতে পারেন এবং ঐ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহারা অতিথিরূপে গণ্য হন। আমি উত্তর ইংলণ্ডের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় দেখিব ঠিক করিলাম। উহার মধ্যে শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় একটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অপেক্ষাকৃত নূতন এবং অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ বা এডিনবার্গের মত ইহার তেমন প্রাচীনতার খ্যাতিও নাই। সেজন্য ইহা দেখিবার জন্য কম প্রতিনিধিই যাইতেন। আমার বাল্যকালে শেফিল্ড রজার্সের ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতির কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, ঐগুলি বাংলাদেশে সে সময়ে খুব ব্যবহৃত হইত। শেফিল্ড এখন খুব বড় শহর হইয়া উঠিয়াছে, অসংখ্য কলকারখানা এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ভিকার্স ম্যাক্সিন এণ্ড কোম্পানির কারখানা এখানে। শেফিল্ড অতিথিগণের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ দিন সকাল বেলায় একমাত্র অতিথি গিয়াছিলাম আমি। একটা কৌতুককর ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। স্টেশনে নামিলে, পোর্টার আমার মালপত্র একটা টানাগাড়ীতে তুলিয়া লইল এবং বলিল যে কোন ট্যাক্সি ভাড়া করিবার দরকার নাই, কেননা নিকটেই অনেকগুলি হোটেল আছে। আমি কোন্‌ হোটেলে যাইতে চাই, তাহাও সে জিজ্ঞাসা করিল। আমি কোন হোটেলের নাম করিতে পারিলাম না,—কেবল সম্মুখের ছোট হোটেল দেখাইয়া

দিলাম। পোর্টার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—"ও হোটেল আপনার যোগ্য নয়।" আমি তাহার উপরই ভার দিলাম এবং সে আমাকে নিকটবর্তী একটি ফ্যাশনেবল হোটেলে লইয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসে আমার আগমন সংবাদ দিলে,—সকলেই আমার অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ভাইস্-চ্যান্সেলর অধ্যাপক হিক্স্ এবং সমস্ত অধ্যাপক আমাকে লইয়া গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ দেখাইলেন। যে হোটেলে আমি ছিলাম, সেখানেই তাঁহারা আমার সম্মানার্থ লাঞ্চের আয়োজন করিলেন। সন্ধ্যার পর একটি চমৎকার অনুষ্ঠান হইল। টাউন হলে বিরাট ভোজের আয়োজন হইল এবং 'মাস্টার কাটলার' আমার এবং কানাডার একজন প্রতিনিধির সম্বর্ধনার প্রস্তাব করিলেন। কানাডার প্রতিনিধিটি অপরাহ্নের দিকে শেফিল্ডে পৌঁছিয়াছিলেন। সুতরাং সমস্তদিন অতিথিরূপে একমাত্র আমিই রাজোচিত আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছিলাম। এই জন্যই বলিয়াছি যে 'দুর্ভাগ্যক্রমে অতিথিরূপে একমাত্র আমি সকালবেলা শেফিল্ডে গিয়াছিলাম।' উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে যোগ দিতে আমার স্বভাবতঃই সঙ্কোচ হয়।

লণ্ডনে "ওয়ারশিপফুল ফিসমঙ্গার্স কোম্পানি" (মৎস্য ব্যবসায়ী) অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য একটি ভোজ দিয়াছিলেন। এই ফিসমঙ্গার্স কোম্পানি এবং ভিণ্টার্স কোম্পানি, মার্চেণ্ট টেলার্স কোম্পানি প্রভৃতি প্রভূত ঐশ্বর্যশালী এবং বহু পুরাতন। এই সব ভোজ এত ব্যয়বহুল যে, ভারতবাসীদের নিকট তাহা রূপকথার মত বোধ হয়। ফিসমঙ্গার্স কোম্পানির একটি ভোজ সভা প্রসঙ্গে মেকলে লিখিয়াছেন—"একবার তাহাদের ভোজে জন প্রতি প্রায় দশ গিনি (১৫০৲ টাকা) ব্যয় হইয়াছিল।" (মেকলের জীবনী, প্রথম খণ্ড, ৩৩৭ পৃঃ)। আর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "ভোজের সম্বন্ধে এই কোম্পানিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" (জীবনী, ৩৩৬ পৃঃ)। এই সব কোম্পানির শহরে এবং অন্যান্য স্থানে ভূসম্পত্তি আছে, উহার মূল্য বর্তমানকালে প্রায় সহস্রগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ভোজের খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় এগারটি পদ ছিল, প্রথমে 'সুপ' এবং প্রত্যেক পদের শেষে উৎকৃষ্ট মদ্য। এইসব মদ্য প্রায় অর্ধশতাব্দী বা তার বেশী মাটির নিচে পাত্রে রক্ষিত এবং ভোজের সময়ে খোলা হইয়াছিল। এই সব অনুষ্ঠানে বহু প্রাচীন প্রথা অনুষ্ঠিত হয়, যথা "কাপ অব লভের" অনুষ্ঠান। সেকালে এই অনুষ্ঠানের সময়, অতিথিরা অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়া পরস্পরের সঙ্গে কলহ করিত। এমনকি পরস্পরকে অস্ত্র দ্বারা আহতও করিত। কাপটি বৃহদাকার, ধাতুনির্মিত। ইহা মদ্যপূর্ণ করা হইত এবং প্রত্যেক অতিথি উহা হইতে একটু মদ্য আস্বাদ করিয়া, তাহার পাশের লোকের হাতে দিত। ইহা শান্তি ও সদিচ্ছার প্রতীক স্বরূপ। আমি মদ্যপান করিনা, সুতরাং কেবল মুখের নিকট তুলিয়া ধরিয়া অন্যের হাতে দিলাম।

কংগ্রেসের অধিবেশনের সমকালে রয়েল সোসাইটির ২৫০তম বার্ষিক উৎসবও হইতেছিল। আমি এই উৎসবেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলাম। সুতরাং ইহার কয়েকটি অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়াছিলাম।

লণ্ডনের লর্ড মেয়র রয়্যাল সোসাইটির সদস্যগণ এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে গিল্ড হলে এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে একটি বিরাট ভোজ দিবার আয়োজন করিলেন। আমিও ঐ ভোজে লর্ড মেয়রের অতিথিরূপে যোগ দিলাম। রাজাও উইণ্ডসর প্রাসাদে অতিথিদের সম্বর্ধনা করিলেন। বহু-বিস্তৃত সবুজ তৃণমণ্ডিত মাঠ এবং বৃক্ষের সারি আমার নিকট বড় মনোরম বোধ হইল।

ডাঃ বিমানবিহারী প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম. এস-সি. উপাধি লাভ করিয়া এই সময়ে লণ্ডনে 'ডক্টর' উপাধির জন্য অধ্যয়ন করিতেছিলেন। আমার লণ্ডন বাস কালে তিনি আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময়ে পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আমি একখানি পত্র পাইলাম। এই পত্র ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ভবিষ্যতের পক্ষে বিপুল আশাসূচক, কেননা ইউনিভার-সিটি কলেজ অব সায়েন্স (বিজ্ঞান কলেজ) প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাষ এই পত্রে ছিল। নিম্নে পত্রখানির অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :—

সিনেট হাউস, কলিকাতা
২৫শে জুন, ১৯১২

প্রিয় ডাঃ রায়,

আপনার স্মরণ থাকিতে পাবে যে, গত ২৪শে জানুআরি তাবিখে সিনেটের সম্মুখে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদের প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তখন আপনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তখন আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়াছিলাম যে,—শীঘ্রই হয়ত বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য ব্যবস্থাও হইবে। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে এবং আপনার ও আমার উচ্চাশা পূর্ণ হইয়াছে। আমরা একটি পদার্থবিদ্যার, ও আর একটি রসায়নশাস্ত্রের— দুইটি অধ্যাপক পদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমরা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় সংসৃষ্ট একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের সঙ্কল্পও করিয়াছি। মিঃ পালিতের মহৎ দান এবং তাহার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজার্ভ ফণ্ড হইতে আরও আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া, আমরা এইসব ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি। গত শনিবার আমি সিনেটের সম্মুখে যে বিবৃতি দিয়াছি, তাহাতে এইসব বিষয় পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে। উহার একখানি নকল আপনাকে পাঠাইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রথম রসায়নাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য আমি আপনাকে এখন মহানন্দে আহ্বান করিতেছি। আমার বিশ্বাস আছে যে আপনি এই পদ গ্রহণ করিবেন। বলা বাহুল্য, আমি এরূপ ব্যবস্থা করিব যাহাতে আর্থিক দিক হইতে আপনার কোন ক্ষতি না হয়। আপনি ফিরিয়া আসিলেই, আপনার সহায়তায় আমরা প্রস্তাবিত গবেষণাগাবেব পরিকল্পনা গঠন করিব এবং যতশীঘ্র সম্ভব উহা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা কবিব। আপনি যদি ফিরিবার পূর্বে গ্রেট-ব্রিটেন ও ইউরোপের কতকগুলি উৎকৃষ্ট গবেষণাগার দেখিয়া আসেন, তবে কাজের সুবিধা হইবে।

আপনাকে "সি. আই. ই" উপাধি দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি, কিন্তু আমি মনে করি যে, ইহা দশ বৎসর পূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল।

আশাকরি আপনি ভাল আছেন এবং ইংলণ্ড ভ্রমণে আপনার উপকার হইয়াছে।

ভবদীয়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আমি যে উত্তর দিয়াছিলাম, তাহার নকল আমি রাখি নাই। কিন্তু যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে নিম্নলিখিত মর্মে আমি উত্তর দিয়াছিলাম :—"প্রস্তাবিত বিজ্ঞান কলেজের দ্বারা আমার জীবনের স্বপ্ন সফল হইবে বলিয়া আমি মনে করি এবং এই কলেজে যোগ দেওয়া এবং ইহার সেবা করা আমার কেবল কর্তব্য নয়, ইহাতে আমার পরম আনন্দও হইবে।"

কলিকাতায় ফিরিয়া আমি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাঁহার বিজ্ঞান কলেজের স্কীম সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিব, এই প্রতিশ্রুতি দিলাম। কলেজ খোলা হইলেই আমি তাহাতে অধ্যাপকরূপে যোগদান করিব, ইহাও বলিলাম। ইতিমধ্যে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্রকে ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রধান প্রধান লেবরেটরী দেখিয়া একটি লেবরেটরীর প্ল্যান প্রস্তুত করিবার জন্য নিয়োগ করা হইল। তিনি আমার একজন ভূতপূর্ব ছাত্র এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন শাস্ত্রে সর্বোচ্চ উপাধি লইয়া তিনি বার্লিন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার 'ডক্টর' উপাধি লইয়া তিনি সবে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

১৯১২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেস হইতে ফিরিবার পর, আমার সহকর্মী ও ছাত্রেরা আমাকে একটি প্রীতি-সম্মেলনে সম্বর্ধনা করেন। মিঃ জেমস সেই সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন :—

"বৈজ্ঞানিক হিসাবে ডাঃ রায়ের কার্যাবলী বর্ণনার স্থল ও সময় এ নহে। তাঁহার কার্যাবলী সহজেই চার ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, ডাঃ রায়ের রাসায়নিক আবিষ্কার, যে সমস্ত মৌলিক গবেষণার দ্বারা তিনি জগতের রসায়নবিৎদের মধ্যে সম্মানের আসন লাভ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস। এবিষয়ে ইহা প্রামাণিক গ্রন্থ, প্রাচীন ভারত রসায়ন বিদ্যায় কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এই গ্রন্থ বিজ্ঞান-জগতের নিকট তাহার পরিচয় দিয়াছে। তাঁহার আর একটি বিশেষ কৃতিত্ব, বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা, ইহা একটি প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হইতেছে। বর্তমান যুগে বাংলার তথা ভারতের একটা প্রয়োজনীয় বিষয় যে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ডাঃ পি. সি. রায় ব্যবসায়ী নহেন, তিনি বৈজ্ঞানিক। কিন্তু ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ীরা যে স্থলে ব্যর্থকাম, সে স্থলে তিনি একটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রাসায়নিক জ্ঞান ও প্রতিভা এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় নিয়োজিত করিয়া তিনি ইহাকে ব্যবসায়ের

দিক দিয়া সফল করিয়া তুলিয়াছেন এবং অংশীদার রূপে অন্য লোকে এখন ইহার লভ্যাংশ ভোগ করিতেছে। তাঁহার আর একদিকে কৃতিত্ব—এবং আমার মতে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব—ডাঃ রায় আমাদের এই লেবরেটরীতে একদল যুবক রসায়নবিৎকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার আরব্ধ কার্য এই সমস্ত শিষ্যপ্রশিষ্যেরাই চালাইবে। এই জন্যই একজন বিখ্যাত ফরাসী অধ্যাপক এই লেবরেটরী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—ইহা বিজ্ঞানের সূতিকাগার, এখান হইতে নব্য ভারতের রসায়নবিদ্যা জন্মলাভ করিতেছে।" (প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন।)

এই সমস্ত উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ কথা শুনিয়া আমি সত্যই সংকোচ বোধ করিতেছিলাম। এই সমস্ত কথা আমি উদ্ধৃত করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে মিঃ জেমস সাহিত্যসেবী হইলেও বিজ্ঞান বিভাগে যে সমস্ত কাজ হইতেছিল, তাহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তিনি সম্যক অনুভব করিতে পারিতেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় রসায়ন গোষ্ঠী—প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ—অধ্যাপক ওয়াটসন এবং তাঁহার ছাত্রদের কার্যাবলী—গবেষণা বিভাগের ছাত্র—ভারতীয় রসায়ন সমিতি

আমি যথারীতি প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার কাজ করিতে লাগিলাম। জে. সি. ঘোষ, জে. এন. মুখুয্যে এবং মেঘনাদ সাহা এই সময় উদীয়মান বৈজ্ঞানিক। বিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা এই সময়ে দত্ত ও ধরের আবিষ্কারসমূহের উল্লেখ করিতেছিলেন। পরবর্তীগণের মনে যে তাহা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমশঃই অধিক সংখ্যক কৃতবিদ্য ছাত্র এই দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং গবেষণার প্রতি তাহাদের আগ্রহ দেখা যাইতে লাগিল। ইঁহাদের মধ্যে মানিকলাল দে, এফ. ভি. ফার্নাণ্ডেজ এবং রাজেন্দ্রলাল দে-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা কেহ কেহ স্বতন্ত্র ভাবে এবং কখনও বা যুক্তভাবে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

১৯১৪ সালে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহার প্রভাব আমাদের লেবরেটরীতে শীঘ্রই আমরা অনুভব করিলাম, কেননা বাহির হইতে রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি বন্ধ হইয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের প্রবীণ ডিমনস্ট্রেটর পরলোকগত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের দূরদৃষ্টি বশতঃ আমাদের ভাণ্ডারে যথেষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য মজুত ছিল। আমরা তাহারই উপর নির্ভর করিয়া কাজ চালাইতে লাগিলাম। আমাদিগকে অবশ্য বাধ্য হইয়া গবেষণা কার্যের জন্য কতকগুলি বিশেষ দ্রব্য তৈরি করিয়া লইতে হইল। ইহা আমাদের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপই হইল, কেননা ইহার ফলে অনেক নূতন ছাত্র রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর রহস্য অবগত হইবার সুযোগ লাভ করিলেন।

১৯১১ সালে আর একজন উৎসাহী ও শক্তিমান যুবক আমার লেবরেটরীতে যোগদান করিলেন। ইঁহার নাম প্রফুল্লচন্দ্র গুহ। তিনি সেই সময়ে ঢাকা কলেজ হইতে রসায়নে 'স-সম্মানে' বি. এস-সি. পরীক্ষায় পাস করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্যবস্থা অনুসারে অধ্যাপক ওয়াটসনের অধীনেই তাঁহার গবেষণা করিবার কথা। কিন্তু অধ্যাপক ওয়াটসন সেই সময় ছুটি লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। হতাশ হইয়া প্রফুল্ল আমার নিকট করুণ আবেদন করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন যে, তাঁহার ছাত্রজীবন অকালে শেষ হইবার উপক্রম এবং তিনি আমার অধীনে গবেষণা করিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে আমার লেবরেটরীতে সাদরে আহ্বান করিলাম এবং তিনি আমার সহকর্মীরূপে কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। গুহ অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন এবং

রাসায়নিক গবেষণায় তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। যথাসময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও সগৌরবে উত্তীর্ণ হইলেন। এম. এস-সি. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিলেন এবং তিনবৎসর পরে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিলেন। তিনি 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তিও পাইলেন।

এই সময়ে আমার কর্মজীবনে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। প্রেসিডেন্সি কলেজেই আমার কার্যজীবনের প্রধান অংশ অতিবাহিত হইয়াছিল। এখন আমাকে সেই কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। ঐ কলেজের প্রত্যেক স্থানেই আমার কর্মজীবনের অতীত স্মৃতি জড়িত। কিন্তু কলেজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্বে, ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল এইচ. আর. জেমসের যোগ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে আমি বিস্মৃত হইব না। তিনি অক্সফোর্ডের ব্যালিওল কলেজের ফেলো ছিলেন এবং বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের জন্যই বিশেষ ভাবে তিনি আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য উচ্চাঙ্গের এবং দৃষ্টিও উচ্চাঙ্গের ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেবল নামে নয়, কার্যতঃ দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজরূপে পরিণত করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, গবেষণাবৃত্তি স্থাপনের সঙ্গে মৌলিক গবেষণা কার্যের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু এই উক্তিরও সীমা আছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দুই একজন ব্যতীত আমার ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা ইউরোপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই উক্ত বৃত্তিধারী ছিলেন না। গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করিবার পর তাঁহারা কোন বৃত্তি বা সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াই নিজেদের কর্তব্যে নিযুক্ত হইলেন। যাঁহার মনে মৌলিক গবেষণার আগ্রহ জন্মে এবং কোন বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা হয়, তিনি কোন বৃত্তি বা সাহায্য না পাইলেও, তাঁহার কর্তব্য ত্যাগ করেন না। উইলিয়াম র‍্যামজে একবার বলিয়াছিলেন যে, বৃত্তি কতকটা উৎকোচের মত। বৃত্তিধারী তিন বৎসরের একটা স্থায়ী আয় লাভ করিয়া যেন তেন প্রকারে গবেষণা কার্য করিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহার মন থাকে অন্য দিকে এবং অধিকতর অর্থকরী কার্যের জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিতে থাকেন। এইরূপ ব্যক্তি সুযোগ পাইলেই গবেষণাক্ষেত্র ত্যাগ করেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমি পরিচিত। কিন্তু যিনি মনের ভিতরে সত্যানুসন্ধানের প্রেরণা পাইয়াছেন, তিনি যেরূপ অবস্থাতেই হউক না কেন, কর্তব্যে দৃঢ় থাকেন। যদি তিনি দরিদ্র হন, তবে সকাল সন্ধ্যায় গৃহশিক্ষকের কাজ করিয়াও অর্থ উপার্জন করেন এবং অন্য সমস্ত সময় গবেষণার জন্য ব্যয় করেন। এমার্সন যথার্থই বলেন, "তাহার (মানুষের) চরিত্রের মধ্যে কি কর্তব্যের আহ্বান নাই? প্রত্যেকেরই নিজ কর্তব্য আছে। প্রতিভাই কর্তব্যের আহ্বান।" যাঁহার ভিতরে গবেষণা কার্যের কোন অনুপ্রেরণা জাগে নাই, কেবল মাত্র বৃত্তির লোভে তাঁহার পক্ষে গবেষণার কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।

রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণাবৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এম. এস-সি.

পাস করিবার পরও কলেজের লেবরেটরীতে তাঁহাদিগকে গবেষণা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। প্রিন্সিপ্যাল জেমস অনেক সময়ে বলিতেন,—এরূপ কৃতী ছাত্রেরা যে কলেজের সঙ্গে কিছুকালের জন্য সংসৃষ্ট থাকিবেন, ইহা কলেজের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। তিনি কলেজের এইসব কৃতী ছাত্রদের গবেষণা কার্যে গৌরব অনুভব করিতেন।

এই সময় প্রচার হইতে লাগিল, যে একটি স্কুল অব কেমিস্ট্রী বা 'রসায়ন গোষ্ঠী' গড়িয়া উঠিতেছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, দত্ত, রক্ষিত, এবং ধরের মৌলিক গবেষণা ইংলন্ড, জার্মানি ও আমেরিকার রাসায়নিক পত্রসমূহে ঐ সব দেশের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা উল্লিখিত হইতেছিল। ইহাতে মনে মনে আমি বেশ আনন্দ অনুভব করিতাম। আমার ইংলন্ড হইতে ফিরিবার কিছুদিন পরে বিহারের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ জেনিংস আমাদের রসায়ন বিভাগ দেখিতে আসিলেন। নানাবিষয়ে কথা বলিতে বলিতে তিনি প্রসঙ্গতঃ বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, আপনি রসায়ন বিদ্যাগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার মূল কারণ।" এই প্রথম এই বিষয়টির প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল এবং এখন পর্যন্ত আমার স্মৃতিপথ হইতে উহা লুপ্ত হয় নাই।

বিলাতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্র "নেচার" এই বিষয়টি স্বীকার করেন; উক্ত পত্রের ২৩শে মার্চ, ১৯১৬ তারিখের সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল—

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে, বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত হইতেছে। গত ১০ই জানুআরি তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের 'ডীন' যে বক্তৃতা করেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গত ২০ বৎসরে বাংলা-দেশে রসায়ন সম্বন্ধে যে সব মৌলিক গবেষণা করা হইয়াছে, এই বক্তৃতায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে ১২৬টি গবেষণার নাম দেওয়া হইয়াছে: কেমিক্যাল সোসাইটি, জার্নাল অব দি আমেরিকান সোসাইটি প্রভৃতিতে এই সকল মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে অনেক-গুলি খুব মূলবান এবং নব প্রতিষ্ঠিত রসায়নবিদ্যাগোষ্ঠীর কার্যাবলীর পরিচয় এইগুলিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক রায়ের কার্য এবং দৃষ্টান্তের ফলেই এই 'বিদ্যাগোষ্ঠী'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অধ্যাপকের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক "হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস" ১৩ বৎসর পূর্বে লেখা হইয়াছিল। উহাতে তিনি প্রমাণ করেন যে প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভাব ছিল। হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'তন্ত্র' প্রভৃতিতে ইহার পরিচয় আছে। অধ্যাপক রায়ের মত লোক—যিনি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং নব্য রসায়নী বিদ্যাতেও পারদর্শী—তিনিই কেবল এইরূপ গ্রন্থ লিখিতে পারেন। এই গ্রন্থে অধ্যাপক রায় দুঃখ করেন যে, ভারতে বৈজ্ঞানিক ভাবের অবনতি ঘটিয়াছে এবং যে জাতি স্বভাবতঃই দার্শনিকতা-প্রবণ, তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-স্পৃহার অভাব হইয়াছে। এখন অধ্যাপক রায় বলিতেছেন, 'দশ বার বৎসরের মধ্যেই আমাদের দেশবাসীর শক্তি সম্বন্ধে আমার ধারণা যে পরিবর্তিত হইবে, এবং জাতির জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।' বাংলাদেশে

বর্তমানে যে সব মৌলিক রাসায়নিক গবেষণা হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে একটা নূতন ভাব জাগ্রত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে এই ভাব ক্রমশঃ ভারতের অন্যান্য অংশেও বিস্তৃত হইবে এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধেও এই মৌলিক গবেষণা-স্পৃহার উদ্ভব হইবে।"

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রীর অধ্যাপক এস. এস. ভাটনগরও তাঁহার একটি বক্তৃতায় ভারতে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রীর প্রবর্তকগণের অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এখন আমার অবসর গ্রহণ করিয়া নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করিবার সময় আসিল। সাধারণ নিয়মে আরও এক বৎসর আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের কাজে থাকিতে পারিতাম, কেন না আমার বয়ঃক্রম তখনও ৫৫ বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

আমার অবসর গ্রহণের সময় ছাত্রেরা আমাকে যে সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন, এবং আমি তাহার যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখযোগ্য।

"মহাত্মন্,

"প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আপনার অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে আপনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন গ্রহণ করুন।

"কলেজে আপনার যে স্থান ছিল, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। ভবিষ্যতে আরও অনেক অধ্যাপক আসিবেন; কিন্তু আপনার সেই মধুর প্রকৃতি, সেই সরলতা, অক্লান্ত সেবার ভাব, উদার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা, তর্ক ও আলোচনায় সেই গভীর জ্ঞান, এই সমস্ত গুণ আমরা কোথায় পাইব? গত ৩০ বৎসর ধরিয়া এই সমস্ত দুর্লভ গুণেই আপনি ছাত্রদের প্রীতি অর্জন করিয়াছেন।

"আপনার কৃতিত্ব অসামান্য। আপনার সরল জীবন যাপন প্রণালী আমাদিগকে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আপনি চিরদিনই আমাদের বন্ধু, গুরু ও পথ-প্রদর্শক ছিলেন। সকলেই আপনার কাছে প্রবেশ করিতে পারে। আপনার প্রকৃতি সর্বদাই মধুর। দরিদ্র ছাত্রদিগকে কেবল সৎপরামর্শ দিয়া নহে, অর্থ দ্বারাও আপনি সহায়তা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। কঠোর ব্রহ্মচর্যপূত অনাড়ম্বর জীবন আপনার, আপনার দেশপ্রেমের বাহ্য আড়ম্বর নাই। কিন্তু উহা গভীর,—আপনার মধ্যে আমরা প্রাচীন ভারতের গুরুর আদর্শেরই পুনরাবির্ভাব দেখিতেছি।

"যখন ভারতের বর্তমান যুগের জ্ঞানোন্নতির ইতিহাস লেখা হইবে, তখন ভারতে নব্য রসায়নী বিদ্যার প্রবর্তক রূপে আপনার নাম সর্বাগ্রে সগৌরবে উল্লিখিত হইবে। এদেশে মৌলিক রাসায়নিক গবেষণার জন্মদাতা এবং বৈজ্ঞানিক ভাবের জন্মদাতা-রূপে যশ ও গৌরব আপনারই প্রাপ্য। আপনার 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থ ভারতীয় কীর্তি-মালার এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে ও অতীতের অন্ধকারের

উপর আলোকের সেতু রচনা করিয়াছে, এবং তাহার ফলে নবীন বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীন নাগার্জুন ও চরকের সঙ্গে জ্ঞানরাজ্যে মৈত্রী স্থাপনের সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

"আপনি এর চেয়েও বেশি করিয়াছেন। রাসায়নিক গবেষণাকে আপনি দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প প্রচেষ্টা বাহিরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াও কিরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারে, বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

"জীবন-সায়াহ্নে লোকে সাধারণতঃ যখন অবসর অন্বেষণ করেন, তখনও আপনি কার্যক্ষেত্রে থাকিতেই সঙ্কল্প করিয়াছেন। এক যুগ পূর্বে আপনি যে বিজ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা অনির্বাণ রাখিবার জন্য আপনি আগ্রহান্বিত। বিজ্ঞান কলেজ এবং রাসায়নিক গবেষণা যেন দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার অক্লান্ত সেবা ও উৎসাহে শক্তি লাভ করে। আপনার আশীর্বাদে আরও বহু বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু যেন এই পথে অগ্রসর হয় এবং আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ ও পরবর্তীগণ যেন আপনার উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত না হই।"

এই বিদায় সম্বর্ধনা সত্যই বেদনাদায়ক! মানুষ যখন আত্মীয়স্বজনের শোকাশ্রুর মধ্যে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে সেইদিনের কথা ইহাতে স্মরণ হয়। আবেগকম্পিতকণ্ঠে গভীর বাষ্পরুদ্ধ স্বরে আমি ইহার উত্তর দিলাম :—

"সভাপতি মহাশয়, আমার সহকর্মিগণ এবং তরুণ বন্ধুগণ,

"আপনারা যে ভাবে আমার প্রতি উচ্চপ্রশংসাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে আমি কুণ্ঠিত ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং যদি মনের রুদ্ধ ভাব আমি যথোচিত প্রকাশ না করিতে পারি, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি জানি, এইরূপ বিদায় সম্বর্ধনার ক্ষেত্রে আপনারা আমার বহু ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিবেন এবং আমার মধ্যে যদি কিছু ভাল দেখিয়া থাকেন, তাহারই উপর জোর দিবেন। ভদ্র মহোদয়গণ, আমি ইহা ভগবানের নির্দেশ বলিয়া মনে করি যে আমার বন্ধু ও সহকর্মী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও আমি গত ত্রিশ বৎসব ধরিয়া এক সঙ্গে কাজ করিয়াছি। আমরা প্রত্যেকে আমাদের স্বতন্ত্র বিভাগে কাজ করিয়াছি, পরস্পরকে উৎসাহ দান করিয়াছি, এবং আমি আশা করি যে আমরা যে অগ্নি মৃদু-ভাবে প্রজ্বলিত করিয়াছি, তাহা ছাত্রপরম্পরাক্রমে অধিকতর উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হইতে থাকিবে এবং অবশেষে তাহা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আলোকিত করিবে। আপনাদের কেহ কেহ হয়তো জানেন যে যাহাকে পার্থিব বিষয়সম্পত্তি বলে, তাহার প্রতি আমি কোন দিন বিশেষ মনোযোগ দিই নাই। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার কার্যকাল শেষ হইবার সময় আমি কি মূল্যবান সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা হইলে প্রাচীন কালের কর্নেলিয়াব কথায় আমি উত্তর দিব। আপনারা সকলেই সেই আভিজাত্য-গৌরব-শালিনী বোমক মহিলার কাহিনী শুনিয়াছেন। জনৈক ধনী গৃহিণী একদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া নিজের রত্ন অলঙ্কার প্রভৃতি সগর্বে দেখাইলেন এবং কর্নেলিয়াকে তাঁহার নিজের

রত্নালঙ্কার দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কর্নেলিয়া বলিলেন—'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার মণি-মানিক্য আমি দেখাইব।' কিছুক্ষণ পরে কর্নেলিয়ার দুই পুত্র বিদ্যালয় হইতে ফিরিলে তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া সগর্বে বলিলেন,—'এরাই আমার রত্নালঙ্কার।' আমিও কর্নেলিয়ার মত, রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রভৃতিকে দেখাইয়া বলিতে পারি, 'এরাই আমার রত্ন।' ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কলেজ ম্যাগাজিনের বর্তমান সংখ্যায় 'প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিকী' নামক যে প্রবন্ধ আমি লিখিয়াছি, তাহাতে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, আপনাদের এই কলেজ নব্য ভারত গঠনে কি মহান্ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। আমি আশা করি, আপনারা কলেজের এই গৌরব রক্ষা করিবেন।

"ভদ্রমহোদয়গণ, প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে আমি সম্বন্ধ ছিন্ন করিতেছি, এ চিন্তা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার জীবনের সমস্ত গৌরবময় স্মৃতি ইহার সঙ্গে জড়িত; এই রাসায়নিক গবেষণাগারের প্রত্যেক অংশ, ইহার ইঁট চুন-সুরকি পর্যন্ত অতীতের স্মৃতিপূর্ণ। আরও যখন মনে পড়ে যে আমার বাল্যজীবনের চার বৎসর ইহারই শাখা হেয়ার স্কুলে আমি কাটাইয়াছি এবং পরে চার বৎসর এই কলেজেই পড়িয়াছি, তখন দেখিতে পাই, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর কালব্যাপী। এবং আমার মৃত্যুকালে এই ইচ্ছাই আমার মনে জাগরূক থাকিবে যে, আমার চিতাভস্মের এক কণা যেন এই পবিত্রভূমির কোথাও রক্ষিত থাকে। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার আশঙ্কা হইতেছে, বক্তৃতায় যেটুকু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম,—তাহার সীমা আমি অতিক্রম করিয়াছি। আপনাদের চিত্তাকর্ষক অভিনন্দনের জন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনাদের এই অনুষ্ঠানের স্মৃতি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি বহন করিব।"

এখানে পরলোকগত ডাঃ ই. আর. ওয়াটসনের স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে, তিনি একদল নবীন রাসায়নিক গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রাণে মহৎ অনুপ্রেরণা জাগাইয়াছিলেন।

"১৯০৮ সালে ঢাকা কলেজ হইতে প্রথম একদল ছাত্র রসায়নশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় পাস করে। ডাঃ ওয়াটসন অনুকূলচন্দ্র সরকার নামক কৃতী ছাত্রকে বাছিয়া লন এবং তাঁহার সহযোগিতায় গবেষণা করিতে থাকেন। পরে আরও দুইজন ছাত্র এই কার্যে যোগ দিয়াছেন। ঢাকা কলেজে রাসায়নিক গবেষণার ইহাই আরম্ভ। তাহার পর হইতে ডাঃ ওয়াটসনের কানপুর গমন পর্যন্ত, তিন চার জন ছাত্র বরাবর ডাঃ ওয়াটসনের সঙ্গে, তাঁহার তত্ত্বাবধানে কাজ করিয়াছিলেন। ডাঃ ওয়াটসনের কয়েকজন ছাত্র পরবর্তীকালে রাসায়নিক গবেষণা করিয়া যশ ও খ্যাতি লাভ এবং জ্ঞানভাণ্ডারের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ সুধাময় ঘোষ এবং ডাঃ শিখিভূষণ দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ওয়াটসন নিজে অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। তাঁহাকে

কখনই কর্মে পরিশ্রান্ত হইতে দেখা যায় নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি একাকী অথবা ছাত্রদের সঙ্গে হাসিমুখে কাজ করিতেন। তাঁহার কার্যতালিকা এইরূপ ছিল ;—সকাল ৭টা—৯১/২টা, লেবরেটরীতে নিজের গবেষণা কার্য, ১০১/২টা—১২১/২টা, ক্লাসে অধ্যাপনা ও আফিসের কাজ। ১১/২টা—৫টা, আই, এস-সি. বি. এস-সি. এবং এম. এস-সি. ক্লাসের ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল কার্য পরিদর্শন। ৫১/২টা—৭টা রিসার্চ ছাত্রদের কার্য পরিদর্শন। তাহার পরেও, রাত্রি ৯টা হইতে ১০টা পর্যন্ত তিনি নিজের গবেষণার কাজ করিতেন। ছুটির দিনে বা অবকাশকালে ডাঃ ওয়াটসনের সময় তাঁহার নিজের গবেষণায় ও রিসার্চ ছাত্রদের গবেষণার কাজ দেখিবার জন্য ব্যয় হইত।" (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,১৯২৭, মার্চ)

আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করিলাম। এই সময়ে রসায়নের নূতন ও পুরাতন কৃতী ছাত্র আসিয়া বিজ্ঞান কলেজে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রিয়দারঞ্জন রায়, পুলিনবিহারী সরকার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন, প্রফুল্লকুমার বসু, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মনোমোহন সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। "Complexes & Valency" এবং মাইক্রো-কেমিস্ট্রী সম্বন্ধে তিনি একজন প্রামাণিক বিশেষজ্ঞ বলিয়া গণ্য। রসায়ন সমিতিসমূহের সম্মুখে আমার নিজের কোন মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করিবার পূর্বে আমি উহা প্রিয়দারঞ্জনকে দেখিতে দেই এবং তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করি। ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে ভারতীয় রসায়ন সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে আমি যে অভিভাষণ পাঠ করি, তাহা প্রধানতঃ প্রিয়দারঞ্জনের ভাব ও সিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মত শান্ত ও নীরব কর্মী বিরল। ইউরোপে গিয়া অধ্যয়ন শেষ করিবার জন্য অতিকষ্টে তাঁহাকে সম্মত করা হয়। Inferiority Complex বা 'নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি' তাঁহার মনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই।

'রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ বৃত্তি' তাঁহার উপর একরকম জোর করিয়াই চাপাইয়া দেওয়া হয়। বার্ন শহরে অধ্যাপক ইফ্রেমের গবেষণাগারে তিনি ৪ মাস কাল গবেষণা করেন। তাঁহার খ্যাতি পূর্বেই বিস্তৃত হইয়াছিল, সুতরাং বার্নে তিনি একজন অভিজ্ঞ সহকর্মী হিসাবেই সম্মান ও অভিনন্দন লাভ করেন। তিনি বহু মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার যে কোন একটির জন্য পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডক্টর" উপাধি দিতে পারেন। কিন্তু এখনও তিনি এ বিষয়ে মনস্থির করেন নাই।

ঘটনা দুইরকমের—নীরব ও বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ। প্রিয়দারঞ্জনের কার্যাবলী প্রথম শ্রেণী ভুক্ত। তাঁহার অন্য সমস্ত গবেষণার কথা ছাড়িয়া দিলেও, সম্প্রতি তিনি "থায়োসালফিউরিক অ্যাসিড" সম্বন্ধে যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতেই প্রকাশ যে তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তা।

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় কলিকাতায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া প্রায় তিন বৎসরকাল

মানচেস্টারে অধ্যাপক রবিন্‌সনের গবেষণাগারে কাজ করেন। তিনি যুক্ত ও স্বতন্ত্র-ভাবে যে সমস্ত মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, 'অ্যালকালয়েড' ঘটিত রসায়ন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কত গভীর। ঘোষ, মুখার্জী ও সাহার অন্যতম সহাধ্যায়ী পুলিনবিহারী সরকার এদেশে তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া প্যারীতে যান এবং সোরবোনে অধ্যাপক উরবেনের গবেষণাগারে তিনবৎসরকাল "Rare Earths" (দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকা) সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 'কেমিক্যাল হোমলজি' সম্বন্ধে তাঁহার নূতনতম গবেষণা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

রাজেন্দ্রলাল দে ১৯১৩—১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার শিক্ষাধীনে 'রিসার্চ স্কলার' ছিলেন। আমার সঙ্গে একযোগে নাইট্রাইট ও হাইপো-নাইট্রাইট সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। তিনি নিজে স্বাধীনভাবেও 'ভ্যালেন্সি' সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম 'লেকচারার'।

আর একজন কৃতী ছাত্র প্রফুল্লকুমার বসু। রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি ও বিকাশ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে বার্ষিক বিবরণী বাহির হইয়াছে তাহাতে বসুর মৌলিক গবেষণার যথেষ্ট সুখ্যাতি করা হইয়াছে।

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ১৯২২—২৪ সাল পর্যন্ত আমার নিকট রিসার্চ স্কলার ছিলেন এবং 'সালফার কম্পাউন্ড' ও 'সিনথেটিক ডাই' সম্বন্ধে বহু মৌলিক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। গোপালচন্দ্র ১৯২৮ সালে 'ডি. এস-সি.' উপাধি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে লেক্‌চারার।

যোগেন্দ্র চন্দ্র বর্ধন অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র মিত্রের শিক্ষাধীনে জৈব রসায়ন সম্বন্ধে অক্লান্তকর্মী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিবার পর তাঁহাকে "পালিত বৈদেশিক বৃত্তি" দেওয়া হয়। ইম্পিরিয়াল কলেজ অব্ সায়েন্সে অধ্যাপক থর্পের নিকট তিনি তিন বৎসরকাল গবেষণা করেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন। তারপর তিনি হল্যাণ্ডে গিয়া অধ্যাপক রুজিকার নিকট কিছুকাল শিক্ষা করেন। 'Balbiano's Acid' সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা অতি মূল্যবান।

মনোমোহন সেনও অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্রের শিক্ষাধীনে থাকিয়া একটি মৌলিক রাসায়নিক গবেষণার জন্য 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন।

বীরেশচন্দ্র গুহ সায়েন্স কলেজের একজন কৃতী ছাত্র এবং আমার লেবরেটরীতে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। তিনি টাটা বৃত্তি লাভ করিয়া ইউরোপ গমন করেন। লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে অধ্যাপক ড্রামণ্ডের শিক্ষাধীনে তিনি বাইওকেমিস্ট্রী সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। পরে কেম্‌ব্রিজ অধ্যাপক হপ্‌কিন্‌সের নিকটও তিনি ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। লণ্ডনে পি-এইচ. ডি. ও ডি. এস-সি. উপাধি লাভ করিয়া তিনি বাইওকেমিস্ট্রী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের নিকট শিক্ষালাভ করিবার জন্য বার্লিন ও ভিয়েনায় যান। তিনি ইউরোপে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়া

সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন; বাইওকেমিস্ট্রী সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

সুশীলকুমার মিত্র আমার গবেষণাগারে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। তিনিও কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

আমার সহকর্মী অধ্যাপক জে. এন. মুখার্জী এবং এইচ. কে. সেনের লেবরেটরীতে তাঁহাদের কৃতী ছাত্রদের দ্বারা কয়েকটি মূল্যবান মৌলিক গবেষণা হইয়াছে।

এ পর্যন্ত ভারতীয় রসায়নবিদেরা সাধারণতঃ ইংলন্ড, জার্মানি এবং আমেরিকার পত্রিকাসমূহেই তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইতেন। আমাদের এখন মনে হইল যে ভারতেই আমাদের একটি রাসায়নিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং তাহার একখানি মুখপত্রও থাকা প্রয়োজন। অধ্যাপক ভাটনগরের যে বক্তৃতা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেই এইরূপ প্রস্তাব প্রথম করা হয়। নিম্নে যে সমস্ত চিঠিপত্র উদ্ধৃত হইল, তাহাতে এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানা যাইবে।

'কেমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও কর্তাগণ নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কেমিক্যাল সোসাইটিকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন' (টেলিগ্রাম)। ইহার উত্তরে 'ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির' সভাপতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিম্নলিখিত পত্র লিখেন :—

বিজ্ঞান কলেজ
৯২, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা (ভারতবর্ষ)
২৩শে অক্টোবর, ১৯২৪

"প্রিয় অধ্যাপক উইন,

আপনার ১৭ই অক্টোবরের (১৯২৪) টেলিগ্রামের জন্য ধন্যবাদ। আপনার নিজের এবং কেমিক্যাল সোসাইটির কাউন্সিলের অভিনন্দন ও সদিচ্ছা আমরা কত মূল্যবান মনে করি, বলা নিষ্প্রয়োজন। লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটিকেই আমরা আমাদের সোসাইটির জনক মনে করি। এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালই রাসায়নিকদের একমাত্র মুখপত্র ছিল। এই কারণে উক্ত পত্রিকাতে ক্রম-বর্ধমান মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি স্থানাভাবে প্রকাশ করা কঠিন হইত এবং তাহার ফলে লেখকদিগকে প্রবন্ধগুলি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইত। একখানি মুখপত্রসহ ভারতে স্বতন্ত্র কেমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

"৪০ বৎসর পূর্বে যখন আমি এডিনবারায় ছাত্র ছিলাম, সেই সময়ে আমি স্বপ্ন দেখিতাম,—ভগবানের ইচ্ছায় এমন দিন আসিবে যেদিন বর্তমান ভারত জগতের বিজ্ঞান ভান্ডারে তাহার নিজস্ব বস্তু দান করিতে পারিবে।' আমার সৌভাগ্যক্রমে সে স্বপ্ন সফল হইয়াছে। মৎকৃত 'ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থে আমি দেখাইয়াছি, প্রাচীন ভারতে কিরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে এই বিজ্ঞানের

অনুশীলন করা হইত। বর্তমানে আমি সানন্দে লক্ষ্য করিতেছি যে, ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ, আমার ছাত্রেরাই অধিকার করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালের নিয়মিত লেখক।

"মূল সোসাইটির সঙ্গে আমাদের সোসাইটির সৌহার্দ্য রক্ষা করিবার জন্য আমি সর্বদা চেষ্টা করিব এবং তাহার উৎসাহ ও প্রেরণা মূল্যবান সম্পদ রূপে গণ্য করিব। এই পত্র লিখিবার সময় আমার মনে যে ভাবাবেগ হইতেছে তাহা আমি রোধ করিতে পারিতেছি না। স্বভাবতঃই সেই ২৩শে ফেব্রুআরির (১৮৪১) কথা আমার মনে পড়িতেছে—যে দিন আদি সদস্যেরা মিলিত হইয়া লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পরামর্শ ও আলোচনা করেন। আমি সানন্দচিত্তে আরও স্মরণ করিতেছি যে, লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির আদি সদস্যদের মধ্যে লর্ড প্লেফেয়ারকে (তিনি কিছুকাল এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রতিনিধি ছিলেন) জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন লর্ড প্লেফেয়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন।

আপনার সদিচ্ছার জন্য পুনর্বার বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভবদীয়
(স্বাঃ) পি সি. রায়"

(কেমিক্যাল সোসাইটির কার্য-বিবরণী হইতে গৃহীত, তারিখ ২০শে নবেম্বর, ১৯২৪।)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান কলেজ

১৯১৬ সালে পূজার ছুটির পর আমি বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করিলাম। তীক্ষ্ণদৃষ্টি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেখিলেন, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু প্রত্যেকেই যথাযোগ্য সুযোগ পাইলে বিজ্ঞান জগতে খ্যাতিলাভ করিবেন। তাঁহাদিগকে নূতন প্রতিষ্ঠানের সহকারী অধ্যাপক রূপে আহ্বান করা হইল। কিন্তু প্রথমেই একটা গুরুতর বাধা দেখা দিল।

ঘোষ ও পালিত বৃত্তির শর্ত অনুসারে বৃত্তির আসল টাকা বা মূলধন খরচ করিবার উপায় ছিল না। শর্তে স্পষ্ট লিখিত ছিল যে লেবরেটরীর ইমারত, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং উহার সংস্কার ও রক্ষা করিবার ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হইবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল না। রসায়নবিভাগে আমি অজৈব রসায়নের ভার লইয়াছিলাম এবং আমার সহকর্মী অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র জৈব রসায়নের ভার লইয়াছিলেন। যে সব যন্ত্রপাতি ছিল, তাহা দিয়াই আমরা কাজ চালাইতাম। কিন্তু ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রী ও ফিজিক্স বিভাগে কার্যতঃ কোন যন্ত্রপাতি ছিল না। ওদিকে, ইউরোপে যুদ্ধ চলিতেছিল বলিয়া সেখান হইতে কোন যন্ত্রপাতি আমদানি করাও অসম্ভব ছিল।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পরীক্ষার্থিগণের নিকট 'ফি'-এর টাকার উদ্বৃত্ত অংশ গত ২৫ বৎসর ধরিয়া জমাইয়া একটা ফন্ড কবা হইয়াছিল। কিন্তু বিজ্ঞান কলেজের জন্য গৃহনির্মাণ করিতেই তাহা ব্যয় হইয়া গেল। এ যেন তাঁহার উপর মালমসলা ব্যতীত ইঁট তৈরি করিবার ভার পড়িল। কিন্তু আশুতোষ পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, কসিমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার বহরমপুরস্থিত নিজের কলেজে পদার্থবিদ্যায় 'অনার্স কোর্স' খুলিবার জন্য কতকগুলি মূল্যবান যন্ত্রপাতি কিনিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে ঐ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। আশুতোষের অনুরোধে মহারাজা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্যের সহিত সমস্ত যন্ত্রপাতি বিজ্ঞান কলেজের জন্য দান করিয়াছিলেন। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ব্রুলও কিছু যন্ত্রপাতি ধার দিলেন। আমি নিজে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে একটি "কনডাক্টিভিটি" যন্ত্র ধার লইলাম।

এইরূপে সামান্য যন্ত্রপাতি লইয়া, ফিজিক্স ও ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রীর দুই বিভাগ খোলা হইল। কিন্তু অধ্যাপকগণ পদে পদে বাধা অনুভব করিতে লাগিলেন, নিজেদের কোন মৌলিক গবেষণা করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, মৌলিক প্রতিভার অধিকারী কোন ব্যক্তিকে

যদি বাহিরের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের উপরে নির্ভর করিতে হয়, তবে জ্ঞানজগতে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস দিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে। জন বুনিয়ানের কোন সাহিত্যিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছিল না। কিন্তু বেডফোর্ডের কারাগারে বসিয়া তিনি তাঁহার অমর গ্রন্থ The Pilgrim's Progress লিখিয়াছিলেন। নিউটনের বয়স যখন মাত্র ২৩ বৎসর তখন লন্ডনে প্লেগ মহামারী হয় এবং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ট্রিনিটি কলেজ ছাড়িয়া স্বগ্রাম উলস্থর্প যাইতে হয়। সেইখানেই যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতীত তিনি তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

বৃহৎ জিনিসের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জিনিসের তুলনা করিলে বলা যায়, 'ঘোষের নিয়ম'-এর (Ghosh's Law) পশ্চাতেও এইরূপ একটা ইতিহাস আছে। ঘোষ যন্ত্রপাতির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া বিজ্ঞান কলেজে তাঁহার নিজের কক্ষে 'ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রী'র রাশীকৃত পুস্তক ও পত্রিকা লইয়া কাল কাটাইতেন। এইখানেই তিনি তাঁহার বিখ্যাত "ঘোষের নিয়ম" আবিষ্কার করেন এবং তাহা শীঘ্রই বৈজ্ঞানিক জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেঘনাদ সাহা গণিত এবং জ্যোতিষ সম্পর্কীয় পদার্থবিদ্যায় (Astro-physics) অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকেও এই দুর্দশায় পড়িতে হইয়াছিল। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করিতে না পারিয়া তিনিও খুব মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন', 'জার্নাল অব্ ফিজিক্স' (আমেরিকা), 'রয়েল সোসাইটির কার্য-বিবরণী' প্রভৃতিতে বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন এবং অবশেষে বিখ্যাত "Saha's Equation" আবিষ্কার করেন। এদিকে আশুতোষ গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে বিজ্ঞান কলেজের জন্য সাহায্য লাভার্থ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। ব্রিটিশ ভারতে বহুদিনের একটা প্রথা ছিল যে, যখনই কোন লোকহিতাকাঙ্ক্ষী মহানুভব ব্যক্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য কোন মহৎ দান করেন, গবর্নমেণ্টও সরকারী তহবিল হইতে অনুরূপ দান করিয়া দাতার ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিতে সহায়তা করেন। আমি এস্থলে দুইটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। পরলোকগত জে. এন. টাটার মহৎ দানের ফলে বাঙ্গালোর "ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স" প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত গবর্নমেণ্ট এই প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা সাহায্য দিয়া থাকেন। কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্টের শিক্ষানীতি যাঁহারা পরিচালনা করিতেন তাঁহারা রাজনৈতিক কারণে বিজ্ঞান কলেজের প্রতি বিরূপ হইলেন। মিঃ শার্প (পরে স্যার হেনরী শার্প) ভারত গবর্নমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। বঙ্গবিচ্ছেদের পর নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের আমলে ইনি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। সিরাজগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্রেরা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া মিঃ শার্পের কোপদৃষ্টিতে পড়ে। মিঃ শার্প এবং গবর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার সিরাজগঞ্জ স্কুলের এই 'বিদ্রোহী' ছাত্রদিগকে শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তাঁহাদের মতে উক্ত স্কুল রাজদ্রোহের আড্ডা ছিল। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সিণ্ডিকেট শার্প ও ফুলারের হাতের পুতুল হইতে সম্মত হইলেন না। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এই ঔদ্ধত্যে ক্রোধে জ্ঞানহারা হইলেন। তিনি বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে লিখিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবাধ্য সিণ্ডিকেটকে যদি সায়েস্তা করা না হয়, তবে তিনি (ফুলার) পদত্যাগ করিবেন। লর্ড মিণ্টো যদিও নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'রৌদ্রদগ্ধ' ব্যুরোক্রাটদের মতে সায় দিতেন, তাহা হইলেও, ইংরাজ অভিজাত বংশের একটা সহজ উদারতার ভাব তাঁহার মধ্যে ছিল। তিনি সিণ্ডিকেটের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং ফুলারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলেন।

মিঃ শার্প ও তাঁহার প্রভু ফুলার যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে মিঃ শার্প ভারত গবর্নমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। সুতরাং এখন তিনি তাঁহার পূর্ব 'অপমানের' প্রতিশোধ লইবার সুযোগ পাইলেন। মিঃ শার্প জানিতেন যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের কার্যনীতি পরিচালনা করিতেন। সুতরাং মিঃ শার্প স্যার আশুতোষ ও তাঁহার প্রিয় বিজ্ঞান কলেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রথমে বিজ্ঞান কলেজের পক্ষপাতী ছিলেন, তারকনাথ পালিতের মহৎ দানের জন্য তাঁহাকে 'স্যার' উপাধিও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যেরূপেই হোক মিঃ শার্প লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেন এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের মতের পরিবর্তন হইল। সেই সময়ে ইহাও শোনা গিয়াছিল যে বিজ্ঞান কলেজের দানশর্তের একটি ধারা পড়িয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছিলেন। ধারাটি এই :—"ভারতবাসী ব্যতীত কেহ অধ্যাপকের পদ পাইবে না।"(১) ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জ কলিকাতায় আসিলে, টাউন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশান সভা হইল। লর্ড হার্ডিঞ্জ কন্‌ভোকেশানে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি এমন ভাব প্রদর্শন করেন যেন বিজ্ঞান কলেজের জন্য যে প্রাসাদোপম গৃহ নির্মিত হইয়াছে, তাহার কথা তিনি কিছুই জানেন না। যে রকমেই হোক ভারত গবর্নমেণ্টের মতিগতি পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং বিজ্ঞানের জন্য গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার কোন আশা ছিল না।

লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে অ্যাসেম্বলীতে গোখেল তাঁহার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল উপস্থিত করেন, কিন্তু শিক্ষাসচিব স্যার হারকোর্ট বাটলার অর্থাভাবের অজুহাতে উহার বিরোধিতা করেন এবং বিলটি অগ্রাহ্য হয়। এই ব্যাপারে আমাদের শাসকদের 'উদার উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ জন্মে। গোখেল তাঁহার শেষজীবনে এই বিলের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াতে একরকম ভগ্ন হৃদয় লইয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভারত গবর্নমেণ্ট যে রাজনৈতিক প্রভাবে পড়িয়াই বিজ্ঞান কলেজে সাহায্য দান করেন নাই, তাহার প্রমাণ দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিম ভারতে দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি

(১) পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে, শিক্ষাবিভাগের উচ্চস্তর হইতে ভারতবাসীরা একপ্রকার বহিষ্কৃত বলিয়াই, এইরূপ শর্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

গবর্নমেণ্টের অতিরিক্ত উদারতা হইতেই বুঝা যায়। ইহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্য বেশীদূর যাইতে হইবে না। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই ব্রিটিশ অধ্যাপকে পূর্ণ এবং তাঁহাদের দ্বারাই উহা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারতীয়েরা ওখানে আছেন বটে, কিন্তু নিম্নতর কাজে এবং তাঁহাদের বেতন অতি সামান্য। বাঙ্গালোরের প্রতিষ্ঠানটির মূলধন প্রায় এক কোটি টাকা এবং উহার বার্ষিক আয় প্রায় ৬ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে গবর্নমেণ্ট বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি সাফল্য লাভ করে নাই এবং যেভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইতেছে, দেশের জনমত তাহার বিরোধী। এতদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে বড় বড় পদগুলি ইউরোপীয়দের দ্বারা পূর্ণ করিলেই কোন প্রতিষ্ঠান সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বাঙ্গালোর ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের "পঞ্চবার্ষিক রিভিউ কমিটির" সদস্য হিসাবে উহার কার্যাবলী পরিদর্শনের বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলেন। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

"পরলোকগত মিঃ টাটা এবং দেওয়ান স্যার শেষাদ্রি যে উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। তাহার অনেক কারণ আছে, কিন্তু প্রধান কারণ, শিল্পবাণিজ্য, কলকারখানার সংশ্রব হইতে দূরে বাঙ্গালোরের মত শহরে ইহার অবস্থান। এই প্রতিষ্ঠানটি বাঙ্গালোরে না হইয়া কোন শিল্পবাণিজ্যপ্রধান শহরের নিকট প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। কেননা তাহা হইলেই, প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও কর্মিগণের আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহ কার্যে পরিণত করিবার সুযোগ হইত। কিন্তু আমি জানি, বর্তমানে যে সব যুবক এখানে শিক্ষালাভ করে, তাহারা কলিকাতা বা বোম্বাই শহরে কাজের চেষ্টায় যাইতে বাধ্য হয়।

"দ্বিতীয় কারণ এই যে, যদিও প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও অতীত ডিরেক্টরগণকে এবং বিভাগীয় কর্তাদিগকে আশাতীত বেতন দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে, তথাপি যাঁহাদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে, অথবা যাঁহারা ইনস্টিটিউটের কার্যে প্রাণসঞ্চার করিতে পারেন, দুই একজন ছাড়া এমন লোককে প্রতিষ্ঠানের কাজে পাওয়া যায় নাই। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কার্যের জন্য ডিরেক্টরকে এত অতিরিক্ত বেতন দেওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে।

"তৃতীয়তঃ, যেভাবে এই ইনস্টিটিউটের কাজে লোক নিযুক্ত করা হয়, তাহাও ইহার ব্যর্থতার একটি কারণ। এই প্রণালীতে যথেষ্ট গলদ আছে এবং সহকারী অধ্যাপকগণকে অত্যন্ত কম বেতন দেওয়া হয়।

"* * * আমি তুলনামূলক একটি দৃষ্টান্তে এবং কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিয়া এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

"লণ্ডনের নিকটবর্তী টেডিংটনে অবস্থিত 'ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরী'-র কথাই ধরা যাক। গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে ইহা একটি সুবৃহৎ এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। ইহার ডিরেক্টরের বেতন বার্ষিক ১২০০ শত পাউণ্ড এবং অধিকাংশ

সহকারী অধ্যাপকের (প্রায় সকলেই নূতন লোক) বেতন বার্ষিক ২৪০ পাউন্ড। অর্থাৎ ডিরেক্টর এবং সহকারিগণের বেতনের অনুপাত ধরিলে ১ : ৫ দাঁড়ায়। কিন্তু বাঙ্গালোরে ডিরেক্টরের বেতন মাসিক ৩৫০০৲ টাকা (অর্থাৎ বিলাতী হিসাবে বার্ষিক প্রায় ৪০০০ পাউন্ড) (২) এবং তাঁহার সহকারিগণ বা গবেষকগণ মাসিক বেতন পান ১৫০৲ টাকা (অর্থাৎ বার্ষিক প্রায় ১২০ পাউন্ড)। সুতরাং এক্ষেত্রে ডিরেক্টর ও তাঁহার সহকারিগণের বেতনের অনুপাত ১ : ৩০। দেখা যাইতেছে, প্রতিষ্ঠানের আয়ের অধিকাংশ ডিরেক্টর এবং অধ্যাপকগণের বেতনেই ব্যয় হয়। গবেষণাকারী তরুণ কর্মীদের জন্য প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমার মনে হয়, এই প্রতিষ্ঠানে আরও বেশী গবেষণাকারী কর্মী থাকার দরকার এবং তাঁহাদিগকে এখনকার চেয়ে বেশী বেতন বা বৃত্তি দেওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে তাঁহারা একনিষ্ঠভাবে তাঁহাদের কাজ করিতে পারেন। উচ্চতর পদগুলির বেতন হ্রাস করিয়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতনের সমান করা উচিত।”

স্যার সি. ভি. রামন পোপ কমিটিব সদস্য ছিলেন, তিনি ইনস্টিটিউটের কাউন্সিলেরও সদস্য। তিনিও ইনস্টিটিউটের কার্যপ্রণালীর অধিকতর তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন।

“বাঙ্গালোরের ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্স তথা দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় করা হইয়াছে, তদনুপাতে ঐগুলির দ্বারা কোনই কাজ হয় নাই। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা আমাদের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণকে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দিবে।”

বোম্বাইয়ের রয়েল ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্সও শহরবাসীদের দানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গবর্নমেণ্ট এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। সাধারণের দানের পরিমাণ ২৪·৭৫ লক্ষ টাকা এবং গবর্নমেণ্টের সাহায্য ৫ লক্ষ টাকা। ২২ লক্ষ টাকা মূলধনরূপে ব্যয় হয় এবং এক লক্ষ টাকা ছাত্রবৃত্তির জন্য পৃথক রাখিয়া দেওয়া হয়। এই সমস্ত বাদ দিয়া, সরকারের নিকট ৬·৭৫ লক্ষ টাকা গচ্ছিত আছে। শতকরা ৩½ টাকা হারে উহার সুদ বার্ষিক ২৫০০০৲ টাকা। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ব্যয় ১·৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য বার্ষিক ১·২৫ লক্ষ টাকা দিয়া থাকেন। সুতরাং ইহার জন্য গবর্নমেণ্ট ৫ লক্ষ টাকা মূলধন যোগাইয়াছেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে বার্ষিক সাহায্যও করিতেছেন। ইহার তুলনায় কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজের প্রতি গবর্নমেণ্টের ব্যবহার অত্যন্ত কার্পণ্যসূচক। বোম্বাইয়ের শিক্ষিত সমাজ কিন্তু উক্ত রয়েল ইনস্টিটিউটকে ব্যর্থ মনে করেন। সম্প্রতি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে এ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

---

(২) অধ্যাপক সাহা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, বর্তমান ডিরেক্টর মাসিক ২০০০৲ টাকার অতিরিক্ত ভাতা পাইতেছিলেন। অর্থাৎ তিনি মোট মাসিক ৫০০০৲ টাকা পাইতেন। পাঁচ বৎসরের জন্য তাঁহার কাজের চুক্তি ছিল। উহার পর হইতে তিনি মাসিক ৩০০০৲ টাকা বেতন ও ৫০০৲ টাকা ভাতা পাইতেছেন।

"ডাঃ ডিগাসের প্রস্তাব এবং তাহার উপর মিঃ গোখেলের সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনায় যে সব তথ্য প্রকাশ পায়, তাহা উপেক্ষণীয় নহে।..."

"...রয়েল ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্সের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা এত কম যে, ইনস্টিটিউটের পরিচালকগণকে স্বেচ্ছাচারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশবাসী এই ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী সম্পর্কে যে নৈরাশ্যের ভাব পোষণ করে, গবর্নমেণ্টের তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই। যাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই এরূপ অভিপ্রায় ছিল না যে, প্রতিষ্ঠানটি একটা সেকেন্ড গ্রেড কলেজে পরিণত হইবে।"—বোম্বে ক্রনিক্ল্, ২৫শে অগস্ট, ১৯৩০।

প্রতিষ্ঠানটিতে শুধু সেকেন্ড গ্রেড কলেজের কাজ হয়, এ কথা বলা অবশ্য ঠিক নয়। কিয়ৎপরিমাণে পোস্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষাও ইহাতে দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে তীব্র সমালোচনা হইয়াছে, তাহা মোটের উপর ন্যায়সঙ্গত।

একথা বলা হইতেছে না যে, ভারতীয়েরা ইউরোপীয়দের চেয়ে বুদ্ধি ও মেধায় শ্রেষ্ঠ। ব্যর্থতার কারণ অন্য দিকে অন্বেষণ করিতে হইবে। পরলোকগত মিঃ জি. কে. গোখেল বলিতেন "তৃতীয় শ্রেণীর ইউরোপীয় এবং প্রথম শ্রেণীর ভারতীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে।"

গবর্নমেণ্ট বিজ্ঞান কলেজকে কেন প্রীতির চক্ষে দেখেন না, এমন কি অপ্রসন্ন দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন, তাহার আর একটি কারণ এই যে, এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা গবর্নমেণ্টের কার্যনীতির সঙ্গে মিলে না। তাঁহাদের ধারণা এই যে, এদেশের জন্য যাহা কিছু ভাল তাহা সমস্তই 'মা বাপ'-রূপী আমলাতন্ত্র গবর্নমেণ্টের দয়াতেই হইবে।

আশুতোষকে এইরূপে নিজের চেষ্টার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফি বাবত প্রাপ্ত টাকা হইতে যাহা কিছু সামান্য বাঁচানো যাইত, তাহা বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটরীর যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য দেওয়া হইত। পালিত এবং ঘোষ বৃত্তির বাবত উদ্‌বৃত্ত অর্থও কিয়ৎপরিমাণে এই কার্যে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত উপায়ে লব্ধ মোট প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা বিজ্ঞান কলেজের জন্য ব্যয় হইয়াছে।

বিজ্ঞান কলেজে সর্বপ্রকার আধুনিকতম ব্যবস্থা করিবার জন্য কয়েকটি নূতন বিভাগ খুলিবার প্রয়োজন ছিল। রাসবিহারী ঘোষের দ্বিতীয় দান এবং খয়রা রাজার দানে এই প্রয়োজন কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইল। ঐ দুই দানের অর্থে, ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা, ব্যবহারিক রসায়ন বিজ্ঞান, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রী এবং বেতার টেলিগ্রাফী বিদ্যার অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠিত হইল। বিজ্ঞান কলেজের গৃহ নির্মাণ করিবার সময় এই সমস্ত পরিকল্পনা ছিল না, সুতরাং আমাদের স্থানাভাব হইতেছিল। অর্থাভাবে সমস্ত বিভাগে যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতিও পাওয়া যাইতেছিল না, সুতরাং আশানুরূপ কাজ হইতেছিল না।

১৯২৬ সালে লর্ড বালফুরের সভাপতিত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে আমি প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়াছিলাম।

প্রথম দিনের আলোচনার বিষয় ছিল—'রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়'। আমি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম—

"আমি এই বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসি নাই। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, আমাদের হাই কমিশনার (তিনি আমার ভূতপূর্ব ছাত্র) অসুস্থতার জন্য আসিতে পারেন নাই, আরও কয়েকজন সদস্য অনুপস্থিত আছেন। সেই কারণে আমি আপনাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে বক্তৃতা করিবার সুযোগ লাভ করা আমি সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

"১৯১২ সালে প্রথম সাম্রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে আমি বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলাম। সুতরাং এখানে আমি নূতন নহি। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমাদের চেয়ারম্যান মহাশয়ও সেই সময়ে কোন এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

"আজ আমার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য, বাংলা দেশে শিক্ষার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহাই ব্যক্ত করা। আমাদের সম্মানিত সভাপতি মহাশয় অক্সফোর্ড ও এডিনবার্গ দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। আমি আশা করি, তিনি যে সব সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহা ভারত গবর্নমেণ্ট ও বাংলা গবর্নমেণ্ট বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

"আপনারা জানেন, ১৯১৯ সালের মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কাব ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবস্থা কি ভাবে পরিবর্তিত করিয়াছে। উহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে যখন আমরা ভারত গবর্নমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁহারা আমাদিগকে বাংলা গবর্নমেণ্টের নিকট যাইতে বলেন; অন্যদিকে বাংলা গবর্নমেণ্ট মেষ্টনী ব্যবস্থার দোহাই দেন। সুতরাং আমরা উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি। গবেষণা-কার্যের জন্য ব্যক্তিগত দানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাঙ্গালোর ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্স। প্রধানতঃ বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনী পরলোকগত মিঃ জে. এন. টাটার বিরাট দানেই উহার প্রতিষ্ঠা। বোম্বাই বহু লক্ষপতির আবাসস্থল। যদিও বাংলাদেশ বহু ধনীসন্তানের গর্ব করিতে পারে না, তবুও সে বিষয়ে আমরা একেবারে দরিদ্র নহি। আমাদের বিজ্ঞান কলেজ দুইজন মহানুভব ধনীর দানে প্রতিষ্ঠিত। প্রধানতঃ স্যার তারকনাথ পালিত। তিনি মৃত্যুর পূর্বে এজন্য ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। উহা প্রায় একলক্ষ পাউণ্ডের সমান। তিনি আইনজীবী এবং এই দানেব দ্বাবা তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, কেন না বলিতে গেলে তাঁহার সর্বস্বই তিনি বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন।

"ভারতের অন্য একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। তাঁহার নাম স্যার রাসবিহারী ঘোষ। তিনি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রায় দেড়লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়া যান। ভারতীয়দের নিকট হইতে আমরা যতদূর সম্ভব সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের দানের পরিমাণ মোট প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা।

"কিন্তু যখনই আমরা ভারত গবর্নমেণ্ট বা বাংলা গবর্নমেণ্টের নিকট অগ্রসর

হই, তাঁহারা অর্থাভাবের অজুহাত দেখান,—অথচ বড় বড় ইম্পিরিয়াল স্কীমের জন্য জলের মত অর্থব্যয় করিতে তাঁহাদের বাধে না। গবর্নমেণ্টের এই কার্পণ্যের সমালোচনা বহুবার আমাকে করিতে হইয়াছে। আমাদের সঙ্গে উপন্যাসের 'অলিভার টুইস্টের' মত ব্যবহার করা হয়। আমি আশা করি সভাপতি মহাশয় যে সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা বেতার যোগে প্রচারিত হইবে এবং রয়টার উহা ভারতে প্রেরণ করিবেন; তাহা হইলে ঐ বক্তৃতা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে এবং উহা ভারতের সর্বত্র পঠিত হইবে। ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি প্রধান অংশ। সুতরাং উচ্চতর বিজ্ঞানের প্রসার সম্বন্ধে একই নীতি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে ও ভারতে কেন অনুসৃত হইবে না, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম।

"আমি বিশেষভাবে একটি তথ্যের প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই ভারতীয় জাতি অতীতে গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। ম্যাক্সমুলার এক স্থলে বলিয়াছেন যে, হিন্দুরা যদি আর কিছু না করিয়া ইউরোপকে শুধু দশমিক পদ্ধতি দান করিত—উহা আরবীয় নহে, আরবেরা কেবল মধ্যস্থরূপে ইউরোপে ঐ বিদ্যা প্রচার করিয়াছেন,—তাহা হইলেও, ভারতের নিকট ইউরোপের ঋণ অসীম হইত। হিন্দুদের অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তি যে অসাধারণ অতীতের স্মৃতিমণ্ডিত এই সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তাহা অজ্ঞাত নহে। হিন্দু প্রতিভা সুযোগ ও উৎসাহ লাভ করিলে কি করিতে পারে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আপনারা পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে, পারাঞ্জপে, রামানুজ এবং জগদীশচন্দ্র বসুর নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা সকলেই এই কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

"আমি মনে করি, দুইটি কারণে এখানে বক্তৃতা করিবার আমার অধিকার আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের সম্মানিত সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে আমি ইতিপূর্বে আর একবার বক্তৃতা করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে, উত্তরাঞ্চলের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে (এডিনবার্গে) আমি ছয় বৎসর ছাত্র রূপে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয় বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। সুতরাং রাসায়নিকের ভাষায় বলিতে পারি, আমি তাঁহার সঙ্গে দ্বিবিধ বন্ধনে আবদ্ধ।

"আমি আশা করি ভারত গবর্নমেণ্ট অথবা বাংলা গবর্নমেণ্ট এখন বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, বিজ্ঞান কলেজের জন্য আমরা গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে শতকরা দুই ভাগ মাত্র সাহায্য পাইয়াছি। অবশিষ্ট—শতকরা ৯৮ ভাগ সাহায্য আসিয়াছে আমাদের দেশবাসীর নিকট হইতে।"

* * *

ভারত গবর্নমেণ্টের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়া আমি যদি ক্ষান্ত হই, তবে অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। আমার স্বদেশবাসীরও এ বিষয়ে যথেষ্ট দোষ। তাঁহাদের নিকট পুনঃ পুনঃ অর্থ সাহায্য চাহিয়াও বিশেষ কোন ফল হয় নাই।

পালিত ও ঘোষ তাঁহাদের সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অর্থ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দান করিয়া যে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, আর কেহ বড় একটা তাহার অনুসরণ করেন নাই। বড় বড় ব্যবসায়ী, বণিক প্রভৃতির সহানুভূতি সাধারণের হিতার্থ আকৃষ্ট করা যায় নাই—বাংলাদেশের এই দুর্ভাগ্যের কথা আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বাংলার শিক্ষিত সমাজও আমাদের আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। শ্রেষ্ঠ আইনজীবিগণ, বিচার ও শাসন বিভাগের কর্মচারিগণ, এ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল, সেক্রেটারিয়েটের বড় বড় কর্মচারী, মন্ত্রী, শাসন-পরিষদের সদস্য, যাঁহারা নির্লজ্জ ভাবে বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা বেতন গ্রহণ করেন,—নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট যাঁহারা বিশেষ ঋণী—এ পর্যন্ত তাঁহারা কোন সাড়াই দেন নাই। তাঁহারা কেবল নিজেদের সোনার সিন্দুক বোঝাই করিয়াছেন মাত্র। বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব ছাত্র পরজীবনে কৃতিত্ব লাভ করেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য বৃত্তি, দান প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন, এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়।

আমি বিজ্ঞান কলেজের কথা আর বেশী কিছু বলিব না। ইহার শৈশব উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখন সে কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছে। আমার যুবক সহকর্মী অধ্যাপক রামন একাই একশ(৩); এই বিজ্ঞান কলেজ যদি কেবলমাত্র একজন রামনকেই সৃষ্টি করিত, তাহা হইলেও ইহা সার্থক হইত এবং প্রতিষ্ঠাতার আশা পূর্ণ হইত। (প্রতিষ্ঠাতা এখন আর ইহলোকে নাই।) অধ্যাপক রামনের সহকর্মী ডি. এম. বসু, পি. এন. ঘোষ, এস. কে. মিত্র, বি. বি. রায় এবং আরও অনেকে তাঁহাদের নিজ নিজ আলোচ্য বিদ্যার ভাণ্ডারে বহু মৌলিক তত্ত্ব দান করিয়াছেন। ফলিত গণিতে ডাঃ গণেশপ্রসাদ, এবং তাঁহার পরবর্তী এস. কে. বন্দ্যোপাধ্যায়, এন. আর. সেন এবং ডাঃ বি. বি. দত্ত জ্ঞানজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসরের মধ্যেই, নানা ত্রুটি ও অভাব সত্ত্বেও, ইহার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ইহার কৃতিত্ব ও গৌরব কম নহে।

এই প্রুফ সংশোধন কালে (২৫শে মে, ১৯৩৭) Chemical Society Annual Reports অর্থাৎ বার্ষিক বিবরণী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই বিজ্ঞান কলেজে রসায়নশাস্ত্র বিভাগে ক্রমান্বয়ে যে সব অধ্যাপক ও ছাত্র কৃতিত্বের সহিত গবেষণা করিতেছেন তাঁহাদের গবেষণার বিষয় বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে দেখিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম পর্যায়ক্রমে উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন (ইঁহার নাম সাত জায়গায় উল্লিখিত হইয়াছে) এবং প্রফুল্লকুমার বসু, পুলিনবিহারী সরকার, বীরেশচন্দ্র গুহ, নির্মলেন্দু রায়, নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী, ভবেশচন্দ্র রায়, জগন্নাথ গুপ্ত ইত্যাদি।

---

* অধ্যাপক রামন নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পূর্বে ইহা লেখা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সময়ের সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার

সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল, কেহ কেহ আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন, আমি আমার প্রিয় বিজ্ঞান ও গবেষণাগার ত্যাগ করিয়াছি কিনা, কিংবা উভয়কেই উপেক্ষা করিতেছি কি না? লোকের পক্ষে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অসঙ্গত নহে। ১৯২১ সাল হইতে খদ্দর প্রচার ও জাতীয় শিক্ষা বিস্তারে আমি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছি এবং কিয়ৎপরিমাণে রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্রবেও আসিয়াছি। আমি কয়েকটি জেলা সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়াছি। তথাকথিত "অবনত সম্প্রদায়" কর্তৃক আহূত কয়েকটি সম্মেলনেও সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত, ১৯২১ সালের খুলনা দুর্ভিক্ষ এবং ১৯২২ সালের উত্তরবঙ্গ বন্যা সম্পর্কে সেবাকার্যের নেতৃত্বও কয়েকবার আমাকে করিতে হইয়াছে। গত দশ বৎসরে আমি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি এবং আমার ভ্রমণের পরিমাণ দুই লক্ষ মাইলের কম হইবে না। ১৯২০ সালে এবং ১৯২৬ সালে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম বার বিলাত ভ্রমণও করিয়া আসিয়াছি।

সম্প্রতি একদল যুবকের নিকট আমি সময়ের ব্যবহার ও অপব্যবহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। উহাতে আমি কতকটা আমার নিজের জীবনযাত্রা-প্রণালীরই যেন সমর্থন করি। বক্তৃতায় কবি কাউপারের সেই প্রসিদ্ধ কবিতা(১) উদ্ধৃত করিয়া আমি বুঝাইয়াছিলাম, যদি কেহ নিজের নির্দিষ্ট সময়-তালিকা অনুসারে কাজ করে, তবে কত বেশী কাজ করিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানুষ যদি ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করে, তবে দশ গুণ বেশী কাজ করিতে পারে। ইংলণ্ড ও ইউরোপে কয়েকবার ভ্রমণকালে আমি যাহাতে ঠিক সকাল সাতটার মধ্যে প্রাতর্ভোজন শেষ করিতে পারি, সেদিনক সতর্ক দৃষ্টি রাখিতাম। তাহার ফলে বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্বে আমি দু একঘণ্টা অধ্যয়ন করিবার অবসর পাইতাম। পূর্বে রেল-গাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় ঝাঁকানির জন্য আমি পড়িতে পারিতাম না। কিন্তু সম্প্রতি এইভাবে ভ্রমণ করা আমার পক্ষে এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, আমি গাড়ীতে একঘণ্টাকাল অনায়াসে পড়িতে পারি। আমার ভ্রমণ-তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় আমি প্রথমেই বড় হরফে ছাপা কতকগুলি ভাল বই বাছিয়া লই। আমি যখন কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলে যাই, তখন স্বভাবতঃই বহু লোক আমার

---

(১) The lapse of time and rivers is the same:
Both speed their journey with a restless stream;
But time that should enrich the nobler mind
Neglected, leaves a dreary waste behind.

সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে হয়। কিন্তু দ্বিপ্রহর হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত অর্থাৎ খুব গরমের সময়, কেহ বড় একটা আসে না এবং সেই সময়ে আমি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বই পড়ি। উহাই আমার পক্ষে বিশ্রামের কাজ করে। কার্লাইলের ন্যায় আমিও বলিতে পারি, অধ্যয়নই আমার প্রধান বিশ্রাম। কার্লাইল লণ্ডনে গিয়া এমন স্থানে বাড়ী লইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন—যেখানে কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিতে না পারে। তাঁহার মনোভাবের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। কার্লাইল যে এত বেশী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—বিভিন্ন ভাষায় এমন পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ, তিনি 'মেনহিলের' নির্জন-গৃহে বাস করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিতকারের ভাষায়, লণ্ডনে যাইবার পূর্বে, "ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে তাঁহার সমবয়স্ক এমন কেহ ছিল না, যে তাঁহার মত এত বেশী পড়াশুনা করিয়াছে অথচ বহির্জগতের সঙ্গে যাহার এত কম পরিচয় ছিল। ইতিহাস, কাব্য, দর্শনশাস্ত্রে তিনি প্রগাঢ়রূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ফরাসী, জার্মান ও ইংরাজী সাহিত্য তথা সমগ্র আধুনিক সাহিত্যের সম্বন্ধে তাঁহার যেমন গভীর জ্ঞান ছিল, তাঁহার সমবয়স্ক আর কোন ব্যক্তিরই তেমন ছিল না।"

আমি আমার অধ্যয়নকার্যকে পবিত্র বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইহার পবিত্রতা রক্ষা করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। যখন কেহ অধ্যয়ননিমগ্ন আছেন, অথবা কোন সমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন—তখন তাঁহার কাজে ব্যাঘাত জন্মাইতে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও দ্বিধা করেন না। মেকলের প্রগাঢ় অধ্যয়ন-স্পৃহার কথাও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। "সাহিত্য আমার জীবন ও বিচার-বুদ্ধিকে রক্ষা করিয়াছে। সকাল পাঁচটা হইতে নয়টা পর্যন্ত (তাঁহার কলিকাতা বাস কালে) এই সময়টা আমার নিজস্ব—এখনও আমি ঐ সময়ে প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিয়া থাকি।" কিন্তু এইরূপ কঠোর সাধনা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার ইচ্ছা থাকিলেও এরূপ করিবার শক্তি আমার নাই। আমার ভাল ঘুম হয় না, সুতরাং সকালবেলা একসঙ্গে সওয়া ঘণ্টার বেশী আমি পড়িতে পারি না।

মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার সময়ে নিউটন প্রায় ভাবোন্মাদ অবস্থায় ছিলেন। যদি লোকে সেই সময়ে তাঁহাকে ক্রমাগত বিরক্ত করিত, তবে অবস্থা কিরূপ হইত, কল্পনা করাও কঠিন। কোলরিজ এ বিষয়ে তাঁহার তিক্ত অভিজ্ঞতা লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। একসময়ে তিনি ভাবমুগ্ধ অবস্থায় "কুবলা খাঁ অথবা একটি স্বপ্নদৃশ্য" নামক প্রসিদ্ধ কবিতার দুই তিনশত ছত্র মনে মনে রচনা করেন। তন্দ্রা হইতে জাগিয়া তিনি কাগজে সেই ছত্রগুলি লিপিবন্ধ করিতেছিলেন, এমন সময় অন্য কাজে তাঁহার ডাক পড়িল এবং সেজন্য তাঁহাকে একঘণ্টারও অধিক সময় ব্যয় করিতে হইল। ফিরিবার সময় লিখিতে বসিয়া তিনি দেখেন যে, স্বপ্নের কথা তাঁহার মাত্র অস্পষ্টভাবে মনে আছে। এমার্সন গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলিয়াছিলেন —"সময় সময় সমস্ত পৃথিবী যেন ষড়যন্ত্র করিয়া তোমাকে তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে বন্দী করিয়া রাখিতে চায়।......এই সব প্রবঞ্চিত এবং প্রবঞ্চনাকারী লোকের মন জোগাইয়া

চলিও না। তাহাদিগকে বল—হে পিতা, হে মাতা, হে পত্নী, হে ভ্রাতা, হে বন্ধু, আমি তোমাদের সঙ্গে এতদিন মিথ্যা মায়াময় জীবন যাপন করিয়াছি। এখন হইতে আমি কেবল সত্যকেই অনুসরণ করিব।"(২)

লোকে যেরূপ অবস্থার মধ্যে থাকে, তাহারই সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়, বৃথা উত্তেজিত বা বিরক্ত হইয়া লাভ নাই। বহুলোক আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই যুবক। তাঁহারা আমার নিকট নানা বিষয়ের সংবাদ ও পরামর্শ চান। কিরূপে জীবিকা সংগ্রহ করিবেন, সেজন্যও উপদেশ চাহেন। ইহার উপর ভারতের সমস্ত অঞ্চল হইতে আমাব নিকট বহু চিঠিপত্র আসে এবং পত্রলেখকেরা অনেক সময় উত্তর আদায় না করিয়া ছাড়েন না। আমি ইহার জন্য অভিযোগ করি না, কেননা আমি জানি, নানাদিকে আমি যে সব কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহার ফলেই এইভাবে আমাকে কিছু সময় ব্যয় করিতে হয়। আমি যথাসাধ্য প্রসন্নভাবেই এ সব সহ্য করি এবং আমার আদর্শ মার্কাস অরেলিয়াসের নীতি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি। চিত্তের সমতা বা প্রশান্তিই ছিল মার্কাস অরেলিয়াসের জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি সৈন্যশিবিরের কোলাহলের মধ্যে সমাহিত চিত্তে বসিয়া যে সব চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করে।

আমি আমার যুবক বন্ধুদিগকে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের 'আত্মচরিত' পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ফ্রাঙ্কলিন গরীবের ছেলে ছিলেন, তাঁহাকে ছাপাখানায় শিক্ষানবিসরূপে কঠোর পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করিতে হইত। তিনি বিদ্যালয়ে অতি সামান্য লেখাপড়ার সুযোগই পাইয়াছিলেন, কেননা দশ বৎসর বয়সেই তাঁহাকে পিতার কাজে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতা সাবান ও মোমবাতির কাজ করিতেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ঘরে বসিয়া রাত্রির অধিকাংশ সময়ই পড়িয়া কাটাইতেন, কেননা অনেক সময় তিনি সন্ধ্যাবেলা বই ধার করিয়া আনিতেন এবং সকালবেলা তাহা ফেরত দিতেন। ছাপাখানার কাজ শেষ করিয়া যেটুকু অবসর পাইতেন, ফ্রাঙ্কলিন সে সময় পড়িতেন। ক্রমে ক্রমে ফ্রাঙ্কলিন মুদ্রাকররূপে সাফল্যলাভ করিলেন। জনৈক বন্ধু বলিয়াছিলেন—"ফ্রাঙ্কলিনের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অসাধারণ ছিল। আমি যখন ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাইতাম, দেখিতাম ফ্রাঙ্কলিন কাজ করিতেছেন; সকালে তাঁহার প্রতিবাসীরা শয্যাত্যাগ করিবার পূর্বেই আবার তিনি কাজ আরম্ভ করিতেন।" ফ্রাঙ্কলিন নিজের চেষ্টায় পরে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা করেন এবং বিদ্যুৎপরিচালকের (Lightning conductor) আবিষ্কর্তারূপে তিনি

---

(২) মুসোলিনী যখন লিখেন, তখন কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিবে, এ তিনি ইচ্ছা করেন না।...তিনি যে ইহাতে কিরূপ ক্রুদ্ধ হন, তাহা রসাটোর একটি বর্ণনায় বুঝা যায়। তাঁহার (মুসোলিনীর) লিখিবার টেবিলের উপর ২০ রাউণ্ডের একটি বড় রিভলভার এবং একখানি চকচকে ধারালো বড় ছুরি থাকে। কালির আধারের উপর একটি ছোট রিভলভার থাকে। * * 'কেহই এখানে আসিতে পারিবে না, যদি কেহ আসে তাহাকে গুলি করিয়া মারিব।'

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ার এই প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের জীবনের কার্যাবলী সম্বন্ধে এখানে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, তাঁহার অসাধারণ রাজনৈতিক কৌশল ও বুদ্ধি-বলেই আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে শেষ হইয়াছিল।

ফ্রাঙ্কলিন কিরূপে জীবনের বিবিধ কার্যক্ষেত্রে এমন সাফল্য লাভ করেন, তাহার মূলমন্ত্র তাঁহার নিজের কথাতেই পাওয়া যায়। "আমার প্রত্যেকটি কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকিত এবং সেই শৃঙ্খলা অনুসারে আমি কাজ করিতাম।"

ফ্রাঙ্কলিনের দৈনন্দিন কার্য-প্রণালী

সকাল	৫টা	ঘুম হইতে ওঠা, হাত মুখ ধোওয়া,
প্রশ্ন—আজ আমি কি ভাল	৬টা	পোশাক পরা। (Powerful good-
কাজ করিব?	৭টা	ness!) দিবসের কার্য সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং সংকল্প স্থির করা। বর্তমানের কার্য ও প্রাতর্ভোজন
	৮টা	
	৯টা	
	১০টা	কার্য
	১১টা	
	১২টা	অধ্যয়ন, হিসাব পরীক্ষা এবং
দ্বিপ্রহর	১টা	মধ্যাহ্নভোজন
	২টা	
অপরাহ্ন	৩টা	কার্য
	৪টা	
	৫টা	
সন্ধ্যা	৬টা	জিনিসপত্র যথাস্থানে রাখা। সান্ধ্য-ভোজন। সংগীত ও বিশ্রাম অথবা কথাবার্তা, দিনের কার্যাবলী সম্বন্ধে
	৯টা	চিন্তা করা
	১০টা	
	১১টা	
	১২টা	
রাত্রি	১টা	নিদ্রা
	২টা	
	৩টা	
	৪টা	

আমার নিজের কথা বলি। আমার ডায়েরীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, কিরূপে আমি আমার কাজগুলি করি।

১৫ই জুন, ১৯২০

সকাল ৭—৮½টা—কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নাল পাঠ; ৯—১২টা—লেবরেটরীতে গমন; ১½—২½টা—পুনরায় লেবরেটরীতে গমন। মোটরে করিয়া পটারী

কারখানায় যাই; ৪½টায় ফিরিয়া আসি। পুনরায় লেবরেটরী দেখি ৫—৬টা—জোলা লিখিত গ্রন্থ 'মানি' (Money)। ৬-১৫—৭½টা—সিটি কলেজ কাউন্সিল সভা। ৮—৯½টা—ময়দান ক্লাব।

১২ই নবেম্বর, ১৯২১

সকাল—টেইন লিখিত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ। ৯টা—লেবরেটরী। স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানির এজেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ। একটু পরে বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজারের সঙ্গে গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ। একটি ঋণের বন্দোবস্ত করা। পটারী ওয়ার্কসের ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, অপরাহ্নে লেবরেটরী। বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টরদের সভা—খুব প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা।

৪ঠা জুন, ১৯২২

বহুবিষয়ে মনোযোগ দিবার ক্ষমতাই আমার একটা দৌর্বল্যবিশেষ। সকালবেলা - কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নাল (এপ্রিল সংখ্যা) পাঠ, তারপর 'মডার্ন রিভিউ'-এ লাহিড়ীর 'ফিস্‌ক্যাল পলিসি' এবং কালিদাস নাগের 'মলিয়েরের ত্রিশতবার্ষিকী' প্রবন্ধ। শেষোক্ত প্রবন্ধ পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম।

২৫শে জুন, ১৯২২

খুলনা দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত সেবাকার্যে এবং চরকা প্রচারে গত বৎসর হইতে আমার পরিশ্রম বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু মনের মত কাজ পাইলে, পরিশ্রমেও আনন্দ হয়।

৩১শে অগস্ট, ১৯২২

কিভাবে জীবন যাপন করিতেছি! আমার সকালবেলার সময়ের উপরও লোকে আক্রমণ করে। অজস্র দর্শক ও ছাত্রের দল আমার নিকটে নানা কাজে আসে। বলা বাহুল্য, আমি কোন আপত্তি করিতে পারি না। খদ্দর প্রচারের কাজে পরিশ্রম বাড়িয়া গিয়াছে। তারপর পটারী কারখানা এবং বঙ্গলক্ষ্মী মিলের সভা।

৬ই অক্টোবর, ১৯২২

বাংলাদেশ পুনর্বার ভীষণ দুর্গতির কবলে—উত্তরবঙ্গে প্লাবন; আমাকে আবার সেবাকার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যদিও এ কার্য আমার সাধ্যের অতিরিক্ত। তৎ-সত্ত্বেও গবেষণাকার্য বেশ চলিতেছে, বোধ হয় ূপ সুফল পূর্বেও কখন লাভ করি নাই।

খৃষ্টজন্মদিন, ১৯২২

প্ল্যাটিনাম সম্বন্ধে গবেষণা—লেবরেটরীর কাজ পুরাদমে চলিতেছে। দুইটি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রস্তুত। আরও দুইটির উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে। বন্যাসেবাকার্যের ভার কিছু হ্রাস হইয়াছে; সেইজন্য লেবরেটরীর কাজ খুব চলিতেছে। উৎসাহ পুরামাত্রায় আছে।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯২২

কয়েকদিন হইল অনিদ্রারোগে ভুগিতেছি। অভিযোগ করিয়া লাভ নাই, সহ্য করিতেই হইবে। হাক্সলির Controverted Essays পড়িতেছি—চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক।

৪ঠা মার্চ, ১৯২৩

নানা কাজের গোলমালে রসায়নশাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি নাই। সকালবেলা কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নাল পড়িলাম; যুদ্ধের পর ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের ধাতে আসিতেছে। অন্য পক্ষে আমাদের জাতির নিশ্চেষ্টতা ও অবসাদ গভীর চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৩

"Progress of Chemistry"-র বার্ষিক বিবরণীতে (১৯২২) 'ঘোষের নিয়মের' আলোচনা পিতৃস্নেহসিক্ত মন লইয়াই পড়িয়াছি।

২৮শে অগস্ট, ১৯৩১

সকাল	৬-৪৫ হইতে ৯টা—	অধ্যয়ন
	৯টা—৯½টা—	সংবাদপত্র
	৯½—হইতে ১০টা—	সুতাকাটা
	১০টা—১১-৪৫—	লেবরেটরী, সঙ্গে সঙ্গে

বন্যা-সেবাকার্যে মনোযোগদান। অসংখ্য পত্র, টেলিগ্রাম, দলে দলে স্কুলের ছাত্র এবং অন্যান্য বহু দাতা সাহায্য করিতেছেন।

আহার ও বিশ্রাম—১২টা—১½টা। ১½টার সময় ভবানীপুরে গেলাম। পদ্মপুকুর ও সাউথ সুবার্বন স্কুলের ক্লাসে ঘুরিয়া ছাত্রদিগকে তাহাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিলাম এবং আরও সাহায্য সংগ্রহ করিবার জন্য উৎসাহিত করিলাম। আশুতোষ কলেজে গিয়া ৩-১৫ মিনিটের সময় খোলা প্রাঙ্গণে একটি সভায় বক্তৃতা করিলাম। ৩-৪৫ মিনিটের সময় ফিরিয়া আসিলাম। ৪টা—৫টা—বিশ্রাম অর্থাৎ 'ক্রমওয়েল'-এর জীবনী পড়িলাম। ৫-৩০টায় মহাত্মাজীর নিকট তাঁহার সাফল্য কামনা করিয়া তার করিলাম। তার পরেই "শিক্ষা-মন্দিরে" গিয়া উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন করিলাম।

৭টায় ময়দানে যাই এবং রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকি। দেখা গিয়াছে, বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি(৩) এবং গ্রন্থকার ১০।১৫ ঘণ্টা অক্লান্তভাবে কাজ করেন, তারপর

(৩) কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাদ্রাজে থাকিবার সময় (১৮৪৮—৫৬) তাঁহার দৈনিক কার্য-তালিকা এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—স্কুলের ছাত্রের চেয়েও আমার জীবন পরিশ্রমপূর্ণ। আমার কার্যতালিকা ৬—৮ হিব্রু; ৮—১২ স্কুল; ১২—২ গ্রীক; ২—৫ তেলেগু ও সংস্কৃত; ৫—৭ লাটিন; ৭—১০ ইংরাজী। মাতৃভাষার উন্নতি সাধনের মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আমি কি প্রস্তুত হইতেছি না? (যোগীন্দ্র বসু কৃত জীবনী, ১৬৪ পৃঃ)।

আবার কিছুকাল নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ সাময়িক উত্তেজনা-বশে কাজ করা আমার পক্ষে কোনদিনই প্রীতিপদ নহে। আমি যাহা কিছু করিয়াছি,—ধীরে ধীরে নিয়মিত পরিশ্রমের দ্বারাই করিয়াছি। গল্পের কচ্ছপ তাহার অক্লান্ত ধীর গতির দ্বারাই খরগোসকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছিল। কোন গভীর বিষয়ে অধ্যয়ন বা রচনা, অনেকদিন আমি খুব সকালেই শেষ করিয়াছি—যে সময়ে যুবকেরা সুতপ্ত শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার মত শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন না। আমি সাধারণতঃ ৫টার সময় উঠি—তারপর দ্রুতপদে একটু ভ্রমণ এবং কিছু লঘু জলযোগের পর ৬টার সময় পড়িতে বসি।

গ্রন্থ নির্বাচন সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অল্প লোকই কোন একটা উদ্দেশ্য লইয়া পড়েন। তাঁহারা হাতের কাছে যে-কোন বই পান, টানিয়া লইয়া পড়েন। এইরূপ অধ্যয়নের দ্বারা মানসিক উন্নতি হয় না।

রেলযাত্রীরা প্রায়ই স্টেশনের বুকস্টলে যাইয়া একখানা বাজে নভেল কিনিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন—বইয়ের চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী পড়িয়াই প্রধানতঃ তাঁহারা আনন্দলাভ করেন। স্কট, ডিকেনস্, থ্যাকারে, ভিক্টর হুগো, টুর্গেনিভ, টলস্টয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদের উপন্যাস পড়িয়া অবশ্য লাভ আছে। কিন্তু অধিকাংশ সময় কেবলই উপন্যাস পড়িলে, গভীর বিষয় অধ্যয়ন করিবার শক্তি হ্রাস পায়। বিশ্রামের সময়েই লঘু সাহিত্য পাঠ করা উচিত। গত পাঁচ বৎসরে ভাল উপন্যাস অপেক্ষা ইতিহাস ও জীবনচরিতই আমি বেশী পড়িয়াছি এবং তাহার ফলে উপন্যাস পাঠের উপর আমার এখন কতকটা বিরাগ জন্মিয়াছে। কোন নূতন পুস্তক আমি গভীরভাবেই পাঠ করিতে আরম্ভ করি। যাঁহাকে দূর হইতে সসম্ভ্রমে দেখিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করিতে হইলে মনে যেমন উত্তেজনার ভাব আসে, নূতন গ্রন্থ পড়িবার সময়ে আমারও মনের ভাব সেইরূপ হয়। উদ্দেশ্যহীনভাবে পড়িতে আমি ভালবাসি না, বস্তুতঃ আমার অধ্যয়ন অল্প সীমার মধ্যে আবদ্ধ। অনেক সময় আমার প্রিয় গ্রন্থগুলি আমি পুনঃ পুনঃ পাঠ করি।

হ্যাল্‌ডেন বলেন,—"আমি শিখিয়াছি যে, কোন বই যদি পড়ার যোগ্য হয়, তবে উহা ভাল করিয়া পড়িয়া উহার মতামত আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহাতে আর একটি লাভ হয়, পড়িবার বইয়ের সংখ্যাও হ্রাস হয়।" (আত্মচরিত, ১৯ পৃঃ)

স্পেন্‌সারের প্রসঙ্গে মর্লিও এই কথা অল্পের মধ্যে সুন্দরভাবে বলিয়াছেন,—"একটা প্রচলিত অভ্যাস তিনি কোনদিনই মানিতেন না, তিনি কোন বই পড়িতেন না। যিনি কোন নূতন মত প্রচার করিতে চান, তাঁহার পক্ষে ইহার কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে, সন্দেহ নাই। অনেক লোক বই পড়িয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলেন। তাঁহারা দেখেন যে সব কথাই বলা হইয়াছে, নূতন কিছু বলিবার নাই। প্যাস্কাল, ডেকার্ট, রুসো প্রভৃতির মত 'অজ্ঞ লোক' যাঁহারা খুব কম বই-ই পড়িয়াছেন, কিন্তু চিন্তা করিয়াছেন বেশী, নূতন কথা বলিবার যাঁহাদের সাহস ছিল বেশী, তাঁহারাই জগৎকে পরিচালিত করিয়াছেন।" (মর্লির স্মৃতিকথা)।

গোল্ডস্মিথের 'ভাইকার অব্ ওয়েকফিল্ড'-এর প্রতি আমার আকর্ষণের কথা

পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার চরিত্রগুলি কি মানবিকতায় পূর্ণ! উনবিংশ শতাব্দীর দুইজন প্রসিদ্ধ লেখক এই বইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। স্কট বলেন,—"ভাইকার অব্ ওয়েকফিল্ড আমার যৌবনে ও পরিণত বয়সে পড়ি, পুনঃ পুনঃ ইহার শরণ লই এবং যে লেখক মানবপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের এমন সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তোলেন, তাঁহার স্মৃতির প্রতি স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা হয়।" গ্যেটে বলেন,—"তরুণ বয়সে আমার মন যখন গঠিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন এই বই আমার মনের উপর কি অসীম প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ইঁহার মার্জিতরুচিপ্রসূত শ্লেষ ও বিদ্রূপ, মানবচরিত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতার প্রতি উদার সহানুভূতি, সর্বপ্রকার বিপদের মধ্যে শান্তভাব, সমস্ত বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের মধ্যে চিত্তের সমতা এবং উহার আনুষঙ্গিক গুণাবলী হইতে আমি যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছিলাম।"

অনেক পুস্তককীট আছেন, মেকলে তাঁহাদের বলেন—'মস্তিষ্ক-বিলাসীর দল'। ইঁহারা একটির পর একটি করিয়া পুস্তক পাঠ শেষ করেন, কিন্তু গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কখনও চিন্তা বা আলোচনা করেন না। ফলে এইসব গ্রন্থকীট শীঘ্রই তাঁহাদের চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলেন। তাঁহাদের কেবল লক্ষ্য, কতকগুলি বই পড়িবেন, আর কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় তাঁহাদের নাই।

এইখানে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিব। ১৯২০ সালে লণ্ডনে থাকিবার সময়ে J. M. Keynes প্রণীত The Economic Consequence of the Peace বা 'সন্ধির অর্থনৈতিক পরিণাম' নামক সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ পাঠ করি। সন্ধিশর্তের ফলে জার্মানির নিকট কঠোরভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা হ্রাস না করিলে, কেবল মধ্য ইউরোপ নয়, সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যে অসীম আর্থিক দুর্গতি ঘটিবে, গ্রন্থকার ভবিষ্যৎদর্শী ঋষির দৃষ্টিতেই তাহা দেখিয়াছিলেন। পুস্তকের এই অংশের প্রুফ যখন আমি সংশোধন করিতেছি (এপ্রিল, ১৯৩২), আমি দেখিতেছি কেন্সের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। পরে আমি পুনর্বার ঐ পুস্তক মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি।

কেবল সময় কাটাইবার জন্য নয়, জীবনের আনন্দ বৃদ্ধি করিবার জন্যও প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী একটা আনুষঙ্গিক কাজ বা 'বাতিক' (hobby) থাকা চাই। যাঁহারা অবসর বিনোদনের উপায় রূপে বিজ্ঞানচর্চা করিয়া জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করিয়াছেন, এমন কতকগুলি লোকের নাম করা যাইতে পারে, যথা—ল্যাভোয়াসিয়ার, প্রিস্টলে, শীলে এবং ক্যাভেন্‌ডিশ। ডায়োক্লিশিয়ান এবং ওয়াশিংটন কার্যময় জীবন হইতে অবসর লইয়া বৃদ্ধবয়সে পল্লীজীবনের নির্জনতায় কৃষিকার্য করিয়া সময় কাটাইতেন। গ্যারিবল্ডিও ঐরূপ করিতেন। অন্য অনেকে, মানব-হিতে, রুগ্ণ ও দরিদ্রের দুঃখ-মোচনে এবং অন্যান্য নানারূপ সমাজসেবায় আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। কেহ কেহ বা শিল্পকলা—যথা সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতির চর্চায় সময় কাটাইয়াছেন। এ-বিষয়ে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই, লোকের রুচির উপর ইহা নির্ভর করে। কথায় বলে—অলস মন, শয়তানের আড্ডা। যেসব কাজের কথা উল্লেখ করিলাম, তরল আমোদ-

প্রমোদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। 'আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ'—অর্থাৎ নিজের মধ্যে নিজেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

অন্যের উপর যতই নির্ভর করা যায়, দুঃখ ততই বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ লোক দিনের কাজকর্ম শেষ হইলে, ক্লাবের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, অথবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডায় গল্প করিয়া সময় কাটায়। তাহারা সময়কে বধ করে বলিলেই ঠিক হয়। সর্বোপরি, সন্তোষ অভ্যাস করিতে হইবে। বাল্যকালে এডিসনের প্রবন্ধে পড়িয়া-ছিলাম—"আমোদ অপেক্ষা আনন্দই আমি চিরদিন বেশী পছন্দ করি।" আনন্দ জীবনের চক্রে যেন তৈলের ন্যায় কাজ করে। এমন সব লোক আছে, সামান্য কারণেই যাহাদের মেজাজ চটিয়া যায়। তুচ্ছ কারণে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। এই সমস্ত লোক সর্বদাই দুঃখ পায়। যাহারা অপ্রিয় ব্যাপার হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, তাহাদের সৌভাগ্য আমি কামনা করি, অন্যের মনোভাব সম্বন্ধে সব সময়ে ভাল দিকটাই দেখিতে হয়। ঈর্ষাকে পরিহার করিতে হইবে, ঈর্ষা লোকের জীবনীশক্তি নষ্ট করে। যাহাকে ঈর্ষা করা যায়, তাহার কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু যে ঈর্ষা করে, তাহার হৃদয় দগ্ধ হয়। হিংসা ও বিদ্বেষ মনের সন্তোষ নষ্ট করে। আর মনের সঙ্গে দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যে অন্যের প্রতি হিংসা করে, সে ভুলিয়া যায় যে তাহাতে তাহার নিজের মনের শান্তিও দূর হয়।

"মিল বলেন, বৈষয়িক কার্যের অভ্যাস সাহিত্য-চর্চার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, ইহাতে শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁহার (মিলের) তরুণ বয়সের অভিজ্ঞতা এই যে, সমস্ত দিনের কাজের পর দুই ঘণ্টায় অনেক বেশী সাহিত্যসেবা করিতে পারিতেন; যখন তিনি প্রচুর অবসর লইয়া সাহিত্যচর্চা করিতে বসিতেন, তখন তেমন বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিতেন না। বৈষয়িক কার্যের সঙ্গে সাহিত্যচর্চার সমন্বয়ের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত বেজহটের জীবন। গিবন বলিতেন যে, শীতকালে লণ্ডনসমাজ ও পার্লামেণ্টের কর্মচঞ্চল জীবনের মধ্যে তিনি অধিক মানসিক শক্তি অনুভব করিতেন, রচনাকার্য তাঁহার পক্ষে বেশী সহজ হইত। গ্রোট প্রতিদিন তাঁহার 'গ্রীসের ইতিহাস' লিখিবার জন্য আধ ঘণ্টা সময় ব্যয় করিতেন, দুই খণ্ড গ্রন্থ বাহির হইবার পূর্বে ব্যাঙ্কের কাজে তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। আমাদের সমসাময়িক জনৈক লোকপ্রিয় ঔপন্যাসিক ডাকঘরের কর্মচারী ছিলেন। প্রত্যহ সকাল বেলা ৫টা-৬টার সময় তিনি ডাকঘরের কাজের মতই সময় নির্দিষ্ট করিয়া উপন্যাস লিখিতে বসিতেন।" (মর্লির স্মৃতি-কথা, প্রথম খণ্ড, ১২৫ পৃঃ)

বৈষয়িক কার্যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াও কিরূপে সাহিত্য সেবা এবং বিদ্যানু-শীলন করা যায়, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, গ্রীসের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার জর্জ গ্রোটের জীবন। দশ বৎসর বয়সে তিনি 'চার্টার হাউসে' ভর্তি হন এবং ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্যাঙ্কে শিক্ষানবিস নিযুক্ত করেন। গ্রোটের বিদ্যাচর্চার প্রতি তাঁহার পিতার একটা অবজ্ঞার ভাবই ছিল। তিনি ব্যাঙ্কে ৩২ বৎসর কাজ করেন এবং ১৮৩০ সালে উহার প্রধান কর্মকর্তা হন। কিন্তু এই কার্যব্যস্ততার মধ্যেও তিনি অবসর সময়ে নিয়মিত ভাবে সাহিত্যসেবা ও রাজনীতি আলোচনা

করিতেন। ১৮৪৩ সালে ব্যাঙ্ক হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁহার গ্রীসের ইতিহাস (১২ খণ্ড) শেষ করেন বটে; কিন্তু ১৮২২ সালেই তিনি ঐ গ্রন্থ লিখিবার সংকল্প করেন এবং বরাবর উহার জন্য অধ্যয়ন ও মালমসলা সংগ্রহকার্যে লিপ্ত ছিলেন। গ্রোট নূতন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান প্রবর্তক। তিনি কয়েক বৎসর পার্লামেণ্টের সদস্যও ছিলেন।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই জানি যে, যাহারা কাজের লোক, তাহাদের সময়ের অভাব হয় না। যাহারা অলস, যাহাদের কাজে শৃঙ্খলা নাই, তাহারাই কেবল দৈনন্দিন কাজে বা কোন জরুরী কাজের জন্য সময়ের অভাবের কথা বলে।

ক্রমওয়েল ১৬৫০ খৃীঃ ৩রা সেপ্টেম্বর ডানবারের যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়াও পলাতক শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কাটে। "পরদিন ৪ঠা সেপ্টেম্বর সকালে লর্ড জেনারেল (ক্রমওয়েল) বসিয়া পর পর সাতখানি পত্র লেখেন। তাহার মধ্যে একখানি স্পীকার লেন্‌থলের নিকট আট পৃষ্ঠাব্যাপী ডেস্‌প্যাচ। আর একখানি তাঁহার 'প্রিয়তমা পত্নী' এলিজাবেথের নিকট এবং তৃতীয়খানি 'প্রিয় ভ্রাতা' রিচার্ড মেয়বের নিকট। রিচার্ড মেয়র ক্রমওয়েলের পুত্রের শ্বশুর বা বৈবাহিক ছিলেন। (ক্রমওয়েল, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০৯-২৫ পৃঃ)

১৬৫১ খৃীঃ ৩রা সেপ্টেম্বর ওরস্টারের যুদ্ধ হয়। ক্রমওয়েল স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সমস্ত দিন স্কচেরা ভীষণ যুদ্ধ করে। ক্রমওয়েল রণক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সৈন্যচালনা করেন। ৪।৫ ঘণ্টা তুমুল সংগ্রাম হয়।

ঐ দিন রাত্রি ১০টার সময় হঠাৎ যুদ্ধ-বিরতির পরই ক্রমওয়েল স্পীকার লেন্‌থলকে যুদ্ধের একটি বর্ণনা প্রেরণ করেন। "আমি ক্লান্ত, লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে না, তবু আপনাকে এই বিবরণ প্রেরণ করা কর্তব্য বোধ করিতেছি।" (৩২৫—৩২৯ পৃঃ)

আমি উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলির দ্বারা ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মহৎ ব্যক্তিদের সংযম-শক্তি ও আত্মসমাহিত ভাব অসাধারণ; তাঁহাদের কার্যপ্রণালীর মধ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে, এবং সেই জন্যই তাঁহারা বহু বিষয়ে মন দিতে পারেন ও সব কাজই সুসম্পন্ন করিতে পারেন। কার্লাইল বীর-উপাসক ছিলেন। তিনি ক্রমওয়েলকে বলিয়াছেন, 'ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা মহৎ চরিত্র।' এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ থাকিতে পারে। জনৈক প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন, "ক্রমওয়েল তাঁহার দেশ-বাসীর রক্তপাতের কলঙ্ক হইতে মুক্ত ছিলেন না।"

আর একটি দৃষ্টান্ত দেই। মুস্তাফা কামাল পাশার স্বদেশবাসিগণ তাঁহাকে নব্য তুরস্কের রক্ষাকর্তা বলিয়া পূজা করেন। কামাল পাশা একাধারে যোদ্ধা, রাজনীতিক, সমাজ-সংস্কারক। তিনি আঙ্গোরা সম্পর্কে সমস্ত কাজই করিবার সময় পান, মন্ত্রীদের সঙ্গে সমস্ত গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁহাদিগকে কার্যে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহার বহুমুখী কার্যশক্তির গুপ্ত রহস্য কি? মিস গ্রেস এলিসন সেই কথাটি সংক্ষেপে বলিয়াছেন :—"মোস্তাফা কামাল পাশার মনঃসংযোগ-

শক্তি অসাধারণ। তিনি মুহূর্তের মধ্যে যে কোন বিষয়ে মন দিতে পারেন এবং সেই সময়ে পূর্ব মুহূর্তের সমগ্র চিন্তা ভুলিয়া যান।” (বর্তমান তুরস্ক, ১৮ পৃঃ)

আর একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত দিতেছি, তিনি প্রেম ও অহিংসা সংগ্রামের মূর্ত বিগ্রহ। মহাত্মা গান্ধীর কর্মশৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা অসাধারণ, তিনি গুরুতর বিষয় সম্পর্কে বড়লাট ও স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেছেন, পত্র লিখিতেছেন, প্রত্যহ তাঁহার নিকট দেশদেশান্তর হইতে শত শত পত্র টেলিগ্রাম আসিতেছে। বহুলোক বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছে; তিনি তাহাদের কথা শুনিতেছেন, ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’র জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং আরও বহু কাজ করিতেছেন,—কিন্তু এই সমস্ত গুরুতর কাজের মধ্যেও, তাঁহার অসংখ্য বন্ধু ও সহকর্মীদের নিকট নিজে উদ্যোগী হইয়া পত্র লিখিবার সময় তিনি পান। আমি চিরদিনই তাঁহার মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছি। গত দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কোন পত্র লিখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সংবাদপত্রে, বোম্বাই শহরবাসীদের প্রতি বাংলার বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য আমার নিবেদনপত্র দেখিয়া, আমাকে এবং বন্যা-সেবাকার্যে আমার প্রধান সহকারীকে, মহাত্মাজী দুইখানি দীর্ঘ পত্র লিখেন। অদ্য—১৯৩১ সালের ৩০শে অগস্ট সকালে, এই কয়েক ছত্র লিখিবার সময় আমি সংবাদপত্রে দেখিতেছি, তিনি বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসীদের নিকট একটি বিদায়বাণী দিয়াছেন :—

ইংলণ্ড যাত্রার পূর্বে
বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য গান্ধীজীর আবেদন

“আমি আশা করি, বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা বাংলার বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইবে এবং ডাঃ পি. সি. রায়ের. নিকট তাহাদের দান প্রেরণ করিবে।” অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, বোম্বে, ২৯শে অগস্ট, ১৯৩১।

মনকে এইভাবে চিন্তামুক্ত করিয়া বিষয়ান্তরে অভিনিবেশ করিবার ক্ষমতা, আমাকেও কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতি দান করিয়াছেন এবং এই শক্তিবলে আমি সময়ে সময়ে একাদিক্রমে ৬।৭টি বিভিন্ন কাজে মনঃসংযোগ করিয়াছি।

আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমার জীবনের কোন্ অংশ সর্বাপেক্ষা কর্মব্যস্ত?—আমি বিনা দ্বিধায় উত্তর দিব—ষাট বৎসরের পর। এই সময়ের মধ্যে আমি ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, প্রায় দুই লক্ষ মাইল ভ্রমণ করিয়া স্বদেশী শিল্পপ্রদর্শনী, জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উদ্বোধন করিয়াছি, স্বদেশীর কথা প্রচার করিয়াছি। দুইবার ইউরোপেও গিয়াছি। কিন্তু আমার দৈনন্দিন কার্যতালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, এইরূপে বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত থাকিলেও বিজ্ঞানাগারে আমার গবেষণাকার্য ত্যাগ করি নাই,—যদিও এদেশের অনেকেরই ধারণা যে বহুপূর্বেই আমি গবেষণাকার্য পরিত্যাগ করিয়া থাকিব। একথা সত্য যে, কাহারও কর্মক্ষেত্র যদি বহুবিস্তৃত হয়, তবে নির্জনতাপ্রিয় ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মত সে গবেষণাকার্যে তত বেশী মনোযোগ দিতে পারে না। এই ক্ষতি

পূরণ করিবার জন্য আমি আমার অবকাশের সময় সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। পূর্বে গরমের ছুটির পুরা একমাস আমি স্বগ্রামে কাটাইতাম, এখন কখন কখন খুলনা ও অন্যান্য স্থানে বেড়াইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটিতে (১২।১৪ দিন ব্যতীত) এবং পূজা, বড়দিন ও ইস্টারের ছুটিতে আমি লেবরেটরীতে কাজ করিয়া থাকি। বস্তুতঃ, বোম্বাই, নাগপুর, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর*, লাহোর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত এখন আমার নিকট ছুটি বলিয়া গণ্য। সুতরাং দেখা যাইবে যে, আমি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সময়ের ক্ষতিপূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। গত ২১ বৎসর যাবৎ আমি প্রত্যহ দুই ঘণ্টা ময়দানে কাটাইয়া আসিতেছি। ইহার ফলে স্বাস্থ্যলাভের জন্য শৈলবিহারে গমন করা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত, যে কাজে দীর্ঘকালব্যাপী অবিরাম মানসিক শ্রমের প্রয়োজন, এমন কাজে আমি কখনও হাত দিই নাই। ঐরূপ অবিরত শ্রমেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সেই কারণে দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্রামেরও প্রয়োজন।

গত অর্ধশতাব্দী কাল, স্বাস্থ্যের জন্য, অপরাহ্ণ ৫টা, সাড়ে ৫টার পর আমি কোনপ্রকার মানসিক শ্রম করি নাই। শীতপ্রধান দেশে এই নিয়ম কিঞ্চিৎ ভঙ্গ করিয়াছি, যথা,—শুইতে যাইবার পূর্বে দু' এক ঘণ্টা কোন লঘু সাহিত্য পাঠ করিয়াছি। বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্য আমাকে বহু সময় দিনে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু এমনভাবে আমি সে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছি যে, আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোন ব্যাঘাত হয় না,—দৈনন্দিন কার্যতালিকা অনুসারে যথাযথ কাজ করিবার ফলেই,—বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার যথেষ্ট অবসর আমি পাইয়াছি। গ্যেটে সত্যই বলিয়াছেন,—"সময় সুদীর্ঘ, যদি আমরা ইহার সদ্ব্যবহার করি, তবে অধিকাংশ কাজই এই সময়ের মধ্যেই করা যাইতে পারে।"

বস্তুতঃ, মানুষের প্রতি ভগবানের এই মহৎ দান সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ লুই আগাসিজ যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম আমি বেশ উপলব্ধি করিতে পারি।

"দশ বৎসর বয়সে আগাসিজ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তৎপূর্বে গৃহেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর বিয়েন শহরের একটি বালকদের বিদ্যালয়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা অগাস্ট চার বৎসর পড়েন। কিন্তু লুইয়ের সত্যকার জ্ঞানপিপাসা ছিল এবং দীর্ঘ অবকাশের সুযোগ তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতেন। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া এই সময়ে তিনি আনন্দলাভ করিতেন।" বাঙালী ছেলেরা কবে এরূপ প্রকৃতিপ্রিয়তা লাভ করিবে?

আগাসিজ বলিয়াছেন—"লোকে কেন অলস হয়, আমি বুঝিতে পারি না; সময় কাটাইবার উপায় খুঁজিয়া পায় না, লোকের এরূপ অবস্থা কিরূপে হইতে পারে, তাহা বুঝা আমার পক্ষে আরও শক্ত। নিদ্রার সময় ব্যতীত, এমন এক মুহূর্তও

---

* গত চারি বৎসর হইল, সায়েন্স ইনস্টিটিউটের কাউন্সিল সভায় আমি বৎসরে ৩।৪ বার যোগদান করিয়া আসিতেছি।

নাই, যখন আমি কর্মের আনন্দের মধ্যে ডুবিয়া না থাকি। তোমার নিকট যে সময় বিরক্তিকর বা ক্লান্তিজনক মনে হয়, সেই সময়টা আমাকে দাও, আমি উহা মূল্যবান উপহার বলিয়া মনে করিব। দিন যেন কখন শেষ হয় না, ইহাই আমি ইচ্ছা করি।"

পরলোগত রসায়নাচার্য স্যার এডোয়ার্ড থর্প আমার Essays and Discourses নামক গ্রন্থ সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"হিন্দু রাসায়নিকের জীবন-ব্রত"

......"স্যার পি. সি. রায় যে শীঘ্রই 'সাধারণের সম্পত্তি' বলিয়া গণ্য হইবেন, ইহা পূর্ব হইতেই বুঝা গিয়াছিল। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সম্মেলন, সাময়িক পত্র, সংবাদপত্র ও দেশের সামাজিক, শিল্পবাণিজ্যগত এবং রাজনৈতিক উন্নতি প্রচেষ্টার সহিত যাহারা সংসৃষ্ট তাহারা জাতীয় কল্যাণের পথ নির্দেশ করিবার জন্য তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল।......অজীর্ণ-রোগ-গ্রস্ত, ক্ষীণ-দেহ এই ব্যক্তি দেশের সেবাতেই নিজের জীবন ক্ষয় করিবেন।" (নেচার, ৬ই মার্চ, ১৯১৯)

তিনি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে বুঝিতে পারিতেন যে, ভগবানের ইচ্ছায় আমার জীবনের কার্য এখনও শেষ হয় নাই। গত ত্রয়োদশবর্ষকাল আমি আমার জীবনে পূর্বের চেয়ে আরও বেশী পরিশ্রম করিয়াছি।

যদি কেহ আমার দৈনিক কার্যক্রম পাঠ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় করিবার সময় আমার হয় নাই। ২৫ বৎসর পূর্বে, জগদীশচন্দ্র বসু, নীলরতন সরকার, পরেশনাথ সেন (বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক), হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য প্রভৃতি বন্ধুগণের বাড়ীতে দু এক ঘণ্টা কাটাইতে পারিতাম, তাঁহাদের বাড়ী আমার নিজগৃহতুল্যই ছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের এত বেশী কাজের সঙ্গে জড়িত হওয়াতে, আমার সামাজিক আনন্দের অবসর লোপ পাইয়াছে। সন্ধ্যাবেলাই সাধারণতঃ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সময়, কিন্তু এই সময়টা আমি 'ময়দান ক্লাবে' কাটাই। অবস্থা-চক্রে বাধ্য হইয়া, নিকটতম আত্মীয়দের কাছেও আমি অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছি। লেবরেটরী ও অন্যান্য স্থানে আমার প্রিয়তম ছাত্রগণের সাহচর্যে আমি অন্য সমস্ত জিনিস, এমন কি বার্ধক্যের আক্রমণও ভুলিয়া গিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি অধ্যক্ষতার কার্য আমি চিরদিন পরিহার করিয়াছি, কেননা ইহাতে অত্যন্ত সময় ব্যয় করিতে হয়। গত ২৫ বৎসরকাল আমি পরীক্ষকের কাজ গ্রহণ করি নাই। মাঝে মাঝে কেবল দুই একটি থিসিস (মৌলিক রচনা) দেখিয়াছি বা প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিয়াছি। আমার জনৈক ইংরাজ সহকর্মী বলিতেন, পরীক্ষকের কাজে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়,—কিন্তু একঘেয়ে পরিশ্রমসাধ্য কাজে সময়ের যথেষ্ট অপব্যয় হয় এবং স্নায়ু পীড়িত হয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রাজনীতি-সংসৃষ্ট কার্যকলাপ

আমার আলোচিত বিজ্ঞান সম্পর্কীয় কাজ, বা শিল্পে তাহার প্রয়োগ, অথবা দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা মোচন, এই সব কাজেই প্রধানতঃ আমি মন দিয়াছি। নানা বিভিন্ন কাজে জড়িত থাকিলেও, রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি আমার গভীর আকর্ষণ আমার জীবনের শান্তিস্বরূপ ছিল। যে বিজ্ঞানদেবীর নিকট প্রথম জীবনে আমি আত্মনিবেদন করিয়াছিলাম, তাঁহাকে কখনও আমি পরিত্যাগ করি নাই। সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পর ক্বচিৎ কখনও আমি রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দিবার জন্য আহূত হইয়াছি।

আমি কখনও মনে করি নাই যে, আমার স্বভাব ও প্রবৃত্তিতে রাজনীতিক হইবার যোগ্যতা আছে। যে ব্যক্তির জীবনের অধিকাংশ সময় লেবরেটরী ও লাইব্রেরিতে কাটিয়াছে, এই বিশাল মহাদেশের সর্বত্র ঘুরিয়া সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ানো তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। ইহাতে যে শারীরিক শক্তি ব্যয় করিতে হয়, তাহাই করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বস্তুতঃ, আমার ক্ষীণ দেহ, স্বাস্থ্য এবং বার্ধক্য রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পক্ষে বাধাস্বরূপ।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, গত অর্ধশতাব্দী কাল ধরিয়া আমি অনিদ্রারোগে ভুগিয়াছি, উহা আমার কাজের পক্ষে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন কাজে শক্তি ও সময় ব্যয় করিলে, আমার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। লর্ড রোজবেরী গ্লাডস্টোনের পর, কিছুদিন প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, যদিও তাঁহার স্বদেশবাসীরা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। লর্ড ক্রু কর্তৃক লিখিত লর্ড রোজবেরীর জীবনীতে আমরা জানিতে পারি,—"লর্ড রোজবেরী অশেষ প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনিদ্রা রোগও ছিল।" ১৯১৩ সালে লর্ড রোজবেরী লিখেন,—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমি পুনর্বার প্রধান মন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণ করি, তবে আবার আমার অনিদ্রারোগ হইবে।"

আমার স্বাস্থ্যের এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও ১৯২১—২৬ এই কয় বৎসরে আমি দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া জাতীয় বিদ্যালয় রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, খদ্দর প্রচলন এবং অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য প্রচারকার্য করিয়াছি। খুলনা, দিনাজপুর, কটক প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি জেলা সম্মেলনে আমাকে সভাপতিত্ব করিতেও হইয়াছে, কেননা ঐ সময়ে প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতাই কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের যখন পূর্ণ বেগ, সেই সময়ে আমি বলি—বিজ্ঞান অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু স্বরাজ অপেক্ষা করিতে পারে না। এই কথার ব্যাখ্যা করা

নিষ্প্রয়োজন। প্রসিদ্ধ ক্যানিজারো যখন রাসায়নিক রূপে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত, সেই সময় ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইল। ক্যানিজারো তাঁহার পথ বাছিয়া লইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। তিনি তাঁহার গবেষণাগার বন্ধ করিয়া স্বেচ্ছাসৈনিক হইয়া বন্দুক ঘাড়ে করিলেন। জন হাম্পডেনের ন্যায় যুদ্ধের প্রথম অবস্থাতেই গুলিতে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারিত। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক দেশের প্রতি কর্তব্যের আহ্বানে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ইংরাজ পদার্থবিদ্যাবিৎ মোজলে অন্যতম। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ পদার্থবিদ্যাবিদৎ মিলিক্যান তাঁহার সম্বন্ধে বলেন :—"২৬ বৎসর বয়স্ক এই তরুণ বৈজ্ঞানিক আণবিক জগৎ সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অপূর্ব; আমাদের চক্ষের সম্মুখে ইহা বহুতর রহস্যের নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। ইউরোপীয় যুদ্ধে যদি এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু ভিন্ন আর কোন অনর্থ না ঘটিত, তাহা হইলেও সভ্যতার ইতিহাসে ইহা একটি বীভৎস এবং অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত।"

১৯১৫ সালের ১০ই অগস্ট প্রসিদ্ধ ফরাসী রসায়নবিৎ হেনরী ময়সানের একমাত্র পুত্র লুই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। যুদ্ধের পূর্বে তিনি কলেজে তাঁহার পিতার সহকারী ছিলেন।

ভারতে বর্তমানে আমরা যেরূপ সঙ্কটময় সময়ে বাস করিতেছি, তাহাতে বিখ্যাত মনীষী হ্যারল্ড ল্যাস্কির নিম্নলিখিত সারগর্ভ মন্তব্য আমাদের প্রণিধান করা কর্তব্য :—

"একথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে নিশ্চেষ্টতা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কল্যাণবুদ্ধির অভাবে পর্যবসিত হয়। যাহারা বলে যে, কোন একটা অবিচারের প্রতিকার করিবার দায়িত্ব তাহাদের নহে, তাহারা শীঘ্রই অবিচার মাত্রই রোধ করিতে অক্ষম হইয়া উঠে। লোকের নিশ্চেষ্টতা ও জড়তার উপরেই অত্যাচারের আসন। অবিচারের বিরুদ্ধে কেহ কোন প্রতিবাদ করিবে না, বাধা দিবে না, এই ধারণার যখন সৃষ্টি হয়, তখনই স্বেচ্ছাচারীর প্রভুত্ব প্রবল হইয়া উঠে। 'যে রাষ্ট্রের অধীনে কোন ব্যক্তিকে অন্যায়রূপে কারারুদ্ধ করা হয়, সেখানে প্রত্যেক খাঁটি ও সৎলোকের স্থানও কারাগারে'—থোরোর সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটির মর্ম ইহাই, কেন না সে যদি অন্যায়ের ক্রমাগত প্রতিবাদ না করে, তবে মনে করিতে হইবে যে সে অন্যায় ও অবিচারকে প্রশ্রয় দিতেছে। তাহার নীরবতার ফলে সে-ই 'জেলার' বা কারাধ্যক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। শাসকগণ তাহার উপর নির্ভর করে, মনে করে সে অতীতে যে নিশ্চেষ্টতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাতেই প্রমাণ, তাহার বিবেক-বুদ্ধি লোপ হইয়াছে। অত্যাচারী প্রভু, নিষ্ঠুর বিচারক এবং দুশ্চরিত্র রাজনীতিক—ইহাদের কাজে কেহ অতীতে বাধা দেয় নাই বলিয়াই, ইহারা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সাহসী হইয়াছে। তাহাদের অত্যাচার ও অবিচারকে একবার বাধা দেওয়া হোক, একজন সাহসের সহিত দণ্ডায়মান হোক, দেখিবে সহস্র লোক তাহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত। এবং যেখানে সহস্র লোক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে প্রস্তুত, সেখানে

অন্যায়কারীকে কোন কাজ করিবার পূর্বে পাঁচবার ভাবিতে হয়।" —(The Dangers of Obedience—pp. 19-20).

ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতির ন্যায় উন্নত দেশে গণশক্তি জাগ্রত, সেখানে বহু কর্মী সাধারণের কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। সেখানেও লোকে এই অভিযোগ করে যে, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক রাষ্ট্রনীতি হইতে দূরে থাকিয়া দেশের ক্ষতি করে। একজন চিন্তাশীল লেখক এই সম্পর্কে বলিয়াছেন :—

"অনেক দিন হইতেই একটা কথা প্রচলিত আছে যে, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের পক্ষে জনারণ্য হইতে দূরে নির্জনে বাস করা শ্রেয়ঃ। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বর্তমান যুগের জনসাধারণ চিন্তা ও ভাবে সাড়া দিতে জানে, তবে তাহারা নিজেদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার মধ্যে সেগুলি বুঝিতে চায়। দৈনন্দিন কার্য-প্রবাহের মধ্যে উহাকে দেখিতে চায়। চিন্তা ও ভাবের আদর্শ যে জনসাধারণের বুদ্ধির স্তরে নামাইতে হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহারা যে সব সমস্যায় পীড়িত, সেগুলির সমাধান করিতে হইবে। যাহাদের চিন্তার মৌলিকতা ও নেতৃত্বের ক্ষমতা আছে, এমন সব বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যদি ঐ সব সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে কোন যশের কাঙাল, জনমতের ক্রীতদাস, নিম্নশ্রেণীর সাংবাদিক বা দুষ্টপ্রকৃতির রাজনীতিক সেই ভার গ্রহণ করিবে? (Lucian Romier,—"Who will be Master,—Europe or America?")

প্লেটো এই কথাটি অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—সৎ নাগরিকেরা যদি রাষ্ট্রীয় ও পৌরকার্যের অংশ গ্রহণ না করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ অসৎ লোকদের দ্বারা তাহাদের শাসিত হইতে হয়।

যদিও আমি প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেই নাই, তথাপি আমি একেবারে উহার সংস্রব ত্যাগ করিতেও পারি নাই। আমাকে অনেক সময়ই রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইতে হইয়াছে। কোকনদ কংগ্রেসে (১৯২৫), আমি দর্শক ও প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলাম। প্রেসিডেণ্ট মহম্মদ আলির নিকটেই বসিবার আসন হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে, বৈকালিক নমাজের সময়, প্রেসিডেণ্টের স্থলে অন্য একজনের সভাপতির আসন অধিকার করিবার প্রয়োজন হইল। সাধারণতঃ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরই এরূপ ক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্টের আসন গ্রহণ করিবার কথা। কিন্তু মহম্মদ আলি আমাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন এবং এ বিষয়ে প্রতিনিধিবর্গের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং আমি দশ মিনিটের জন্য সভাপতি হইলাম। ইহার অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্তও আমার স্মরণ হইতেছে, যদিও উহা কতকটা হাস্যকর। লর্ড হ্যালডেন বার্লিন হইতে ফিরিলে, ১৯০৭ সালে রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড জার্মান সম্রাটকে উইণ্ডসর প্রাসাদে রাজকীয়ভাবে নিমন্ত্রণ করিলেন। জার্মান সম্রাটের সঙ্গে তাঁহার কয়েকজন সঙ্গীও আসিলেন, কেননা রাজনৈতিক ব্যাপার আলোচনা করিবার প্রয়োজন ছিল। লর্ড হ্যালডেন তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিতেছেন—"এক সময় মন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ হইল এবং তুমুল তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল। 'আমি

জার্মান সম্রাটকে বলিলাম যে আমি একজন বিদেশী এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্য নহি, সুতরাং আমার সেখানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু সম্রাটের রসবোধ ছিল এবং আমার সমর্থন লাভ করিবারও ইচ্ছা ছিল। তিনি বলিলেন,—'আজ রাত্রির জন্য আপনি আমার মন্ত্রিসভার সদস্য হউন, আমি আপনাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিব।' আমি সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। আমার বিশ্বাস, আমিই একমাত্র ইংরাজ যে জার্মান মন্ত্রিসভার সদস্য হইতে পারিয়াছি, যদিও অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্য মাত্র।" (হ্যালডেন —আত্মজীবনী)

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারতবাসীরা আশা করিয়াছিল ব্রিটেন তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ একটা বড় রকমের শাসন-সংস্কার দিবে। কেননা ব্রিটেনের সঙ্কটসময়ে ভারত অর্থ ও সৈন্য দিয়া বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবাসীরা সশঙ্ক চিত্তে দেখিল যে তাহাদের রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ 'রাউলাট আইন' পাইয়াছে! এই আইন অনুসারে পুলিস যে কোন রাষ্ট্রিককে গ্রেফতার করিয়া বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করিয়া রাখিতে পারে। ইহার ফলে স্বভাবতঃই দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হইল। টাউনহলে একটি সভা হইল, তাহার প্রধান বক্তা ছিলেন সি. আর. দাশ,—তিনি তখন সবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছেন। আমার বন্ধু সত্যানন্দ বসু একদিন আমাকে বলিলেন যে আমি যদি একটু আগে ময়দানে বেড়াইতে যাই, তবে সভায় যোগদান করিতে পারিব। সুতরাং কতকটা ঘটনাচক্রেই আমি সভায় উপস্থিত হইলাম। টাউনহলের নিচের তলায় সভাস্থলে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। হলের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির উপরে এবং রাস্তাতেও বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। লোকে যাহাতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে পারে, এই জন্য শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সম্মুখের সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি জনতার পশ্চাতে ছিলাম। এই সময়ে কেহ কেহ আমাকে দেখিতে পাইয়া সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিল এবং চিত্তরঞ্জনের পার্শ্বেই আমি স্থান গ্রহণ করিলাম। আমি যাহাতে কিছু বলি, সেজন্য সকলেরই আগ্রহ ছিল। তাহার পর কি হইল, একখানি স্থানীয় দৈনিকপত্রে বর্ণিত হইয়াছে :—

"মিঃ সি. আর. দাশ ডাঃ স্যার পি. সি. রায়কে আলোচ্য প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ডাঃ রায় বক্তৃতা করিবার জন্য উঠিলেন। সেই সময়ে একটি দৃশ্যের সৃষ্টি হইল, যাহা ভুলিতে পারা যায় না। কয়েক মিনিট পর্যন্ত ডাঃ রায় কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কেন না তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া চারিদিকে ঘন ঘন আনন্দোচ্ছ্বাস ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি হইতে লাগিল। ডাক্তার রায় আরম্ভে বলিলেন যে তাঁহাকে যে সভায় বক্তৃতা করিতে হইবে, ইহা তিনি পূর্বে কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি মাত্র দর্শক হিসাবে আসিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারেই তাঁহার কাজ। কিন্তু এমন সময় আসে, যখন বৈজ্ঞানিককেও —তাঁহার অবশিষ্ট কথাগুলি শ্রোতৃবর্গের আনন্দধ্বনির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ডাঃ রায় পুনরায় বলিলেন—'এমন সময় আসে যখন বৈজ্ঞানিককেও গবেষণা ছাড়িয়া দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়।' আমাদের জাতীয় জীবনের উপর এমন বিপদ

ঘনাইয়া আসিয়াছে যে ডাঃ পি. সি. রায় তাঁহার গবেষণাগার ছাড়িয়া এই দেশের অনিষ্টকর আইনের প্রতিবাদ করিবার জন্য সভায় যোগ দিয়াছিলেন।" (অমৃতবাজার পত্রিকা, ফেব্রুআরি, ১৯১৯)।

পূর্বপৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে ভারত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিল। নিম্নে ঐ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

সহকারী ভারতসচিব লর্ড ইসলিংটন 'ইণ্ডিয়া ডে' বা 'ভারত দিবস' (৫ই অক্টোবর, ১৯১৮) উপলক্ষে একটি বিবৃতি-পত্র প্রস্তুত করেন। উহাতে, ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারতের দান তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়। (ক) সৈন্য, (খ) যুদ্ধের উপকরণ, (গ) অর্থ; তন্মধ্যে প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ করা হইতেছে।

(ক) সৈন্য—ভারত হইতে যে সব ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্য ৪ঠা অগস্ট ১৯১৪ হইতে ৩১শে জুন ১৯১৮ পর্যন্ত প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ১,১১৫,১৮৯।

(খ) যুদ্ধের উপকরণ—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, যদি ভারতের প্রদত্ত মালমসলা উপকরণ প্রভৃতি ব্রিটেন না পাইত, তবে বিপদ আরও শতগুণে বৃদ্ধি পাইত এবং এরূপ ভাবে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হইত। মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং অন্যান্য স্থানের ভারতীয় সৈন্যের রসদ প্রভৃতি যোগাইবার জন্য তখন ব্রিটেনকে যুদ্ধের মালমসলা সরবরাহ করার জন্য ভারতে বিশেষভাবে একটি মিউনিশান বোর্ড স্থাপন করিতে হইয়াছিল।

(গ) অর্থ—১৯১৭ সালের জানুআরি মাসে, ভারত গবর্নমেণ্ট যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে ১০ কোটি পাউণ্ড সাহায্য করেন। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাহা সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেন।

ভারত গবর্নমেণ্ট যুদ্ধের সময়ে সামরিক ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই ভারতের আর্থিক দায়িত্ব শোধ হইয়া যায় নাই,—যুদ্ধের জন্য নানা প্রকারে তাহার আর্থিক দায়িত্বভার বাড়িয়াছিল। বস্তুতঃ ভারত আর্থিক ব্যাপারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ।

বাংলার অসহযোগ আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ চিত্তরঞ্জন দাশের কারাদণ্ডের সময়, আমি তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলাম। উহা তৎকালে ভারতের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

"প্রিয় ভগিনী,

"আমার মনে যে প্রবল ভাবাবেগ হইয়াছে, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম। আপনার স্বামী যখন সেই ইতিহাস-স্মরণীয় মোকদ্দমায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন, সেই দিন হইতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অশেষ বদান্যতা, তীব্র স্বদেশপ্রেম, মহান্ আদর্শবাদ, দীনদরিদ্রের পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহার অসীম আগ্রহ, সর্বদাই লোকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। যদিও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য আছে, তবুও চিরদিনই তাঁহার প্রতি আমি আকর্ষণ

অনুভব করিয়াছি। তিনি বাংলা দেশ বা তরুণ ভারতের চিত্ত অধিকার করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। রাজনীতিতে তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের মতভেদ আছে, তাঁহারাও তাঁহার (চিত্তরঞ্জনের) অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীযুত দাশের এই অগ্নিপরীক্ষার দিনে, তাঁহার প্রতি স্বতঃই আমাদের চিত্ত ধাবিত হইতেছে। আমি জানি, আমার মত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুত দাশের জীবনের ব্রত সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিবে না, কেন না লোকসমাজ ও ঘটনার স্রোত হইতে সর্বদাই আমি দূরে বাস করি। চিরজীবন একান্তভাবে বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে আমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, মনের প্রসার বোধ হয় সংকুচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রিয় ভগিনী, আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, যখন আমি বিজ্ঞান চর্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই সেবা করি। আমাদের লক্ষ্য একই, ভগবান জানেন। আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

"আপনি আপনার দুঃখ অপূর্ব সাহস ও আনন্দের সঙ্গে বহন করিতেছেন। বাংলার সম্মুখে নারীত্বের যে উচ্চ আদর্শ আপনি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সেই অতীত রাজপুত গৌরবের যুগকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আমি মনে প্রাণে আশা করি, যে কৃষ্ণ মেঘ আমাদের মাতৃভূমির ললাট আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা শীঘ্রই অপসারিত হইবে এবং আপনার স্বামীকে আমরা ফিরিয়া পাইব।

১৪-১২-২১ ভবদীয়

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বাংলায় বন্যা—খুলনা দুর্ভিক্ষ—উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা—অল্পদিন পূর্বেকার বন্যা—ভারতে অনুসৃত শাসনপ্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিচয়—শ্বেতজাতির দায়িত্বের বোঝা

১৯২১ সালে আমি যখন চতুর্থবার ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিলাম সে সময়, খুলনা জেলায় সুন্দরবন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কলিকাতায় থাকিয়া আমি অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারি নাই। মে মাসে গ্রীষ্মের ছুটির সময় আমি যখন গ্রামে গেলাম, তখন আমার চোখের সম্মুখেই দুর্ভিক্ষের ভীষণতা দেখিতে পাইলাম। পর পর দুই বৎসর অজন্মার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। জনসাধারণের 'মা বাপ' ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর এ অবস্থা দেখিয়াও অবিচলিত ছিলেন। কিন্তু সংবাদপত্রে ইহা লইয়া খুব আন্দোলন হইতেছিল। গবর্নমেণ্টের চক্ষুকর্ণস্বরূপ ম্যাজিস্ট্রেট এ সব বিষয় তুচ্ছ মনে করিতেছিলেন, চারিদিক হইতে অন্নকষ্টের যে হাহাকার উঠিতেছিল, তাহা গ্রাহ্য করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই, তিনি তাঁহার সদর আফিসে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা লোকে কখনও ভুলিতে পারিবে না। উহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—"প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অপর্যাপ্ত ফল জন্মে, খাল হইতে ছোট ছোট ছেলেরাও মাছ ধরিতে পারে এবং চাহিলেই একরূপ বিনামূল্যে দুধ পাওয়া যায়।" ভারতের দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যাঁহাদের কিছু পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, দুধ অসম্ভবরূপে সস্তা হওয়া—দুর্ভিক্ষের ভীষণতার লক্ষণ। পিতামাতা তাহাদের শিশু-সন্তানকে বঞ্চিত করিয়া দুধ বিক্রয় করে, যদি তাহার পরিবর্তে কিছু চাল পাওয়া যায়। কিন্তু দুধ কিনিবে কে? কেন না ভারতে এখন দুর্ভিক্ষের অর্থ—টাকার দুর্ভিক্ষ। পাঠককে এ কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে, সুন্দরবন অঞ্চলে ফলের গাছ হয় না এবং ফলের গাছ সেদিকে নাই। এখানে বলা যাইতে পারে যে, ভারতে যখনই কোন স্থানে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ হয়, গবর্নমেণ্ট তাঁহাদের সিমলা বা দার্জিলিঙের শৈলবিহার হইতে, প্রথম প্রথম দুর্গতদের কাতর আবেদনে কর্ণপাত করেন না। ক্রমে যখন সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে আন্দোলন হইতে থাকে এবং তাহা উপেক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে, আমলাতন্ত্রের প্রভুরা তখন কিঞ্চিৎ অস্বস্তি অনুভব করেন। কিন্তু তখনও 'সরকারী বিবরণ' না পাইলে তাঁহারা কিছু করিতে চাহেন না। সেক্রেটারিয়েট এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের উপর নির্ভর করেন, কেন না, তিনিই সংবাদ আদানপ্রদানের ডাকঘর বিশেষ। কমিশনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবার পুলিসের দারোগার নিকট হইতে রিপোর্ট তলব করেন। দারোগা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর এবং পঞ্চায়েত গ্রাম্য চৌকিদারের উপর সংবাদ সংগ্রহের

ভার দেন। এইসব চতুর অধস্তন কর্মচারীর দল জানে যে কিরূপ রিপোর্ট গবর্নমেণ্টের মনোমত হইবে এবং সেই অনুসারেই রিপোর্ট প্রস্তুত হয়। গেজেটে যে সরকারী ইস্তাহার বাহির হয়, তাহা এইরূপ 'প্রত্যক্ষ সংবাদের' উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। কোন স্বাধীন দেশ হইলে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট অথবা বন্যার জন্য রেলওয়ে এজেণ্টই যে কেবল কঠিন শাস্তি পাইত, তাহা নহে, মন্ত্রিসভাও বিতাড়িত হইত। কিন্তু ভারতে বন্যা দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে এইসব ব্যাপার নিত্যই ঘটিতেছে।

বন্ধুবর্গের অনুরোধে দুর্গতদের সেবাকার্যের ব্যবস্থা এবং দেশবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিলাম। দেশবাসী সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিল—যদিও গবর্নমেণ্ট সরকারীভাবে খুলনার এই দুর্ভিক্ষকে স্বীকার করেন নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, কুঞ্জলাল ঘোষ প্রভৃতি খুলনার জননায়কগণ আমাকে এই কার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করেন; বরিশাল ও ফরিদপুর জেলা হইতে বহু স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াও আমার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

১৯২২ সালের উত্তরবঙ্গ বন্যা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, যদি গ্রামবাসীর প্রার্থনা গ্রাহ্য করা হইত, তাহা হইলে এই বন্যা নিবারিত হইতে পারিত, অন্ততঃপক্ষে ইহার প্রকোপ খুবই হ্রাস পাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে এই সমস্ত আবেদন-নিবেদন সরকারী কর্মচারীরা গ্রাহ্যও করেন না। যে কোন নিরপেক্ষ পাঠকই বুঝিতে পারিবেন যে গবর্নমেণ্ট এই বন্যার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। বন্যা হইবার এক বৎসর পূর্বে গ্রামবাসীরা রেলওয়ে বাঁধ সম্পর্কে গবর্নমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল। দরখাস্তকারিগণ অজ্ঞ গ্রামবাসী, কিন্তু একথা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, যদি রেলওয়ে বাঁধের সংকীর্ণ 'কালভার্ট'গুলির পরিবর্তে চওড়া সেতু করিবার ব্যবস্থা না হয়, তবে তাহাদিগকে সর্বদাই বন্যার বিপত্তি সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু কার্যতঃ ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল। আসল কথা এই যে, বিদেশী অংশীদারদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রেলওয়ে রাস্তা ও বাঁধগুলি তৈরি করা হয়। খরচা যত কম হইবে, অংশীদারদের লাভের অঙ্কও তত বেশী হইবে। এই কারণে রেলপথ নির্মাণ করিবার সময় বহু স্বাভাবিক জলনিকাশের পথ মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া ফেলা হয়, অথবা তাহাদের পরিসর এত কম করা হয় যাহাতে সংকীর্ণ 'কালভার্ট' দ্বারাই কাজ চলিতে পারে।(১) আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯২২ সালের ২১শে নভেম্বর তারিখে রেলওয়ে বাঁধই সে দেশের সর্বনাশের কারণ এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন :—

"রেলওয়ে লাইনই যে উত্তরবঙ্গের লোকদের অশেষ দুঃখ-দুর্দশার কারণ এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে লিখিয়াছি। আদমদীঘি এবং নসরতপুর অঞ্চলের (সান্তাহারের উত্তরে দুইটি রেলওয়ে স্টেশন) গ্রামবাসীরা, বগুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মারফত রেলওয়ে এজেণ্টের নিকট দরখাস্ত করে যে, পূর্বোক্ত দুইটি

(১) বন্যার অব্যবহিত পরেই রানীনগর স্টেশন হইতে নসরতপুর স্টেশন পর্যন্ত রেলওয়ে লাইনটি আমি দেখি এবং তাহার ফলে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়।

স্টেশনের মধ্যে রেলওয়ে লাইনে সঙ্কীর্ণ কালভার্টের পরিবর্তে চওড়া সেতু করা হোক, তাহা হইলে প্রবল বর্ষার পর উচ্চভূমি হইতে যে জলপ্রবাহ আসে, তাহা বাহির হইবার পথ পাইবে। ইহার উত্তরে রেলওয়ে এজেণ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নিম্ন-লিখিত পত্র লিখেন :—

নং ১৩৫৬—ভি. ডবলিউ

ই. বি. রেলওয়ের এজেণ্ট লেঃ কর্নেল এইচ. এ. ক্যামেরন সি. আই. ই.

বগুড়ার ম্যাজিস্ট্রেটের বরাবর

কলিকাতা, ২৮শে অক্টোবর, ১৯২১

মহাশয়,

আপনার ১৯২১ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখের পত্র পাইলাম। উহার সঙ্গে উমিরুদ্দীন জোদ্দার এবং আদমদীঘি ও তন্নিকটবর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণের যে দরখাস্ত(২) আপনি পাঠাইয়াছেন, তাহাতে এই আবেদন করা হইয়াছে যে আদমদীঘি ও নসরতপুর স্টেশনের মধ্যে একটি সেতু নির্মাণ করা হউক। তদুত্তরে আমি জানাইতেছি যে, যথাযোগ্য তদন্তের পর আমরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, উক্ত স্থানে সেতু নির্মাণের কোন প্রয়োজন নাই।

(স্বাঃ) অস্পষ্ট

এজেণ্টের পক্ষে

মেমো নং ১৭৭৩—জে

বগুড়া ম্যাজিস্ট্রেটের আফিস

৩রা নভেম্বর, ১৯২১

উমিরুদ্দীন জোদ্দার এবং অন্যান্যের অবগতির জন্য, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ হইতে এই পত্রের নকল প্রেরিত হইল।

(স্বাঃ) অস্পষ্ট

ডাঃ বেণ্টলী স্বাভাবিক জলনিকাশের পথরোধ সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—

"সমস্ত জলনিকাশের পথেরই গতি নদীর দিকে। ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আবার জলরাশিকে পদ্মা ও যমুনার গর্ভে ঢালে। দেশের অবনমন ঢালুতা বা 'গড়ান' ৬ ইঃ হইতে ৯ ইঃ পর্যন্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে, যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার এই অঞ্চলে জেলাবোর্ড ও রেলওয়ের রাস্তাগুলি তৈরি করিবার জন্য দায়ী, তাঁহারা দেশের স্বাভাবিক জলনিকাশের পথের কথা লইয়া মাথা ঘামান নাই। কাজেই, রাস্তা ও রেলওয়ে বাঁধগুলিতে যে সব কালভার্ট বা পয়োনালীর ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে। জলপ্রবাহ অনিষ্টকর নহে, কিন্তু উহার দ্রুত নিকাশের ব্যবস্থা

(২) শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সান্তাহার হইতে এই দরখাস্তখানি আমার নিকট পাঠান। ইহার একটি নকল সংবাদপত্রে পাঠানো হয় এবং আনন্দবাজার পত্রিকা ইহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন ও এই সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। মূল পত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না।

করিতে হইবে। বন্যা যে প্রায় বাৎসরিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কারণই এই যে, রেলওয়ে লাইন তৈরি করিবার ত্রুটির দরুন বাংলার নদীগুলির স্বাভাবিক কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমাদের সম্মুখে প্রধান সমস্যা এই—স্বাভাবিক জলনিকাশের পথের পুনরুদ্ধার—যাহাতে প্রত্যেক বর্ষার পর জল দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া যাইতে পারে। বাংলার নদী ব্যবস্থাকে সার্ভে করিয়া দেখিতে হইবে, রেলওয়ে বাঁধের ফলে প্রত্যেক নদীর গর্ভ কি ভাবে এবং কতদূর পর্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। যেখানেই প্রয়োজন, যথেষ্ট সংখ্যক নূতন ধরনের কালভার্ট বসাইতে হইবে।......... এই ব্যবস্থা অনুসারে কার্য করিলে বাংলাদেশ তাহার রাস্তা ও রেলওয়েগুলি ঠিক-মত রক্ষা করিতে পারিবে, ম্যালেরিয়াকে বহুল পরিমাণে দূর করিতে পারিবে, জলসরবরাহের ব্যবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বন্যার প্রকোপও নিবারণ করিতে পারিবে। রাস্তা ও রেলওয়ের দ্বারা দেশের জলপ্রবাহের স্বাভাবিক ব্যবস্থা নষ্ট করাতেই যত কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে।......রেলওয়ে বাঁধ এবং জেলাবোর্ডের রাস্তাগুলিই অনেকাংশে বন্যার জন্য দায়ী।"

গবর্নমেণ্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দ্বারাই সরকারী উক্তির সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত অতীতে বড় একটা দেখা যায় নাই, ভবিষ্যতেও দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ।

১৯২২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া যে প্রবল বৃষ্টির ফলে আত্রাই নদীর গর্ভ প্লাবিত হয়, তাহাই বন্যার কারণ। এই আত্রাই নদী ব্রহ্ম-পুত্রের (বা যমুনার) শাখা এবং ঐ অঞ্চলের সমস্ত জলপ্রবাহ আত্রাই নদীতে যাইয়াই পড়ে। এই ভীষণ বিপত্তির সংবাদ কলিকাতা শহরে এক অদ্ভুত উপায়ে পৌঁছে। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে মেল ট্রেন দার্জিলিঙ হইতে ছাড়িয়া পরদিন পার্বতীপুরে পৌঁছে। কিন্তু ট্রেনখানি পার্বতীপুর ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে পারে না, কেননা পার্বতীপুরের দক্ষিণে কয়েক মাইল পর্যন্ত লাইন জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল এবং রেলওয়ে কর্মচারীরা সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, আক্কেলপুরে লাইন ভাঙিয়া গিয়াছে। যাত্রিগণ এইভাবে ৪ দিন পার্বতীপুরে থাকিতে বাধ্য হন এবং পরে একটা রাস্তা দিয়া তাঁহাদিগকে কলিকাতায় পাঠানো হয়। বিপন্ন যাত্রীদের মধ্যে স্টেটস্‌ম্যানের একজন সম্পাদক ছিলেন। তিনিই প্রথম কলিকাতায় আসিয়া এই ভীষণ সংবাদ মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেন। রেলওয়ে বাঁধ ভাঙিয়া চারিদিকে কিরূপে একটা সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল,—ঐ সমস্ত দৃশ্যের ফটোগ্রাফও তিনি প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে, অন্য সূত্রে সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ঘটনাস্থলে অবস্থা পরিদর্শন করিতে গমন করেন। সেখান হইতে তিনি আমার নিকট, কংগ্রেস আফিসে এবং বঙ্গীয় যুবকসঙ্ঘের আফিসে তার করেন। সুভাষবাবু বঙ্গীয় যুবকসঙ্ঘের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সংবাদপত্রের মারফত সাধারণের নিকট এই মর্মে আবেদন করা হইল যে, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে জনসভা করিয়া বন্যাসাহায্য কমিটি গঠন এবং ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী আলোচনা করা হইবে। সকল সম্প্রদায়ের লোক এই সভায় অপূর্ব আগ্রহসহকারে যোগ দিয়াছিল। বন্যা সাহায্য সমিতি গঠন হইল এবং আমি তাহার

সভাপতি নির্বাচিত হইলাম। আমি প্রথমতঃ এই গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলাম না, কেন না তখন সবেমাত্র আমি খুলনা দুর্ভিক্ষের জন্য কর্তব্য সমাপন করিয়াছি। কিন্তু লোকে আমার আপত্তি গ্রাহ্য করিল না এবং বাধ্য হইয়া সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হইল।

বন্যায় কিরূপ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য 'স্টেটস্‌ম্যান' হইতে নিম্নলিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। ঐ সংবাদপত্র ভারতবাসীদের প্রতি অতিরিক্ত প্রীতিবশতঃ অতিরঞ্জন করিয়াছে, এমন কথা কেহই বলিবেন না।

"বন্যার ফলে লোকের যে সম্পত্তি নাশ হইয়াছে, যে ক্ষতি হইয়াছে, গবর্নমেণ্টের হিসাবে তাহার পরিমাণ খুব কমই ধরা হইয়াছে। সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরের হিসাবে বগুড়া জেলার ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকার উপরে। তালোরা গ্রামে প্রায় ২০০ শত বাড়ীর মধ্যে সাতখানি মাত্র চালাঘর অবশিষ্ট আছে।

"নওগাঁ মহকুমার অবস্থা পরিদর্শন করিবার ফলে আমি বলিতে পারি,—সরকারী হিসাবে যাহা বলা হইয়াছে, গো-মহিষাদি পশু ও অন্যান্য সম্পত্তি নাশের দরুন ক্ষতির পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক বেশী। নওগাঁ মহকুমার লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ এবং এই মহকুমার এলাকায় প্রায় ৬০ হাজার গৃহ ধ্বংস হইয়াছে।

"প্রায় সমস্ত গাঁজার ফসল নষ্ট হইয়াছে এবং ধান্য ফসল অতি সামান্যই রক্ষা পাইবে।" (স্টেটস্‌ম্যান, ১৫ই অক্টোবর, ১৯২২)

সরকারী ইস্তাহারেই স্বীকৃত হইয়াছে যে বগুড়ার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল অপেক্ষা রাজসাহীর বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের আয়তন প্রায় তিনগুণ বেশী এবং সেখানে গৃহ ও সম্পত্তি ধ্বংস বাবত ক্ষতির পরিমাণও অনেক বেশী। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের সহকারী ডিরেক্টরের হিসাবকে ভিত্তিস্বরূপ ধরিলে পাবনা ও রাজসাহী জেলায় মোট ক্ষতির পরিমাণ ৫ কোটি টাকার কম হইবে না এবং সমগ্র বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের ক্ষতির পরিমাণ ৬ কোটি টাকার ন্যূন হইবে না।

বিজ্ঞান কলেজের প্রশস্ত গৃহে বন্যা সাহায্য সমিতির অফিস করা হইল এবং অপূর্ব উৎসাহের চাঞ্চল্যে ঐ বিদ্যামন্দিরের নীরবতা যেন ভঙ্গ হইল। দলে দলে নরনারী ঐ স্থানে যাতায়াত করিতে লাগিল। প্রায় সত্তর জন স্বেচ্ছাসেবক—তাহার মধ্যে কলিকাতার কলেজসমূহের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও ছিলেন—প্রত্যহ সকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অনবরত কার্য করিতেন। সাধারণ কার্যলয়, কোষাগার, দ্রব্য-ভাণ্ডার, টাকাকড়ি, জিনিসপত্র পাঠাইবার আফিস এবং ঐ সমস্ত গ্রহণ করিবার আফিস এক একটি ঘরে। এই সমস্ত বিভিন্ন বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট হইল। কলিকাতা আফিসের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—প্রচার বিভাগ। জনসাধারণকে ঐ বিভাগ হইতে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করা হইত। ভারতের সর্বত্র—এমন কি ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকাতেও সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইল। এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের কার্য ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিতভাবে চলিত। প্রতিষ্ঠানটি নানা-শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকল কর্মীর প্রাণেই বন্যা-

পীড়িতদের জন্য সমবেদনা ও সেবার আগ্রহ ছিল—কাজেই সকলে ঐক্যবন্ধ হইয়া কাজ করিতে পারিত।

বেঙ্গল রিলিফ কমিটির সাফল্যের কারণ এই যে প্রথম হইতেই সমবায় এবং সহ-যোগিতার নীতি অনুসারে ইহার কার্য পরিচালিত হইয়াছিল। বন্যার ভীষণ দুঃসংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র দেশের চারিদিকে অসংখ্য সাহায্য সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বেঙ্গল রিলিফ কমিটি এই গুলির কার্যকে ঐক্যবন্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত না করিলে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইত এবং বহু শক্তির অপব্যয় হইত। বেঙ্গল রিলিফ কমিটি পূর্ব হইতেই অবস্থা বুঝিয়া, কংগ্রেস কমিটি, বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটি-ক্যাল ওয়ার্কস, বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ, বঙ্গীয় যুবকসঙ্ঘ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে, কার্যনির্বাহক সমিতিতে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য, যাহাতে পরস্পর পরামর্শ ও আলোচনা করিয়া কার্যের শৃঙ্খলা বিধান করা যাইতে পারে। এই আহ্বানে সকলেই সাড়া দিলেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হস্তে বিভিন্ন অঞ্চলের ভার অর্পিত হইল। এইরূপে এমন একটি কার্যসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহার মধ্যে প্রত্যেক শাখা-সঙ্ঘের স্বাতন্ত্র্য ও কার্যশক্তি অব্যাহত ছিল—অথচ সকলে মিলিয়া একটা বিরাট কার্য পরিচালনা সম্ভবপর হইয়াছিল।

শ্রীমান সুভাষচন্দ্র বসুর হৃদয় আর্তের দুঃখে স্বভাবতঃই বিগলিত হয়। তিনিই স্বেচ্ছায় প্রথমে বন্যাবিধ্বস্ত স্থানে গিয়া অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন। ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্তও বহু স্বার্থত্যাগ করিয়া, বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে কিছুকাল থাকিয়া সেবাসমিতি গঠন করেন। বগুড়ার নিঃস্বার্থ কর্মী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়, নৌকার অভাবে কেরোসিন টিনের তৈরী নৌকায় চড়িয়া কয়েক মণ চাউল লইয়া বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। বেঙ্গল কেমিক্যালের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তও তাঁহার কারখানা হইতে বহু স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে গমন করেন।

প্রায় দুইমাস পরে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে রাজনৈতিক কার্যে যোগ দিবার জন্য গেলে, ডাঃ ইন্দ্রনরায়ণ সেনগুপ্ত, তাঁহার কার্য-ভার গ্রহণ করেন। ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণের মত নিঃস্বার্থ কর্মী আমি খুব কমই দেখিয়াছি। কিন্তু সেবাকার্যের প্রধান চাপ পড়িয়াছিল শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের উপর। তাঁহার অসাধারণ কর্মশক্তি এবং সংগঠনী শক্তি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। শ্রীযুত সতীশবাবু বেঙ্গল রিলিফ কমিটির গোড়া হইতেই ছিলেন এবং সাধারণ পরিচালনা-ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল। শেষকালে তাঁহার উপরেই সম্পূর্ণরূপে সমস্ত কাজের ভার পড়িয়াছিল। বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজে তাঁহার গুরুতর দায়িত্ব সত্ত্বেও তিনি মাসে একবার বা দুইবার আত্রাই কেন্দ্রে গমন করিতেন। তিনি একনিষ্ঠভাবে সেবাকার্য করিয়াছিলেন এবং রিলিফ কমিটির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় দায়িত্ব ত্যাগ করেন নাই।

এই ব্যাপারে আমার নাম যে সমধিক প্রচারিত হইয়াছে, এজন্য আমি কুণ্ঠিত।

প্রকৃতপক্ষে, আমি নামমাত্র কর্মকর্তা ছিলাম। বন্যাসেবাকার্যের সাফল্যের জন্য দায়ী আমার বিজ্ঞান কলেজের সহকর্মিগণ, বিশেষভাবে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, মেঘনাদ সাহা এবং শ্রীযুত নীরেন্দ্র চৌধুরীর (বঙ্গবাসী কলেজ) মত নিঃস্বার্থ কর্মিগণ।

"মানচেস্টার গার্ডিয়ানের" বিশেষ সংবাদদাতা ১১ই নবেম্বর তারিখে বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চল হইতে এক পত্রে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রেরণ করেন :—

গবর্নমেণ্টের মর্যাদা হ্রাস

"আমি উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে কয়েক দিন হইল আছি এবং যে সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ও শুনিতেছি, তাহা বেশ শিক্ষাপ্রদ।

"উত্তরবঙ্গ গঙ্গার ব-দ্বীপে, এই নিম্নভূমিতে প্রধান ফসল ধান; ইহার মধ্য দিয়া বহু নদী প্রবাহিত এবং সেই সমস্ত স্বাভাবিক জল-নিকাশের পথ রোধ করিয়া আড়াআড়িভাবে রেলওয়ে লাইন চলিয়া গিয়াছে। ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই অঞ্চলে প্রবল বর্ষা হয় এবং জলের উচ্চতা অভূতপূর্ব রূপে বাড়ে। তাহার ফলে সমস্ত চাষের জমি জলমগ্ন হয় এবং রেল লাইন পর্যন্ত জল ওঠে। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের আয়তন প্রায় দুই হাজার বর্গমাইল। লোকসংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক। ভগবানের কৃপায় লোকের মৃত্যু-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। জলে ডুবিয়া প্রায় ৬০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ঘন বসতিপূর্ণ প্রায় ৭০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে অর্ধেকের বেশী গৃহই ধ্বংস হইয়াছে। গবাদি পশুর খাদ্য সমস্তই নষ্ট হইয়াছে এবং অন্ততঃপক্ষে ১২ হাজার গবাদি পশুর মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৫০০ শত বর্গ মাইল স্থানে, প্রধান ফসল (ধান্য) প্রায় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী না হইলেও, উপেক্ষার যোগ্য নহে।

গবর্নমেণ্টকে দোষ দেওয়া হইতেছে কেন?

"এই বিপত্তি যখন ঘটে, তখন গবর্নমেণ্টের সদস্যগণ বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল হইতে বহুদূরে দার্জিলিঙের শৈলশিখরে ছিলেন। তাঁহারা এখনও সেখানে আছেন। এই বিপত্তির যে প্রাথমিক সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই। দুর্দশার প্রতিকারকল্পে কোনরূপ কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইয়া গেল। যেটুকু তাঁহারা করিলেন তাহাও যথেষ্ট নহে, এবং লোকমতের চাপে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন সেটুকু তাঁহাদের করিতে হইল—অন্ততঃপক্ষে বাংলার জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল।

স্যার পি. সি. রায়

"এইরূপ অবস্থায় একজন রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক,—স্যার পি. সি. রায় কার্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন এবং গবর্নমেণ্ট যে দায়িত্ব পালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছেন, দেশবাসীকে তাহাই করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে সকলে সোৎসাহে সাড়া দিল। বাংলার জনসাধারণ একমাসের মধ্যেই তিন লক্ষ টাকা সাহায্য

করিল। ধনী স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের রেশমের শাড়ী এবং গহনা দান করিলেন, গরীবেরা তাঁহাদের উদ্বৃত্ত পরিধেয় বস্ত্রাদি দান করিলেন। শত শত যুবক বন্যা-পীড়িত স্থানে সেবাকার্যের জন্য অগ্রসর হইল। কাজটি কঠোর পরিশ্রমসাধ্য এবং ম্যালেরিয়াপূর্ণ স্থানে স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কাও আছে।

"গবর্নমেণ্টের প্রতি লোকের অসন্তোষ বৃদ্ধির আরও কারণ এই যে, তাহাদের বিশ্বাস রেললাইন নির্মাণের ত্রুটিই এই বন্যার কারণ,—বন্যার জল-নিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রেলপথ নির্মাণের সময় করা হয় নাই। এই অভিমত সমর্থনের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু বন্যার প্রায় দেড় মাস পরে গবর্নমেণ্ট এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শক্তিশালী ব্যক্তি

"স্যার পি. সি. রায়ের আহ্বানে সাড়া দিবার একটা কারণ,—বৈদেশিক গবর্নমেণ্টকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা, আর একটা কারণ দুর্গতদের সেবা করিবার প্রবৃত্তি। কিন্তু স্যার পি. সি. রায়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার প্রভাবই ইহার প্রধান কারণ। স্যার পি. সি. রায় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তাঁহাকে গোঁড়া অসহযোগী বলা যাইতে পারে না, কিন্তু তিনি একজন প্রবল জাতীয়বাদী এবং গবর্নমেণ্টের কার্যের তীব্র সমালোচক। শিক্ষক এবং সংগঠন-কর্তা হিসাবেও তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। একজন ইউরোপীয়কে আমি বলিতে শুনিয়াছি—'মিঃ গান্ধী যদি আর দুইজন স্যার পি. সি. রায় তৈরি করিতে পারিতেন, তবে এক বৎসরের মধ্যেই তিনি স্বরাজ লাভে সক্ষম হইতেন।' একজন বাঙালী ছাত্র আমাকে বলিয়াছিলেন, 'যদি কোন সরকারী কর্মচারী অথবা কোন অসহযোগী *রাজনীতিক সাধারণের কাছে সাহায্য চাহিতেন,—* তবে লোকে এক পয়সাও দিত *কিনা সন্দেহ। কিন্তু যখন স্যার পি. সি. রায় সাহায্য চাহিলেন, তখন লোকে জানে* যে অর্থের সদ্ব্যয় হইবে এবং এক পয়সাও অপব্যয় হইবে না।' কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজে স্যার পি. সি. রায়কে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে এবং আমি বুঝিতে পরিয়াছি, কেন তাঁহার স্বদেশবাসিগণের তাঁহার উপর এমন প্রগাঢ় আস্থা। একদিন দেখিলাম, বন্যাপীড়িতদের জন্য দেশবাসীর প্রদত্ত যে সব নূতন ও পুরাতন বস্ত্র স্তূপীকৃত হইয়াছে, সেইগুলি তিনি সানন্দে পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁহার সম্মুখে সেইগুলি গুছাইতেছেন এবং বিভিন্ন সাহায্যকেন্দ্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পরদিন দেখিলাম, তিনি দুইজন তরুণ ছাত্রকে রাসায়নিক পরীক্ষায় সাহায্য করিতেছেন,—আমার বোধ হইল শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট প্রীতির সম্বন্ধ বর্তমান। গবর্নমেণ্টের কথা যখন তিনি বলিলেন, তখন আমার মনে হইল যে, তাঁহার সমালোচনার বিষয়ীভূত হওয়া অপেক্ষা তাঁহার অধীনে কাজ করা বহুগুণে শ্রেয়ঃ। তিনি এমন আবেগময় ও উৎসাহী প্রকৃতির লোক যে, তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমালোচক হওয়া কঠিন। কিন্তু তাঁহার সমালোচনায় যদি কাহারও মনে আঘাত লাগে, তবে তিনি এই ভাবিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন যে, সাধারণ

সমালোচকদের ন্যায় তিনি দায়িত্ব এড়াইবেন না, বরং সুযোগ পাইলে, নিজে সেই কর্তব্যভার গ্রহণ করিবেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহা সুসম্পন্ন করিবেন। বন্যার প্রায় দেড়মাস পরে আমি বিধ্বস্ত গ্রামগুলি দেখিতে গেলাম। বন্যার জল তখন নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্ষতির চিহ্ন সুস্পষ্ট বর্তমান। বিভিন্ন সেবা-সমিতিগুলি অক্লান্ত-ভাবে কাজ করিতেছে। স্যার পি. সি. রায়ের 'বেঙ্গল রিলিফ সমিতি' তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং ইঁহারা খুব শৃঙ্খলার সহিত কাজও করিতে-ছিলেন। ইহা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নহে, কিন্তু ইহার হিন্দুস্থানী কর্মীদের মধ্যে দেখিলাম সকলেই অসহযোগী।

সাহায্য সমিতির কর্মিগণ

"সাহায্য সমিতির কর্ম পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইয়াছিল, একজন বাঙালী যুবকের উপর (শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু)। ইনি প্রায় দুই বৎসর পূর্বে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু পরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করেন। সেই অবধি ইনি রাজনৈতিক আন্দোলনে সংসৃষ্ট আছেন। তাঁহার অধীনে প্রায় দুই শত স্বেচ্ছাসেবক সাহায্যকেন্দ্রে কাজ করিতেছেন, ইঁহাদের বয়স ১৭ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে। সওদাগর আফিসের কয়েকজন কেরানী তাঁহাদের প্রভুদের অনুমতি লইয়া এই সাহায্যকেন্দ্রে কর্মিরূপে যোগদান করিয়াছেন। চিকিৎসা-বিভাগে কাজ করিবার জন্য কয়েকজন ডাক্তারও ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ স্বেচ্ছা-সেবকই কংগ্রেসকর্মী। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গান্ধীজির আহ্বানে সরকারী স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আমি একজন 'অসহযোগী' ভারতীয় খৃষ্টান যুবককে দেখিলাম,—আর একজন হিন্দু যুবককে দেখিলাম, তিনি যুদ্ধের পূর্বে বিপ্লব আন্দোলনে জড়িত সন্দেহে অন্তরীণ হইয়াছিলেন।

"মোটের উপর প্রতিষ্ঠানটি ভাল বলিয়া বোধ হইল, স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মের আদর্শও খুব উচ্চ বলিয়া মনে হইল। তাঁহারা বিধ্বস্ত গ্রামগুলিতে স্বয়ং যান, নিজেরা সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং গ্রামবাসীদের নিকট হইতে তাহাদের দুঃখদুর্দশা ও ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে তদন্ত করেন। তারপর, তাঁহারা গ্রামবাসীদের যাহা প্রয়োজন তাহা নিজেরা গিয়া দিয়া আসেন অথবা গ্রামবাসীদের নিকটবর্তী সাহায্যকেন্দ্র হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিবার জন্য অনুমতিপত্র দেন। এইভাবে গ্রামবাসীদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য, ঔষধ ও বস্ত্রাদি বিতরণ করা হইয়াছে এবং গৃহনির্মাণের উপকরণ ও গো-মহিষাদি পশুর খাদ্য বিতরণকার্য আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য সাহায্য সমিতিও কাজ করিতেছে এবং গবর্নমেণ্টও অনেক কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু আমি অনুসন্ধানের ফলে বুঝিলাম যে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে লোকের অভিযোগের কারণ আছে। তাহারা স্পষ্টই বলিল যে, এই সমস্ত ব্যাপারে গবর্নমেণ্টের যথেষ্ট মর্যাদা হ্রাস হইয়াছে এবং অসহযোগীদের মর্যাদা বাড়িয়াছে। স্যার পি. সি. রায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের উৎকৃষ্ট কার্যই ইহার প্রধান কারণ।

"আমি সকল রকমের লোকের সঙ্গেই দেখা করিয়াছি এবং এ বিষয়ে কথাবার্তা বলিয়াছি। নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারী, লোকাল বোর্ডের কর্মচারী, উকিল, জমিদার, রেল-কর্মচারী, অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবক এবং গ্রামবাসী সকলেই নিম্নলিখিতরূপে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। ছয় বৎসর পূর্বে ছোট রেল লাইনকে বড় লাইনে পরিণত করা হয়। ইহার ফলে জল-নিকাশের পথ স্থানে স্থানে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ সঙ্কুচিত হয়। ইহারই পরিণামস্বরূপ, ১৯১৮ সালে প্রবল বন্যা হয়, ১৯২০ সালে আর একবার সামান্য আকারে একটা বন্যা হয় এবং তাহার পর বর্তমান বিপত্তি। স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণ পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিলেও, গবর্নমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। এখন গবর্নমেণ্টের রেলওয়ে বিশেষজ্ঞগণ, রেলওয়ে বাঁধই যে বন্যার জন্য দায়ী এবং তাহার জন্য বিষম ক্ষতি হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। গবর্নমেণ্ট যে সুযোগ হারাইয়াছেন, অসহযোগীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া গ্রামবাসীদের হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছে। বেঙ্গল রিলিফ কমিটি খুব তৎপরতা ও সহৃদয়তার সহিত কাজ করিয়াছে। ইহার কর্মীরা গ্রামে গিয়া কৃষকদের প্রাণে সাহস সঞ্চার করিয়াছে। রেলওয়ে বিভাগ ও তাহার কর্মচারিগণও খুব তৎপরতার সহিত সাহায্য করিয়াছেন এবং স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণ খুবই পরিশ্রমসহকারে গ্রামবাসীদের দুঃখ লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও কোন কোন সরকারী কর্মচারী (সুখের বিষয়, তাঁহারা ইউরোপীয় নহেন) বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি ঈর্ষার ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন।

"কিন্তু বেঙ্গল রিলিফ কমিটির ব্যবস্থার তুলনায় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট বলা যায় না। চারিটি সরকারী জিলা এবং চারিটি সরকারী বিভাগ বন্যা সাহায্যকার্যের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তথাপি গবর্নমেণ্ট কেবলমাত্র বন্যা সাহায্য কার্যের জন্য কোন কর্মচারী নিযুক্ত করেন নাই; এ বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করিতে পারেন, স্বেচ্ছাসেবকদের সুপরিচালিত করিতে পারেন, এমন কোন দায়িত্বসম্পন্ন লোকও নাই। কোন কোন বিভাগ লোক পাঠান বটে, কিন্তু উহাদের কোন কাজ থাকে না। আবার, অন্য কোন কোন বিভাগের লোকও নাই, টাকাও নাই। জনরব শুনিলাম যে, ২০ হাজার টাকা মূল্যের বীজ বিতরণ করিতে, কর্মচারীদের মাহিনা ও ভাতা বাবত গবর্নমেণ্টের ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। এটা আনুমানিক হিসাব মাত্র, পরীক্ষিত হিসাব নহে সত্য, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একজন কৃষিবিশেষজ্ঞ অন্য দুইজন কৃষিবিশেষজ্ঞের কাজ পরীক্ষা করিতেছিল, শেষোক্ত দুইজন বস্তুতঃ কোন কাজই করে নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত আনুমানিক হিসাবের চেয়ে বেশী খরচ হওয়াও আশ্চর্যের বিষয় নহে।(৩)

---

(৩) পত্রপ্রেরকের উক্তি অনুমানমাত্র নহে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অনেকে বলিয়াছেন যে গবর্নমেণ্ট যখন কোন সাহায্যকার্যে অর্থব্যয় করেন, তখন তাহার প্রায় অর্ধাংশই অপব্যয় হয়। (এফ. এইচ. স্ক্রাইন, কলিকাতা রিভিউ, ১৯২৮, অগস্ট, ১৪১-৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

স্টেশনমাস্টারের অভিজ্ঞতা

"একজন স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি তাঁহার স্ত্রী ও নবজাত শিশুসহ একটি গ্রাম্য স্টেশনে ছিলেন। বন্যার জল বাড়িতে আরম্ভ করিলে তাঁহার স্ত্রী নিজেদের বাসা ত্যাগ করিয়া স্টেশনের টিকিট ঘরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। চারটি সাপও এই ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল। স্টেশনমাস্টার বলেন, তাঁহার ঘরের জানালার বাহিরে প্ল্যাটফরমের উপরে একটা ছোট গাছ ছিল। সেই গাছের উপরে ২০টি সাপকে তিনি আশ্রয় লইতে দেখেন। ঐ অঞ্চলে যত সাপ ছিল, বন্যার ফলে সকলেই বিবরচ্যুত হইয়া মানুষের মতই উচ্চভূমিতে আশ্রয় অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। জল আরও বাড়িলে স্টেশনমাস্টার আরও উঁচু জায়গার সন্ধানে বাহির হইলেন। লাইনের অপর দিকে গুদামঘর। সেখানে গিয়া সস্ত্রীক তিনি আশ্রয় লইলেন। ধানের বস্তার উপর তামাকের বস্তা ফেলিয়া যতদূর সম্ভব উঁচু করিয়া তাহার উপর তাঁহারা উঠিলেন। তখন বেলা ৯টা। পরদিন রাত্রি ৮টার সময় দেখা গেল জল আরও বাড়িয়াছে এবং তাঁহাদের আশ্রয়স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তাঁহারা জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। রাত্রি দশটায় শিশুটির মৃত্যু হইল। তারপর জল কমিতে লাগিল। পাকা স্টেশনঘরে থাকিয়া স্টেশনমাস্টারেরই যদি এই অবস্থা হয়, তবে দরিদ্র গ্রামবাসীদের কি অবস্থা হইয়াছিল, অনুমানেই বুঝা যাইতে পারে। তাহাদের কুঁড়ে ঘর ও মাটির দেওয়াল বন্যার প্রথম আঘাতেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অনেকে গাছের উপর আশ্রয় লইয়াছিল এবং অনাহারে দুই তিন দিন কাটাইবার পর কর্মীরা নৌকা লইয়া গিয়া তাহাদের নামাইয়া আনিয়াছিল। আমি স্থানীয় একজন ক্ষুদ্র জমিদারের কথা শুনিয়াছি। তিনি নিজের নৌকা লইয়া উদ্ধার-কার্য করিতেছিলেন। বন্যার দ্বিতীয় দিনে তিনি দেখেন, একটি ঘর তখনও টিকিয়া আছে। আর তাহার মধ্যে দুইটি মুরগী, একটি শিয়াল, একটি শশক, দুইজন মানুষ এবং কতকগুলি সাপ আশ্রয় লইয়াছে।

"গবর্নমেণ্টের জনৈক সদস্য সেদিন বলিয়াছেন যে, গবর্নমেণ্ট দাতব্য প্রতিষ্ঠান নহে। তিনি যদি বন্যাবিধ্বস্ত স্থানগুলি দেখিতেন এবং গ্রামবাসীদের অসীম দুর্দশা প্রত্যক্ষ করিতেন, তবে তিনি এই সময়ে এরূপ কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেন।

গবর্নমেণ্টের কোথায় কর্তব্যচ্যুতি হইয়াছে

"প্রকৃত কথা এই যে, যখন গবর্নমেণ্টের উদার ও মুক্তহস্ত হওয়া উচিত ছিল তখনই তাঁহারা অতি সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। গ্রামবাসীদের জীবনোপায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের মূলধন সামান্য যাহা কিছু ছিল, ধ্বংস হইয়াছিল এবং ভয়ে তাহারা বুদ্ধিহারা হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে এমন লোকের প্রয়োজন ছিল, যিনি তাঁহাদের প্রাণে সাহস সঞ্চার এবং তাহাদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন এবং যথাসাধ্য তাহাদের বিপদে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইতে পারেন। স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদের সাধ্যানুসারে

এই কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্নমেণ্ট তাঁহাদের প্রয়োজনানুরূপে অর্থ দেন নাই, গ্রামবাসীকে বিশেষ কোন ভরসাও তাঁহারা দিতে পারেন নাই। সুতরাং 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটির' উপরেই এই কাজ করিবার ভার পড়িয়াছিল এবং স্যার পি. সি. রায় যে বীজ বপন করিয়াছেন, তাহার সুফল অসহযোগীরাই ভোগ করিবে, ভোগ করিবার যোগ্যতাও তাহাদের আছে বটে। স্থানীয় সমস্ত সরকারী কর্মচারীই আমাকে বলিলেন যে, স্বেচ্ছাসেবকেরা গ্রামবাসীদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে এবং আগামী নির্বাচনে তাহারা স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশ পালন করিবে। আমি জনৈক সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র সাহায্যকেন্দ্র দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে গ্রামবাসীরা স্পষ্টই আমাদিগকে বলিল যে, গান্ধী মহারাজ (এখন আর 'মহাত্মা গান্ধী' নহেন, 'গান্ধী মহারাজ') এবং তাঁহার শিষ্যগণ গ্রামবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আগামী নির্বাচনে তাহারা গান্ধী মহারাজের পক্ষে ভোট দিবে। ইউরোপীয় কর্মচারীদের পরিবর্তে তাহারা ভারতীয় কর্মচারীদের চাহে, কেননা তাহারা গান্ধী মহারাজের স্বেচ্ছাসেবকদের মত তাহাদের অভাব-অভিযোগ বুঝিতে পারিবে এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। তাহারা বলিল যে স্বরাজ যত শীঘ্র সম্ভব আসুক, ইহাই তাহাদের প্রার্থনা, কেন না স্বরাজের আমলে তাহারা সুখী হইবে। আমি আরও দুইদিন গ্রামে কাটাইয়াছিলাম, প্রথম দিন জনৈক অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে, দ্বিতীয় দিন জনৈক অভিজ্ঞ ভারতীয় কর্মচারীর সঙ্গে। প্রত্যেক স্থানেই আমি ঐরূপ কথা শুনিতে পাই। গ্রামবাসীদের মনে পূর্বে যদি বা কিছু সংশয় থাকিয়া থাকে, এখন আর তাহা নাই। তাহারা বিশ্বাস করে যে অসহযোগীরাই তাহাদের প্রকৃত বন্ধু, সরকারী কর্মচারীরা নহে। সরকারী কর্মচারীরা নিজেরাও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিলেন যে, বাংলার গ্রামে ইহাই এখন প্রচলিত ধারণা।

"আমার মনে এই ভাব আরও দৃঢ় হইল, কেননা যে সব গ্রামের কথা বলিতেছি সেগুলি মোটেই রাজনৈতিক হিসাবে উন্নত নহে। এই অঞ্চল সাধারণতঃ অনুন্নত, গ্রামবাসীরা দরিদ্র, অশিক্ষিত, সরল-প্রকৃতি এবং ভীরু। ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান।

"আমি বলিয়াছি যে পঞ্জাবে গুরু-কা-বাগের ব্যাপারে অসহযোগ জয়লাভ করিয়াছে। বাংলাদেশেও এই বন্যা সেবাকার্যের ভিতর অসহযোগ আন্দোলন আরও একবার জয়লাভ করিল।"

মিঃ সি. এফ. অ্যানড্রুজ একাধিকবার বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তিনি সংবাদপত্রে এই বিষয়ে ৪টি প্রবন্ধ লিখেন। তাহা হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হইল :—

"আমরা সুদীর্ঘ ভ্রমণপথে কয়েকটি গ্রামের মধ্য দিয়া গেলাম এবং সহজেই দেখিতে পাইলাম—বেঙ্গল রিলিফ কর্মীরা কিরূপ প্রশংসনীয় কার্য করিয়াছে। তাহারা গ্রামবাসীদের গৃহ পুনর্নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। অধিকাংশ স্থলে তাহাদের সাহায্যেই এই গৃহনির্মাণকার্য হইয়াছে। এই ভ্রমণকালে, তাহাদের প্রচেষ্টা যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাই দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। রেলওয়ে

লাইন হইতে দূরে নিভৃত গ্রামেও আমি গিয়াছি এবং সেখানেও তাহাদের সেবার হস্ত প্রসারিত হইতে দেখিয়াছি। কর্মীরা যেন সর্বত্রগামী, এবং তাহাদের কাজ যেমন স্বল্প ব্যয়ে নির্বাহিত হইয়াছে, তেমন ফলপ্রদও হইয়াছে। যতই ঐ সব কাজ আমি দেখিয়াছি, ততই আমার মনে উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছে। বস্তুতঃ, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ডাঃ পি. সি. রায় এবং তাঁহার সহকারিবৃন্দ শ্রীযুত দাশগুপ্ত, ডাঃ সেনগুপ্ত এবং অধ্যাপক এস. এন. সেনগুপ্তের উৎসাহ ও প্রেরণায় যে কাজ হইয়াছে, তাহা বর্তমান ভারতে মানবের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য একটি সুমহৎ প্রচেষ্টা।

"স্বেচ্ছাসেবকদের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাও অপূর্ব। তাহাদের অনেকে আমাকে বলিয়াছে, মানবের দুর্দশা ও সহিষ্ণুতাশক্তির যে জ্ঞান তাহারা লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে তাহাদের জীবনের আদর্শই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। গভীর বিপদের মধ্যেও গ্রামবাসীরা যে সন্তোষ ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে, স্বেচ্ছাসেবকরা আমার নিকট শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়াছে।

"সান্তাহারে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির প্রধান কর্মকেন্দ্রে তাঁহাদের কার্যপদ্ধতি আমি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং তাহা যেভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। ইহা ঠিক যেন কোন ব্যবসায়ী ফার্মের প্রধান আফিস। কাগজপত্র যথারীতি রাখা হয় এবং হিসাব নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হয়। আমার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে আমি সাধারণকে নিশ্চিতরূপে জানাইতে পারি যে, সাহায্যকার্যের জন্য যে অর্থ দান করা হইয়াছে, তাহার একটি পয়সাও অপব্যয় হয় নাই। সাহায্য বিতরণ ও পরিদর্শন প্রভৃতির জন্যও যতদূর সম্ভব কম ব্যয় করা হইয়াছে। যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইবার আশঙ্কা নাই।.........ঐ অঞ্চলে যত লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহাদের সকলেরই বিশ্বাস যে, এই নূতন রেলওয়ে বাঁধের জন্য দেশের স্বাভাবিক জল-নিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে রাজসাহী জেলার আত্রাই-পাতিসার অঞ্চলে প্রায় একমাসকাল জল দাঁড়াইয়াছিল এবং ঐ সময়ের মধ্যেই ঐ অঞ্চলের সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

"এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে, কলিকাতাস্থিত বেঙ্গল রিলিফ কমিটির গঠনকর্তাগণ এবং বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের কর্মিগণ সকলকেই আমি প্রশংসা ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে বন্যার প্রথম হইতে এই অক্টোবর মাস পর্যন্ত ক্রমাগত অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের পরিশ্রম কাজের বিস্তৃতির সঙ্গে ক্রমেই বাড়িতেছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং উপযুক্ত আহার্য ও বিশ্রামের অভাবে অনেক কর্মী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। সাহায্য-কেন্দ্রের হাসপাতালে এই সব কর্মীদের চিকিৎসা করা হইয়াছে এবং সুস্থ হইয়াই প্রশংসনীয় সাহসের সহিত তাঁহারা পুনরায় কর্মে যোগ দিয়াছেন।"

বর্তমানকালে যতদূর স্মরণ হয়, এরূপ ভীষণ বন্যা ইতিপূর্বে আর হয় নাই। ছয় সাত বৎসর পূর্বে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই বৎসরের (১৯৩১)

সেপ্টেম্বর মাসেও আর একটি প্রবল বন্যা উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের বহুলাংশ বিধ্বস্ত করিয়াছে। ইহা ভীষণতা, ধ্বংসের পরিমাণ এবং বিস্তৃতিতে পূর্বের সমস্ত বন্যাকে অতিক্রম করিয়াছে। হিমশিলার মত ইহা সম্মুখে যাহা পাইয়াছে, সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ১৯২২ সালের বন্যা সাহায্যকার্যে একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। "বাংলার বন্যা ও তাহা নিবারণের উপায়" নামক একটি প্রবন্ধের মুখবন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"কয়েক বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে প্রবল বন্যা হইয়া গিয়াছে। গত বৎসরেও আর একটি বন্যা হইয়াছে।

"সংবাদপত্রের বিবরণে দেখা যায়, ব্রহ্মপুত্র নদীর গর্ভে প্রায় ২৫ হাজার বর্গ মাইল স্থান গত বৎসর (১৯৩১) ভীষণ বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল। স্মরণীয় কালের মধ্যে এরূপ বন্যা এদেশে আর হয় নাই। এই অঞ্চলে লোকবসতির পরিমাণ প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ৮ শত। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বন্যায় প্রায় বিশ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং প্রায় ৪ লক্ষ গৃহ বিধ্বস্ত হইয়াছে। লোকের বন্যা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আছে (তাঁহার বাড়ী বন্যাপীড়িত অঞ্চলে) এবং সংবাদপত্রে যে বিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে এই বন্যায় বাংলাদেশের ৮ কোটি হইতে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। বাংলাদেশের প্রত্যেক বাড়ীর মূল্য গড়ে ২০০ শত হইতে ২৫০ শত টাকা ধরিয়া এই হিসাব করা হইতেছে। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ এর চেয়ে বেশী হইবারই সম্ভাবনা।" (মডার্ন রিভিউ, ফেব্রুআরি, ১৯৩২)।

আমি পুনর্বার বন্যাপীড়িতদের সাহায্যকার্যের জন্য আহূত হইলাম এবং সঙ্কটত্রাণ সমিতি ঐ কার্যের ভার গ্রহণ করিল। পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও আমাদের সাহায্যের আবেদনে লোকে সাড়া দিল।। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা এবং অর্থাভাবের জন্য, লোকের সহৃদয়তা সত্ত্বেও পূর্বের মত অর্থ পাওয়া গেল না। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি যে, খুলনা দুর্ভিক্ষ, উত্তরবঙ্গের বন্যা, এবং বর্তমান বন্যা—সকল সময়েই ইউরোপীয় মিশনারীদের নিকট হইতে আমি অর্থ সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিয়াছেন। কেহ কেহ স্বচক্ষে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য বন্যাপীড়িত অঞ্চলে গিয়াছেন এবং সংবাদপত্রে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

এবারও বিজ্ঞান কলেজের গৃহে সঙ্কটত্রাণ সমিতির কার্যালয় খোলা হইয়াছিল এবং সৌভাগ্যক্রমে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পঞ্চানন বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতির মত কর্মীদের সাহায্য আমি পাইয়াছিলাম। ইঁহারা নিজেদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিয়াও প্রভাত হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কার্য করিতেন। প্রধানতঃ কাঁথি ও তমলুক হইতে আগত একদল স্বেচ্ছাসেবক আমাদের কার্যে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। বন্যার প্রথম অবস্থায় বিধ্বস্ত অঞ্চলে কলেরা ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব

হইয়াছিল। কিন্তু এইসমস্ত ত্যাগী কর্মীরা "অজ্ঞাত যোদ্ধার" মতই সে সব বিপদ গ্রাহ্য করেন নাই। মানবসেবার আহ্বানে সাড়া দিয়া স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ এবং জনসাধারণও অর্থসংগ্রহকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। কয়েকমাস পর্যন্ত একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল—ছোট ছোট বালকবালিকারা পর্যন্ত কলেজে তাহাদের সংগৃহীত অর্থ দান করিবার জন্য আসিত।

গবর্নমেণ্ট তাঁহাদের অভ্যাসমত দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের কাতর চিৎকারে কর্ণপাত করিলেন না। দৈনিক সংবাদপত্রসমূহের স্তম্ভে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের দুঃখদুর্দশার কথা সবিস্তারে প্রকাশিত হইতেছিল। সুতরাং দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির প্রতিকারের ভার শাসনপরিষদের যে সদস্যের উপর, তিনি স্পেশাল সেলুন গাড়ীতে এবং স্টীম-লঞ্চে চড়িয়া বন্যাপীড়িত অঞ্চল দেখিতে গেলেন। কিন্তু সদস্য মহাশয়ের নিজের চোখকান রুদ্ধ, অধস্তন কর্মচারীদের চোখকান দিয়াই তিনি দেখাশোনা করেন। বিভাগীয় কমিশনার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নিজের সিভিলিয়ান সেক্রেটারী—ইহারাই তাঁহার বার্তাবহ ও মন্ত্রণাদাতা। দুর্ভাগ্যের বিষয় এবারে মিঃ গাইনের মত সংবাদ-পত্রের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না, যিনি বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের হুবহু বর্ণনা করিতে পারেন। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বন্যাপীড়িত অঞ্চলে পূর্ব বৎসর হইতেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এই অঞ্চলের প্রধান ফসল পাটের দর কমিয়া যাওয়াতেই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছিল।

কিন্তু গবর্নমেণ্টের জনৈক সদস্য পূর্বেই বলিয়াছিলেন যে, গবর্নমেণ্ট দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয় এবং দান করিবার অবসর তাঁহাদের নাই। সুতরাং বন্যায় লোকের যে অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা লঘু করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা গবর্নমেণ্টের পক্ষে স্বাভাবিক। রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য তাঁহার ইস্তাহারে বলেন,—

"বর্তমানে কোন দুর্ভিক্ষ নাই, যদিও কিছু সাহায্য করিবার প্রয়োজন আছে। গবর্নমেণ্ট এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সকলেই সে সাহায্য করিতেছেন।"

অনাহারের দৃষ্টান্তও তাঁহার চোখে পড়ে নাই!

"সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা যে সমস্ত আশঙ্কাজনক বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা যে অতিরঞ্জিত, বন্যাপীড়িত স্থানের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা গেল। যদিও এখনও কতকগুলি লোককে সাহায্য করিবার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বেশী নহে।"

জনৈক ইংরাজ ধর্মযাজক কিন্তু বন্যাপীড়িত অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে নিম্ন-লিখিতরূপ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন :—

"স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু (১৯৩১, ২৯শে সেপ্টেম্বর)—

"আপনার ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯৩১) বুধবারের সংখ্যায় বাংলার বন্যার অবস্থা সম্পর্কে যে সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমি খুব মনোযোগের সহিত পড়িলাম। ইস্তাহার পড়িয়া বোধ হইল যে রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মহাশয় পাবনা, বগুড়া, এবং রংপুর জেলায় সাতদিন দ্রুতগতিতে ভ্রমণ

করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা' হইতে তিনি সরকারী ইস্তাহারে বন্যার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

"তাঁহার সাহস প্রশংসনীয় হইলেও বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। পাবনা জেলা সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বেড়া এবং বনওয়ারী নগরের বিল অঞ্চল সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মক। আমি এই অঞ্চলে সম্প্রতি তিন সপ্তাহ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি এবং নিজের সামর্থ্যানুসারে সাহায্যকার্যও করিয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে, অনেক স্থলেই, বিশেষতঃ বিল অঞ্চলে ও ইচ্ছামতী ও চিকনাই নদীর নিকটে, আউশ ও আমন ধান বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে এবং দরিদ্র গ্রামবাসীরা কাঁচাধান যেটুকু পারে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। বলা বাহুল্য, উহা গরুর খাদ্য ছাড়া আর কোন প্রয়োজনে লাগিবে না। মাননীয় সদস্য মহাশয় বলেন, 'ঐ অঞ্চলে অনাহারের কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পান নাই।' তিনি ও তাঁহার দলবল যেখানে লঞ্চে ছিলেন, সেখানে হয়ত অনাহারের দৃষ্টান্ত ছিল না। যদি তিনি দুই একদিনও থাকিতেন এবং আমার মত গ্রামের ভিতরে যাইতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেন যে শত শত লোক অনশনে, অর্ধাশনে আছে। অনেক স্থলে আমি দেখিয়াছি যে, তিনদিনের মধ্যে একবার আহার, সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য। আমি যে সমস্ত গ্রামে গিয়াছি এবং যে সব লোককে সাহায্য করিয়াছি, তাহাদের নামের তালিকা দিতে পারি। ঐ সব স্থান অসীম দুর্দশাগ্রস্ত।

......"বন্যা সাহায্যের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আপাততঃ জমা করিয়া রাখার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। দুর্দশাগ্রস্তদের মধ্যে খাদ্য-সাহায্য বিতরণ করিবার এই সময় এবং যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তদ্ব্যতীত আরও অর্থ এই উদ্দেশ্যে এবং বস্ত্র ও ঔষধের জন্য প্রয়োজন; গবর্নমেণ্টকে সেই কারণে আমি পরামর্শ দিই যে, তাঁহারা বীজশস্য এবং চাষের বলদ প্রভৃতির জন্য ঋণদান কার্য চালাইতে থাকুন। বন্যায় অধিকাংশ গো-মহিষাদি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সাধারণের নিকট হইতে যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা বর্তমানে দুর্গতদের সাহায্যের জন্য বিতরণ করা হউক।"

পাবনা, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ (রেভাঃ) অ্যালান. জে. গ্রেস

মিঃ এইচ. এস. সুরাবর্দী বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া 'স্টেটস্‌ম্যানে' একখানি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন (২২শে অক্টোবর, ১৯৩১)। তাহাতে তিনি বলেন যে, —"স্মরণীয় কালের মধ্যে বাংলায় এরূপ ভীষণ বন্যা আর হয় নাই।"

"জনৈক ভারতীয় পত্রলেখক" রেভাঃ গ্রেসের উক্ত পত্রের উপর নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন (৩০শে সেপ্টেম্বর, স্টেটস্‌ম্যান) :—

"গত মঙ্গলবারের স্টেটস্‌ম্যানে বন্যাপীড়িত অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে পাবনার রেভাঃ অ্যালান গ্রেসের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বাংলা গবর্নমেণ্টের রাজস্ব-বিভাগের সদস্য মহাশয়কে বিব্রত করিয়া তুলিবে। মিশনারী মহাশয় রেভেনিউ

সদস্যের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে, অনাহারের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই—সরকারী ইস্তাহারের এই বর্ণনা সত্য নহে। মিঃ গ্রেসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, কোন কোন স্থানে লোকে তিন দিনে একবার আহার করাটা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করে। সরকারী ইস্তাহারের এইরূপ প্রতিবাদ যদি কোন ভারতবাসী করিতেন তবে তাহা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের মিথ্যা প্রচারকার্য বলিয়া অগ্রাহ্য হইত। কিন্তু গবর্নমেণ্ট বা অপর কেহ মিঃ গ্রেসকে সেই দলে ফেলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। তাঁহার সময়োচিত ও সাহসিকতাপূর্ণ উক্তি দেখাইয়া দিয়াছে যে, সরকারী ইস্তাহারে মাঝে মাঝে যে সব বিবৃতি করা হয়, তাহা একরূপ অসার। এবং আরও দুঃখের বিষয় এই যে, এই ইস্তাহার একজন বাঙালী সদস্যের তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। এই বাঙালী সদস্য মহাশয় জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতির কার্যে যাপন করিয়াছেন।........ ”

আমার মতে লেখক আসল প্রশ্নটাই এড়াইয়াছেন। রেভেনিউ সদস্যের পদে ঘটনাচক্রে একজন বাঙালী ছিলেন। আসলে বর্তমান শাসনপ্রণালীই যে শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী, একথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি।

আর অধিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করিয়া আমি শুধু এখানে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের বর্ণনা উদ্ধৃত করিব। তিনি নিজে বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও প্রদব্রজে ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে সমস্ত অবস্থা দেখেন।

“একটি গ্রামে, একটি পরিবার ব্যতীত সমস্ত লোককে আমি কুমুদ ফুলের মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিতে দেখিয়াছি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাহারা অন্ন কাহাকে বলে জানিতে পারে নাই। গ্রামে অনাহারেও লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মেয়েরা ছিন্ন বস্ত্র পরিয়াছিল, পুরুষেরা দুর্বল ও নৈরাশ্যগ্রস্ত, বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্য শোচনীয়। আমি যখন গিয়াছিলাম, দেখিতে পাইলাম যে, কতকগুলি বালক-বালিকা কুমুদ ফুলের মূলের সন্ধান করিতেছে। এবং মেয়েরা গৃহে উহাই খাদ্যের জন্য সিদ্ধ করিতেছে। টাঙ্গাইলের বাসাইল থানার অন্তর্গত চাকদা গ্রামের এই অবস্থা। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে এমন শত শত গ্রাম আছে, যাহার অবস্থা এর চেয়ে ভাল নয়। যেখানে কুমুদ ফুল হয় না, অথবা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না, সেখানে লোকে কলাপাতার আঁশ খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে।”

শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্তও বন্যাপীড়িত অঞ্চলে লোকের অবস্থা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি লোকের বাড়ীতে রন্ধনশালার ভিতরে গিয়া, তাহারা কি খাইয়া বাঁচিয়া আছে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলেন।

“একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া ক্ষিতীশবাবু এককোণে দুই-খানি ইক্ষুখণ্ড দেখিলেন। গৃহস্বামী ক্ষিতীশবাবুকে তৎক্ষণাৎ বুঝাইয়া দিলেন যে উহা ইক্ষুখণ্ড নহে, কদলীর ডগা মাত্র। ঐগুলি চাঁচা হইয়াছে, সেজন্য ইক্ষুর মত দেখাইতেছে। সোজা কথায় ওগুলি 'নকল ইক্ষুদণ্ড'। ছোট ছেলেমেয়েরা

যখন কাঁদে এবং তাহাদের খাইতে দিবার কিছু থাকে না, তখন উহা ইক্ষুখণ্ডের মত ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তাহাদের দেওয়া হয়। তাহারা সেগুলি চিবাইয়া রস পান করে। এইভাবে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং আর কাঁদে না। শিশুরা চিবাইয়া যে ছোবড়া ফেলিয়া দিয়াছে, তাহাও ক্ষিতীশবাবুকে দেখানো হইল। ক্ষিতীশবাবু ঐগুলি লইয়া আসিয়াছিলেন। বিজ্ঞান কলেজে উহা দেখানো হইতেছে।

"তার পর ক্ষিতীশবাবু আর একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে রান্না-ঘরে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, দুইটি ছোট ছেলে এক কোণে বসিয়া গোপনে কি যেন খাইতেছে। ক্ষিতীশবাবু জিনিসটা কি জানিতে চাহিলেন এবং থালাখানা বাহিরে লইয়া আসিলেন। দেখিলেন, ছেলেরা কি একটা আঠার মত জিনিস খাইতেছিল। ছেলেদের বাপ বুঝাইয়া দিল, উহা কচুসিদ্ধ মাত্র। উহার সঙ্গে লবণও ছিল না। বাপ যখন কথা বলিতেছিল, সেই সময় একটা ছয় বৎসরের মেয়ে আসিয়া থালা হইতে তাড়াতাড়ি খাইতে আরম্ভ করিল। ছোট ছেলেদের জন্য খানিকটা রাখিবার জন্য মেয়েটিকে বলা হইল, কিন্তু কথা শেষ হইবার পূর্বেই সে বাকীটুকু এক গ্রাসে খাইয়া ফেলিল। ছোট ছেলে দুইটি হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিল। ওইটুকুই ছিল শেষ সম্বল। বাপ বেচারা রান্নাঘর হইতে পাত্র আনিয়া দেখিল, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।"

দৈনিক সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত ঐ সমস্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, দেশের শাসনপ্রণালী কি ভাবে চলিতেছে। ঐ সমস্ত বর্ণনাই প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে উহার উপর কোনরূপ টীকা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু তথাপি সাম্রাজ্যবাদের কবি তাঁহার 'ভারতীয় অভিজ্ঞতা' লইয়া নিম্নোদ্ধৃত অর্থহীন বাজে কবিতা লিখিতে কুণ্ঠিত হন না। ঐগুলি বোধ হয় স্বদেশবাসী এবং বিশ্ববাসীদের মনকে প্রতারিত করিবার জন্য।

শ্বেতাঙ্গের দায়িত্ব-ভার মাথায় তুলিয়া লও; (ক)
দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের অন্ন দাও,
রোগ পীড়া দূর কর;
শ্বেতাঙ্গদের দায়িত্বভার মাথায় তুলিয়া লও,
রাজাদের তুচ্ছ শাসনের প্রয়োজন নাই।

(ইংরাজী কবিতার অনুবাদ)

১৯২২ সালের উত্তরবঙ্গ বন্যা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া আমি বলিয়াছি,—"প্রজাদের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া যদি রেলওয়ের সঙ্কীর্ণ কালভার্টগুলি বড় সেতুতে পরিণত করা হইত, তবে এই বন্যা নিবারণ করা যাইত, অন্ততঃপক্ষে ইহার প্রকোপ বহুল পরিমাণে হ্রাস করা যাইত।" বর্তমান বৎসরের বন্যাও এম

(ক) আমি যখন এই অংশের প্রুফ দেখিতেছিলাম, তখন (১১।৬।৩২) স্যার স্যামুয়েল হোর ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের যে গুণগান করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কৌতুক বোধ করিলাম। প্রত্যুত্তর স্বরূপে আমার বহির এই অংশ তাঁহাকে উপহার দিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই আত্মগরিমা কীর্তনের প্রহসন কবে শেষ হইবে?

ভীষণ হইত না যদি পূর্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া জল-নিকাশের পথ করা হইত। সম্প্রতি এই বিষয়ে একখানি সময়োপযোগী পুস্তিকা আমার হস্তগত হইয়াছে। লেখক বিষয়টি খুব যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং এবিষয়ে তাঁহার কথা বলিবার অধিকার আছে। আমি ঐ পুস্তিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"১৯২২ সালের উত্তর বঙ্গের প্রবল বন্যা অনেকের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার বেণ্টলী তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বলে আবিষ্কার করেন যে ই. বি. রেলপথ (বিশেষতঃ নূতন সারা-সিরাজগঞ্জ রেলপথ) নির্মাণের গুরুতর ত্রুটিই ইহার কারণ। এই সমস্ত রেলপথে সংকীর্ণ কালভার্ট এবং ক্ষুদ্র অপরিসর সেতু থাকাতেই জল জমিয়া বন্যার পথ প্রশস্ত করে। এই বন্যারই আনুষঙ্গিক ফল ম্যালেরিয়া, কলেরা এবং অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ। কিন্তু এই বন্যা ও মহামারীর ফল ভোগ করে দরিদ্র মূক কৃষককুল, এই আত্মপ্রচার ও বড়মানুষির যুগে যাহাদের অস্তিত্ব বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ জলশক্তি বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার স্যার উইলিয়াম উইল্‌কক্‌স্‌ যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা বাঁধ নির্মাণ করিবার নীতির অসারতা প্রমাণিত হইয়াছে। তবু, এই সমস্ত অপকার্য নিবারণ করিবে কে? কত দিনেই বা তাহা নিবারিত হইবে? পক্ষান্তরে, 'ভবিষ্যৎ বন্যার বিরুদ্ধে সতর্কতার ব্যবস্থা স্বরূপ' আরও বেশী বাঁধ নির্মিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে।"(খ)

উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের সাহসী কৃষককুলই গবর্নমেণ্টের প্রধান সহায় ও শক্তি-স্বরূপ,—কেননা ইহারাই পাট চাষের দ্বারা ঐশ্বর্য উৎপাদন করে এবং ইহারাই আমদানী ব্রিটিশ বস্ত্রজাত ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের প্রধান ক্রেতা। গবর্নমেণ্ট এই দরিদ্র ও অসহায়দের মশামাছির মত ধ্বংস হইতে দিতেছেন।

দরিদ্র মূক রায়তেরা যে ক্ষতি সহ্য করিয়াছে, তাহা অপরিমেয়। অনেক স্থলে তাহাদের গোমহিষাদি পশু এবং বাড়ীঘর বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। ভারতগবর্নমেণ্ট সমস্ত পাট শুল্কই নিজেরা গ্রহণ করেন এবং গত কয়েক বৎসরে তাঁহারা প্রায় ৪০।৫০ কোটি টাকা এই বাবত লইয়াছেন। যদি এই বিপুল অর্থের শতকরা এক ভাগও দুর্গতদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হইত, তবে তাহারা হয়ত বাঁচিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইলে অন্যদিকে যে সব অমিতব্যয়িতা অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহা সম্ভবপর হইত না।

বাংলাদেশে প্রায়ই যে সব বন্যা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাহা হইতে শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় আছে। আমাদের জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ কি এবং জাতীয় জীবনের বিকাশের পথে এই বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে আমরা কিরূপে সংগ্রাম করিতে পারি, তাহা এই সব বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) The Bengal flood, 1931—by Sailendra Nath Banerjee, Member, Board of Directors, Central Co-operative Anti-Malaria Society Ltd., pp. 3-4.

বাংলা গবর্নমেণ্ট বন্যার ধ্বংসলীলা ও তজ্জনিত অপরিমেয় ক্ষতি লঘু করিয়া দেখাইবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছেন। গবর্নমেণ্ট বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের ক্ষতি সম্বন্ধে হাস্যকর বিবরণ প্রকাশ করেন এবং একটি নিখিল বঙ্গ সাহায্যভাণ্ডার খোলাও প্রয়োজন মনে করেন না।

গবর্নমেণ্ট যদি তাঁহাদের সরকারী দস্তুর মাফিক সাহায্যকার্যের বন্দোবস্ত করিতেন, তাহা হইলে সাহায্যকার্যের জন্য প্রদত্ত অর্থের কতটা অংশ বড় বড় কর্মচারীদের মোটা মাহিনা ও গাড়ীখরচা বাবত ব্যয় হইত? খুব সম্ভব আসল কাজ অপেক্ষা পরিদর্শনের কাজেই বেশী টাকা লাগিত। বে-সরকারী স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজই অধিকতর স্বল্প ব্যয়ে এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়, কেননা সেখানে সরকারী লাল ফিতার দৌরাত্ম্য নাই।

বন্যা বাংলার যুবকদিগকে নিয়মানুবর্তিতা ও দৃঢ়সঙ্কল্পের শিক্ষা দিয়াছে। ইহা হাতেকলমে আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের কাজ শিখাইয়াছে। পূর্বে বন্যার সময়, সাহায্যকার্য তিন সপ্তাহ বা একমাসের বেশী স্থায়ী হইত না, উহা কতকটা প্রাথমিক সাহায্যস্বরূপ ছিল। বন্যার ভীষণতা একটু কমিলেই সাহায্যকার্য বন্ধ করা হইত এবং হতভাগ্য অধিবাসীদের নিজেদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হইত। যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টা হইত না।

কিন্তু বন্যার সম্বন্ধে একটা খুব বড় কথা এই যে—হিন্দু-মুসলমান মিলনের সমস্যা এই বন্যা সেবাকার্যের মধ্য দিয়া আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা এই মিলন সম্ভবপর মনে করেন না, তাঁহাদিগকে আমি জানাইতে চাই যে, বন্যাপীড়িতদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জনই ছিল মুসলমান এবং যাহারা সাহায্যকার্য করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৯ জনই ছিল হিন্দু এবং আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, কোন হিন্দুই, মুসলমান ভ্রাতাদের সাহায্যের জন্য যে সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি করে নাই। রাজনৈতিক প্যাক্ট ও আপস সফল হইতে না পারে, কিন্তু এই আন্তরিক সেবা ও সহানুভূতির দৃঢ় ভিত্তির উপর যে বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে, তাহার ক্ষয় নাই।

এই বন্যার মধ্য দিয়া আমরা ভবিষ্যৎ যুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছি। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকমের জলবায়ু, বিভিন্ন ভাষা, বিচিত্র রকমের বেশভূষা, বিভিন্ন ধর্ম এবং বিভিন্ন রকমের মতামত থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ যে একটি অখণ্ড দেশ তাহা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহার কোন অংশে কোন বিপদ বা বিপত্তি ঘটিলেই সমস্ত অঙ্গই গভীর আন্তরিকতা ও সমবেদনার সঙ্গে তাহাতে সাড়া দেয়।

আত্মচরিত

দ্বিতীয় খণ্ড

শিক্ষা, শিল্পবাণিজ্য, অর্থনীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় কথা

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা

(১) দলে দলে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি

"আমি একমাত্র বৃহৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছি, একমাত্র শিক্ষকের নিকট পড়িয়াছি। সে বৃহৎ গ্রন্থ জীবন, সেই শিক্ষক দৈনিক অভিজ্ঞতা।"—মুসোলিনী।

"আমার বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন অধিকাংশ লোকের পক্ষে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশি করে।"—র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের জন্য অদ্ভুত ব্যাকুলতা আমাদের যুবকদের একটা ব্যাধির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মার্কা' পাইবার জন্য ব্যাকুলতা—ইহার মূলে আছে একটা অন্ধ বিশ্বাস। আমাদের ছাত্রগণ এবং তাঁহাদের অভিভাবকেরা সকলেই মনে করে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সরকারী চাকরি লাভের একমাত্র উপায়,—আইন, ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবারও ঐ একমাত্র পথ। উপাধিধারীদের অবশেষে যে শোচনীয় দুর্দশা হইয়াছে, তাহা এস্থলে বলা নিষ্প্রয়োজন। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, অসংখ্য বেকারদের কথা বিবেচনা করিলে, একজন গ্রাজুয়েটের বাজারদর গড়ে মাসিক ২৫৲ টাকার বেশী নহে। তাহাদের মধ্যে শতকরা একজন বোধহয় জীবনে সাফল্য লাভ করে, বাকী সকলে চিন্তাহীন-ভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হইয়া অনেক শিক্ষিত যুবক আত্মহত্যা করে—বিশেষতঃ যদি তাহাদের ঘাড়ে সংসারের ভার পড়ে।(১)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা আমরা এতকাল পর্যন্ত জাতির শক্তি ও মেধার যে অপরিমেয় অপব্যয় হইতে দিয়াছি, তাহার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২০ সালে ভাইস্ চ্যান্সেলররূপে বক্তৃতা করিতে গিয়া শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার যে হৃদয়বিদারক বর্ণনা করেন, এই প্রসঙ্গে তাহা উদ্ধৃত করিব।

"মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮,৫০০ হাজার গ্রাজুয়েটের জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রায় ৩,৭০০ জন সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিল;

---

(১) "মৃত্যুঞ্জয় শীল নামক ৩০ বৎসর বয়স্ক যুবক আত্মহত্যা করে। এই সম্পর্কে করোনারের আদালতে তদন্তের সময় নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। শীল অনেকদিন পর্যন্ত বেকার ছিল। সম্প্রতি একদিন সে তাহার মাকে বলে যে, সে একটি কাজ পাইয়াছে। ১৪ই মার্চ সকালে দেখা গেল সে গুরুতররূপে পীড়িত,— জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে সে বিষ খাইয়াছে। হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিলে সেইখানেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পকেটে একখানি পত্র পাওয়া যায়। ঐ পত্রে লেখা ছিল যে, তাহার মা ও স্ত্রী অনাহারে আছে, ইহা সে আর সহ্য করিতে পারে না। সে তাহার মাকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিবার জন্য মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল, সে কাজ পাইয়াছে।"—দৈনিক সংবাদপত্র, ২৮শে মার্চ, ১৯২৮।

এইরূপ ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটিতেছে।

প্রায় ঐ সংখ্যক গ্রাজুয়েট শিক্ষকরূপে কাজ করিতেছিল। ৬০০০ হাজার আইন ব্যবসায়ে যোগ দিয়াছে। চিকিৎসা ব্যবসায়ে ৭৬৫ জন, বাণিজ্যে ১০০ এবং বিজ্ঞানচর্চায় মাত্র ৫৬ জন যোগ দিয়াছে। এই ১৮½ হাজার লোকের মধ্যে মানবজ্ঞান-ভাণ্ডারে কিছু দান করিতে পারিয়াছে, এমন লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিতেছেন (১৯২৬)—

"এই বৎসর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লাভার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪৫০ হইয়াছে। এই সংখ্যাধিক্যের জন্য এবার স্থির হইয়াছে যে, আগামী বৃহস্পতিবার দুইবার কন্‌ভোকেশান হইবে। প্রথমবার ২টার সময়, ভাইস্-চ্যান্সেলর উহাতে সভাপতিত্ব করিবেন, দ্বিতীয়বার ৪½টার সময়, চ্যান্সেলর উহার সভাপতি হইবেন।"

কলিকাতা ও মাদ্রাজের দুই বিশ্ববিদ্যালয় অজস্র গ্রাজুয়েট প্রসবের কারখানা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহাও যেন পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় নাই, তাই পর পর কতকগুলি নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এক যুক্তপ্রদেশেই বারাণসী, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ এবং আগ্রাতে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশও পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহে, সেখানেও অন্নমালাই ও অন্ধ্র—আরও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ও অজস্র গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করিয়া জাতির যুবক শক্তির ক্ষয়ে সহায়তা করিতেছে। ডিগ্রী লাভের জন্য এই অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ব্যাধিবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ঘোর অনিষ্ট করিতেছে। জাতির মানসিক উন্নতি ও সংস্কৃতির মূলে ইহা বিষের ন্যায় কার্য করিতেছে। বর্তমানে যেরূপ ভ্রান্ত-প্রণালীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার ফলে এমন এক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকের সৃষ্টি হইতেছে, যাহাদের কোন কর্মপ্রেরণা, উৎসাহ ও শক্তি নাই এবং জীবনসংগ্রামে তাহারা নিজেদের অসহায় বলিয়াই বোধ করে। সংখ্যার দিক দিয়া এই শিক্ষায় কিছু লাভ হইতেছে বটে, কিন্তু উৎকর্ষের দিক দিয়া ইহা অধঃ-পতনের সূচনাই করিতেছে। সাধারণ গ্রাজুয়েটরা মার্কাধারী মূর্খ বলিলেও হয়। আমার কয়েকটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় আমি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অজ্ঞতা ঢাকিবার ছদ্মবেশ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর অতি সামান্য জ্ঞানই আছে এবং পরীক্ষায় পাস করিবার জন্য যেটুকু না হইলে চলে না, সেইটুকুই সে শিখে।(২)

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরা অনেক সময় অভিযোগ করেন, আমি তাঁহাদের প্রতি অবিচার করিতেছি। তাঁহারা বলেন, "আপনি কি আমাদের মাড়োয়ারী হইতে বলেন?" আমি স্পষ্ট ভাবেই তাঁহাদিগকে বলি যে আমি তাহা চাই না। আমি

---

(২) "যত কম মূল্যে সম্ভব, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীকে ক্রয় করাই যেন প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ২৫, টাকায় একজন বি. এ.-কে পাওয়া যায় (সম্ভবতঃ তাহারা আরও অন্য কাজ করে বা আইন পড়ে)। সব সময়ের জন্য একজন বি. এ.-কে ৪০, টাকায় পাওয়া যায়। ইহারা সবচেয়ে দুর্বল, হতাশ প্রকৃতির লোক। ইহাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি উভয়ই হ্রাস পাইয়াছে। কাজ যেমনভাবে ইচ্ছা চলুক, ইহাই তাহাদের মনের ভাব। যদি কোন ছাত্র পড়ে ভাল,—না পড়িয়া দুষ্টামি করিয়া বেড়ায়, তাহাতেও ক্ষতি না।"—মাইকেল ওয়েস্ট, এডুকেশন, ১৭৮ পৃঃ।

যদি এই শেষ বয়সে 'মাড়োয়ারীগিরি' প্রচার করি, তবে আমি নিজেকে এবং সমস্ত জীবনের কার্যকেই ছোট করিয়া ফেলিব। প্রত্যেক যুবকই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভকেই জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা বলিয়া মনে করিবে, ইহারই আমি তীব্র নিন্দা করি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০।২৫ হাজার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরও প্রায় দুই হাজার ছাত্র ডিগ্রী লাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২।৩ জন সরকারী চাকরি, এবং ডাক্তারি, ওকালতি প্রভৃতি ব্যবসায়ে স্থান পাইতে পারেন, এই অপ্রিয় সত্য সকলেই ভুলিয়া যান। অবশিষ্ট শতকরা ৯৭ জনের কি হইবে? তাঁহাদের যে নিতান্ত অক্ষম অবস্থায় জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইবে। যদি এই বিপুল সংখ্যা হইতে বাছিয়া বাছিয়া তিন হাজার ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করা যায়, তবে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ প্রভৃতির ফলে যে সমস্ত চাকরি খালি হয় তাহার জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া যাইবে, নানা বিদ্যায় গবেষণা করিবার জন্য ছাত্রের অভাব হইবে না এবং ভবিষ্যৎ শাসক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ এবং উচ্চশ্রেণীর কেরানী পদের জন্যও লোক জুটিবে।

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটুটারী কমিশনের রিপোর্ট (সেপ্টম্বর, ১৯২৯) [Interim Report —Review of the Growth of Education in British India] হইতে নিম্নে যে অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হইবে।

"অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও আইন ব্যবসায়ে দুই চারিজনের ভাগেই মাত্র পুরস্কার মিলে, আর অধিকাংশের ভাগে পড়ে শূন্য। একজন সাধারণ উকিলের পক্ষে জীবিকার্জন করাও কঠিন হইয়া পড়ে।(৩) চিকিৎসা ব্যবসায় ও ইঞ্জিনিয়ারিং অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকই অবলম্বন করিতে পারে—ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাশিক্ষা ব্যয়সাধ্যও বটে। যে সমস্ত লোকের বিদ্যাচর্চার প্রতি কোন আকর্ষণ নাই, তাহা অনুশীলন করিবার যোগ্যতাও নাই, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার একটি প্রধান কারণ, এই যে, গবর্নমেণ্ট সরকারী কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী একান্ত আবশ্যক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যে সমস্ত কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নাই তাহাতে গবর্নমেণ্ট যদি ডিগ্রীর দাবি না করিতেন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির উপর চাপ বোধ হয় কম পড়িত। আমরা প্রস্তাব করি যে, কতকগুলি সরকারী কেরানী পদের জন্য বিলাতে যেমন সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা আছে, ঐ ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা হউক। কেরানীগিরির জন্য যে সব বিষয় জানা প্রয়োজন,

---

(৩) আলিপুর বারে প্রায় ৯৫০ জন বি. এল. ও এম. এ., বি. এল. উকিল আছেন। কয়েকজন কৃতী উকিলের মুখে আমি শুনিয়াছি যে ঐ সমস্ত উকিলদের মধ্যে শতকরা ১০ জনও ভালরূপে জীবিকার্জন করিতে পারে না। এই সব 'ব্রিফহীন' উকিলের কথা প্রবাদবাক্যের মত হইয়া পড়িয়াছে। মক্কেলের চেয়ে উকিলের সংখ্যাই বেশী। কোন কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকের নিকট শুনিয়াছি, বরিশালে একজন উকিলের আয় গড়ে মাসে ২৫৲ টাকার বেশী নহে। অবশ্য 'ব্রিফহীন' উকিলদের অবস্থা বিবেচনা করিয়াই এই হিসাব ধরা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কলিকাতা ও ঢাকার আইন কলেজে দলে দলে ছাত্র যোগদান করিতেছে।

উক্ত পরীক্ষা তদনুরূপ হইবে এবং উহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর দরকার হইবে না। আমরা শুধু কেরানীগিরি কাজের কথাই বলিতেছি, উচ্চশ্রেণীর সার্ভিসের কথা বলিতেছি না। কেননা এই সব উচ্চশ্রেণীর কাজে কম লোকেরই প্রয়োজন হয় এবং উহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার বিশেষ কিছু হ্রাসবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই।

"বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সব ছাত্রের ভীড়ই বেশী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে যাহাদের মানসিক বা আর্থিক কোন উন্নতি হয় না। শত শত ছাত্রের পক্ষে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা অর্থ ও শক্তির অপব্যয় মাত্র। আর ইহাতে কেবল ব্যক্তিগত অর্থেরই অপব্যয় হয় না। সকল দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের প্রত্যেক ছাত্রের জন্য তাহার প্রদত্ত ছাত্রবেতন অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় হয়, কোন কোন স্থলে পাঁচ ছয়গুণ বেশী অর্থ ব্যয় হয়।(৪) ভারতবর্ষে এই অতিরিক্ত অর্থ লোকের বৃত্তি হইতে এবং অনেকাংশে সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় হয়। বর্তমানে যে সব ছাত্র উচ্চশিক্ষার যোগ্যতা না থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে যায় তাহাদের মধ্যে অনেককে যদি অল্প বয়সেই তাহাদের শক্তি সামর্থ্যের অনুরূপ নানা বৃত্তি শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করা যায়, তবে তাহার ফল ভালই হইবে। একদিকে যেমন ঐ অতিরিক্ত অর্থ অধিকতর কার্যকরী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যাইবে, অন্যদিকে তেমনই মেধাবী ছাত্র-গণের জন্য ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে যে সব ছাত্র দলে দলে যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকের শিক্ষা ব্যর্থ হয়; দেশ ও সমাজের দিক হইতেও তাহাদের কোন চাহিদা নাই এবং ইহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অবনতি ঘটিতেছে।"

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট বনাম আত্মচেষ্টায় শিক্ষিত ব্যক্তি

একজন ক্ষীণ-স্বাস্থ্য ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করিয়াও, সাহিত্য-জগতে কিরূপ কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সভ্যতার ইতিহাস' প্রণেতা হেনরি টমাস বাক্‌লের (১৮২১—১৮৬২) নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার স্বাস্থ্য বাল্যকাল হইতেই ভাল ছিল না এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁহার পিতা-মাতা 'তাঁহার মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই।' আট বৎসর বয়সেও তাঁহার অক্ষর পরিচয় হয় নাই এবং আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি 'সেক্সপিয়র', 'পিল্‌গ্রিম্‌স্‌ প্রোগ্রেস' এবং 'আরেবিয়ান নাইটস্‌' ছাড়া বিশেষ কিছু পড়েন নাই। তাঁহাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়, কিন্তু সেখান হইতে তাঁহাকে ছাড়াইয়া আনা হয়।

---

(৪) ১৯২৭—২৮ সালে বিভিন্ন কলেজে প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিতরূপ ব্যয় হইয়াছে :—প্রেসিডেন্সি কলেজে ৭৫৫, টাকা, তন্মধ্যে সরকারী তহবিল হইতে ৩০১·৫ টাকা; ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে ৪৩১·৯ টাকা, তন্মধ্যে সরকারী তহবিল হইতে ৩৪৩·৪ টাকা; হুগলী কলেজে ৫১৫·৫ টাকা, সরকারী তহবিল হইতে ৪২৭·২ টাকা; সংস্কৃত কলেজে ৫৫৬·৩ টাকা, সরকারী তহবিল হইতে ৫০৯ টাকা; কৃষ্ণনগর কলেজে ৫৩৫·৩ টাকা, সরকারী তহবিল হইতে ৪৩৫·৬ টাকা এবং রাজসাহী কলেজে ২৮৫·৩ টাকা, তন্মধ্যে সরকারী তহবিল হইতে ১৯২·৬ টাকা। (বাংলার বার্ষিক শিক্ষাবিবরণী—১৯২৭—২৮)।

সতের বৎসর বয়সে বাক্‌লের স্বাস্থ্য কিছু ভাল হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ১৯টি ভাষা বেশ সহজে পড়িতে পারিতেন। তাঁহার স্বল্পায়ু জীবনে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ভয় সর্বদা তাঁহার মনে ছিল এবং একাদিক্রমে তিনি বেশী পড়াশুনো কখনই করিতেন না। তৎসত্ত্বেও নিয়মিত অভ্যাসের ফলে তিনি প্রায় বাইশ হাজার বই পড়িয়াছিলেন। "সভ্যতার ইতিহাস" পড়িলে তাঁহার পরিণত চিন্তা এবং অগাধ পান্ডিত্যের পরিচয় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ মহিলা ঔপন্যাসিক জর্জ ইলিয়ট ৫ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন, কলেজী শিক্ষা তাঁহার হয় নাই। কিন্তু তিনি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং জার্মান ও ইটালিয়ান ভাষা জানিতেন।

মহিলা কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (১৮০৬—৬১) নিজের চেষ্টাতেই শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যাশিক্ষার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। আট বৎসর বয়সের সময় তাঁহার একজন গৃহশিক্ষক ছিল। সেই সময় তিনি একহাতে হোমরের মূল গ্রীক কাব্য পড়িতেন, অন্য হাতে পুতুল লইয়া খেলা করিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য বরাবরই খারাপ ছিল।

মেকলে ভারতে পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রবর্তনের একজন প্রধান সহায়। তিনি এই প্রচলিত মতের প্রধান প্রচারকর্তা ছিলেন—"যাহারা বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হয়, তাহারাই উত্তরকালে জীবনসংগ্রামে সাফল্য লাভ করে।" মেকলে বলেন—"বিশ্ব-বিদ্যালয়ের র‍্যাংলারদের এবং জুনিয়র ওপটিমদের তালিকা তুলনা করিয়া আমি বলিতে চাই যে, পরবর্তী জীবনে যেখানে একজন জুনিয়র ওপটিম সাফল্য লাভ করিয়াছে, সেখানে বিশ জন র‍্যাংলার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।(৫)

"কিন্তু সাধারণ নিয়ম নিশ্চয়ই এই যে যাহারা বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে, তাহারাই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছে।"

মেকলে অন্যান্য দৃষ্টান্তের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংসের নাম করিয়াছেন। কিন্তু যেরূপেই হউক, রবার্ট ক্লাইভের কথা তাঁহার একবারও মনে পড়ে নাই। রবার্ট ক্লাইভের পিতামাতা তাঁহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া গিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহাকে একবাক্যে 'গর্দ্দভ' বলিতেন। "তাঁহাকে (মেকলের ভাষাতেই) জাহাজে করিয়া মাদ্রাজে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—উদ্দেশ্য ছিল, হয় তিনি সেখানে ঐশ্বর্য লাভ করিবেন অথবা জ্বরে ভুগিয়া মরিবেন।" পূর্বে হেস্টিংসের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তিনি দারিদ্র্যবশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিতে পারেন নাই।

মেকলের নিজের কথা হইতেই আমি তাঁহার মতের প্রতিবাদ আর একবার করিব। তাঁহার প্রিয় নায়ক উইলিয়ম অব অরেঞ্জ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"ইতিমধ্যে তিনি তৎকালীন 'ফ্যাশন' কেতাবী বিদ্যায় অতি সামান্য দক্ষতাই লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য বিজ্ঞান কোন বিষয়েই তাঁহার উৎসাহ ছিল না। নিউটন ও লিবনিজের

---

৫) Trevelyan—Life and Letters of Macaulay, Vol. II.

আবিষ্কার অথবা ড্রাইডেন এবং বোয়ালোর কবিতা—সমস্তই তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল।”

ব্লেনহিম সমরক্ষেত্রের বীর জন চার্চিল (পরে ডিউক অব মার্লবরো) সম্বন্ধে আমরা মেকলের বইতেই(৬) পড়ি,—“তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে এত বেশী ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার নিজের ভাষার অতি সাধারণ শব্দ পর্যন্ত বানান করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ম ও জোরাল বুদ্ধি এই কেতাবী বিদ্যার অভাব পূর্ণ করিয়াছিল।” তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বংশের একজন বংশধর উইনস্টন চার্চিল বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ কোন পরিচয় দেন নাই। উত্তরকালে তিনি যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবেন, তাহার কোন আভাসই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার পিতা লর্ড র‍্যান্‌ডলফ তাঁহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া কেপ কলোনি গবর্নমেণ্টের অধীনে তাঁহার জন্য একটি সামান্য কাজের জোগাড় করিবার চেষ্টায় ছিলেন। একথা সত্য যে, গ্ল্যাডস্টোনের সময় পর্যন্ত অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের ‘বিদ্যা’ পার্লামেণ্টারী গবর্নমেণ্টের একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল। “১৮৫৯ সালে পামারস্টোন যখন তাঁহার গবর্নমেণ্ট গঠন করেন, তখন তাঁহার মন্ত্রিসভায় অক্সফোর্ডের ছয়জন প্রথম শ্রেণীর গ্রাজুয়েট ছিলেন (তাঁহাদের মধ্যে তিনজন আবার ডবলফার্স্ট) এবং মন্ত্রিসভার বাহিরে তাঁহার দলে চার জন প্রথম শ্রেণীর গ্রাজুয়েট ছিলেন। ১৮৫০—১৮৬০ পর্যন্ত আমি অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিলাম। ঐ সময়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যাপার ধর্মযাজকদের মুষ্টির মধ্যেই ছিল; কিন্তু তাঁহাদের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছিল।” (মর্লির স্মৃতিকথা—প্রথম খণ্ড, ১২ পৃঃ)। কিন্তু গ্ল্যাডস্টোনের সময়েও ইহার ব্যতিক্রম ছিল। জন ব্রাইট স্কুল কলেজের বিদ্যার ধার ধারিতেন না। জোসেফ চেম্বারলেন নিজেকে ‘ব্যবসায়ী’ বলিয়া গর্ব করিয়াছেন। তাঁর স্ক্রুর কারখানা ছিল। ডবলিউ এইচ. স্মিথ উত্তরকালে পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল-দলের নেতা হইয়াছিলেন। “তিনি তাঁহার প্রথম যৌবনে ও মধ্যবয়সে নিজের চেষ্টায় এবং সাধু উপায়ে একটা বৃহৎ ব্যবসায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার প্রচুর আয় হইত।”(৭)

বার্ট ও ব্রডহার্স্ট শ্রমিক প্রতিনিধিরূপে পার্লামেণ্টে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি পরে গ্ল্যাডস্টোন মন্ত্রিসভার সদস্যও হইয়াছিলেন। শ্রমিক নেতা জন বার্নসও ১৯১৪ সালে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন।

স্যার হ্যারি পার্কস কূট রাজনীতিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। “তিনি অনাথ বালক রূপে মেকাওতে তাঁহার এক আত্মীয় পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে ব্রিটিশ রাজদূতের অফিসে চাকরি পান। ক্যাণ্টন দখলের সময় তিনি খুব নাম করেন এবং বৈদেশিক অধিকারের সময় ঐ নগরের শাসনকর্তা হন। অ্যাংলো-ফরাসী

(৬) Macaulay—History of England.

(৭) Oxford and Asquith—Fifty Years of Parliament.

সৈন্যদলের অভিযানের সময় তিনি পিকিন শহরে চীনাদের হস্তে নির্যাতিত হন। ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি জাপানে ব্রিটিশ মন্ত্রী রূপে বদলি হইয়াছিলেন।”(৮) আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

“লয়েড জর্জের গৌরবময় জীবনকাহিনীর সঙ্গে ডিজ্‌রেলির তুলনা করা হয়। এই দুই চরিত্রের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পূর্ব-গামী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীদের মত তাঁহাদের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছিল না। পক্ষান্তরে নিজেদের চেষ্টায় তাঁহারা শিক্ষালাভ করেন এবং জীবনসংগ্রামে আত্মশক্তির উপরই নির্ভর করিতেন।”(৯) যাঁহারা সমাজের নিম্নস্তর হইতে আসিয়াছেন—কৃষক ও শ্রমিকের ছেলে—বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষা পান নাই—তাঁহাদের মধ্যেও অসাধারণ বাগ্মিতার শক্তি দেখা গিয়াছে এবং রাজনীতিক হিসাবেও তাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। লর্ড কার্জন তাঁহার রীড বক্তৃতায় (১৯১৩) এই বিষয়টি নিপুণ-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার ঐ বক্তৃতাগ্রন্থের নাম Modern Parliament Eloquence.

“আমি আশা করি ভবিষ্যতে দেশে অন্য এক শ্রেণীর বক্তৃতার উদ্ভব হইবে, যাহা অধিকতর সময়োপযোগী ও লোকপ্রিয়। জর্জিয়ান যুগের বক্তৃতা ছিল অভিজাতধর্মী। মধ্য ভিক্টোরিয়ান যুগের বক্তৃতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা যাইত। আমার মনে হয় ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক যুগের উপযোগী বাগ্মিতার আবির্ভাব হইবে। আমেরিকার আব্রাহাম লিঙ্কনের মত যদি কেহ সমাজের সাধারণ লোকদের ভিতর হইতে উদ্ভূত হন এবং তাঁহার যদি অসামান্য প্রতিভা ও বাগ্মিতা থাকে, তবে তিনি ইংলণ্ডে পুনরায় চ্যাথাম বা গ্র্যাটানের গৌরবময় যুগ সৃষ্টি করিতে পারেন। জনসভা অপেক্ষা সেনেটে তাঁহার সাফল্য কম হইতে পারে, তাঁহার বক্তৃতাভঙ্গী অতীত যুগের বিখ্যাত বক্তাদের মত না হইতে পারে, কিন্তু তিনি নিজ শক্তির বলে সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়া সাম্রাজ্য পরিচালনা ও তাহার ভাগ্য নির্ণয় করিতে পারেন। লয়েড জর্জের মধ্যে এইরূপ শক্তির লক্ষণ দেখা যায়।...হাউস অব কমন্সে শ্রমিক সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর বক্তা আছেন—যথা মিঃ ফিলিপ স্নোডেন এবং মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড।” কার্জনের এই বাণী ভবিষ্যৎ বাণীতে পরিণত হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য।

যে তিনটি বক্তৃতা ইংরাজী ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা এবং ইংরাজী ভাষাভাষী জাতির সম্পদরূপে গণ্য হয়, তাহার মধ্যে দুইটিই ‘বুনো’ আব্রাহাম লিঙ্কনের। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর. গেটিসবার্গ সমাধিভূমিতে আব্রাহাম লিঙ্কন যে বক্তৃতা করেন, তাহা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময়, আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকেরা

---

(৮) J. W. Hall—Eminent Asians, p. 161.

(৯) Edwards—Life of Llyod George.

অনেক সময়ে কাজের যোগ্য বলিয়া গণ্য হইত না, সহজবুদ্ধি সাধারণ ব্যবসায়ী-দিগকে ডাকিয়া কাজ চালাইতে হইত।

যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য আমেরিকা এডিসনের নীতি অনুসরণ করিয়া 'কার্যক্ষম ব্যক্তিদিগকেই' নির্বাচিত করিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস যে তাহারা শ্রেষ্ঠ লোকদেরই বাছিয়া লইয়াছিল। মিঃ ড্যানিয়েল উইলিয়ার্ড সৈন্য ও রসদ চালান বিভাগের (ট্রান্সপোর্টেশান) কর্তা ছিলেন। ইনি এখন আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ রেলওয়ে, বাল্টিমোর এবং ওহিও রেলওয়ের প্রেসিডেন্ট। তিনি রেলওয়ে শ্রমিকরূপে জীবন আরম্ভ করেন। পরে ইঞ্জিনচালক হন এবং ক্রমে ক্রমে বর্তমান পদ লাভ করিয়াছেন। ব্যাঙ্কার মিঃ ভ্যান্‌ডারলিপ আমেরিকায় 'ব্রিটিশ-যুদ্ধ-ঋণ-কমিটির' চেয়ারম্যান ছিলেন। পরে তিনি ট্রেজারী-সেক্রেটারীর সহকারী নিযুক্ত হন। জগতের মধ্যে ষষ্ঠ বৃহৎ ব্যাঙ্কের তিনি প্রধান কর্তা। তিনি সংবাদ-পত্রের রিপোর্টাররূপে প্রথম জীবনে কাজ আরম্ভ করেন। মিঃ রোজেন-ওয়াল্‌ড যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যক্রয় বিভাগের কর্তা ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে সংবাদবাহক বালক-ভৃত্য ছিলেন। তিনি এখন শিকাগোর একটি বড় মাল সরবরাহ-কারী ব্যবসায়ী ফার্মের কর্তা এবং তাঁহার আয় বার্ষিক প্রায় ১০ লক্ষ ডলার। ব্যাঙ্কার মিঃ এইচ. পি. ডেভিসন যুদ্ধের কাজে সহায়তা করিবার জন্য ব্যাঙ্কারদের একটি কমিটি গঠন করেন। তাঁহার বিশ বৎসর বয়সেই তিনি ২ লক্ষ পাউন্ড উপার্জন করেন, সুতরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সময় পান নাই। (Hankin : The Mental Limitations of the Expert—pp. 55—56.)

লর্ড রণ্ডা এবং স্যার এরিক গেডিস্ ব্যবসায়ীরূপে গত যুদ্ধের সময় অনেক কাজ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রমিক গবর্নমেণ্টের মন্ত্রিসভাতেই ইহার চূড়ান্ত দেখা গিয়াছে। "গতকল্য আমরা নূতন শ্রমিক মন্ত্রিসভার সদস্যগণের একখানি ফটোগ্রাফ প্রকাশ করিয়াছি। ১৯ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন কোন সাধারণ বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং দুইজন পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেন। যে যুগে ইটন ও হ্যারো স্কুল হইতে মন্ত্রিসভার সদস্য লওয়া হইত, মনে হয়, সে যুগ অতীত হইয়াছে। ইংলণ্ডের ৪ জন মন্ত্রীর মধ্যে কেবল একজন স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং বর্তমান ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য-গণের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেরই কোন কলিকাতা সামাজিক ক্লাবের সদস্য হইবারও যোগ্যতা নাই। ইংলণ্ডে এখন আর কেবলমাত্র পুরাতন পন্থায় উচ্চ পদ লাভ হয় না। মিঃ জোসেফ চেম্বারলেন, মিঃ লয়েড জর্জ, মিঃ বোনার ল এবং মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড পুরাতন রীতির ব্যতিক্রম করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এখন আর উচ্চতম যোগ্যতাবিশিষ্ট লোক বাহির হইতেছে না, লোকের মনে যাহাতে এই বিশ্বাস না জন্মে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক।" (স্টেটস্‌ম্যান, ২৯শে জুন, ১৯২৯)

মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার প্রথম জীবনের কিছু বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন—"সাইক্লিস্টদের ভ্রমণ-ক্লাবে আমি প্রথমে একটা কাজ পাই। সেখানে খামের

উপরে নাম ও ঠিকানা লিখিতে হইত, সপ্তাহে দশ শিলিং করিয়া বেতন পাইতাম। কিন্তু ঐ কাজ মাত্র কিছুদিনের জন্য ছিল। মাথায় ঋণের বোঝা লইয়া কপর্দক-শূন্য বেকার অবস্থায় লণ্ডনের রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ানোর অভিজ্ঞতাও আমার আছে।"

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ছিল এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য তাঁহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি বলেন—"বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারি নাই বলিয়া আমি দুঃখিত নহি। বস্তুতঃ আমার বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিকাংশ লোকের পক্ষে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট বেশী করে।"

আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। স্যার জোসিয়া চাইল্ড্ উইলিয়ম অব অরেঞ্জের সময়ে (১৬৯১) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সংসৃষ্ট প্রধান ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। "তিনি ঐশ্বর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তাঁহার সময়ের বড় বড় অভিজাতদের সমকক্ষ ছিলেন।" সামান্য শিক্ষানবিসরূপে তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন। শহরের একটি ব্যাঙ্কের বাড়ী তাঁহাকে ঝাড়ু দিতে হইত। "কিন্তু এই নিম্নতম অবস্থা হইতে স্বীয় যোগ্যতার বলে তিনি ঐশ্বর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশ ও মান লাভ করেন।" (মেকলে)

সম্প্রতি মিঃ উইল আরউইন তাঁহার সহপাঠী প্রেসিডেণ্ট হুভারের প্রথম জীবন সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখিয়াছেন, তিনি বলেন—"১১ বৎসর বয়সে হুভার তাঁহার প্রভুর ঘোড়ার পরিচর্যা করিতেন, গাভী দোহন করিতেন, হাপর জ্বালাইতে সাহায্য করিতেন এবং এই সব কাজ করিয়া স্কুলেও পড়িতে যাইতেন। সালেমে একটি আফিসে বালকভৃত্যরূপে কাজ করিবার সময়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিখিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হয় এবং নূতন লেল্যাণ্ড স্ট্যানফোর্ড জুনিয়র বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের জীবিকাও অর্জন করিতেন।"

"দরিদ্রের কুটীর হইতে প্রেসিডেণ্টের রাজপ্রাসাদ"—আমেরিকায় ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাবিশেষ।

ইংরাজী সাহিত্যের কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের ভাগ্যে স্কুল-কলেজের শিক্ষালাভ হয় নাই। জন্‌সন, গিবন ও কার্লাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার তাঁহারা নিন্দাই করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বর্তমান সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বার্নাড শ বলেন যে, তিনি ১৫ বৎসর বয়সে কেরানীগিরি কাজ করিতে বাধ্য হন। সুতরাং তিনি কলেজী শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। স্পেন্সার সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতে যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করেন। যখন তিনি Social Statics নামক গ্রন্থ লিখেন তখন তিনি কোন স্কুল-কলেজের শিক্ষা পান নাই। তিনি নিজে বলিয়াছেন,—"আমার পিতৃব্যের সহিত থাকার সময়, ১৩ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত, আমার শিক্ষা ইউক্লিড, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, মেকানিক্স এবং নিউটনের প্রিন্সিপিয়ার প্রথম ভাগে নিবন্ধ ছিল। এর চেয়ে বেশী শিক্ষা আমি কখনও লাভ করি নাই।" (জীবনী, ৪১৭ পৃঃ)

"অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আমি কোন ঋণ স্বীকার করি না এবং ঐ

বিশ্ববিদ্যালয়ও সানন্দে আমার ছাত্রত্ব অস্বীকার করিবেন। আমি ১৪ মাস ম্যাগডালেন কলেজে ছিলাম; আমার সমস্ত জীবনের মধ্যে ঐ ১৪ মাস অলস ও কর্মহীন বলিয়া আমি মনে করি।

* * *

"অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, অধিকাংশ অধ্যাপক কয়েক বৎসর হইতে শিক্ষাদানের ছলনা পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানশাস্ত্র ব্যতীত আর সমস্ত বিদ্যাই পুরাতন প্রথায় অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতিরেকেও নানা মূল্যবান পুস্তিকা পাঠেই অধিগত করা যায়।

"ম্যাগডালেন কলেজে অথবা অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের অন্য কোন কলেজে আমি যদি অনুরূপ অনুসন্ধান করিতাম, তবে প্রত্যুত্তরে অধ্যাপকরা হয়তো একটু লজ্জিত হইতেন অথবা বিদ্রূপভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিতেন।

"কমনার (Commoner) হিসাবে আমি 'ফেলো' নির্বাচিত হইয়াছিলাম। আমি আশা করিয়াছিলাম যে—সাহিত্য সম্বন্ধীয় কোন শিক্ষা ও আনন্দপ্রদ বিষয় লইয়াই বুঝি আমাদের আলোচনা হইবে। কিন্তু দেখিলাম, আমাদের কথাবার্তা কলেজের ব্যাপার, টোরী রাজনীতি, ব্যক্তিগত কাহিনী এবং কুৎসা প্রভৃতিতেই সীমাবদ্ধ।

"ডাঃ-এর বেতনের বিষয়টা বেশ মনে থাকে, কেবলমাত্র কর্তব্য করিতেই তিনি ভুলিয়া যান!"—গিবন, আত্মচরিত।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—ব্যবসায়ে সাফল্যের পথে বাধাস্বরূপ

"ব্যবসায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবক—ইংলণ্ডে তাহাদের অবস্থা কিরূপ?" —শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মিঃ গিলবার্ট ব্র্যাণ্ডন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি জীবনে সাফল্য লাভের পক্ষে বাধাস্বরূপ। বড় বড় ব্যবসায়ী বা শিল্পপ্রবর্তকদের কথা চিন্তা করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পান নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কঠোর পরিশ্রম ও অক্লান্ত সাধনার দ্বারা নিম্নতম স্তর হইতে সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের আর একটি বিশেষ শক্তি ছিল—যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে, অর্থোপার্জনের বুদ্ধি বা কৌশল।

পাবলিক স্কুলের ছাত্রগণের নিয়োগ

"একজন ভদ্রলোক জোরের সঙ্গে বলেন যে সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে কার্যে নিয়োগ করিতে হইবে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, অধিকাংশক্ষেত্রে সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সুদক্ষ ব্যবসায়ী হইতে পারে না। ইংলিশ পাবলিক স্কুলের প্রচলিত ধারণা এই যে সেখানে 'ভদ্রলোক' তৈরি করা হয়। পাঠ্যাদিও সেই আদর্শ অনুসারেই স্থির হয়। খেলা-ধুলার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। আমি ব্যবসায়ক্ষেত্রে

বহু সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়াছি, কাজ অপেক্ষা খেলার দিকেই তাহাদের মন বেশী। তাহারা সর্বদাই ঘড়ির দিকে চাহিয়া থাকে, কখন কাজ ছাড়িয়া তাহারা গল্‌ফ্ বা টেনিস্ খেলায় যাইতে পারিবে।

"সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবক কাজের 'অর্ডারে'র জন্য দালালি করিয়া বেড়াইতে চাহে না। কাজ করিতে তাহার আত্মসম্মানে বাধে। সে মনে করে, তাহার কাজ হইতেছে চেয়ার টেবিলে ঘণ্টা বাজাইয়া অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে ডাকা এবং চিঠিতে নাম দস্তখত করা।

অক্সফোর্ডের ত্রুটি

"আমি 'ক্লাসিক' বা প্রাচীন সাহিত্যে শিক্ষিত বহু যুবককে দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে মৌলিকতা ও কর্ম-প্রেরণা নাই। তাহাদের মন যেন খাঁটি 'ক্ল্যাসিক্যাল'। যখন কোন গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয়, তখন তাহারা সক্রেটিসের উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারে, কিন্তু সক্রেটিসের উপদেশ কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই অথবা নিজে বুদ্ধি করিয়াও তাহারা কিছু একটা করিতে পারে না।"

মিঃ অ্যানড্রু কার্নেগী তাঁহার "Empire of Business" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটের অভাব বিশেষভাবে চিন্তা করিবার বিষয়। আমি সর্বত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, কর্মক্ষেত্রে যাহারা নেতা বা পরিচালক তাঁহাদের মধ্যে গ্রাজুয়েটদের নাম পাই নাই। বহু আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাহারা অবশ্য বিশ্বস্ত কর্মচারিরূপে নিযুক্ত আছে। ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। ব্যবসায়ে যাঁহারা সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা গ্রাজুয়েটদের অনেক পূর্বেই কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা ১৪ বৎসর হইতে ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে কাজে ঢুকিয়াছেন, আর এই সময়টাই শিক্ষার সময়। অপরপক্ষে কলেজের যুবকেরা এই সময়ে অতীতের তুচ্ছ কাহিনী অথবা মৃত ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্যই ব্যস্ত ছিল। এই সব বিদ্যা ব্যবসায়ক্ষেত্রে কোন কাজে লাগে না, এ যেন অন্য কোন পৃথিবীর উপযোগী বিদ্যা। যিনি ভবিষ্যতে ব্যবসায়ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়াছেন, তিনি তখন হাতেকলমে কাজ শিখিয়া ভবিষ্যৎ জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।"(১০)

জনৈক আমেরিকান লেখক বলিয়াছেন—"ব্যবসায় শিক্ষার বেলায়, একথা ভুলিলে চলিবে না যে ব্যবসায়ীর ভবিষ্যৎ জীবন কাজের জীবন হইবে, অধ্যয়নের জীবন হইবে না। অকেজো উপাধিলাভের প্রচেষ্টায় তাহার স্বাস্থ্য যাহাতে নষ্ট না হয় এবং বাজে

---

(১০) পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু যখন বিলাতে 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে'র সদস্য ছিলেন, তখন তাঁহার জনৈক সহকর্মীকে (ইনি কোন বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংসৃষ্ট ছিলেন), একটি বাঙালী যুবককে ব্যাঙ্কের কাজে শিক্ষানবিস লইতে অনুরোধ করেন। সহকর্মী যখন জানিতে পারিলেন যে যুবকটি গ্রাজুয়েট এবং তাহার বয়স ২২ বৎসর, তখন মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"তরুণ বন্ধু, তুমি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অপব্যয় করিয়াছ এবং আমার আশঙ্কা হয়, ব্যাঙ্কের কাজ শেখা তোমার পক্ষে অসম্ভব। আমরা গ্রামার স্কুলের পাসকরা ১৪ বৎসর বয়সের ছেলেদের ব্যাঙ্কে শিক্ষানবিস লইয়া থাকি। তাহারা ঘরে ঝাড়ু দেয়, টেবিল চেয়ার পরিষ্কার করে, সংবাদবাহকের কাজ করে, সেই সঙ্গে হিসাব রাখিতে ও খাতাপত্র লিখিতে শিখে এবং এইরূপে তাহারা ক্রমে ব্যাঙ্কের কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া দায়িত্বপূর্ণ পদ পায়।"

বিষয় চিন্তা করিয়া সে যাহাতে বেশী ভাবপ্রবণ না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।”

আমি যদি পুনর্বার যুবক হইতাম!

যুবকদের সুযোগ

ব্যবসায়ী, ক্রোড়পতি এবং খেলোয়াড় স্যার টমাস লিপ্‌টন দারিদ্র্যের নিম্ন স্তর হইতে অভ্যুত্থান করিয়াছেন। “জীবনে কে সাফল্য লাভ করে?”—এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে জোরাল ভাষায় নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন :—

“ষাট বৎসরেরও অধিক হইল, আমি গ্লাসগোর একটি গুদাম ঘরে শ্রমিকের কাজ করিতাম, পারিশ্রমিক ছিল সপ্তাহে অর্ধ ক্রাউন (২½ শিলিং)। সেই সময় আমি মনে করিতাম, আমার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য আত্মগর্ব। তার পর বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ তাহার আত্মবিশ্বাস।

“আমার সেই প্রথম জীবনে যখন আমার আয় দৈনিক ৬ পেন্সের কম ছিল,—আমি আমার মাতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, শীঘ্রই তাঁহার জুড়িগাড়ী হইবে। ইহা ফাঁকা প্রতিশ্রুতি নয়, আমার মাতার মৃত্যুর বহু পূর্বেই তিনি প্রায় এক ডজন জুড়িগাড়ীর অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

আমার মা আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন

“আমি যদি পুনরায় যুবক হইতাম! আমি যদি অতীতকে অতিক্রম করিয়া পুনর্বার জীবন আরম্ভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে পূর্বের মতই জীবনপথে অগ্রসর হইতাম।

“কিন্তু আমার চরিত্রে দুইটি অমূল্য গুণ থাকার প্রয়োজন হইত—আমার মাতার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা এবং নিজের যোগ্যতার প্রতি বিশ্বাস। যে যুবক জীবন-যুদ্ধে সাফল্যলাভ করিবেন, তাঁহার মধ্যে এই দুইটি গুণ দেখিতে চাই। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, আমাব সমস্ত সাফল্যের জন্য মায়ের নিকট আমি ঋণী, তিনি আমাকে প্রত্যেক কাজে উৎসাহ দিতেন।(১১)

“যে যুবক ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, তাহার পক্ষে সাধারণ বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কি প্রয়োজন আছে, আমি বলিতে পারি না। ঐ শিক্ষার

---

(১১) কার্নেগীও তাঁহার মাতার প্রতি এই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সাধারণতঃ ইউরোপীয় পিতামাতার কিছু বুদ্ধি বিদ্যা আছে। রবার্ট বার্নস, অ্যানড্রু কার্নেগী, মুসোলিনী এবং লয়েড জর্জের পিতামাতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

“সচ্চরিত্র দরিদ্র পিতামাতার ছেলেমেয়ের ধনীদের ছেলেমেয়ের অপেক্ষা এই বিষয়ে অনেক বেশী সুবিধা আছে। মা, ধাত্রী, রাঁধুনী, গবর্নেস, শিক্ষক, ধর্মের আদর্শ সবই একজন; অপরপক্ষে, পিতা একাধারে আদর্শ চরিত্র, পথপ্রদর্শক, পরামর্শদাতা ও বন্ধু। আমি ও আমার ভ্রাতা এই-ভাবেই মানুষ হইয়াছিলাম। একজন লক্ষপতি বা অভিজাত বংশের ছেলের ইহার তুলনায় কি বেশী সম্পদ আছে?” কার্নেগী, আত্মচরিত।

ফলে এমন সব বিদ্যা সে অধিগত করে যাহা তাহার কোন কাজে লাগে না। এবং উহাতে অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় হয়, যাহা সে উপার্জনে ব্যয় করিতে পারিত।

"একজন যুবক ২১।২২ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে থাকিবে কেন? সেই সময় মধ্যে কাজ করিয়া সে জীবনে সম্মান ও ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারিত। বর্তমানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবক ব্যবসায়ক্ষেত্রে কোন কাজে আসে না, আফিসের একজন উচ্চশ্রেণীর বালকভৃত্য হইতে পারে মাত্র।

"আমাকে যদি পুনর্বার জীবন আরম্ভ করিতে হইত, তবে আমি একজন শ্রমিকের ছেলের চেয়ে বেশী শিক্ষা চাহিতাম না। আমি সর্বদা চেষ্টা করিতাম,—কিসে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিব।

"আমি যাট বৎসর পূর্বের মতই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতাম, আমি সেইভাবেই দেশবাসীকে খাদ্য যোগাইবার ভার লইতাম, কেননা খাদ্যের চাহিদা কখনও কম হয় না। আমার ব্যবসা লোকের খেয়ালের উপর নির্ভর করিত না। আমি এমন জিনিসের ব্যবসা করিতাম, যাহা চিরদিনই লোকপ্রিয় হইতে বাধ্য।

"ব্যবসা আরম্ভ করিয়া আমি আমার সম্মুখে কয়েকটি আদর্শ রাখিতাম। আমি পুরাতন কোন খরিদ্দার কখনও ত্যাগ করিব না, পরন্তু সর্বদা নূতন খরিদ্দার সংগ্রহ করিব। আমি খরিদ্দারদের "সেবা" করিব, সুতরাং কেহই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে না। আমি সর্বদা এই গর্ব করিব যে, আমি সর্বাপেক্ষা কম দামে, বেশী ও ভাল জিনিস দিই, আমার ব্যবসা অন্যের আদর্শস্বরূপ। আমি প্রত্যেক খরিদ্দারকে আমার বন্ধু করিতে চেষ্টা করিব, প্রত্যেকে এইকথা ভাবিবে যে তাহার জন্য আমি সর্বদা অবহিত।

চোখে ঠুলি দেওয়া যুবকগণ

"সংক্ষেপে, আমি আমার অভিজ্ঞতালব্ধ পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত নীতিগুলি অবলম্বন করিব। এবং সর্বোপরি আমার মাতার প্রভাব আমাকে সর্বদা মহত্তর ও বৃহত্তর কাজের প্রেরণা দিবে।

"এ একটা মহৎ প্রচেষ্টা হইবে। বর্তমানে জীবনসংগ্রাম বড় কঠোর, সুতরাং অধিকতর উৎসাহ ও আনন্দপূর্ণ।

"যে ব্যক্তি একক জীবনসংগ্রামে প্রবেশ করে, সে শীঘ্রই বড় বড় প্রতিযোগীদের সম্মুখীন হয়, তাহারা তাহাকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করে।

"কিন্তু বর্তমানে সে তাহার ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করিবার বহু সুযোগ পাইবে। যে যুবক সাফল্য লাভ করিতে চায়, বাধাবিপত্তি তাহার কাছে কিছুই নয়।"—পিয়ার্সনস্ উইকলি।

লর্ড কেব্‌ল(১২) এবং লর্ড ইঞ্চকেপ (মিঃ ম্যাকে) নিম্নতম স্তর হইতে জীবন

---

(১২) শবার্ড অ্যান্ড কোম্পানির লর্ড কেব্‌লের জীবন এই শিক্ষা দেয় যে দৃঢ় সঙ্কল্প ও যোগ্যতা দ্বারা নানা বাধাবিপত্তির মধ্যেও সাফল্য লাভ করা যায়। লর্ড কেব্‌ল ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু অল্প বয়সে কলিকাতায় আসেন এবং এখানেই যাহা কিছু শিক্ষালাভ করেন। ক্রমে

আরম্ভ করেন। লর্ড কেব্‌ল মাসিক একশত টাকা বেতনের শিক্ষানবিস ছিলেন। একজন ইংরাজের পক্ষে এই বেতন অতি সামান্য।

"যুবকরা গোড়া হইতে কার্য আরম্ভ করিবে এবং অধস্তন পদে কাজ করিবে, ইহাই ভাল ব্যবস্থা। পিট্‌সবার্গের বহু প্রধান ব্যবসায়ীকে কর্মজীবনের আরম্ভেই গুরুতর দায়িত্ব বহন করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে প্রথম অবস্থায় আফিসঘর ঝাঁট দিতে পর্যন্ত হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে আমাদের যুবকগণ ঐ ভাবে ব্যবসায় শিক্ষার সুযোগ পায় না। ঘটনাক্রমে যদি কোন দিন সকালবেলা ঝাড়ুদার অনুপস্থিত হয়, তবে যে যুবক ভবিষ্যৎ মালিক হইবার যোগ্যতা রাখে সে কখনও ঘর ঝাড়ু দিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। আমি ঐরূপ একজন ঝাড়ুদার ছিলাম।" অ্যানড্রু কার্নেগী, The Empire of Business.

"৪৫ বৎসর পূর্বে একজন নির্মলকান্তি, প্রিয়দর্শন ল্যাঙ্কাশায়ার যুবক এক মুদীর দোকানে কাজ করিত। তাহার দুইটি চোখ ভিন্ন বিশেষভাবে আকর্ষণের বস্তু আর কিছু ছিল না। যাহার এরূপ চোখ, সে কখন সাধারণ লোক হইতে পারে না। কোন শিল্পীই সেই চোখের বিচিত্র বর্ণ ধরিতে পারিত না। এই বালকই ভবিষ্যতে লর্ড লেভারহিউল্‌ম্‌ হইয়াছিলেন। বিশ বৎসর পূর্বে জনৈক বোল্‌টনবাসীর মুখে আমি এই বর্ণনা শুনি। সে উইলিয়াম লেভার ও তাঁহার পিতাকে চিনিত। বালক এখন একজন প্রধান ব্যবসায়ী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী।

"পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার কথা আমার মনে পড়িতেছে। যুবক লেভার অল্প-কালই শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তার পরই তিনি ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।" (লর্ড বার্কেনহেড, Contemporary Personalities, ২৭৭ পৃষ্ঠা।)

লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসায়ে দুইজন প্রধান অগ্রণী হেনরী বেসেমার এবং অ্যানড্রু কার্নেগী। বেসেমার ইস্পাত তৈরি প্রক্রিয়ায় যুগান্তর আনয়ন করেন। "তিনি ধাতুবিদ্যার কিছুই জানিতেন না, কিন্তু তাহাতে তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। এ বিষয়ে যাহা কিছু পাঠ্য পাইয়াছিলেন, সমস্তই তিনি পড়িয়াছিলেন। বহু-কোটিপতি এবং লোকহিতব্রতী অ্যানড্রু কার্নেগী টেলিগ্রাফের পিয়ন রূপে কাজ আরম্ভ করেন। তাঁহার জীবনেও এই একই দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এক কথায় তিনি সম্পূর্ণ স্বীয় চেষ্টায় শিক্ষালাভ করেন। কার্নেগী আবিষ্কারক কিংবা বৈজ্ঞানিক নহেন। কিন্তু একটা মহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে সময়োপযোগী করিয়া কিরূপে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হয়, সে বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। অ্যানড্রু কার্নেগী 'বেসেমার প্রক্রিয়াকে' গ্রহণ করিয়া আমেরিকায় তথা জগতের শিল্পে যুগান্তর আনয়ন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে

ক্রমে তিনি নিজের যোগ্যতা বলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে সর্বোচ্চতম স্থান অধিকার করেন এবং বহু ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেন। একসময়ে বেঙ্গল চেম্বার অব্‌ কমার্সের সভাপতির পদেও তিনি নির্বাচিত হইয়া-ছিলেন"—স্টেট্‌স্‌ম্যান, ৩১শে মার্চ, ১৯২৭। লর্ড কেব্‌ল মাসিক একশত টাকা বেতনে শিক্ষা-নবিসরূপে কাজ আরম্ভ করেন।

হইলে, অথবা শিল্পপ্রবর্তক হইতে হইলে, বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের জ্ঞান তেমন প্রয়োজনীয় নহে, সেজন্য চাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করিবার শক্তি, উৎসাহ ও প্রেরণা। ডাঃ হ্যান্‌কিন যথার্থই বলিয়াছেন :—

"ব্যবসায়ীর নিকট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অকেজো বলিয়াই মনে হয়। ব্যবসায়ীর মতে সহজ বুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞানই আসল জিনিস, ইহার দ্বারাই অর্থোপার্জন করা যায়। বিশেষজ্ঞের মধ্যে ইহার একান্ত অভাব।

"জনৈক বিশেষজ্ঞ কোন ব্যবসায়ীর জ্ঞানের সুযোগ লইয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে অধিকতর সাফল্য লাভ করেন। ব্যবসায়ীটি এজন্য দুঃখ করিয়া বলেন,—'আমি ভাবিয়াছিলাম, সে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক।'

"পরলোকগত আমেরিকান ব্যাঙ্কার মরগ্যান একবার বলিয়াছিলেন, 'আমি ২৫০ ডলার দিয়া যে কোন বিশেষজ্ঞকে ভাড়া করিতে পারি, এবং তাহার প্রদত্ত তথ্যের দ্বারা আরও ২৫০ হাজার ডলার উপার্জন করিতে পারি। কিন্তু সে আমাকে ঐভাবে কাজে খাটাইতে পারে না।' একজন সাধারণ বিশেষজ্ঞের ব্যবসায়ক্ষেত্রে উপযোগিতা কতটুকু, তাহা এই কয়টি কথার দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে।"

আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মিঃ বাটার কর্মজীবন

"মোরেভিয়ার জিলিন শহরনিবাসী মিঃ টমাস বাটা দশ বৎসরে এক কোটি পাউণ্ড উপার্জন করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। ইনি জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পাদুকা ব্যবসায়ী। কিছুদিন পূর্বে বিমানযোগে ইনি কলিকাতায় আসিয়াছেন।

"ব্যবসায়ক্ষেত্রে মিঃ বাটার সাফল্যের কাহিনী উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক। তিনি একজন গ্রাম্য মুচির ছেলে, বাল্যকালে লোকের বাড়ী জুতা বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। বর্তমানে ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জুতার কারখানার অধিকারী। তাঁহার কারখানায় প্রত্যহ ১ লক্ষ ৬০ হাজার জোড়া জুতা তৈরি হয় এবং ১৭ হাজার লোক কাজ করে।" (দৈনিক সংবাদপত্র,, ৮ই জানুআরি, ১৯৩২)

আমি বহুবার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতেন, তাহা হইলে বাংলাদেশের পক্ষে দুর্ভাগ্য হইত। যদি তিনি বি. ই. ডিগ্রীধারী হইতেন, তবে তাঁহার কর্মজীবন ব্যর্থ হইত।(১৩)

বাংলার কথা বলিতে গেলে, দেখিতে পাই,—"সরকারী লবণগোলার ভূতপূর্ব

---

(১৩) "সরকারী কাজ পাইবার সম্ভাবনাই ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষার প্রধান আকর্ষণ। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দশজন ছাত্রের মধ্যে গড়ে ৮ জন মাত্র সরকারী কাজ পায় এবং কেবলমাত্র একজন বে-সরকারী কাজে নিযুক্ত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হিটন বলেন যে, বাংলায় শিল্পের উন্নতি যে কত কম হইতেছে, এই ঘটনাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।" **T. G. Cumming: Technical and Industrial Instruction in Bengal, 1888—1980 part I, p. 12.**

দেওয়ান বিশ্বনাথ মতিলাল মাসিক আট টাকা বেতনে প্রথম জীবনে কার্য আরম্ভ করেন এবং দেওয়ানী কার্য হইতে অবসর লইবার পূর্বে তিনি ১০।১২ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। প্রসিদ্ধ ধনী আশুতোষ দেবের পিতা একজন দেশীয় মালিকের অধীনে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে কর্ম করিতেন। তৎপরে তিনি ফেয়ারলি, ফার্গুসন অ্যান্ড কোম্পানির ফার্মে কেরানীর কাজ পান। আমেরিকান জাহাজ ব্যবসায়ীদের অধীনেও তিনি কার্য করেন। শেষোক্ত ব্যবসায়ীরা তাঁহার নামে তাঁহাদের একখানি জাহাজের নাম 'রামদুলাল দেব' রাখিয়াছিলেন। এই দুই বিদেশীয় ফার্মের অধীনে কার্য করিয়া তিনি প্রভূত ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেন। কলিকাতার রথচাইল্ড, টাকার বাজারের সর্বেসর্বা মতিলাল শীল প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে মাসিক দশ টাকা বেতনে কর্ম আরম্ভ করেন।" (ইন্ডিয়ান মিরর, ১৪ই অগস্ট, ১৯১০)

পরলোকগত শ্যামচরণ বল্লভ তাঁহার সময়ে একজন প্রধান পাটব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করেন। প্রচলিত মত অনুসারে তিনি "শিক্ষিত" ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার ব্যবসায়বুদ্ধি ও কর্মপটুতা উচ্চশ্রেণীর ছিল।

শ্রীযুত ঘনশ্যামদাস বিড়লার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নাই। যদি তাঁহাকে তরুণ বয়সে বই মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাস করিতে হইত, তবে তাঁহার একটুও ব্যবসায়বুদ্ধি বা কর্মপ্রেরণা হইত না। শিল্প-বাণিজ্য, মুদ্রানীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে।

বোম্বাইয়ের 'টাটা কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কসের' মিঃ এস. পি. ব্যানার্জি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে আফিসে নিম্নতম কেরানী রূপে কাজ আরম্ভ করেন। তিনি ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষাও পাস করেন নাই, কিন্তু তিনি আশ্চর্য কর্মশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ফার্ম সাধারণ ইমারতাদি তৈয়ারির বড় বড় কন্‌ট্রাক্টই যে গ্রহণ করে, তাহা নহে, রেলরাস্তা প্রভৃতি নির্মাণের কন্‌ট্রাক্টও লয়। অপর পক্ষে, যাহারা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহারা কেবল চাকরি খুঁজিয়া বেড়ায়।

শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার। ব্যবসায়ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তিনি মাত্র ম্যাট্রিকুলেশান পাস। কিছুকাল হইল বিবিধ অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা ও পুস্তিকাদি সুচিন্তিত তথ্যে পূর্ণ।

আমি যখন এই কয় ছত্র লিখিতেছিলাম, তখন ঘটনাচক্রে সংবাদপত্রে মিঃ মরিসের একটি বিবৃতির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। মিঃ মরিসকে "ইংলণ্ডের ফোর্ড" বলা হয়। মরিস বলিয়াছেন—"ব্যবসায়ের দিক দিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সময়ের অপব্যয় মাত্র। দু একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ আমার ব্যবসায়ে দেখিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কোন কাজে লাগে না। বাণিজ্যক্ষেত্রে যে সব গুণের প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয় তাহা দিতে পারে না, বরং ঐরূপ কোন গুণ থাকিলে তাহা নষ্ট করে। আণ্ডারগ্রাজুয়েটদের ধারণা জন্মে যে জীবন অতি সহজ ব্যাপার, তাহারা খেলাধুলা, আমোদপ্রমোদের প্রতিই বেশী মনোযোগ দেয়।"

গত ৪০ বৎসর ধরিয়া আমি বাংলার কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছি। এই সব ক্ষেত্রে-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকদের অযোগ্যতা দেখিয়া আমি মনে গভীর আঘাত পাইয়াছি।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও নারীদের যদি একটা হিসাব লওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নাই, অথবা কোনরূপ শিক্ষাই তাঁহারা লাভ করেন নাই।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অ্যানড্রু কার্নেগী, হেনরী ফোর্ড, টমাস এডিসন, লর্ড কেব্‌ল, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, টমাস লিপ্‌টন প্রভৃতির মত লোক যদিও কলেজে শিক্ষিত হন নাই, তবুও তাঁহাদের 'কালচার' বা সংস্কৃতির অভাব ছিল না। কঠোর জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া যখন তাঁহারা ভবিষ্যৎ সাফল্যের গোড়া পত্তন করিতে-ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে স্বীয় চেষ্টায় জ্ঞান উপার্জনের সুযোগও তাঁহারা ত্যাগ করেন নাই।

যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী এবং রাষ্ট্রনীতিবিৎরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অথচ সমাজের নিম্নস্তরে যাঁহাদের জন্ম অথবা সামান্য শ্রমিকরূপে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, এরূপ বহু লোকের দৃষ্টান্ত আমি প্রায়ই উল্লেখ করিয়া থাকি। এই সমস্ত লোক সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কৃতিত্বলাভ করেন।

আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইঁহারা ব্যবসায়-বুদ্ধির সহিত রাজনীতি-জ্ঞান অথবা বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সমন্বয় সাধন করিয়া-ছিলেন। গোসেন এবং লাবক (লর্ড আভেবেরী) ব্যাঙ্কার ছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোসেন ছিলেন রাজনীতিক এবং লাবক রাজনীতিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়ই ছিলেন। একই ব্যক্তির মধ্যে বহু গুণের এরূপ সমন্বয় দুর্লভ এবং রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়ও নহে। বর্তমান সমাজ শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি বরাবর বলিয়া আসিয়াছি যে, বাংলাব আর্থিক দুর্গতির একটা প্রধান কারণ এই যে, প্রত্যেক যুবক এবং তাহাব অভিভাবক মনে করে, যদি সে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা না পায়, তবে তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে।(১৪) যদি কেবলমাত্র সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী এবং বিদ্যানুরাগী ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানো হইত এবং অন্য ছেলেরা স্কুলের পড়া শেষ করিবার পরই ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে শিক্ষানবিসি আরম্ভ করিত, তবে বাংলার এই আর্থিক দুর্গতি নিবারণ করা যাইতে পারিত।

"যাহাদের প্রতিভা আছে, রাষ্ট্র কেবল তাহাদের জন্যই শিক্ষার ব্যয় বহন করিয়া থাকে। যাহাদের সে যোগ্যতা নাই, তাহাদের জন্য অন্য নানা পথ আছে।

"গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালিত বিদ্যালয় সকলের জন্যই; একই আধারে মণিমাণিক্য ও জঞ্জাল উভয়ই এক সঙ্গে থাকিতে পারে। কিন্তু আমি এই

---

(১৪) সা-আদত কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাদের কলেজ ম্যাগাজিনে "নতুবা আমার জীবন ব্যর্থ হইবে" এই শীর্ষক একটি নিবন্ধে বিষয়টি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

নীতির বিরুদ্ধবাদী। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মনে করিত স্কুল তাহাদেরই জন্য। সুতরাং ইহার প্রতি তাহাদের কোন সম্মানবোধ ছিল না। তাহারা বিদ্যালয়ের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব প্রশ্রয়ই চাহিত। উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি কোন উপাধিলাভ অথবা যে কোন প্রকারে উচ্চশ্রেণীতে প্রমোশন।"—মুসোলিনী, আত্মচরিত।

(৪) শ্রমের প্রতি অবজ্ঞা—জাতীয় সঙ্কটের লক্ষণ

স্যার এডওয়ার্ড ক্লার্ক সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"কিংস কলেজ, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস এবং সমস্ত দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এমন বহু ছাত্র আছে, যাহারা জীবিকার জন্য দৈনন্দিন কার্য করিবার পর, অতিরিক্ত সময়ে পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করে।" এই শ্রেণীর ছাত্র হইতেই শ্রমিক মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন এই সব ব্রিটিশ যুবকদের প্রতি জাতি নির্ভর করিতে পারে। বস্তুতঃ, কোন উদ্দেশ্য লইয়া অধ্যয়ন করাতেই ফল হয়।

যাহারা এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া পড়াশুনা করে, তাহারা সেই সব ছাত্রদের চেয়ে বেশী যোগ্যতা প্রদর্শন করিবে, যাহারা কেবলমাত্র অভিভাবকদের তাড়নায় পড়িতে বাধ্য হয়; সেরূপ ছাত্রদের প্রকৃতপক্ষে নিজেদের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যই নাই।

বিদ্যালয়ে সাফল্যের উপর বাহিরের কাজের প্রভাব

যাহারা জীবিকার জন্য নিজে উপার্জন করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই বিদ্যালয়ে বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। কেবল মাত্র কাজ করিলেই সফলতা লাভ করা যায় না। তাহার উদ্দেশ্য থাকা চাই। The Vocational Guidance Magazine-এ ফ্রান্সিস টি ম্যাকেব (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে এই তথ্য অবগত হওয়া যায়। রিঞ্জ টেক্‌নিক্যাল স্কুলে (কেম্‌ব্রিজ, মাসাচুসেট্‌স) এ সম্বন্ধে একটি পরীক্ষা করা হয়। ঐ বিদ্যালয়ে ১৩ বৎসর হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক প্রায় এক হাজার ছাত্র আছে।

"৭৫৮ জন ছাত্র লইয়া এই পরীক্ষা করা হয়, ঐ সমস্ত ছাত্রের প্রকৃতি অথবা যোগ্যতা পূর্ব হইতে জানা ছিল না। বিদ্যালয়ের পরে কে কি করে প্রত্যেক ছাত্রকে তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়; এই ভাবে ছাত্রদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—যাহারা বিদ্যালয়ের পরে কাজ করে এবং যাহারা সেরূপ কোন কাজ করে না।

"ইহার সঙ্গে বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর মিলাইয়া দেখা গেল, যাহারা জীবিকার জন্য কাজ করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই বেশী দায়িত্বজ্ঞান লইয়া পড়াশোনা ও পরিশ্রম করে।

* * *

"উপরোক্ত দুই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে, যাহারা কাজ করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায়।

"যাহারা কাজ করে না অথবা সাময়িক ভাবে কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্য কাজ

করে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা নিয়মিত ভাবে কাজ করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই বিদ্যালয়ে বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

"যাহারা কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সব ছাত্র প্রায়ই দেখা যায়। আমেরিকার প্রত্যেক স্টেটে কৃষি এবং শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য সরকারী বিদ্যালয় (Land-Grant Colleges) আছে। স্টেট এবং যুক্তরাষ্ট্রের তহবিল হইতে এই সব বিদ্যালয়ে সাহায্য করা হইয়া থাকে। এরূপ ৪৮টি কলেজ লইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাত্রদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক এবং ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ জীবিকার জন্য কার্য করে।

"এই সব কলেজে প্রায় ১৩ হাজার ছাত্র এবং ৩ হাজার ছাত্রী কলেজে থাকিবার সময় স্বোপার্জিত অর্থে ব্যয় নির্বাহ করে। সাধারণতঃ আণ্ডার-গ্রাজুয়েটরা আংশিক সময়ে কাজ করিয়া এক এক 'টার্মে' ৩০ পাউণ্ড হইতে ৭০ পাউণ্ড এবং গ্রীষ্মাবকাশে ৪০ পাউণ্ড হইতে ৫০ পাউণ্ড পর্যন্ত উপার্জন করে।"

ট্রিবিউন পত্রিকার চীনস্থিত একজন সাংবাদিকের কথাপ্রসঙ্গে ক্যারূপ নিলসেন বলিয়াছেন—"অন্য অনেক আমেরিকান সাংবাদিকের ন্যায় তিনি জীবনে নানা কাজ করিয়াছেন, তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইয়া সংবাদপত্রসেবী হইয়াছেন। এক সময়ে তিনি রেলওয়ে লাইনে শ্রমিকের কাজও করিয়া ছিলেন।"— The Dragon Awakes p. 77.

ইহার দ্বারা বুঝা যায় না যে, আমেরিকার প্রত্যেক কলেজের ছাত্র স্বাবলম্বী এবং পরিশ্রমী। বহু বৎসর পূর্বে, এমার্সন শহরের পুত্তলিকাবৎ অকর্মণ্য ছাত্র (ইহারা অনেকটা আমাদেরই শহরবাসী ছাত্রদের মত) এবং দৃঢ়-প্রকৃতি স্বাবলম্বী যুবকের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন :—

"আমাদের যুবকরা যদি প্রথম চেষ্টাতেই ব্যর্থ হয়, তবে তাহারা ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়ে। যদি কোন নবীন ব্যবসায়ী সাফল্য লাভ করিতে না পারে, লোকে বলে যে সে একেবারে ধ্বংসের মুখে গিয়াছে। যদি কোন বুদ্ধিমান ছাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়া এক বৎসরের মধ্যে বোস্টন বা নিউইয়র্কে কোন আফিসে কাজ না পায় তবে সে এবং তাহার বন্ধুগণ মনে করে তাহার নিরাশ হইবার ও সারাজীবন বিলাপ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পক্ষান্তরে, নিউ হাম্পাশায়ার বা ভারমণ্ট হইতে আগত দৃঢ়প্রকৃতি যুবক একে একে সমস্ত কাজে হস্ত দেয়, সে ফার্মে শ্রমিকের কাজ করে, ফেরী করে, স্কুলে পড়ায়, বক্তৃতা করে, সংবাদপত্র সম্পাদন করে, কংগ্রেসে যায়, নাগরিকের অধিকার ক্রয় করে। বৎসরের পর বৎসর এইরূপ বিভিন্ন কাজ করিয়াও তাহার চিত্তের স্থৈর্য নষ্ট হয় না। সে একাই, শহরবাসী এক শত অকর্মণ্য পুত্তলিকার সমকক্ষ, সে জীবনের পথে বুক ফুলাইয়া চলে, কোন উচ্চতর বৃত্তি শিক্ষা করে নাই বলিয়া লজ্জা বোধ করে না,—কেননা সে কখনও তাহার জীবনের গতি বন্ধ করে নাই, সর্বদাই সে জীবন্ত। তাহার জীবনে মাত্র একবার সুযোগ আসে না, শত শত সুযোগ তাহার সম্মুখে বর্তমান।"

মিস্টার সি. জে. স্মিথ গত ৪০ বৎসর ধরিয়া অনেক বড় বড় কাজ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি (১৯৩১) ৬৯ বৎসর বয়সে 'ক্যানাডিয়ান ন্যাশন্যাল রেলওয়ের' ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সারগর্ভ অভিমত পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

"কানাডাতে গ্রীষ্মের ছুটির সময় বালকদিগকে, ভবিষ্যতে যে বৃত্তি সে অবলম্বন করিবে, তাহা হাতেকলমে শিক্ষা করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। আমার মতে এই রীতি ভাল। ইহার ফলে সে সব দিক হইতে বিষয়টি শিখিতে পারে।

"আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন গল্‌ফ বা বিলিয়ার্ড খেলা ছিল না। এবং ৩০ বৎসর বয়সে আমি যখন 'সভ্যতার' সংস্পর্শে আসিলাম, তখন আমি পুল বা গল্‌ফ খেলা জানিতাম না।"

যাঁহারা সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় চেষ্টায় জীবনের নানা বিভাগে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, এরূপ বহু ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে আমি দিয়াছি। চারজন প্রসিদ্ধ জননায়কের প্রথম জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া আমি এই অধ্যায় শেষ করিব।

মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড এইভাবে তাঁহার প্রথম জীবনের বর্ণনা করিয়াছেন (২৬শে নভেম্বর, ১৯৩১ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা) :—"অতীত জীবনের ঘটনা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে লসিমাউথের জনৈক বৃদ্ধা ধীবররমণী আমাকে দেখিয়া তাহার সরল সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিয়াছিল—'জিমি, পৃথিবীতে এমনই আশ্চর্য ঘটনা ঘটে!"

"জীবনের সহজ সুগম সদর রাস্তা দিয়া না গিয়া যদি দুর্গম কর্দমাক্ত সংকীর্ণ পথে চলা যায়, তবে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি, ত্যাগ ও আনন্দ, সব অবস্থারই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়।"

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার বাল্যস্মৃতি হইতে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করেন। "শীতের প্রভাত, তুষারপাত হইতেছে। অন্ধকার থাকিতে আমরা উঠিয়াছি এবং তুষারাবৃত পথে প্রায় এক মাইল পদব্রজে গিয়াছি। আমরা একটি আলুর ক্ষেতে গেলাম। সেখানে যন্ত্রযোগে মাটির নিচ হইতে আলু তোলা হইতেছে, আমি একটি ঝুড়িতে আলু সংগ্রহ করিতেছি। দুই হাত তুষার-হিম হইয়া গিয়াছে, চোখের জল রোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সকলের উপরে যে সর্দার সে আমার কাছে আসিল, আমার তুষার-হিম কর্ণমূলে চপেটাঘাত করিল। সেই কথা স্মরণ করিতেই এখনও যেন আমি শরীরে বেদনা বোধ করি। অনেক সময় পার্লামেণ্টে গবর্নমেণ্টের পক্ষীয় সম্মুখের আসনে বসিয়া ঐ অতীত কাহিনী এখনও আমার মনে ভাসিয়া আসে।"

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার বাল্যস্মৃতিতে একজন সেকেলে লোকের কথা বলিয়াছেন। তিনি লসিমাউথের রাস্তায় ঠেলাগাড়ীতে ফেরি করিয়া বেড়াইতেন। "তাঁহার গাড়ীর সম্মুখে এক খণ্ড ট্যাসিটাসের বই থাকিত। তিনি লাটিন ও গ্রীক বই পড়িতেন আর সঙ্গে সঙ্গে জিনিসের নাম হাঁকিতেন। একদিন তিনি আমার

হাতে একখানি বই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি এ সব পড়িতে ভালবাস?' এবং আমার হাতে একখানি হেরোডোটাসের ইতিহাস দিলেন। পরে কয়েকমাস যাবৎ তিনি আমাকে আরও কতকগুলি বই দিয়াছিলেন।"

আর একজন শ্রমিক নেতা জর্জ ল্যান্সবেরী সম্প্রতি (ডিসেম্বর, ১৯৩১) তাঁহার বাল্যজীবনের কথা এবং কিভাবে তাঁহাকে কঠোর জীবনসংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ঘটনা (রাজনৈতিক ব্যাপার ব্যতীত) ১৮৮৪—৮৫ সালে ঘটে। সেই সময়ে আমি স্ত্রী, ৪ বৎসরের কমবয়স্ক তিনটি শিশু এবং ১১ বৎসরের কমবয়স্ক একটি ছোট ভাইকে সঙ্গে লইয়া দেশ ছাড়িয়া অস্ট্রেলিয়াতে যাত্রা করি।

"অবশেষে একটা পাথর ভাঙ্গার কাজ আমি পাইলাম; একরকম নীল রঙের গ্র্যানাইট পাথর—উহাতে যখন হাতুড়ি পিটাইতাম, তখন মনে হইত আমার হাতের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও বুঝি ভাঙিয়া পড়িতেছে।

*　　　　*　　　　*

"পরে পার্সেল বিলি করিবার জন্য পিয়নের কাজ পাইলাম। তারপর যত দিন আমি অস্ট্রেলিয়ায় ছিলাম, ঐ কাজই করিতাম, আমার বেতন ছিল সপ্তাহে পাঁচ শিলিং, ব্রিসবেন হইতে পাঁচমাইল দূরে টুঅং নামক স্থানে থাকিবার জন্য একটি বাড়ীও পাইলাম।

প্রবল বর্ষার ধারা

"আমার প্রথম রাত্রির কাজ, খুব উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছিল। পার্সেলের গাড়ী খোলা ছিল এবং প্রবল বেগে বর্ষা আসিল। আমাকে বিভিন্ন বাড়ীতে ২০০টি পার্সেল বিলি করিতে হইবে, অথচ আমি একটি বাড়ীরও ঠিকানা জানি না। আমি সন্ধ্যা ৬টার সময় রওনা হইলাম এবং ভোর ৪টার সময় শেষ পার্সেল বিলি করিয়া ফিরিলাম। সকলেই ভাবিয়াছিল, আমি নূতন লোক, সুতরাং এ কাজ করিতে পারিব না। কিন্তু এই ভাবে কাজ সুসম্পন্ন করাতে কার্যে আমার বেশ সুনাম হইল এবং আমি ছয় মাস সেখানে কাজ করিলাম।

"কাজের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার নাই। তবে পরিশ্রম একটু বেশী হইত। প্রায়ই সকালবেলা ৮টা হইতে পরদিন বেলা ১২টা কি ১টা পর্যন্ত কাজ করিতে হইত।"

মুসোলিনীর জীবনীতে আমরা পড়ি :—

"রাজমিস্ত্রীর মজুরের কাজে তিনি দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সুইজার-ল্যাণ্ডে বেশী শীত পড়াতে বাড়ী তৈরির কাজ বন্ধ হইয়া যায়। মুসোলিনী সেই অবসর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সান্ধ্য বিদ্যালয়ে পড়িতে লাগিলেন। সুইজার-ল্যাণ্ডের ন্যায় স্কটল্যাণ্ডেও বাড়ী তৈরির কাজে নিযুক্ত যুবকদের শীতকালে কোন

কাজ থাকে না। সেই সময়ে তাহারা মুসোলিনীর মতই স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। আমি যখন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম তখন এইরূপ ছাত্রকে সেখানে দেখি। কিন্তু মুসোলিনী আমার স্বদেশবাসীর চেয়ে অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, কেননা তিনি শ্রমের কাজ একেবারে ত্যাগ করেন নাই, তিনি কখনও কখনও দোকানদারদের দারোয়ান বা সংবাদবাহকরূপে কাজ করিতেন। তাহাদের মালপত্র ক্রেতাদের বাড়ীতে ঘাড়ে করিয়া বা বাক্সে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেন। জিনিস বেশী ভারী হইলে কিংবা ক্রেতাদের বাড়ী একটু দূরে হইলে ঠেলাগাড়ীতেও লইয়া যাইতেন। এইভাবে যাহা উপার্জন করিতেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যালয়ের বেতন এবং ছাত্রাবাসের ব্যয় নির্বাহ হইত।" Robertson, Mussolini, pp. 49-50.

ম্যাসারিক সম্বন্ধে তাহার জীবনীকার মিঃ স্ট্রীট লিখিয়াছেন—

"এই সময়ে (১৮৬৮—৬৯) তাঁহার বাল্যজীবনে তাঁহাকে নিজের এবং তাঁহার এক ভ্রাতার ভরণপোষণের জন্য অর্থোপার্জন করিতে হইত, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে পড়াশুনাও করিতে হইত। তাঁহার মাতা মাঝে মাঝে তাঁহাকে হয়ত কয়েক ফ্লোরিন (মুদ্রা) পাঠাইতেন। কিন্তু অন্যের নিকট হইতে তাঁহার আর কোন সাহায্যপ্রাপ্তির আশা ছিল না। তাঁহাকে নিজের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইত।

"তিনি প্রথমতঃ নোভা ইউলিসের একজন মুচির বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন তাঁহারই মত দরিদ্র ছাত্র থাকিত। তাহাদের থাকা, খাওয়া, জলখাবার এবং কাপড় কাচার জন্য প্রত্যেক ছাত্র মাসে তিন শিলিং করিয়া দিত। মুচির বাড়ীতে কিরূপ অবস্থায় বাস করিতে হইত, তাহা অনুমানেই বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু ম্যাসারিক ও অন্যান্য বালকেরা উহারই মধ্যে সানন্দে কালযাপন করিতেন।"

আর একটি দৃষ্টান্ত লর্ড রিডিংয়ের জীবন। তিনি প্রথমবার জাহাজের ছোকরা বা 'ক্যাবিন-বয়' রূপে কলিকাতায় আসেন, দ্বিতীয়বার আসিয়াছিলেন ভারতের বড়লাটরূপে।

ইউরোপ ও আমেরিকাতে শ্রমের মর্যাদা এইরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের জিনিস, কিন্তু ভারতে তাহার বিপরীত ভাব। বিশেষতঃ যে সব বালক ও যুবক স্কুল-কলেজে পড়ে, তাহারা শ্রমকে হেয় জ্ঞান করে। ভূতপূর্ব স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর মৌলবী আবদুল করিম এ সম্পর্কে ব্যথিত চিত্তে লিখিয়াছেন :—

"মফঃস্বল ভ্রমণের সময় বাখরগঞ্জ জেলার একটি স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া আমি দেখি অর্থ ও ছাত্রাভাবে ঐ স্কুলটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম। আমি স্থানীয় মাতব্বর লোকদের অনুরোধ করিলাম তাঁহারা যেন আমার সঙ্গে আমার নৌকায় গিয়া দেখা করেন। তাঁহারা গেলে, আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম যে স্কুলটি রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে এবং ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করিয়া দিতে হইবে। এই সময়ে আমি শুনিলাম একজন নিম্নস্বরে বলিতেছেন, স্কুলটি উঠিয়া গেলে তিনি হরিলুট দিবেন। ভদ্রলোকেরা চলিয়া গেলে, আমি স্থানীয় পুলিসের দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা স্কুলের উপর এমন বিরক্ত

কেন? দারোগা যাহা বলিলেন, তাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম, গ্রামের লোকদের স্কুলের উপর বিরক্ত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। স্থানটিতে অনেক ছোট ছোট দোকানদারের বাস। তাহারা চায়, তাহাদের ছেলেরা দোকানের জিনিস বিক্রয় ও হিসাবপত্র রাখার কাজে সাহায্য করুক। কিন্তু যেই ছেলেরা স্কুলে ভর্তি হয়, অমনি তাহাদের 'চাল' বাড়িয়া যায় এবং এই ভাব দেখায় যে লেখাপড়া জানা লোকের পক্ষে দোকানদারি ছোট কাজ। এই ঘটনা হইতে এবং পরে আরও অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, গ্রামে স্কুল থাকায় অনেক স্থলে কৃষকদের পক্ষে বিরক্তি ও অসুবিধার কারণ হইয়াছে। 'গুরুর' অনুরোধে ও বালকদের আগ্রহে অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৃষকরা ছেলেদের স্কুলে পাঠাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু স্কুলে ঢুকিয়াই ছেলেরা সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির হইয়া যায়। তাহাদের ধরনধারণ, অভ্যাস, রুচি সব বদলাইয়া যায়, এমন কি অনেক সময় নাম পর্যন্ত বদলাইয়া ফেলে।

* * *

"তাহাদের পিতামাতা কেবল যে তাহাদের নিকট হইতে গরু চরানো, চাষের কাজ ইত্যাদির সাহায্য হইতেই বঞ্চিত হয়, তাহা নহে, তাহাদের জন্য ভাল কাপড়চোপড়, ছাতা, বহি, খাতাপত্র ইত্যাদি যোগাইতে বাধ্য হয়। এই সব ব্যয় করা অনেক সময় তাহার সাধ্যাতীত। ফলে ছেলে পরিবারের বোঝা এবং সমাজের অভিশাপস্বরূপ হয়। কেননা সে দলাদলি সৃষ্টি করে, মামলা-মোকদ্দমা পাকাইয়া তোলে, এমন কি অনেক সময় জালজুয়াচুরিও শিখায়।" (Some Political, Economical & Educational Questions pp. 5-6)। এরূপ অবস্থা প্রত্যেক দেশহিতকামী ব্যক্তিকে হতাশ করিয়া তুলিবে। আমাদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, যে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ফলে গ্রামের উপর অবজ্ঞা জন্মে, সেগুলি দেশের পক্ষে কল্যাকর নহে, বরং জাতীয় উন্নতির ঘোর শত্রুস্বরূপ।

(৫) আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি—বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়াতে বিরাট শক্তির অপব্যয়

বাঙালী ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে বিরাট শক্তির অপব্যয় হয়, তাহার কথা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বালকের জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ৫।৬ বৎসর কাল একটি দুরূহ বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতেই ব্যয় করিতে হয়, কেননা ঐ ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাকে অন্যান্য বিষয় শিখিতে হইবে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এরূপ অস্বাভাবিক ও ঘোর অনিষ্টকর ব্যবস্থা নাই। মাতৃভাষাই সব সময়ে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। এই স্বতঃসিদ্ধ সহজ সত্য ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। একজন ইংরাজ বা স্কচ বালক ডিকেন্সের Child's History of England, স্কটের Tales of a Grand father, Gulliver's Travels অথবা Alice in Wonderland গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে। তাহার পিতামাতার নিকট হইতেও সে অনেক বিষয় শিখে। সে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, উত্তর মেরুর অভিযানের বিবরণ, কিলিমানজারো, আণ্ডিস

অথবা হিমালয় পর্বত শিখরে আরোহণের কাহিনী সাগ্রহে পড়ে, তাহার নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকে এ সব নাই, একথা তাহাকে বলিয়া দিতে হয় না। একজন ইংরাজ বালককে প্রথমে পারসী, চীনা, জার্মান অথবা রুশীয় ভাষা শিখিয়া, তাহার মধ্য দিয়া অন্যান্য বিষয় শিখিতে হইতেছে, এরূপ ব্যাপার কেহ কল্পনা করিতে পারেন কি? কাহারও নানা বিষয় জানাশোনা আছে, এরূপ বলিলে বোঝা যায় না, কোন্ ভাষার সাহায্যে সে ঐ সব বিষয় শিখিয়াছে। আমরা অন্ধ ভাবে একটা অনিষ্টকর ব্যবস্থা অনুসরণ করিতেছি, এবং ইহার ফলে আমাদের ছেলেদের যথার্থ শিক্ষা ও জ্ঞানলাভে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি হইতেছে।(১৫)

প্লেটো, হেগেল ও কাণ্ট, কনফিউসিয়াস্ ও মেনসিয়া, বাইবেল ও কোরান, রামায়ণ ও মহাভারত—এখনও প্রায়ই লোকে অনুবাদের সাহায্যে পড়ে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যতীত কেহ মূল ভাষায় গ্রন্থ পড়িবার জন্য গ্রীক, জার্মান, চীনা, হিব্রু, আরবী বা সংস্কৃত শিখে না। এমন কি হিন্দুরাও সাধারণতঃ রামায়ণ মহাভারত তুলসীদাস, কৃত্তিবাস ও কাশীরামের অনুবাদের মধ্য দিয়া পড়ে। কিন্তু ভারতে আমরা একটা কৃত্রিম অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি এবং তাহার জন্য শাস্তিভোগও করিতে হইতেছে।

ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, পাটীগণিত, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি বাংলা ভাষার মধ্য দিয়াই অনায়াসে শিখানো যাইতে পারে। ইংরাজীকে দ্বিতীয় ভাষার পর্যায়ে রাখা উচিত।

যাহারা পণ্ডিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা কেবল ইংরাজী নয়, জার্মান ও ফ্রেঞ্চও শিখিবে। তবে ইংরাজীকে কোন ক্রমেই শিক্ষার বাহন করা উচিত নয়। শিক্ষিত ব্যক্তিকে মোটামুটি সমস্ত বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং মাতৃভাষার সাহায্যেই সে সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই জ্ঞান লাভ করিতে পারে। জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সময়ে আমাদের ছেলেদের সময় ও শক্তির কিরূপ বিষম অপব্যয়

---

(১৫) বহির এই অংশ ছাপিতে দিবার সময় **Report of the Matriculation Regulations Committee (June, 1932)** আমার হাতে পড়ে। উহাতে দেখিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, ম্যাট্রিকুলেশনে ইংরাজী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয় মাতৃভাষার সাহায্যেই শিখাইতে হইবে, সুতরাং এই অধ্যায়ে আমাব বিবৃত যুক্তিগুলি মাত্র ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু আমি দেখিযা হতাশ হইলাম যে নূতন নিয়মাবলীতে, একদিক হইতে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, অন্যদিক হইতে তাহা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। দুরূহ বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিবার কঠোর পরিশ্রম ছেলেদের মস্তিষ্ক এখনও ভারাক্রান্ত করিতে থাকিবে। বস্তুতঃ ইংরাজীকে এত বেশী প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে যে তাহার জন্য তিনটি প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে। অথচ ইতিহাস ও ভূগোলের ন্যায় প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য মাত্র একটি করিয়া প্রশ্নপত্র থাকিবে। গণিতের জন্য একটি এবং মাতৃভাষার জন্য দুইটি করিয়া প্রশ্নপত্র থাকিবে। সুতরাং ইংরাজীর জন্য যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইবে, তাহার মাত্র ষষ্ঠ অংশ ইতিহাস বা ভূগোলের জন্য দেওয়া হইবে এবং অন্য সমস্ত বিষয়ের ক্ষতি করিয়া ইংরাজীর জন্যই ছেলেদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। তা ছাড়া, এইভাবে শিক্ষিত হইয়া ছাত্রেরা জীবন সংগ্রামে দাঁড়াইতে পারিবে না, কেননা সেজন্য প্রয়োজন সাধারণ ও সহজ জ্ঞান, কোন বিশেষ ভাষায় পারদর্শিতা নহে। মোটের উপর, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর যে সব দোষ ও ত্রুটি তাহা বরং কোন কোন দিকে বেশী হইবে। মিঃ মোনাহানের ভাষায় এই রিপোর্ট সাম্রাজ্যবাদের ভাবের দ্বারা অত্যধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছে।

হয়, তাহা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি হইতেই বুঝা যাইবে। ১৯৩০—৩১ সালে কতজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা এই তালিকায় দেওয়া হইয়াছে।

বিষয়	পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী	৬ষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণী
ইংরাজী	১১৯	১১২
গণিত	৩৬	২৯
দর্শন	৩৬	২৬
ইতিহাস	৫৫	৪৪
অর্থনীতি	১১৬	৯২
বাণিজ্য	২৩	২০
প্রাচীন ইতিহাস	১৪	১৭
নৃতত্ত্ব	৫	৬
পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যা	৪	৩
তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব	১	০
সংস্কৃত	১৯	২০
পালি	২	২
আরবী	৪	১
পারসী	৮	৩
ভারতীয় ভাষা	৭	১৮
মোট	৪৪৯	৩৯৩

ছাত্রেরা এবং তাহাদের অভিভাবকগণ পাঠ্য বিষয় নির্বাচনের জন্য যে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেন না, এই তালিকা হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। দেখা যাইতেছে, ইংরাজী ভাষার প্রতিই ছেলেদের বেশি আকর্ষণ। অথচ অবস্থা ইহার বিপরীত হওয়াই উচিত ছিল। কেননা একটা কঠিন বিদেশী ভাষার দুরূহ তত্ত্ব অধিগত করিতে যে সময় ও শক্তি ব্যয় হয়, তাহা অন্য দিকে প্রয়োগ করিলে বেশী লাভ হইত। পাঠ্য বিষয়ের গ্রন্থ-তালিকা দেখিলে চক্ষু স্থির হয়। গ্রন্থকারগণ এবং তাঁহাদের কৃত গ্রন্থ-তালিকা পড়িলে স্তম্ভিত হইতে হয়, উহা ক্যালেন্ডারের সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে। প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিশাল ইংরাজী সাহিত্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। ভিক্টোরিয়া যুগের পরবর্তী আধুনিক কালের এইচ. জি. ওয়েলস্, কনর‍্যাড, বার্নাড শ, আর্নল্ড, বেনেট, গল্স্ওয়ার্দি সকলেই ইহার মধ্যে আছেন।

আমি সম্পূর্ণরূপে স্বীকাব করি যে, এমন সব ভারতীয় ছাত্র থাকিবেন যাঁহারা সমস্ত জীবন ধরিয়া ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিবেন। ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতেও এমন অনেক ছাত্র আছেন যাঁহাবা সমস্ত জীবন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেছেন। ভাবতীয় শ্লেগেল বা টেইনের অভ্যুদয়ে আমি আনন্দিত

হইব। কিন্তু ইংরাজীতে এম. এ. উপাধি লাভের জন্য ২৩১ জন ছাত্র সময় ও শক্তি ব্যয় করিবে কেন? তাহাদের জ্ঞান পল্লব-গ্রাহিতার নামান্তর। সুতরাং একজন ইংরাজীর এম. এ. লোকের নিকট উপহাসের পাত্র হইবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। ঢাকা ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ওয়েস্ট, কৃষি কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময় বলিয়াছেন,—"একজন এম. এ.-র ইংরাজী পাঠের ক্ষমতা ১৫ বৎসরের ইংরাজ বালিকার সমান, একজন বি. এ.-র ১৪ বৎসরের ইংরাজ বালিকার এবং একজন ম্যাট্রিক পাশের ১০ বৎসরের ইংরাজ বালিকার সমান।"

মিঃ ওয়েস্ট অজ্ঞাতসারে কিছু অতিরঞ্জন করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু একজন সাধারণ গ্রাজুয়েটের সম্বন্ধে তাঁহার কথা মোটের উপর সত্য।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেকলে তাঁহার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রিপোর্টে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন সমর্থন করেন—প্রতীচ্যবাদী এবং প্রাচ্যবাদীদের মধ্যে যে তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল, মেকলের রিপোর্টে তাহার অবসান হয়।(১৬) মেকলেকে এজন্য নিন্দা করা হইয়া থাকে। বলা হইয়া থাকে যে, তিনি মাতৃভাষার দাবি উপেক্ষা করেন। ইহা ন্যায্য সমালোচনা বলিয়া বোধ হয় না। কেননা মেকলে নিজেই দূরদৃষ্টিবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া মাতৃভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করিবে।(১৭) তাঁহার

---

(১৬) বর্তমান সময়ে মেকলের রিপোর্টের যে অংশ আপত্তিজনক বলিয়া গণ্য হয়, তাহা এই—"প্রধান প্রশ্ন এই যে, কোন্ ভাষা শিক্ষা করা সর্বাপেক্ষা লাভজনক?.........প্রাচ্য বিদ্যার মূল্য সম্বন্ধে আমি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের মতই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। আমি এমন একজনও প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ দেখি নাই যিনি অস্বীকার করিতে পারেন যে, কোন ভাল ইউরোপীয় লাইব্রেরির এক আলমারি বই, ভারত ও আরবের সমস্ত দেশীয় সাহিত্যের সমতুল্য।......আমি মনে করি যে, এ দেশের অধিবাসীরা ইংরাজী শিখিবার জন্য ব্যগ্র, সংস্কৃত বা আরবী শিখিতে তাহারা ইচ্ছুক নহে।" —Minute by Macaulay, 2nd Feb., 1935.

"সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু শাস্ত্রের পক্ষপাতী হইবেন, এরূপ আশা করা যায়। কিন্তু তিনি রামমোহন, এমন কি মেকলে অপেক্ষাও তীব্র ভাষায় বেদান্তের নিন্দা করিয়াছেন। ১৮৫৩ সালে কাউন্সিল অব এডুকেশানের নিকট তিনি যে পত্র লিখেন তাহাতে আছে—"কতকগুলি কারণে আমরা এক্ষণে সাংখ্য ও বেদান্ত শিক্ষা দিতে বাধ্য হইতেছি। বেদান্ত ও সাংখ্য যে মিথ্যা দর্শনশাস্ত্র তাহাতে এখন আর সন্দেহ নাই।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর)

বস্তুতঃ, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর নিজেরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হইলেও, স্বজাতির মনকে প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারের মোহ হইতে মুক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এই শাস্ত্র-দাসত্ব হিন্দুর মনের উপর এতকাল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছিল। এই দুই মহাপুরুষের উদ্দেশ্য ছিল যে, কেবলমাত্র সংস্কৃত ও পারসী শাস্ত্র ও সাহিত্যের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, আমাদের সাহিত্য পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে। রামমোহন বেশ জানিতেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসীরা যদি জ্ঞান লাভ করিতে চায় তবে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিতে হইবে। এই কারণে তিনি একখানি বাংলা সংবাদপত্র (সংবাদকৌমুদী, ১৮২১) পরিচালনা করিতেন, এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে, একখানি বাংলা পুস্তিকা লিখিয়াই তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ সুপরিচিত গ্রন্থ মূল ইংরাজী হইতে অনুবাদ এবং উহার ভাষা বাংলা রচনার আদর্শ। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরকেই লোকে বাংলা গদ্যের জনক বলিয়া গণ্য করে।

(১৭) কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গ্রন্থকারগণকে পারিশ্রমিক দিয়া তাঁহাদের দ্বারা দেশীয় ভাষায় পুস্তক লিখাইতে হইবে। মেকলে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে। মেকলের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার ২০ বৎসরের মধ্যে, এমন কি তাহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,*অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং আরও অনেকে, বাংলা ভাষায় শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ সকল গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়াছিল। একথা ভুলিলে চলিবে না, মেকলের রিপোর্ট লিখিবার ২০ বৎসর পূর্বে (১৮১৬) কলিকাতায় হিন্দু প্রধানেরা নিজেদের অর্থসাহায্যে একটি কলেজ স্থাপন করেন। যুবকদিগকে ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টের নিকট তেজোব্যঞ্জক ভাষায় একখানি পত্র লিখেন। ঐ পত্রে তিনি দেশবাসীকে ইংরাজী সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সাগ্রহ অনুরোধ করেন,—উহার কতকগুলি লাইনের সঙ্গে মেকলের রিপোর্টের হুবহু মিল আছে। প্রথম ইংরাজী কবিতা লেখক বাঙালী কাশীপ্রসাদ ঘোষ, মেকলের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পাঁচ বৎসর পূর্বে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

প্রকৃত কথা এই যে আমাদের পূর্বপুরুষরাই ইংরাজী শিক্ষা লাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নবেম্বর ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশান হলে একটি জনসভা হয়। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহার একটি রিপোর্টে সরকারী কাজে "অশিক্ষিত" ভারতবাসীদের চেয়ে "শিক্ষিত" ভারতবাসীদিগকে অধিকতর সুযোগ দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার উদ্দেশ্যে এই সভা আহূত হইয়াছিল। প্রথমে ইংরাজী ভাষা শিখিয়া তাহার সাহায্যে জ্ঞান আহরণ না করিলে, কেহই "শিক্ষিত" বলিয়া গণ্য হইবেন না, এস্থলে ইহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই কারণে ইংরাজী শিক্ষার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হইল এবং স্কুল কলেজে একটা কৃত্রিম শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইল। ইহার ফলে প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, এমন কি মাইনর স্কুলগুলি পর্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। কেবলমাত্র ম্যাট্রিক স্কুলগুলিকেই লোক পছন্দ করে, ঐগুলিই সংখ্যায় বাড়িতেছে, কেন না ঐ স্কুলে পাস করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যায়।(১৮)

"৪।৫ জন বেতনভুক্ লোক দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা, কোন দেশে কোন কালে সফল হয় নাই, হইবেও না। ভাষা ক্রমে বিকাশ লাভ করে, উহা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা যায় না। আমরা এখন যে প্রণালী অবলম্বন করিতেছি, ধীরে ধীরে হইলেও তাহার ফল সুনিশ্চিত। এই উপায়েই ভারতের বিভিন্ন ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইবে। আমরা ভারতে এক বিশাল শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি আশা করি, বিশ বৎসর পরে, এমন শত সহস্র ভারতবাসীর আবির্ভাব হইবে, যাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং উৎকৃষ্ট রচনাশক্তির অধিকারী হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক পাওয়া যাইবে, যাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান স্বদেশীয় ভাষার সাহায্যে প্রচার করিতে সক্ষম হইবে। আমার বিশ্বাস, এ দেশের ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।" ট্রিভেলিয়ান—লর্ড মেকলের জীবনী ও পত্রাবলী, ৪১১ পৃঃ।

(১৮) "মাতৃভাষা-শিক্ষার প্রতি লোকের তীব্র বিরাগ পূর্ববৎই রহিল। ১৮৫২ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, প্রত্যেক জেলায় ইংরাজী শিক্ষার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভার্নাকুলার স্কুলগুলির জন্য যাহারা সামান্য অর্থসাহায্য করিতেও কাতর হইত, তাহারা ইংরাজী শিক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় অর্থদান করিত এবং ঐ উদ্দেশ্যে স্কুল স্থাপন করিত। একথা স্বীকার করিতে হইবে,—

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায়, ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ সালের মধ্যে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, কেন না ঐ ভাষাই তখন পাশ্চাত্য বিদ্যালাভের দ্বারস্বরূপ ছিল। কিন্তু তখনও প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়া সর্বপ্রকার বিষয় শিখিবার জন্য বাধ্য করা উচিত হয় নাই। উহা একটি মারাত্মক ভুল হইয়াছিল এবং উহার একমাত্র কারণ সরকারী চাকরি পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ১৮৬০ সালে জেকোস্লোভাকিয়াতে শিক্ষিত সমাজের মানসিক অবস্থা অনেকটা এইরূপ ছিল। "ম্যাসারিকও একটি প্রসিদ্ধ জার্মান রচনাভঙ্গী শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যে এত আগ্রহের সঙ্গে জার্মান ভাষা শিক্ষার দিকে মন দিয়াছিলেন, উহা কতকটা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে, কেন না, অন্য দিকে আবার 'জেক' জাতীয় ভাব তাঁহার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু, ইহার মধ্যে বস্তুতঃ বিরোধ কিছুই নাই। জেক ভাষা সাহিত্যের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইত না। কেবলমাত্র সাধারণ কথাবার্তায়, বিশেষতঃ দরিদ্র ও অশিক্ষিতদের মধ্যে এই ভাষার ব্যবস্থা ছিল। ম্যাসারিককে যদি শিক্ষিত সমাজের নিকট কোন কথা নিবেদন করিতে হইত, তবে জার্মান ভাষার আশ্রয় লইতে হইত,—সমগ্র বোহিমিয়া ও মোরেভিয়া দেশে এই জার্মান ভাষা প্রচলিত ছিল। অনেকেই তখন ভাবিতে পারেন নাই যে, উত্তর-কালে এই জার্মান ভাষা শিক্ষার ফলেই, 'জেক' জাতি তাহাদের মাতৃভাষাতেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সক্ষম হইয়াছিল।" (প্রেসিডেণ্ট ম্যাসারিক—জীবনচরিত)

মিঃ ওয়েস্ট তাঁহার **Bilingualism** গ্রন্থে (বিশেষভাবে বাংলাদেশ সম্বন্ধে) এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

"যে দেশের বিদ্যালয়ে দুইটি ভাষা শিখিতে হয় এবং যে দেশে মাত্র একটি ভাষা শিখিতে হয়, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। শেষোক্ত দেশে, যে অল্পসংখ্যক ছেলেমেয়ের ভাষা শিক্ষার প্রতিভা আছে, অথবা ঐশ্বর্য ও অবসর আছে, কেবল তাহারাই স্বেচ্ছায় কোন বিদেশী ভাষা শিখে; পক্ষান্তরে, প্রথমোক্ত দেশে (দ্বৈভাষিক দেশে) প্রত্যেক সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, এমন কি তার চেয়েও নিকৃষ্ট ছেলেমেয়েকে বাধ্য হইয়া একটি বিদেশী ভাষা শিখিতে হয়। যাহাদের ভাষা শিক্ষার প্রতিভা আছে, তাহাদিগকেও বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম ও শক্তি ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ততোধিক নিকৃষ্ট ছেলেমেয়েদের পক্ষে বিদেশী ভাষা শিক্ষার চেষ্টা কি সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে না? বুদ্ধিমান ছাত্রের সময় ও অবসর জুটে, কিন্তু সাধারণ ছাত্রের সে অবসর কোথায়? যদিই বা কোন সাধারণ ছাত্র বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অন্য সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিবার পর্যাপ্ত সময় সে পায় না। সুতরাং তাহাকে ভাষা শিক্ষা এবং জ্ঞান-লাভ এই দুইটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হয়। হয় তাহাকে ভাষায় দরিদ্র হইতে হইবে, অথবা তাহাকে সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে নিকৃষ্ট হইতে হইবে।

---

* প্রকৃত শিক্ষালাভ অপেক্ষা ছেলেরা ভাল চাকুরি পাইবে, অধিকাংশ স্থলে এই আশাতেই অভিভাবকেরা [illegible] শিক্ষার ব্যয় বহন করিয়া থাকেন। [illegible] স্কুলে এই লাভের আশা নাই।—[illegible] West : Education.

"ইংরাজী বলা, শোনা বা লেখা তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, কেবলমাত্র ইংরাজী পড়িতে পারাই তাহাদের পক্ষে দরকার। কেন না ইংরাজী পড়িতে শিখিলে, ঐ ভাষায় সঞ্চিত বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারে তাহারা প্রবেশ করিতে পারে।"

মিঃ এফ. জে. মোনাহান বাংলার দুইটি বিভাগে কমিশনারের কার্য করিয়াছেন। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং গভীর জ্ঞান আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন :

"আমার মনে হয়, যে সব ইংরাজ স্কুল কলেজে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন রাখিবার পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সাম্রাজ্যবাদের ভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইংরাজী ভাষাকে সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্যসূত্ররূপে তাঁহারা গণ্য করেন;—এই ভাষাই ভারতের সর্বত্র সাধারণ ভাষা হইয়া উঠিবে, এমন স্বপ্নও তাঁহারা দেখেন।

* * * "বহু দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, শিল্প বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে ইংরাজী ভাষার জ্ঞান অতি সামান্যই প্রয়োজন। এমন কি সেজন্য বেশী কিছু শিক্ষারই প্রয়োজন নাই। বড়বাজারের ক্রোড়পতি মাড়োয়ারী বণিক ইংরাজী শেখা প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কিন্তু তিনি ইংরাজীতে চিঠিপত্রাদি লিখিবার জন্য মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে একজন বি. এ. পাস বাঙালীকে নিযুক্ত করেন। ইংরাজী ভাষার সহিত ভাল সাধারণ শিক্ষা ভারতবাসীর পক্ষে জীবনের নানা ক্ষেত্রে সুবিধার বটে; কিন্তু যদি বহুসংখ্যক ভারতবাসীকে শিল্পবাণিজ্যে দক্ষ করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত প্রণালীই উৎকৃষ্ট হইবে। ছেলেরা যত শীঘ্র সম্ভব স্কুলে কাজচালানো গোছের কিছু ইংরাজী, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ক ও হিসাবপত্র রাখা শিখিবে, তারপর অল্প বয়সেই তাহাদিগকে কোন বাণিজ্য বা শিল্প ব্যবসায়ে শিক্ষানবিস করিয়া দিতে হইবে।

"আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে বহু বিচিত্র জাতি, ভাষা, সভ্যতা, আদর্শ, ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্র বিদ্যমান, সেখানে বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়া একই প্রণালীতে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা মহা ভ্রম। তার পর সর্ব শ্রেণীর সরকারী চাকরি এবং ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি ব্যবসায়ে প্রবেশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকেই একমাত্র উপায় রূপে নির্দিষ্ট করা আরো ভুল। মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর ভারতবাসীদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে, তাহার অনেকটা এই কারণ হইতেই উদ্ভূত বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার প্রস্তাব এই যে, সরকারী চাকরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকে আর একমাত্র যোগ্যতা রূপে গণ্য করা হইবে না, অবশ্য, যে সব কাজের জন্য টেকনিক্যাল বা বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন, সেগুলির কথা স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেও উদারতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যে কলেজ বা উচ্চশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দিবে, সেগুলিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল দেখিবেন যে, শিক্ষার আদর্শ ঠিক আছে কিনা। অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে মাতৃভাষাই উপযুক্ত শিক্ষার বাহন হইবে; কাহারও কাহারও পক্ষে অবশ্য ইংরাজী ভাষাও শিক্ষার বাহন হইতে পারে।"

১৯২৬ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি বিতরণের সময় আমি যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম তাহার কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ভারতে যে শিক্ষা প্রণালী বর্তমানে প্রচলিত, তাহা পরীক্ষা করিলে বলিতে হইবে, আমাদের সর্বপ্রথম অপরাধ বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের শিক্ষানীতির এই গুরুতর ভ্রম—যাহা আমাদের বুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছে—আমরা অতি অল্প দিন পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখনও পর্যন্ত, আমাদের কোন কোন সুপরিচিত শিক্ষাব্যবসায়ী মনে করেন যে ইংরাজী ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার শ্রেণীতে গণ্য করিলে, তাহার ফল ঘোর অনিষ্টকর হইবে। যাহাতে কাহারও মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা না হইতে পারে, সেজন্য পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন যে ইংরাজী বা অপর কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রতি আমি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি না; কেননা, ঐ সব ভাষা শিক্ষার ফলে জ্ঞানের নূতন দ্বার খুলিয়া যায়। শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রথমতঃ সব বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং মাতৃভাষার সাহায্যেই এই শিক্ষা যথাসম্ভব কম সময়ে উত্তমরূপে হইতে পারে। পাটীগণিত, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, তর্কশাস্ত্র এবং ভূগোল মাতৃভাষার সাহায্যেই সহজে শিক্ষা করা যাইতে পারে। উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।"

বাংলায় "দ্বৈভাষিক শিক্ষা" সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ জনৈক শিক্ষাব্যবসায়ী এবিষয়ে নিম্নলিখিত অভিমত আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন :—

বিদেশী ভাষা শিক্ষা পরে আরম্ভ করিতে হইবে

"আমার বিশ্বাস, বিদেশী ভাষা শিক্ষায় এদেশে এত অধিক শক্তি ও সময় ব্যয় হওয়ার কারণ এই যে ছেলেমেয়েরা অতি অল্প বয়সেই বিদেশী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করে। সাধারণের একটা ধারণা আছে যে, যত অল্প বয়সে বিদেশী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করা যায়, ঐ ভাষা তত বেশী আয়ত্ত হয়। আট বৎসর বয়সের নীচে একথা খাটিতে পারে, ছোট শিশু একজন বয়স্ক লোকের চেয়ে শীঘ্র বিদেশী ভাষা মুখে মুখে শিখিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু এই অল্প বয়সে এরূপ দ্বৈভাষিক শিক্ষার ব্যবস্থায় মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যেখানে ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে বিদেশী ভাষা শুনে না, অথবা যেখানে তাহারা ৮।৯ বৎসর বয়সে পাঠ্য বিষয় রূপে স্কুলে উহা পড়িতে আরম্ভ করে, সেখানে এই যুক্তি খাটে না। বিদেশী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিবার উপযুক্ত সময় ১২ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যে, কেননা ঐ বয়সে ছাত্রেরা প্রায় মাতৃভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলে, ব্যাকরণের মূল সূত্র জানিতে পারে এবং কোন বিষয় অধ্যয়ন করিবার উপযুক্ত মনের বিকাশ তাহাদের হয়। বিশেষতঃ, ১৪ বৎসর বয়স হইলে, বুঝিতে পারা যায়, ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাহাদের বিদেশী ভাষা শিক্ষার যোগ্যতা আছে, অথবা ঐ ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না।

"বর্তমানে আমরা অসংখ্য ছাত্রকে ইংরাজী শিখাইয়া থাকি,—উহাদের [illegible]

অনেকের পক্ষে ঐ ভাষা কোন প্রয়োজনেই লাগিবে না। অনেকের ঐ ভাষা আয়ত্ত করিবার মত মেধা নাই। ছাত্রসংখ্যাও এত বেশী যে, আমরা প্রয়োজনানুরূপ যোগ্য শিক্ষক পাই না। সুতরাং শিক্ষা ভাল হয় না। ক্লাসের ছাত্রসংখ্যার উপরে ভাষা-শিক্ষা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। ছেলেরা কথাবার্তার মধ্য দিয়াই ভাষা শিখে। যে ক্লাসে ৬০ জন ছাত্র আছে, সেখানে প্রত্যেক ছাত্র গড়ে এক মিনিটের বেশী কথা বলিতে পারে না; উহার মধ্যে শিক্ষক যদি আধ মিনিট কথা বলেন, তবে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ছাত্র গড়ে আধ মিনিট কথা বলিতে পারে। আমার বিবেচনায়, ২৫ জনের বেশী ছাত্র কোন ক্লাসে থাকিলে, বিদেশী ভাষায় কথাবার্তা বলার কোন ভাল ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহাও যদি শিক্ষকের দক্ষতা থাকে। সেইরূপ, লিখিতে অভ্যাস করিয়াই লেখা শিখে। কিন্তু ভুল সংশোধন ব্যতীত লেখার কোন মূল্য থাকে না। ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা যদি কম না হয় এবং ছাত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা যদি না থাকে, তাহা হইলে ছাত্রদের লেখা খাতা এত বেশী হয়, যে তাহা সংশোধন করিবার সময় শিক্ষকের থাকে না। বিশেষতঃ নিকৃষ্ট ছাত্রেরা এত বেশী ভুল লিখে যে, তাহা সংশোধন করিতেই শিক্ষকের অনেক বেশী সময় অপব্যয় হয়। আমার বিশ্বাস, এদেশে শিক্ষা-সংস্কারের একটা প্রথম ও প্রধান উপায় মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। যে সমস্ত ছাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, কেবল তাহাদিগকেই ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে শিখানো হইবে।”

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ কার্য

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমি সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব বিরুদ্ধেই প্রচার করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য মোটেই সেরূপ নয়। আমাদের যুবকদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের জন্য যে অস্বাভাবিক উন্মত্ততা দেখা যাইতেছে, তাহার বিরুদ্ধেই আমার অভিযোগ। আমি চাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের জন্য বাছাই করিয়া খুব অল্পসংখ্যক ছাত্র প্রেরিত হইবে। যাহার ভিতরে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রেরণা নাই তাহার কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও উচ্চতর সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ হইবে। যাহারা জ্ঞানান্বেষণের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, তাহারাই যেন কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়।

অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি তাঁহার Danger of Obedience গ্রন্থে বলেন :—

“অধ্যাপক তাঁহার বক্তৃতায় যদি কেবল পুঁথি পড়া বিদ্যা উদ্‌গিরণ করেন, তবে তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।

“যদি ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে অধীতব্য বিষয় লইয়া সাগ্রহে আলোচনা করিতে না শিখে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল। আর যদি শিক্ষার ফলে মহৎ গ্রন্থ সমূহ পড়িবার প্রবৃত্তি তাহাদের না জাগে তবে সে শিক্ষাও নিষ্ফল।

“ছাত্র যদি সংক্ষিপ্তসার পড়িয়াই সন্তুষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে সে বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের অন্দরমহলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিয়াছে; সে কেবল তথ্য গলাধঃকরণ করিয়াছে, কিন্তু হজম করিতে পারে নাই।

"মহৎ শিক্ষকের সংখ্যা মনুষ্যসমাজে বিরল।

"অধ্যাপকের বক্তৃতা, সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক প্রতি বৎসর একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এগুলি স্বভাবতঃই শিখিয়া ফেলে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অনেক সময় এই অভিযোগ করা হয় যে, আমাদের আশার স্থল তরুণ যুবকেরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পার হইয়া বাহিরে আসে তখন তাহারা নিজেদের জীবিকা অর্জন করিতে পারে না। এরূপ হওয়ার কারণ, এতকাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি এবং প্রতিযোগিতা সরকারী চাকরি ও ডাক্তারি, ওকালতি প্রভৃতি ব্যবসায়ে প্রবেশ লাভের উপায়স্বরূপ ছিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, এক্ষেত্রে চাহিদা অপেক্ষা যোগানো মালের সংখ্যা শতগুণ, সহস্রগুণ, বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। এ কথা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য উদার শিক্ষা দেওয়া, যাহার ফলে তাহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে এবং মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে। সাধারণ বিষয়ী লোকেরা এই সংকীর্ণতা অতিক্রম করিতে পারে না।

ন্যাস্কি বলিতেছেন ঃ—"আন্ডারগ্রাজুয়েটদিগকে সমস্ত তথ্যের আধার করিয়া তোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নয়। মানুষকে ইহা নানা কাজে বিশেষজ্ঞ করিয়া তুলিতেও পারে না। তথ্যসমূহ কিরূপে সত্যে পরিণত হয়, তাহাই শিখানো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ।..... ইহা মনকে এমনভাবে গঠন করে যাহার ফলে ছাত্রেরা তথ্যসমূহ যথার্থরূপে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া সত্যে উপনীত হইতে পারে। নূতনকে গ্রহণ করিবার শক্তি, জ্ঞানলাভের স্পৃহা, সংযম ও ধীরতা—ইহাই শিখানো বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য। যদি কোন ছাত্র এই সমস্ত গুণ লইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে, তবেই বুঝিবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাহার পক্ষে ব্যর্থ হয় নাই।"

কার্ডিন্যাল নিউম্যান যথার্থই বলিয়াছেন :—"জ্ঞানই মনের প্রসারের একমাত্র উপায় এবং জ্ঞান দ্বারাই ঐ প্রসার লাভ করা যায়।" (Idea of A University.)

"যে সংস্কৃতি প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য; এই প্রজ্ঞার অনুশীলনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ।"

"জ্ঞানানুশীলনের উদ্দেশ্যই জ্ঞানলাভ। মানুষের মনের গঠন এমনই যে, জ্ঞান-লাভই জ্ঞানের পুরস্কারস্বরূপে গণ্য হইতে পারে।"

বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ীর উক্তি হইতে বুঝা যাইবে যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কারের প্রয়োজন কত গুরুতর। এডিসন বলিয়াছেন, —"সাধারণ কলেজে গ্রাজুয়েটদের জন্য এক পয়সাও দিতে আমি প্রস্তুত নহি।" "যে কেবল ইতিহাসের পাতার কয়েকটি তারিখ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে, সে শিক্ষিত ব্যক্তি নহে; যে নিজে কোন কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারে, সেই শিক্ষিত ব্যক্তি। বস্তুই

কলেজের উপাধি লাভ করুক না কেন, যে চিন্তা করিতে পারে না, তাহাকে শিক্ষিত ব্যক্তি বলা যায় না।" (হেনরী ফোর্ড)

সম্প্রতি ল্যাম্কি প্রায় এইরূপ ভাষাতেই অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন:— "কারখানার প্রণালীতে শিক্ষাদানের একটা রীতি আছে। এই উপায়ে হাজারে হাজারে 'শিক্ষিত ব্যক্তি' তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু চিন্তাশক্তিসম্পন্ন মন তৈরি করাই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে এ উপায় বিপজ্জনক।"

এই "দলে দলে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি" সম্বন্ধে মুসোলিনী বলিয়াছেন :

"শিক্ষার জন্য যোগ্য ছাত্র নির্বাচন এবং বৃত্তি শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা আমাদের নাই। আমাদের শিক্ষার ঘানি হইতে একই ধরনের ছাত্র দলে দলে বাহির হইতেছে এবং তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী চাকরি গ্রহণ করিয়া জীবন শেষ করিতেছে। এই সব ব্যক্তিদের দ্বারা সরকারী চাকরির আদর্শ পর্যন্ত নীচু হইয়া পড়ে। আইন ও চিকিৎসা নামধেয় তথাকথিত 'স্বাধীন ব্যবসায়ে' বিশ্ববিদ্যালয় আর কতকগুলি পুতুল তৈরি করে।"

"জাতীয় জীবনের উপর যাহার এমন অসাধারণ প্রভাব সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে।" (আত্মজীবনী)

"গ্রন্থ-সংগ্রহই এ যুগের যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়"—কার্লাইল তাঁহার The Hero as Man of Letters নামক নিবন্ধে এই কথা বলিয়াছেন।

মিঃ এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ এই কথাটিরই(১৯) বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন :—

"অধ্যাপকের বক্তৃতা নয়, উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহকেই শিক্ষার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিলে, তাহার ফল বহুদূরপ্রসারী হইয়া পড়ে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে শিক্ষালাভ করিবার পুরাতন প্রথার দাসত্ব লোপ পায় এবং নির্দিষ্ট কোন ঘরে যাইয়া নির্দিষ্ট কোন সময়ে অধ্যাপকের শ্রীমুখ হইতে অমৃতময় বাণী শুনিবার প্রয়োজন ছাত্রদের আর থাকে না। যে যুবক কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের সুসজ্জিত কক্ষে বেলা ১১টার সময় পড়ে এবং যে যুবক সমস্ত দিন কাজ করিয়া রাত্রি ১১টার সময় গ্লাসগো শহরে কোন ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া পড়ে,—তাহাদের মধ্যে আর কোন প্রভেদ থাকে না।"

যদি উপযুক্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলে,—তবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জাতির প্রভূত হিত সাধন করিতে পারে। স্টীট তাঁহার "প্রেসিডেণ্ট ম্যাসারিক" গ্রন্থে এই ভাবটি বেশ পরিষ্কাররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন :

---

(১৯) কার্লাইল এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় উঠাইয়া দিলেও চলে। তিনি বলিতেছেন :

"বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বর্তমান যুগের সৃষ্টি—শ্রদ্ধার বস্তু। গ্রন্থ সংগ্রহ ইহার উপরে অশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যে সময়ে কোন বই পাওয়া যাইত না, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্ভব হয়। তখনকার দিনে একখানি বইয়ের জন্য লোকে নিজের এক খণ্ড ভূ-সম্পত্তি পর্যন্ত দিতে বাধ্য হইত। সেই সময়ে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যে ছাত্র সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে চেষ্টা করিতেন, ইহার প্রয়োজন ছিল। আবেলার্ডের নিকট জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, তাঁহার নিকট যাইতে হইত। সহস্র সহস্র ছাত্র আবেলার্ড এবং তাঁহার দার্শনিক মতবাদ জানিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইত।"

"ম্যাসারিক তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এবং যে সব ছাত্র পরবর্তী কালে তাঁহার নিকট পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া, শিক্ষা সম্বন্ধে অভিমত গঠন করিয়াছিলেন। বোহিমিয়ার শিক্ষা-প্রণালীর বিরুদ্ধে তাঁহার প্রধান বক্তব্য এই যে, ইহার দ্বারা চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য, আত্মজ্ঞান এবং আত্মমর্যাদাবোধ জন্মে না। ইহার দ্বারা পরীক্ষায় পাস করিবার উদ্দেশ্যে পল্লবগ্রাহিতাই প্রশ্রয় পায়,—প্রকৃত জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাঁহার নিজের কথা একটু স্বতন্ত্র। গৃহের প্রভাব হইতে দূরে থাকিয়া স্বোপার্জিত অর্থে তাঁহাকে জীবিকা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল, তাহার ফলে স্বভাবতঃই তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য যাঁহারা তাঁহার চেয়ে অধিকতর স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে লালিত হইয়াছিলেন, ছাত্রজীবন তাঁহাদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করে নাই। অর্থোপার্জন, কোন নিরাপদ সরকারী চাকরি লাভ এবং পেন্সন পাওয়ার নিশ্চয়তা, ইহা ভিন্ন ঐ সব ছাত্রের মধ্যে আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। ম্যাসারিক ইহার মধ্যে দেখিয়াছিলেন,—মৃত্যুভীতি ও সংগ্রামময় জীবনের সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা; সংক্ষেপে যে সব গুণ থাকিলে জননায়ক হওয়া যাইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ অভাব।

"ম্যাসারিকের মত এই যে, ছেলেরা স্কুলে যাহা শিখে, পরবর্তী কালে তাহা সমস্তই ভুলিয়া যায়। সুতরাং অন্ততঃপক্ষে, শিক্ষার প্রথম অবস্থায়, ছেলেদের কেবল কতকগুলি তথ্য গলাধঃকরণ করাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে,—তাহাদের মনে এমন কৌতূহল জাগ্রত করা উচিত যাহাতে তাহারা নিজেরাই তথ্য নির্ধারণে সক্ষম হইতে পারে। এরূপ কৌতূহল জাগ্রত করিবার প্রধান উপায়, শিক্ষককে নিজে সেই বিষয়ে আগ্রহশীল হইতে হইবে। শিক্ষক রূপে ম্যাসারিকের সাফল্যের কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি যে বিষয় শিখাইতেন, সে বিষয়ে খুবই উৎসাহী ছিলেনণ যুবক অবস্থায় তিনি বালকদের শিক্ষকতা করিতেন এবং পরবর্তীকালে প্রাগ শহরে তাঁহার ক্লাসে স্লাভ দেশের সর্বত্র হইতে তাঁহার নিকট পড়িবার জন্য ছাত্রেরা আসিত। সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষাদান কার্যে তিনি এইরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন।

"একই ছাঁচে ঢালা, একই প্রকৃতির শত শত গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি এমন এক শ্রেণীর লোক তৈরি করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহাদের চিন্তার স্বাধীনতা জন্মিবে। তাঁহার মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হইবে, মানুষের প্রকৃতিকে এমনভাবে গঠন করা যাহার ফলে কোন বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইলে, সে নিজেই তাহার সমাধান করিতে পারে। বাল্যবয়স হইতে ছাত্রদের কেবল কতকগুলি তথ্য শিখাইলে চলিবে না,—নির্ভুল ও সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করিবার এবং মনঃসংযোগ করিবার অভ্যাস তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।"

হার্বার্ট স্পেন্সার যথার্থই বলিয়াছেন,—"বিদ্যানুশীলনের জন্য পুস্তকের প্রয়োজনীয়তাকে খুব বেশী অতিরঞ্জিত করা হয়। প্রত্যক্ষভাবে লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা পরোক্ষভাবে লব্ধ জ্ঞানের মূল্য কম হওয়া উচিত এবং প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করাই সঙ্গত, কিন্তু প্রচলিত ধারণা তাহার বিপরীত বলিলেই হয়। ছাপা বইয়ের পাতা

হইতে সংগৃহীত বিদ্যা শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু যে বিদ্যা জীবন এবং প্রকৃতির নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে লব্ধ তাহা শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয় না। পুস্তক অধ্যয়নের অর্থ অন্যের দৃষ্টি দিয়া দেখা,—নিজের ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা না শিখিয়া অন্যের ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা শেখা। কিন্তু প্রচলিত ধারণা এমনই সংস্কারাচ্ছন্ন যে, লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা পরোক্ষভাবে লব্ধ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বিদ্যানুশীলনের নামে চলিয়া যায়।"

স্টিভেন্সন বলেন,—"পুস্তকের এক হিসাবে প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু তাহারা প্রাণহীন, অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাৎ জীবনের কাছে কিছুই নহে।"

প্রেসিডেন্সি কলেজে ২৭ বৎসর ব্যাপী অধ্যাপনাকালে আমি বিশেষ করিয়া নিম্নতর শ্রেণীতেই অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিতাম। হাই স্কুল হইতে ছেলেরা যখন প্রথম কলেজে পড়িতে আসে, তখনই তাহাদের মন যথার্থরূপে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী থাকে। কুম্ভকার যেমন কাদার তাল হইতে ইচ্ছামত মূর্তি গড়ে,—এই সময়ে ছেলেদের মনও তেমনি ইচ্ছা মত গড়িয়া তোলা যায়। আমি কোন নির্দিষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ ধরিয়া পড়াইতাম না। যদি সেসনের প্রথমে কোন ছাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিত, কোন্ বহি পড়িতে হইবে—আমি উত্তর দিতাম, "যদি কোন বহি কিনিয়া থাক, পোড়াইয়া ফেল এবং আমার বক্তৃতা অনুসরণ কর।" অবশ্য, বাজার চল্‌তি কোন বই অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর কোন মৌলিক গ্রন্থ হইলে, আমি তাহা পড়িতে পরামর্শ দিই।

জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর সেসনের আরম্ভে এই তিনমাস,—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এই তিন মূল পদার্থ এবং তজ্জাত মিশ্র পদার্থগুলির আলোচনা হয়। আমি আমার ছাত্রদিগকে রসায়নের ইতিহাস, অক্সিজেনের আবিষ্কার, প্রিস্টলে, লাভোয়াসিয়ার এবং শীলের আবিষ্কারকাহিনী এবং তাঁহাদের পরস্পরের কৃতিত্ব এই সব শিখাই, তারপর অকসাইড্‌স অব নাইট্রোজেন, পরমাণুতত্ত্ব প্রভৃতি বিশ্লেষণ করি এবং ডাল্‌টনের আবিষ্কারকাহিনী বলি। এইরূপে নব্য রসায়নী বিদ্যার প্রবর্তকদের সঙ্গে ছাত্রদের মনের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করি। সংক্ষেপে আমি প্রথম হইতেই ছাত্রদের রসায়নজ্ঞানকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমি সভয়ে দেখি, অন্যান্য কলেজ ইতিমধ্যেই পাঠ্যগ্রন্থ অনেকখানি পড়াইয়া ফেলিয়াছেন, এমন কি পুনরালোচনা চলিতেছে।

এই প্রসঙ্গে, বর্তমানে কলেজে সাহিত্য ও বিজ্ঞান যে প্রণালীতে পড়ানো হয়, তাহার কথা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। কেবল ছাত্রেরা নয়, অধিকাংশ শিক্ষকও গতানুগতিক প্রথার দাস হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহারা কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকগুলিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। যদি কোন শিক্ষক পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে গিয়া, নূতন কোন কথা বলিতে চেষ্টা করেন, তবে ছাত্রেরা বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। তাহারা প্রতিবাদ করিয়া বলে, "স্যার, আপনি বাহিরের কথা বলিতেছেন, আমরা এগুলি শুনিয়া মন ভারাক্রান্ত করিব কেন? পরীক্ষায় পাস করার জন্য এগুলির প্রয়োজন নাই।"

যদি পাঠ্যপুস্তকগুলিও ঠিক মত পড়া হইত, তাহা হইলেও আমি খুশী

হইতাম। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল ব্যাপার আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ছাত্রেরা পাঠ্যপুস্তকগুলি পরিহার করিয়া তৎপরিবর্তে সংক্ষিপ্তসার, নোটবুক প্রভৃতি পড়িতেছে।(২০)

অন্যত্র আমি বলিয়াছি যে, আমার ছাত্রজীবনে আমি কেবল পাঠ্যপুস্তক পড়িয়াই সন্তুষ্ট হইতাম না, সেগুলিকে কেবল পথপ্রদর্শকরূপে ব্যবহার করিতাম। পক্ষান্তরে আমি ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী সাময়িক পত্রাদি খুঁজিয়া মৌলিক প্রবন্ধসমূহ পড়িতাম। পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি নিজের চেষ্টায় ল্যাটিন এবং ফরাসী ভাষা শিখি। আমি সেই বয়সেই সেক্সপিয়রের কয়েকখানি নাটক এবং ইংরাজী সাহিত্যের কয়েকখানি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। এই কারণে, আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারি নাই এবং সাধারণ ছাত্র রূপে গণ্য হইতাম।

আমার ছাত্রজীবনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ম্যাসারিকের ছাত্রজীবনের সাদৃশ্য দেখিয়া আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। 'গ্রেট্‌স', 'ডবল ফার্স্ট' প্রভৃতি পরীক্ষার সম্মানকে আমি বরাবরই কৃত্রিম জিনিস বলিয়া গণ্য করিয়াছি।

"ভিয়েনা এবং ব্রুনো উভয় স্থানের কোথাও তিনি শিক্ষকদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে সাধারণ ছাত্র বলিয়া মনে করিতেন, মেধাবী ছাত্ররূপে গণ্য করিতেন না। ইহার কারণ এই যে, ম্যাসারিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা প্রণালী মানিতেন না এবং কোন একটি বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হইতে চেষ্টা করিতেন না। ব্রুনোতে তিনি যে সর্বগ্রাসী জ্ঞানতৃষ্ণার পরিচয় দিয়াছিলেন, ভিয়েনাতে আসিয়া তাহা অতিরিক্তরূপে বাড়িয়া গেল।

"এই সময়ে তিনি 'ক্লাসিক' সাহিত্য পড়িতে ভাল বাসিতেন। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী তিনি মূল ভাষাতেই পড়িয়াছিলেন। স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠ্যে তাঁহার আশা মিটিত না। যদি কোন বিষয় পড়িতে হয়, তবে তাহা ভাল করিয়াই পড়িতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার মত।......১৯ বৎসর বয়সেই তিনি যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষায় তাঁহার বিশেষ কোন উপকার হইবে না। তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য বুদ্ধিমান যুবকদের ন্যায় তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বীয় শক্তির উপরেই নির্ভর করিতেছে। সে ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে, তখন পর্যন্ত তাহা অবশ্য তিনি জানিতেন না। কিন্তু তিনি জানিতেন —সেই ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সাধন করিতে হইলে, তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। কেবল বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান লাভ করিলেই চলিবে না, তাহার বাহিরে যে বৃহত্তর জ্ঞানরাজ্য পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

---

(২০) 'Aids', 'Digests', 'Compendiums', 'One-day-preparation Series'. 'Made easy Series' —এইগুলিই বেশী প্রিয়। ছাত্রেরা পরীক্ষার পূর্ব ক্ষণে এই সব বটিকা সেবন করে।

১৯২৮—২৯ সালের ভারতের শিক্ষার বিবরণে এডুকেশনাল কমিশনার বলিতেছেন :— "বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পাঠ্যপুস্তক পড়িবার জন্য মাথা ঘামায় না, তাহারা তৎপরিবর্তে বাজার-চলতি সংক্ষিপ্তসার, নোটবুক প্রভৃতি মুখস্থ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়।" ('নেচার' হইতে উদ্ধৃত)

যে সব শক্তি মানব-জগৎকে পরিচালনা করিতেছে, ম্যাসারিকের পক্ষে তাহার মূল রহস্য অবগত হওয়া প্রয়োজন ছিল।”

বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ফলে যে অনিষ্ট হইয়াছে, জনৈক চিন্তাশীল লেখক তাহা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

“পাঠ্য পুস্তক নির্দিষ্ট করা—বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিশাপ স্বরূপ। গোড়ার কথা এই যে, ছাত্রেরা কোন বিষয়ের মূল বস্তু প্রথমতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিখিবে। যদি সে সেক্সপিয়র পড়ে, সেক্সপিয়রের মূল গ্রন্থ তাহাকে পড়িতে হইবে। ব্রাড্লে অথবা কিট্রেজ সেক্সপিয়র পড়িয়া কি শিখিয়াছেন, তাহা জানাই ছাত্রদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদি সে রাষ্ট্রনীতির ঐতিহাসিক ধারা জানিতে চায়, তবে তাহাকে প্লেটো ও অ্যারিস্টট্ল, লক, হবস্ এবং রুশোর বই পড়িতে হইবে। এবং সেই সমস্ত জানিয়া যদি সে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত অসংখ্য নামের তালিকা আবৃত্তি করিতে না পারে, তাহা হইলেও তাহার পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে না। যদি সে অর্থনীতির শিক্ষার্থী হয়, তবে অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর গ্রন্থ পড়া তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ঐ সমস্ত চিন্তা-প্রবর্তকদের গ্রন্থ পড়িলে, তাহার মনের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, কোন অধ্যাপকের লেখা পাঠ্য গ্রন্থ পড়িয়া তার চেয়ে বেশী জ্ঞান সে লাভ করিতে পারিবে না।” (হ্যারল্ড ল্যাস্কি)

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উপলক্ষে প্রদত্ত অভিভাষণে (১৯২৬) আমি বলিয়াছিলাম :—

“সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার (সেকেণ্ডারী এডুকেশান) ব্যবস্থা যদি উন্নততর করা হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অনেক অনাবশ্যক অঙ্গ বর্জন করা যাইতে পারে এবং তাহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যথার্থ উন্নতি হইতে পারে। শিক্ষার যে গতানুগতিক অংশের স্কুলেই শেষ হওয়া উচিত, তাহার জের এখন দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত টানা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নততর করিলে, ইহার অবসান হইবে এবং ফলে বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থরূপে বিদ্যা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়া উঠিবে। এ বিষয়ে আরও একটু বিস্তৃতভাবে বলা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে এত বেশী খুঁটিনাটি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, ইহার কাজ অনেকটা সেকেণ্ডারী স্কুলের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে পর্যন্ত কেহ কেহ রীতিমত “একসারসাইজ” দিবার জন্য জিদ করেন। আমি এমন কথা বলি না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার নামে, ছেলেদের ভিতর আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হোক। মানসিক যোগ্যতার সঙ্গে পরিশ্রম করিবার অভ্যাস, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার গোড়ার শর্ত হওয়া উচিত। আমি ইহাই বলিতে চাই যে, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে অধ্যাপকদের বক্তৃতা ও ‘একসারসাইজ’ দেওয়ার যে বাঁধাধরা নিয়ম আছে, তাহা তুলিয়া দিতে হইবে; অন্যথা ছাত্রদের মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে পারে না। অবশ্য, বক্তৃতা দেওয়ার রীতির দ্বারা মনে হইতে পারে, কিছু কাজ হইতেছে। কিন্তু যদি কোন ছাত্র নিজের সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে চায়, তাহা হইলে সে দেখিবে যে, এই সব বক্তৃতার

ক্লাস হইতে অনুপস্থিত থাকাই তাহার বেশী লাভজনক। এই বাঁধাধরা বক্তৃতা দেওয়ার রীতির প্রধান ত্রুটি এই যে, ছাত্রেরা কোন বিষয় না বুঝিতে পারিলেও, অধ্যাপককে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ কদাচিৎ পাইয়া থাকে। এই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'টিউটোরিয়াল সিস্টেম' বা ছাত্রদিগকে 'গৃহশিক্ষা' দেওয়ার রীতিও প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু যদিও এই ব্যবস্থায় প্রথমোক্ত রীতির ত্রুটি কিছু সংশোধিত হয়, তথাপি মোটের উপর ইহা অনেকটা পরীক্ষায় পাস করাইবার জন্য 'ছেলে তৈরি' করিবার মত। ইহাতে ছেলেদের বিশেষ কিছু মানসিক উন্নতি হয় না। ইহার বিপরীত শিক্ষাপ্রণালীর কথা বিবেচনা করিয়া দেখুন। অধ্যাপকেরা ছাত্রদের নিকট কেবল কতকগুলি গ্রন্থের নাম করেন এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থে যে সব সমস্যা আলোচিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন। ছাত্রেরা ঐ সব গ্রন্থ পড়ে, তাহাতে যে সমস্ত সমস্যার আলোচনা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করে, নিজেরাই সমাধানের উপায় আবিষ্কার করে এবং কলেজের তর্কসভায় অধ্যাপক ও সহপাঠীদের সঙ্গে ঐ বিষয়ে তর্কবিতর্ক ও আলোচনা করে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই প্রণালীতে ছাত্রের বিশ্লেষণ ও সমীকরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যদিও প্রথম প্রথম তাহার পক্ষে এই প্রণালী কষ্টকর মনে হইতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইহারই মধ্য দিয়া নিজের একটা 'জ্ঞানরাজ্য' গড়িয়া তোলে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নততর না হইলে, এই প্রণালী প্রবর্তিত হইতে পারে না।

"প্রশ্ন হইতে পারে, যদি অধ্যাপকের বক্তৃতা দেওয়ার রীতি বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের কাজ কি হইবে? উত্তর অতি স্পষ্ট—অধ্যাপকদের প্রধান কাজ হইবে মৌলিক গবেষণা। অধ্যাপক যেখানে মনে করেন যে, তাঁহার নূতন কিছু শিক্ষা দিবার আছে, কেবল সেই স্থলেই তিনি বক্তৃতা দেন, আলোচনা করেন এবং এইভাবে ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণের প্রবৃত্তি জাগ্রত রাখেন। বারট্রাণ্ড রাসেলের ভাষায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় পাঠশালার গুরুগিরির স্থান আর এখন নাই।......

"আমি এ পর্যন্ত, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর ৪টি গুরুতর ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছি—শিক্ষার বাহন, ছাত্র নির্বাচনের অভাব, অধ্যাপকের বক্তৃতা দেওয়ার বাধ্যতামূলক রীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে ছেলেদের যোগসূত্রের অভাব। আরও অনেক ত্রুটি আছে, তন্মধ্যে একটি বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কাধারীদের জন্যই কেবল ঐ প্রতিষ্ঠানটি একচেটিয়া থাকিবে, এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। আমরা যতদিন বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের শিক্ষাদানপ্রণালী নির্ভুল এবং শিক্ষালাভযোগ্য সকলের ভারই আমরা গ্রহণ করিতে পারি, ততদিন পর্যন্ত এ ধারণার একটা অর্থ ছিল। এরূপ দাবি একান্ত অমূলক। যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই যে বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক গবেষণার কেন্দ্রস্বরূপ হইবে, তাহা হইলে, যে কেহ মৌলিক চিন্তা, ও গবেষণার পরিচয় প্রদান করিবে, তাহারই জন্য উহার দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ তাহার দেহে থাকুক আর নাই থাকুক। এরূপ উদার নীতি অবলম্বনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের

উন্নতির গতি রুদ্ধ হইবে, কোন শিক্ষাব্যবসায়ী এমন কথা বলিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, যদি আমরা চিন্তা করি যে, সমাজের অতি সামান্য অংশই শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছে, এবং অজ্ঞাত প্রতিভা হয়ত সুযোগের অভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে প্রচলিত সংকীর্ণ নীতির পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর মহৎ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের যদি একটা হিসাব আমরা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট, এমন কি কোন বিশেষ শিক্ষা-প্রণালীর নিকটই ঋণী নহেন। সেক্সপিয়ার গ্রীক ও লাটিন অতি সামান্যই জানিতেন। আমাদের দেশের কেশবচন্দ্র সেন এবং রবীন্দ্রনাথ, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার অতিক্রম করেন নাই।(২১) বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ বুদ্ধির ছাত্রদেরই আশ্রয় দেয়, এ অভিযোগ যেমন সম্পূর্ণ অমূলক নহে, তেমনি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিভার বিরোধী, এমার্সনের এ অপবাদও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা যায় না। যাঁহারা মানব-জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত বিশ্ববিদ্যালয় এমন সমস্ত কর্মীকে যেমন সাদর অভ্যর্থনা করিবেন, তেমনি প্রতিভার অধিকারীদের যাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করিতে না হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য ব্যতীত স্বাধীন ভাবে তাঁহারা কার্য করিতে পারেন, তাহাও আমাদের দেখিতে হইবে।"

মিঃ এইচ. জি. ওয়েলস বলেন—"ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কোন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে না, সাহিত্য বা বিজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া কোন উপাধি দিবে না। যে সমস্ত যুবক জ্ঞানচর্চার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিবেন এবং সেই কারণে প্রসিদ্ধ মনীষী ও অধ্যাপকদের সহকারী, সেক্রেটারী, শিষ্য ও সহকর্মিরূপে কাজ করিতে আসিবেন, তাঁহারাই সে যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে গণ্য হইবেন। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যের ফলে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধিশালী হইবে।"

(৭) বিদেশী উপাধির মোহ—দাস-মনোভাব—হীনতা-বোধ

পরাধীন জাতির সহস্র প্রকার দুর্ভাগ্যের মধ্যে একটি এই যে, সে তাহার আত্ম-সম্মান ও মর্যাদাজ্ঞান হারাইয়া ফেলে এবং প্রভুজাতির মাপকাঠিতেই সমস্ত বস্তুর মূল্য নির্ণয় করিতে থাকে। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই শোচনীয় মনো-বৃত্তির কথা আমি অনেকবার বলিয়াছি। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই ভাবে ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে জয় করিয়াছে। আমাদের শাসকরাও নানা ভাবে এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়াছেন।

এমার্সন যথার্থই বলিয়াছেন—"আত্মানুশীলনের অভাবেই 'দেশ-ভ্রমণে'র সম্বন্ধে

---

(২১) গিরিশচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র উভয়েই প্রগাঢ় পণ্ডিত। গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে জনৈক লেখক অমৃতবাজার পত্রিকায় (২৬—১—৩১) লিখিয়াছেন—"গিরিশচন্দ্র অক্লান্ত অধ্যয়নশীল ছিলেন। যাহা কিছু পড়িতেন, তাহাই আয়ত্ত করিতে পারিতেন। বৎসরের পর বৎসর ছাত্রদের মতই তিনি অনেক সময় তাঁহার পুস্তকাগারে পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার এই অভ্যাস বজায় ছিল।" শরৎচন্দ্রের ক্ষুদ্রপুস্তক 'নারীর মূল্য' পড়িলেই বুঝা যায়, তিনি কত গ্রন্থ পড়িয়াছেন।

এক প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়াছে। শিক্ষিত আমেরিকাবাসীরা মনে করে যে বিদেশ ভ্রমণ না করিলে কোন উন্নতি হইতে পারে না। এই কারণেই ইটালী, ইংলণ্ড, মিশরের মোহে তাহারা আচ্ছন্ন। যাহারা ইংলণ্ড, ইটালী বা গ্রীসকে কল্পনায় বড় মনে করে, তাহারা স্থাণুর মত এক জায়গাতেই স্থির হইয়া থাকে। মানুষের মত যখন আমরা চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি, কর্তব্যই সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস। বিদেশ ভ্রমণ নির্বোধেরই কল্পনার স্বর্গ।”

আমাদের দেশের যুবকদের উচ্চতর সরকারী পদ লাভ করিতে হইলে ইংলণ্ডে যাইতে হইবে এবং সেই বহুদূরবর্তী বিদেশে থাকিয়া বহুকষ্টে, বহু অর্থব্যয়ে বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে; এবং এত কষ্ট ও অর্থব্যয়ের পর, প্রবল প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় সাফল্যের উপর তাহার ভাগ্য নির্ণীত হইবে। এই উপায়ে, গত ৫০।৬০ বৎসরে অল্পসংখ্যক ভারতবাসী ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের সিভিল, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও ঐ সমস্ত বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের পদ-মর্যাদা পূর্বোক্ত ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের লোকদের চেয়ে হীন। এইরূপে এক শ্রেণীর নূতন জাতি-ভেদ গড়িয়া উঠিয়াছে। আই. সি. এস., আই. এম. এস., এবং আই. ই. এস. নিজেদের উচ্চস্তরের জীব মনে করে এবং তথাকথিত নিম্নতর সার্ভিসের লোকদের করুণার চক্ষে দেখে।

বিদেশী বিশেষতঃ ব্রিটিশ ডিগ্রী বা যোগ্যতার মোহে আমাদের বহু অর্থ, শক্তি ও সময়ের অপব্যয় হইতেছে। সম্প্রতি লণ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনারের আফিস হইতে তথাকার শিক্ষাবিভাগের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, ইংলণ্ড, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ছাত্রদের মোট সংখ্যা ২৫০০-এর কম নহে। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, এই ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকা ভারত হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার প্রতিদানে ভারতের বিশেষ কিছু লাভ হইতেছে না। উক্ত রিপোর্টে নিম্নলিখিত সারগর্ভ মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে :

গুরুতর অপব্যয়

“ভারতে বর্তমানে সরকারী কাজে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ করা হইতেছে। যে সমস্ত পদে বিলাত হইতে লোক নিযুক্ত করা হইত, তাহার অনেকগুলিতে ভারতেই লোক নিযুক্ত করা হইতেছে,—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যোগ্যতাও সমান ভাবেই স্বীকৃত হইতেছে;—তৎসত্ত্বেও এই ভ্রান্ত ধারণা কিছুতেই দূর হইতেছে না যে, যাহারা ভারতে শিক্ষা লাভ করে, তাহাদের চেয়ে যাহারা বিদেশে শিক্ষা লাভ করে তাহারা সরকারী কাজে বেশী সুযোগ ও সুবিধা পায়। এই শ্রেণীর ছাত্রেরাই বেশির ভাগ বিদেশে গিয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগে উপাধিলাভের জন্য অধ্যয়ন করে। ঐরূপ শিক্ষা লাভ করিলেই কোন বিশেষ সরকারী কাজে তাহাদের যোগ্যতা জন্মে না। ঐ ধরনের শিক্ষা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও

তাহারা পাইতে পারিত। এই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে ব্যারিস্টার হইবার জন্য আইন পড়ে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রও ইহাদের মধ্যে কম নয়। ১৯২৮ সালে ২৬৬ জন ছাত্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ১৭০ জনই ছিল ভারতীয় এবং এই ১৭০ জনের মধ্যে মাত্র ১৭ জন পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

"ইহাদের মধ্যে অনেক এমন সব ছাত্রও দেখা যায় যাহাদের বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে পড়িবার মত যোগ্যতা নাই। প্রতি বৎসরই কতকগুলি ছাত্র অতি সামান্য সম্বল লইয়া এদেশে আসে; তাহাদের তীক্ষ্ন বুদ্ধি, অধ্যবসায়, ও সাহস প্রশংসনীয় বটে,—কিন্তু অর্থ ও যোগ্যতার অভাবে তাহারা সাফল্য লাভ করিতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর ভারতীয় ছাত্র নিঃসম্বল অবস্থায় ভবঘুরের মত এদেশে আসে, শীঘ্রই তাহারা পিতামাতা ও অভিভাবকদের উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষও তাহাদের জন্য চিন্তিত হইয়া উঠেন। যখন দেশ হইতে তাহাদের টাকা আসা বন্ধ হয় অথবা অন্য কারণে তাহারা নিঃসম্বল হইয়া পড়ে, তখন হাই কমিশনারের আফিস হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে ভারতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে হয়।

"এ সমস্ত কথা পূর্বেও বহুবার বলা হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় জনমতকে সচেতন করিতে পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন আছে। ইহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে যে প্রতি বৎসর যে সব ছাত্র ভারত হইতে বিদেশে আসে, তাহাদের অধিকাংশের দ্বারাই আর্থিক হিসাবে বা বিদ্যার দিক দিয়া ভারতের কোন উপকার হয় না। ইহারা হতাশ ও বিরক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া যায়, কোন কাজের উপযুক্ত বিশেষ কোন যোগ্যতা লাভ করে না, এবং অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক জীবনের স্নেহবন্ধন হইতে তাহারা বিচ্যুত হইয়া পড়ে, স্বজাতির স্বার্থের সঙ্গেও তাহাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়। একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, এই ভাবে প্রতি বৎসর ভারতের যুবকশক্তির বহু অপব্যয় হইতেছে। ভারতের যুবকদের মঙ্গল কামনা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের এই গুরুতর বিষয়টি বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করা প্রয়োজন।"

একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরা নিজেদের খুবই উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা করিলে, অনেক স্থলেই তাহাদের সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, দর্শনশাস্ত্রের কথা ধরা যাক। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম অবশ্যই এক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য। তাঁহার বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র-শিক্ষার্থীদের চিত্তে ঈর্ষা ও নৈরাশ্যের সঞ্চার করে। তাঁহার সমকক্ষতা লাভের কল্পনাও তাঁহারা করিতে পারেন না। এ কথা সত্য যে, তিনি এমন কোন গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই, যাহার দ্বারা তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরিয়া যে সব ছাত্র তাঁহার পদমূলে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা

ডাঃ শীলের নিকট তাঁহাদের অশেষ ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তিনি সক্রেটিসের মতই তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্য দিয়া জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করেন।(২২)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অপর যে সব প্রসিদ্ধ অধ্যাপক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে হীরালাল হালদার, রাধাকিষণ, এবং সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তিন জনের মধ্যে কেবল একজনের "অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে" বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি আছে। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ইউরোপে গিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কেবল প্রতীচ্যের নিকট প্রাচ্য দর্শনের ব্যাখ্যাতা রূপে।

ইহাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা তাহার সংসৃষ্ট কলেজসমূহে যাঁহারা ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের কৃতী অধ্যাপকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অক্সফোর্ড বা কেম্‌ব্রিজে শিক্ষা লাভ করেন নাই। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটই তাঁহারা ঋণী। এই প্রসঙ্গে জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল ঘোষ এবং ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

যাঁহারা বিলাতের কোন "ইনস্‌ অব কোর্টে" ডিনার খাইয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসেন, কলিকাতা হাইকোর্টে আইনের ব্যবসায়ে তাঁহারা এযাবৎ কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়াছেন; এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের উপাধি প্রাপ্ত উকিলেরা ঐ সমস্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। এই কারণে ব্যারিস্টারেরা উকিলদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করেন।

কিন্তু সিভিলিয়ানদের মত আইনজীবীরা ভাগ্যবান নহেন,—জীবন সংগ্রামে কঠোর প্রতিযোগিতা করিয়া তাঁহাদের সাফল্য অর্জন করিতে হয়। সুতরাং আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, উকিলেরা অনেক সময় ব্যারিস্টারদের চেয়ে যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হন এবং ব্যারিস্টারেরা তাঁহাদের তুলনায় উপহাসের পাত্র হইয়া দাঁড়ান। ভাশ্যাম আয়েঙ্গার বা রাসবিহারী ঘোষের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার তুলনা নাই। যে ৫৬ জন এ পর্যন্ত "ঠাকুর আইন বৃত্তি" পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৩৮ জনের মধ্যে ২৮ জন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রদত্ত বক্তৃতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য এবং আইনে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হয়। এই প্রসঙ্গে রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল সরকার, প্রিয়নাথ সেন এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে দেখিতে পাই, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে ইংরাজী ভাষা অনভিজ্ঞ ভাউদাজী

---

(২২) রবীন্দ্রনাথ ডাঃ শীলকে জ্ঞানের মহাসমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কত জন যে তাঁহার পদমূলে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছেন তাহা অনেকেই জানেন। কেবলমাত্র তাঁহার মৌখিক উপদেশ শুনিয়াই বহু ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিয়াছেন।

এবং ডাঃ ভাণ্ডারকর ও তাঁহার পুত্র খ্যাতিমান। ইঁহাদের মধ্যে কেহই বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন নাই এবং ডাঃ সেন ব্যতীত আর কাহারও কোন বিদেশী বিদ্যালয়ের উপাধি নাই। ডাঃ সেন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎপূর্বেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরূপে মৌলিক গবেষণায় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে দেখা যায়, 'রামন তত্ত্বের (Raman Effect) আবিষ্কর্তা অধ্যাপক রামন(২৩) স্বীয় চেষ্টাতেই বিজ্ঞানবিদ্যার নিগূঢ় রহস্য অধিগত করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত প্রসিদ্ধ মৌলিক গবেষণা কলিকাতার লেবরেটরীতেই করা হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারে ধর, ঘোষ, মুখোপাধ্যায়, সাহা, বসু প্রভৃতির অবদানের কথা পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি (১৩শ ও ১৪শ অধ্যায়)। এস্থলে শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, তাঁহাদের প্রত্যেকে কলিকাতার লেবরেটরীতে গবেষণা করিয়াই খ্যাতি লাভ করেন। আমি কয়েকবার জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, ঘোষ ও সাহা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষা সমাপন করিলেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. এস-সি. উপাধি ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করেন নাই। কেননা তাঁহাদের মনে হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা তাঁহাদের স্বীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধির গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু (বোস-আইনস্টাইন তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত) যদিও বিদেশে গিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পদার্থতত্ত্ব-বিদ্‌গণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তথাপি ঐ একই মনোভাবের বশবর্তী হইয়া কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি গ্রহণ করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একজন প্রিয় ছাত্রের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন,—আমি অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন রায়ের কথা বলিতেছি।

একটি আশার লক্ষণ এই যে, আমি যে সব কথা বলিলাম, তাহা এদেশে অধ্যয়নকারী ছাত্রেরা নিজেরাই ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে (ডিসেম্বর, ১৯৩১) 'ব্রিটিশ ডিগ্রীর মূল্য' আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর শ্রীযুত অনাথনাথ বসু বলেন, "ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মূল্য ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্য নহে, একথা বলিলে, আমাদের মনের শোচনীয় অবস্থার পরিচয়ই দেওয়া হয়। আমি বিশ্বাস করি না যে, কোন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর পড়িয়া যে শিক্ষা লাভ করা যায়, কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর পড়িয়া সেইরূপ শিক্ষা লাভ করা যায় না। অথচ ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরা উচ্চ পদ ও মোটা বেতন পান। ইহা মর্যাদাবোধের কথা এবং ইহার মূলে

---

(২৩) অধ্যাপক রামনের 'নোবেল প্রাইজ' পাওয়ার বহু পূর্বে এই প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে। অল্প দিন পূর্বে (২৭—৬—৩১; কলিকাতা কর্পোরেশান অধ্যাপক রামনকে সম্বর্ধনা করিবার সময় এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন :—

"ভারতে প্রাপ্ত শিক্ষা বলে, ভারতীয় লেবরেটরীতে গবেষণা করিয়া আপনি অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দেশ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কিরূপ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, আপনার কার্য দ্বারা আপনি তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।"

রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা আমাদিগকে বৃদ্ধি করিতে হইবে।"

শ্রীযুত এম. ভি. গঙ্গাধরন বিলাতে ভারতীয় ছাত্রের আইন শিক্ষার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একজন ভারতে শিক্ষিত আইনজ্ঞ কেন যে বিলাতে শিক্ষিত কোন আইনজ্ঞ অপেক্ষা কম দক্ষ হইবেন, তাহার কারণ তিনি বুঝিতে পারেন না। "আমি সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, যেদিন ভারতীয় ছাত্রেরা বিলাতের 'ইন্‌স্‌ অব্‌ কোর্টে'র কমন রুমে 'আশ্চর্য বস্তু' বলিয়া গণ্য হইবে। কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত বিলাতে শিক্ষিত আইনজ্ঞেরা, কিছু বেশী সুবিধা ভোগ করিতেন। কিন্তু ঐ সমস্ত সুবিধা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এখন ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে বিলাতে গিয়া আইন শিখিবার কোনই প্রয়োজন নাই।"

দেশী অথবা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিবার দুর্নিবার মোহ সম্বন্ধে আমার স্বদেশবাসীর বিশেষভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। বাংলা-দেশ তাহার চিন্তাহীনতার জন্য আর্থিক ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। এখনও প্রতি-কারের সময় আছে। কেহ যেন না ভাবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভের মোহ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম, তদ্দ্বারা আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই প্রচার করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয় অল্পসংখ্যক মেধাবী ছাত্রদের জন্য। অবশিষ্ট সাধারণ ছাত্রেরা জীবনসংগ্রামে প্রস্তুত হইবার জন্য পূর্ব হইতেই তদনুরূপ শিক্ষালাভ করিবেন। যখন সত্যকার জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হয় তখন উচ্চতর বিদ্যার গবেষণা করা অধিকাংশ সাধারণ ছাত্রের পক্ষে সময় ও শক্তির অপব্যয় মাত্র। আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। বিপদসূচক সঙ্কেত সম্মুখেই দেখা যাইতেছে এবং যে সমস্ত ছাত্র ও অভিভাবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি —বিশেষতঃ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য এখনও মোহাবিষ্ট, তাঁহাদের এ বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য, পূর্ব হইতে সাবধান হইলে, বিপদকে সহজে নিবারণ করা সম্ভব হইতে পারে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

শিল্পবিদ্যালয়ের পূর্বে শিল্পের অস্তিত্ব—শিল্পসৃষ্টির পূর্বে শিল্পবিদ্যালয়—ভ্রান্ত ধারণা

"পণ্ডিত চীন কোন শিল্প সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

"কিরূপে অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পের উন্নতি করা যায়, ষাট বৎসর পূর্বে জাপানের সম্মুখে এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। জাপান কয়েক বৎসরের জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং সমস্ত নবপ্রতিষ্ঠিত কলকারখানার কর্তৃত্ব তাহাদের হাতেই দিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক বিদেশী ম্যানেজার এবং তাহাদের প্রধান প্রধান বিদেশী সহকারীদের সঙ্গে একজন করিয়া জাপানী সহকারী নিযুক্ত হইল। এই সব জাপানী সহকারী কেবল শোভাবর্ধনের জন্য ছিল না। বিদেশী বিশেষজ্ঞেরা যেভাবে কার্যপরিচালনা করেন সেই বিদ্যা অধিগত করাই ছিল জাপানী সহকারীদের কর্তব্য।" **Baker** : *Explaining China.*

(১) যুদ্ধ ও শিল্প

১৯১৪ সালের অগস্ট মাসে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং রাসায়নিক জগতের উপর উহার প্রভাব বহুদূরপ্রসারী হয়। রাসায়নিক গবেষণা ও উহার প্রয়োগবিদ্যায় জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব ইংলন্ড এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে লাগিল। ইংলন্ডের সাম্রাজ্য জগতের সর্বত্র বিস্তৃত এবং জার্মান সাবমেরিন ইংলন্ডের বাণিজ্য-পোতগুলির ঘোর অনিষ্ট করিলেও, ইংলন্ড তাহার সাম্রাজ্যের নানা স্থান হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে লাগিল। আমেরিকা ও ভারতবর্ষ হইতে গম, মাংস এবং ফল বোঝাই জাহাজ ইংলন্ডে নিয়মিতভাবে আসিতে লাগিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে অস্ত্রশস্ত্রও সে আমদানি করিতে লাগিল। কিন্তু জার্মানী শত্রু কর্তৃক চারিদিকে অবরুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িল। এই সময়ে জার্মানীর রাসায়নিকগণ অসাধারণ কর্মশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়াই জার্মানী অনেকদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে পারিয়াছিল। নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রেট্‌স বিস্ফোরক পদার্থ তৈরির প্রধান উপাদান। নাইট্রেট অব সোডিয়াম বা চিলি সল্‌ট্‌পিটারও এজন্য খুব প্রয়োজন। বাহির হইতে এসব জিনিসের আমদানি বন্ধ হওয়াতে জার্মান রাসায়নিকেরা নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করিবার অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সুইডেনে এই সময়ে বাতাস হইতে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরির প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। জার্মানীও এই উপায়ে নাইট্রিক অ্যাসিড পাইতে পারিত কিন্তু তাহাতে ব্যয় বোধ হয় বেশী পড়িত। জার্মান রাসায়নিক হাবার এই সময়ে অ্যামোনিয়া হইতে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরির প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের সময়, ইংলণ্ড অন্যান্য কয়েকটি ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে যোগ দিয়া ফ্রান্সের চারিদিক অবরুদ্ধ করিয়াছিল এবং সেই সময়ে ফ্রান্সকেও এইরূপ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ফ্রান্সে বাহির হইতে সোডা ও চিনির আমদানি বন্ধ হইল। এই দুই প্রয়োজনীয় পদার্থ যাহাতে ফ্রান্সেই তৈরি হইতে পারে, সাধারণতন্ত্র দেশপ্রেমিক বৈজ্ঞানিকদের নিকট তদুদ্দেশ্যে অনুরোধ করিলেন। ইহার ফলে লে-ব্ল্যাঙ্ক লবণ হইতে সোডা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ বীটমূল হইতে চিনি তৈরির প্রণালী আবিষ্কার করিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত সেই প্রাচীন প্রবাদবাক্যেরই সমর্থন করে—প্রয়োজন হইতেই নব নব উদ্ভাবনের জন্ম।

ব্রিটিশ রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিকরাও পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন। তাঁহারা বেশ জানিতেন যে, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানী রাসায়নিক শিল্পে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে হইলে প্রবল প্রচেষ্টা করিতে হইবে। ইংলণ্ডের স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হইয়া উঠিল। যে দেশ নিউটন, ফ্যারাডে এবং র‍্যামজের জন্ম দিয়াছে, সে দেশ রাসায়নিক সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিতে পারে না। এই সন্ধিক্ষণে ইংলণ্ড কি করিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইংলণ্ড এই সংগ্রামে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট এই সময়ে আমার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লিখেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক বিভাগে আমাদের সাধারণ কাজের অথবা ছাত্রদের গবেষণা সংক্রান্ত কাজের মোটের উপর কোন ক্ষতি হয় নাই। চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে ডিমনস্ট্রেটর ছিলেন। তিনি বেশ হিসাব করিয়া রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রপাতির বার্ষিক সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেন। আমাদের লেবরেটরীতে ঐ সমস্ত জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে মজুত ছিল। কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য আমরা নিজেরাই প্রস্তুত করিলাম, ঐগুলি পূর্বে জার্মানী হইতে আমদানি করা হইত। কিন্তু আমাদের ফার্ম 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' হইতেই এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ হইয়াছিল। এখান হইতে গবর্নমেণ্টকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রিক অ্যাসিড সরবারহ করা হইল। সামরিক বিভাগে আমাদের জনৈক রাসায়নিকের প্রস্তুত 'অগ্নি নির্বাপক'এর খুব চাহিদা হইল। মেসোপটেমিয়ায় বারুদ ও বিস্ফোরকের গুদামের জন্য এগুলি চালান দেওয়া হইয়াছিল,—আমাদের রাসায়নিকগণের উদ্ভাবিত প্রণালীতে থাইওসাল্‌ফেটও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছিল। চায়ের গুঁড়া হইতে প্রচুর পরিমাণে ক্যাফিনও তৈরি করা হইত। আমাদের কারখানায় অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে রাসায়নিক তুলাদণ্ডও তৈরি হইত। মোটের উপর, যুদ্ধের ফলে কারখানার কয়েকটি বিভাগের কাজ আশাতীতরূপে বাড়িয়া গিয়াছিল।

ভারত ইউরোপীয় যুদ্ধে কম সাহায্য করে নাই। ভারতীয় সৈনিকরাই ইপ্রেসের যুদ্ধের সন্ধিক্ষণে মিত্রশক্তিকে রক্ষা করিয়াছিল। ভারতই মেসোপটেমিয়াতে শ্রমিক সরবরাহ করিয়াছিল। ভারত হইতেই রেলওয়ে লাইন, মালমসলা প্রভৃতি জাহাজে করিয়া লইয়া বাসরাতে বসানো হইয়াছিল। ছোট-বড় সমস্ত দেশীয় রাজারাই সৈন্য

ও অর্থ দিয়া ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। টাটা আয়রন ওয়ার্ক্‌সও যথেষ্ট কাজ করিয়াছিলেন ; ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ইস্পাতের আমদানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং টাটার কারখানায় প্রস্তুত সমস্ত জিনিস গবর্নমেণ্টের আয়ত্তাধীন হইয়াছিল।

এই সন্ধিক্ষণে, ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যেরূপ কাজ করিয়াছিল, তাহার জন্য শাসকেরা খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯১৬—১৮ সালের শিল্প কমিশন ভারত যাহাতে শিল্প সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তাহার সপক্ষে বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে গবর্নমেণ্ট এবং প্রধান শিল্প ব্যবসায়ীদের মত পরিবর্তন হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, ভারতকে শিল্পজাত বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মরক্ষায় সক্ষম করিবার জন্য কলকারখানা স্থাপন করা প্রয়োজন। যুদ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে শিল্পজাত আমদানির প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা এ যুগে আর সম্ভবপর নহে।"

এখানে বলা প্রয়োজন যে, কেমিক্যাল সার্ভিস কমিটিতে আমি যে স্বতন্ত্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি দেখাইয়াছিলাম যে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ যে শিক্ষা দিয়া থাকে, তাহা অতিমাত্রায় সাহিত্যগন্ধী, অতএব কতকগুলি লোকের মতে উহার পরিবর্তে শিল্প-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেই, চারিদিকে জাদুমন্ত্র বলে শিল্পবাণিজ্য কলকারখানা গড়িয়া উঠিবে।

স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া যে একটি শিল্প মহাবিদ্যালয় বা টেকনোলজিক্যাল ইউনিভারসিটি স্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র, তাহারও কারণ এই ভ্রান্ত ধারণা ; তিনি বলিয়াছেনঃ—

"শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন করিতে হইবে, যাহার ফলে দেশের কর্মক্ষেত্রে সমস্ত বিভাগে কতকগুলি নেতা তৈরি হইয়া উঠিবে,—শাসক, শিল্প-বিশেষজ্ঞ, ইত্যাদি। যে সমস্ত যুবকদের যেদিকে রুচি ও যোগ্যতা আছে, তাহাদিগকে সেই সেই বিষয়ে এইভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। যাহাদের নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতা আছে এবং যাহারা শ্রমিক জনসাধারণ সেই দুই শ্রেণীই দেশের আর্থিক ব্যাপারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই দুই শ্রেণীর সহযোগে ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। মধ্যবর্তীশ্রেণী যথা ফোরম্যান, কারিগর প্রভৃতি ইহারা স্বভাবতঃই তৈরি হইয়া উঠিবে,—ইহাদেরও প্রয়োজন আছে এবং তাহাদের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।" (অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত পঞ্চম বার্ষিক কনভোকেশান অভিভাষণ)

ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। প্রত্যেক দেশেই শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে, তাহার পরে বিজ্ঞান ও বিবিধ শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি আসিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃৎপাত্র এবং মৃৎশিল্পের কথা ধরা যাক। এগুলির

চল্‌তি নাম চীনামাটির বাসন এবং এই নাম হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে,— যে অতি প্রাচীন কাল হইতে চীনদেশে এই শিল্প প্রচলিত ছিল। চীনারা ঐ শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং জাপান তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে।

"মৃৎশিল্প রোমকদের অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু চীনারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই এ বিষয়ে দক্ষতা লাভ করে। (সান-ইয়াট-সেন তাঁহার Memories of a Chinese Revolutionary গ্রন্থে ইহার বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"যে চীনা শিল্পীরা এই সব মৃৎশিল্প তৈরি করিত, তাহারা পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র জানিত না")। প্রাচীন মিশরের কবরগুলির মধ্যে যে সব পাত্রের অবশেষ আছে, তাহাও মৃৎশিল্প-জাতীয়। ইউরোপে মধ্যযুগে মৃৎপাত্রে রং করা খুবই প্রচলিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে আলকেমিস্ট পিটার বোনাস এবং আলবার্টাস ম্যাগনাস্ ঐ সময়ে যে প্রণালীতে মৃৎপাত্রে রং করা হইত, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী শতাব্দীতে এই শিল্পের খুব উন্নতি হয়। অ্যাগ্রিকোলা এই শিল্প সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"যাঁহারা মৃৎশিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বার্নার্ড প্যালিসির নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। রঙীন ও উজ্জ্বল মৃৎশিল্প নির্মাণের জন্য তিনি বহু ত্যাগ স্বীকার করেন এবং এইরূপে আধুনিক মৃৎশিল্পের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ দ্বারা ইউরোপে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রচারিত হয়। কিন্তু L'Art de Terre et des Terres d'Argilé নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কেবল মৃৎশিল্পের কথাই আছে। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে বুটিকের মৃৎশিল্প সম্বন্ধে নূতন প্রণালী আবিষ্কার করেন এবং তাহার পর বৎসরে স্যাক্সনির মিসেন শহরে প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্পের কারখানা স্থাপিত হয়।

"মিসেনের কারখানায় মৃৎশিল্পের নির্মাণ-প্রণালী গোপন রাখা হইয়াছিল। সেইজন্য প্রাসিয়ার রাজা প্রসিদ্ধ রাসায়নিক পটকে উহার তথ্য নির্ণয় করিবার জন্য আদেশ দেন। কিন্তু পট বহু চেষ্টা করিয়াও কিছুই জানিতে পারেন নাই। তখন তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা করিতে থাকেন। কথিত আছে যে এজন্য পট প্রায় ত্রিশ হাজার বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করেন। বিভিন্ন খনিজ পদার্থে তাপ দিলে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, এই সমস্ত এবং মৃৎশিল্প সম্পর্কে আরও অনেক মূল্যবান তথ্য মিসেনের পরীক্ষা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি। এই সময়ে রোমারও মৃৎশিল্প নির্মাণ রহস্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন। তিনি দেখিতে পান দুই বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার সংযোগে উহা তৈরি হয়।

"রোমারের পরে ১৭৫৮ সালে লোরাগোয়ে, ডা'রসেট এবং লিগেসী ফ্রান্সে এই বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন, এবং তাঁহারা ম্যাকারের সহযোগে মৃৎশিল্প নির্মাণ-প্রণালী পুনরাবিষ্কারে সক্ষম হন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সেভার্সের বিখ্যাত মৃৎশিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত আসল মৃৎশিল্প দুর্লভ ছিল। বর্তমানে

ইহা সুলভ হইয়াছে, এবং সাধারণ দৈনন্দিন কাজেও এই সব পাত্র ব্যবহৃত হয়।" রস্কো এবং শোর্লেমার ২য় খণ্ড ১৯২৩।

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, এদেশে কোন শিল্প প্রবর্তকের পথ কিরূপ বাধাবিঘ্ন-সঙ্কুল। জাপান ও ইউরোপের পশ্চাতে বহু বৎসরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং তাহারা ঐ সমস্ত সুবিধার বলে অতি সুলভে পণ্য আমদানি করিয়া আমাদের বাজার দখল করিতে পারে।(১) কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস এবং অন্যান্য কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা হইতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কোন শিল্প ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, কত অর্থ, সময় ও শক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন।

কোন কোন মেধাবী ছাত্রকে বিদেশে শিল্প শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হইত ; তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া কোন নূতন শিল্প প্রবর্তন করিতে পারিবে, এইরূপ আশা আমরা মনে মনে পোষণ করিতাম। কিন্তু এইরূপ সোজা বাঁধা রাস্তায় কোন কাজ হইতে পারে না ; এ দেশেও বহু শিল্প প্রবর্তনের চেষ্টা এই ভাবে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

বিদেশ হইতে কোন শিল্পে বিশেষজ্ঞ হইয়া যখন কোন যুবক ফিরিয়া আসে, তখন সে যেন অগাধ জলে পড়িয়া যায়। তাহাকে মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে, কোম্পানি গঠন করিতে হইবে। ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে হইলে, কাঁচা মাল সংগ্রহ এবং বাজারে তৈরী শিল্পজাত বিক্রয় করা, সবই তাহাকে করিতে হইবে। এক কথায়, তাহার মধ্যে বিবিধ বিরোধী গুণের সমাবেশ থাকা চাই। যদিও সৌভাগ্যক্রমে সে মূলধনী সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলেও যখন কাজ আরম্ভ হয়, তখনই সত্যকার বাধাবিঘ্ন, অসুবিধা প্রভৃতি দেখা দেয়। যুবকটি যে দেশে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছে, সেখানকার জলবায়ু, কাঁচামাল এবং অন্যান্য অবস্থা, ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নিজের দেশের স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে তাহার হয়ত কোন জ্ঞান নাই। ইউরোপে সে বহু টাকা মূলধনে বিরাট আকারে পরিচালিত ব্যবসা দেখিয়া আসিয়াছে। ঐ দেশে শিক্ষিত দক্ষ কারিগরও সর্বদা পাওয়া যায়। মৃৎশিল্পের কথাই ধরা যাক। ইউরোপে বালি, মাটি, প্রভৃতি উপকরণ ভারতের তুলনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আরও একটা কথা, যুবকটি হয়ত বিদেশের কোন টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিয়াছে। বিদ্যালয়ে অধীত বিদ্যার সঙ্গে হাতেকলমে ঐরূপ কিছু ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শিল্পজাত তৈরি করিতে হইলে ঐ শিক্ষা বিশেষ কাজে আসে না। কোন কারখানায় প্রবেশ করিয়া, তাহার শিল্প প্রস্তুত-প্রণালী অবগত হওয়া বড়ই কঠিন কাজ। ব্যবসায়ী ফার্ম প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মত উদার নহে। যে সমস্ত গূঢ়

---

(১) বর্তমানে জাপান ও জেকোস্লোভাকিয়া কলিকাতার বাজারে দেশীয় শিল্পের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

রহস্য তাহারা বহুবৎসরের সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে অবগত হইয়াছে, সেগুলি বাহিরের লোককে শিখাইবার জন্য তাহারা ব্যগ্র নহে।

এমার্সন বলেন, ব্যবসায়ীদের পরস্পরের মধ্যে বেশ ঈর্ষার ভাব আছে। একজন রাসায়নিক একজন সূত্রধরের নিকট তাহার ব্যবসায়ের গূঢ় কথা বলিতে পারে, কিন্তু তাহার সমব্যবসায়ী আর একজন রাসায়নিককে কিছুতেই তাহা বলিবে না।

বিদেশে শিক্ষালাভার্থ যে সব যুবককে পাঠানো হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সাফল্য লাভ করিতে পারে না। এমন কি কোন কোন প্রথম শ্রেণীর এম. এস-সি. ডিগ্রিধারীরও এই দশা হইয়াছে। চীনদেশেও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার পরিণাম শোচনীয় হইয়াছে। একজন চিন্তাশীল লেখক কর্তৃক লিখিত চীন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এ বিষয়ে আমাদের দেশের সঙ্গে চীনের অবস্থার আশ্চর্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে।

"প্রণালী উপনিবেশ (স্টেট্‌স্ সেট্‌ল্‌মেন্ট) এবং তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে চীনারা ব্যবসায়ে নহে, পণ্য উৎপাদনেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। টিন শিল্পের কথাই ধরা যাক। এইসব স্থানে নির্দিষ্ট আইনকানুন আছে, করের হারও অত্যধিক নয়; এবং মামলা মোকর্দমা নিষ্পত্তিরও সুব্যবস্থা আছে। এরূপ ক্ষেত্রে চীনারা ব্যবসায়ে এবং পণ্য উৎপাদনে অন্য সমস্ত জাতিকে পরাস্ত করিয়াছে।

"তৎসত্ত্বেও একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিদেশে এই সমস্ত স্থানে যে সমস্ত চীনা সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহারা খুব দরিদ্র অবস্থায় গিয়াছিল। এমন কি প্রথমতঃ কুলির কাজ করিতেও গিয়াছিল। তারপর নিজেদের যোগ্যতা বলে তাহারা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। এই সব স্থানে তাহাদের অসংখ্য জাতি-কুটুম্বের কবল হইতে তাহারা অনেকটা মুক্ত; সুতরাং সহজে টাকা খাটাইতে পারে। শীঘ্রই কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ছোটখাট ঠিকা কাজ নেয়। তাহারা তাহাদের অধীনস্থ লোকদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকিয়া বুঝিতে পারে, কাহারা যোগ্য ফোরম্যান, কাহাদের উপর বেশী দায়িত্ব দেওয়া যায়, কাহারা কাজ করিতে ভয় পায়, কাহাদের সাহস বেশী ইত্যাদি। এইভাবে গোড়া হইতে কাজ করিতে করিতে তাহারা তাহাদের ব্যবসা গড়িয়া তোলে। হয়ত তাহারা ইংরাজী বা ডাচ ভাষাও কিছু কিছু শিখিয়া ফেলে এবং তাহার দ্বারা ব্যবসায়ের সুবিধা হয়। এইভাবে সুদীর্ঘ কালের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তাহারা ব্যবসায় চালাইবার উপযোগী এমন কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে, যাহার ফলে কোন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা ম্যানেজার সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারে।" (বেকার ঃ ১৭৯-৮০ পৃঃ)

"চীনা মূলধনীরা সাংহাই, ক্যান্টন প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত কারখানা স্থাপন করিয়াছে, সেগুলির সঙ্গে পূর্বোক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির বিস্তর প্রভেদ। এই সমস্ত মূলধনীরা তাহাদের ছেলেদের বিদেশে শিক্ষার্থ প্রেরণ করে। ছেলেরা সেখানে ব্যবসা পরিচালনা প্রণালী ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করে। তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পায়, চীন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানি করা এবং বিদেশ হইতে শিল্পজাতরূপে ঐগুলি আমদানি করার মত অস্বাভাবিক ব্যাপার আর

কিছু হইতে পারে না। তাহারা বুঝিতে পারে যে, বিদেশী শুল্ক এবং বিদেশী শ্রমিকদের অতিরিক্ত মজুরি বাদ দিয়া যদি মাল রপ্তানির খরচা বাঁচানো যায়, তবে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। পিতাকে এইসব কথা তাহারা সহজেই বুঝাইয়া দেয়। তাহারা এ কথাও বলে যে, তাহারা ব্যবসায় জানে। তাহারা কি ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় গ্রাজুয়েট হয় নাই? দুই বৎসর ফ্যাক্টরীতে কাজ করে নাই? পিতা সন্তুষ্ট হইয়া কারখানা স্থাপন করিবার জন্য মূলধন দেন। কারখানা তৈরির কাজ আরম্ভ হয়। ঠিকাদারদের লইয়া গোলমাল হয়, কাজে বিলম্ব হয়, ভাল কাজ হয় না এবং সেরূপ অবস্থায় কাজ অগ্রাহ্য করিলে ঠিকাদারেরা ধর্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করে। কারখানা তৈরি করিতে বরাদ্দের চেয়ে ব্যয় অনেক বেশী পড়ে, এরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। পিতা বিরক্ত হইয়া উঠেন। তবু তিনি কারখানা তৈরি শেষ করিতে আরও টাকা দেন। কারখানা তৈরি হইলে, আসল কাজ আরম্ভ হয়। তখন কলকব্জার গোল-যোগ ঘটিতে থাকে, নূতন কলকব্জায় প্রথম প্রথম এমন একটু-আধটু গোলযোগ হয়ই। লোকে নানা কথা বলিতে থাকে। কাজ চালাইবার জন্য যথেষ্ট মূলধন পাওয়া যায় না। চীনা কারখানাগুলিতে মূলধন সম্বন্ধে বরাদ্দ প্রায়ই খুব কম করিয়া ধরা হয়। আমেরিকা অপেক্ষা চীনে মূলধন উঠিয়া আসিতে দেরী লাগে, আদায় হইতে বিলম্ব হয়। বকেয়া বাকী আদায় হওয়াও বেশী কঠিন। ইহার উপরে, ফোরম্যানদের মধ্যে বিবাদের ফলে যদি ধর্মঘট হয়, তবে এইসব অনভিজ্ঞ তরুণ কর্মাধ্যক্ষেরা নিশ্চয়ই কাজ ছাড়িয়া দিবে। তাহাদের 'মুখ দেখানো ভার' হইয়া পড়ে, তাহাদের পরিবারেরও সেই অবস্থা। তাহাদের অন্য নানা সুযোগ আছে। তাহারা সরকারী কাজের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। আর একটা পরিত্যক্ত শূন্য কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

"কিন্তু যদি এইসব যুবক নিঃসম্বল অবস্থায় কাজ আরম্ভ করিয়া কারখানা স্থাপন করিত, নিজের উপার্জিত এবং অতিকষ্টে সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়ে খাটাইত, মালমসলা, ঠিকাদার, মজুর প্রভৃতির সম্বন্ধে যদি তাহাদের বহু বৎসরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের কাজে অসুবিধা ও গোলযোগ কম ঘটিত, ব্যবসায়ের উপরও তাহাদের এমন প্রাণের মায়া জন্মিত যে, উহাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার, সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটি করিত না। প্রথম আঘাতেই বিচলিত হইয়া দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কাজ ছাড়িয়া পলাইত না। প্রায় প্রত্যেক বড় বড় ব্যবসায়েই একটা দুর্যোগের সময় আসে; তাহা অতিক্রম করিতে পারিলে, সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহার জন্য যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক, তাহা বর্তমান যুগের শিক্ষিত চীনা যুবকদের মধ্যে নাই। আমি পুনর্বার বলিতে চাই, শিক্ষিত ও পণ্ডিত চীন শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে নাই।" (বেকার : ১৮০—৮২ পৃঃ)

শিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা ব্যবসা আরম্ভ করিয়া কিরূপে অকৃতকার্য হয়, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। জার্মানী ও আমেরিকাতে শিক্ষিত বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য (পি-এইচ. ডি) কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রকে আমি জানি। তাহারা

ঐসব দেশে রাসায়নিক এবং বৈদ্যুতিক কারখানায় শিক্ষানবিস হইয়া প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। দেশে ফিরিয়া তাহারা ঐসব বিদেশী ফার্মের 'ভ্রাম্যমাণ' ক্যান্‌ভাসার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(২) "ট্রাস্ট" ও "ডাম্পিং"

ইউরোপ ও আমেরিকাতে শিল্পপতিরা প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করে। এক একটা কারখানায় দৈনিক যে পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন হয়, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। দুনিয়ার বাজার তাহাদের করতলগত, সুতরাং এরূপ বিরাট আকারে পণ্য উৎপাদন করা তাহাদের পক্ষে পোষায়। সুয়েজ খাল তৈরি ও স্টীমারের প্রচলন হওয়ায় তাহারা পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত সহজে মাল রপ্তানি করিতে পারে। তাহারা লোকসান দিয়াও কম দামে মাল বিক্রয় করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দেশীয় শিল্পকে পিষিয়া মারিতে পারে।(২)

দৃষ্টান্তস্বরূপ সাবান শিল্পের কথা ধরা যাক্। ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার দরুন আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। সাবানের একটা প্রধান উপাদান 'অ্যালকালি' বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। তেলের বাজারেও দরের ওঠানামা প্রায়ই হয়। এই দরের ওঠানামা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা চাই এবং সুযোগমত যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা মাল কিনিয়া মজুত রাখা চাই। তাহা হইলে, হাতে কোন কন্‌ট্রাক্ট পাইলে মাল যোগাইয়া লোকসান পড়ে না। কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ী যখন বিদেশী ব্যবসায়ীর সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য কঠোর প্রতিযোগিতা করিতেছে, সেই সময়ে উক্ত বিদেশী ব্যবসায়ী সস্তায় জিনিস যোগাইয়া দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিষিয়া মারিতে পারে। বস্তুতঃ, এ যেন ঠিক বামন ও দৈত্যের মধ্যে লড়াই।

'ইম্পিরিয়াল রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠান' সম্বন্ধে নিম্নে যে দুইটি বিবরণ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক রহস্য জানা যাইবে।

"বর্তমান যুগে লোক যে ব্যয়বহুল ও বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করে, তাহা বর্তমান যুগের কার্যপ্রণালী ও অভিজ্ঞতার দ্বারাই সম্ভবপর হয়। রসায়ন শিল্পের এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে, যাহা শিল্পসমবায় (amalgamation) সম্পর্কীয় সমস্যার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিতে পারে। রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত-প্রণালীর দ্রুত পরিবর্তন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই শিল্পের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং এখন কিরূপ হইয়াছে, তাহা তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে।

"বর্তমান কালের রাসায়নিক শিল্প-নির্মাতারা যদি বাঁচিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগকে নিজেদের শিল্পজাত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগতের আধুনিকতম সংবাদ রাখিতে হইবে। তাঁহাদের এমন সব সুশিক্ষিত লোক রাখা প্রয়োজন, যাঁহারা

(২) বিদেশ হইতে সস্তায় পণ্য আমদানি বন্ধ করিবার জন্য এবং বিলাসদ্রব্যের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আইন করিবার ক্ষমতা প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রেরই আছে। কিন্তু ভারতের পক্ষ হইতে এরূপ কোন আইন করিবার প্রচেষ্টায় প্রবলভাবে বাধা দেওয়া হইয়াছে। আপ্টন ক্লোজ : The Revolt of Asia, pp. 104-5.

লেবরেটরীতে ক্ষুদ্রাকারে পরীক্ষাকার্য করিতে পারেন। মাঝে মাঝে বৃহদাকারে পরীক্ষাকার্য চালাইবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। ৪।৫টি পরীক্ষার মধ্যে অন্ততঃ তিনটিও যদি সফল হয়, তবুও আশার কথা। এইরূপে বৃহদাকারে পরীক্ষার ব্যাপার ব্যয়সাধ্য এবং যখন অনেকগুলি কর্মপ্রতিষ্ঠান হাতে থাকে, তখনই এরূপ ভাবে কাজ করা সহজ। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে ও গোপনে কাজ করিয়া সকলে মিলিয়া যাহাতে চাহিদার তিন গুণ বেশী মাল উৎপাদন না করে, সে সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হওয়া চাই। শিল্পসমবায়, পরস্পর সংযুক্ত কোম্পানি প্রভৃতি নূতন জিনিস নয়। ১৮৯০ সালে বহু ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে 'ইউনাইটেড অ্যালকালি কোম্পানি' গঠিত হয়। আমরা 'ডাই-স্টাফ্স্ করপোরেশানের' অভ্যুদয়ও দেখিয়াছি; ১৯০২ সালে এমন অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, যেগুলি পরে একত্র করিয়া 'দি ব্রুনার মণ্ড গ্রুপ' গঠিত হইয়াছে। 'নোবেল ইন্ডাস্ট্রিজ' নামক সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। সীসক এবং শ্বেত সীসকের শিল্পে আমরা বহু শিল্প-ব্যবসায়ের সমবায় দেখিয়াছি। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যাঁহারা ২৫ বৎসর পূর্বে শিল্প-সমবায়ের কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও উহা চালাইতে ইচ্ছুক। ইহার অনেক কারণ আছে। এস্থলে মাত্র একটি কারণের উল্লেখ করিব। কোন একক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে শিল্পসমবায়ের পক্ষে গবেষণা ও পরীক্ষাকার্য অনেক সহজ।

"বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানি তথ্য সংগ্রহ করিবে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সাহায্য করিবে, এবং নবগঠিত শিল্পসমবায় কোম্পানি তাহার বিনিময়ে, আর্থিক ব্যাপারে এবং কর্মপরিচালনা বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে সংযোগসূত্ররূপে কাজ করিবে। এইরূপে ব্রিটিশ রাসায়নিক শিল্প সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অন্যান্য দেশের শিল্পসমবায়ের সঙ্গে সমকক্ষভাবে কাজ করিতে পারিবে। প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে স্বতন্ত্ররূপে দুনিয়ার বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে না। একটি শক্তিশালী সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পসমবায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া তাহারা অনেক সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে।

বর্তমান কালে রাসায়নিক শিল্পের জন্য কলকব্জা যন্ত্রাদি বসাইবার জন্য বহু মূলধনের প্রয়োজন। কোন বিশেষ শিল্প নির্মাণে দক্ষতা, মূলধনের সদ্ব্যবহার, নির্মাণপ্রণালীর উৎকর্ষ—এই সমস্ত সাফল্যের পক্ষে অপরিহার্য। কেবল রাসায়নিক শিল্প নয়, আধুনিক সমস্ত শিল্পের পক্ষেই এ কথা খাটে।

সুদক্ষ ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত হইলে, বর্তমান যুগের শিল্পসমবায় কোন ব্যবসা একচেটিয়া করিতে অথবা কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে না। যাহাতে ব্যবসায় লাভজনক হয় এবং মূলধনী ও শ্রমিক উভয়েই তাহার সুবিধা ভোগ করে, বিভিন্ন শিল্পকে বাজারের দরের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিতে না হয়,—তাহার প্রতিই এই সমবায়ের লক্ষ্য থাকে। সুদক্ষ পরিচালকের অধীনেও বিভিন্ন শিল্পকে যেসব ঝড়-ঝাপ্টা সহ্য করিতে হয়, শিল্পসমবায় সে সমস্ত বিপদ হইতে অংশীদার ও শ্রমিকদিগকে রক্ষা করে।

"যে শিল্প-সমবায় গঠিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা রাসায়নিক শিল্পে ইংলণ্ড ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সর্বাগ্রগণ্য হইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই শিল্প জাতির আত্ম-রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং ইহার উপর অন্যান্য বহু শিল্পের প্রসার নির্ভর করে।" Chemistry and Industry, 1926. pp. 789-91.

(৩) রাসায়নিক শিল্প উৎপাদন এবং বর্তমান যুগের শিল্প

"রাসায়নিক শিল্প উৎপাদন প্রণালীর উন্নতির ফলে বর্তমান যুগের শিল্পে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্‌ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের লর্ড মেলচেট এবং তাঁহার সহকর্মিগণ একথা খুব ভাল রূপেই বুঝেন। এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই কার্যতঃ এখন ইংলণ্ড এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অধিকাংশ স্থানের রাসায়নিক পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও এই কোম্পানি কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়াছে। ১৯২৬ সালে দি ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্‌ডাস্ট্রিজ কোম্পানি গঠিত হয়। প্রথমতঃ ইহার মধ্যে চারটি কোম্পানি ছিল—ব্রুনার মণ্ড অ্যাণ্ড কোং, ইউনাইটেড অ্যালকালি কোং, নোবেল ইন্‌ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং ব্রিটিশ ডাই-স্টাস্‌স কর্পোরেশান লিমিটেড।

"বর্তমানে এই সমবায় অন্ততঃপক্ষে ৭৫টি কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ইহার মূলধনের পরিমাণ ৯½ কোটি পাউণ্ড, তাহার মধ্যে ৭ কোটি ৬০¾ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন বণ্টন করা হইয়াছে।

"১৯২৮ সালে সমবায়ের লাভ হইয়াছিল ৬০ লক্ষ পাউণ্ড।"

কোন শিল্প-প্রবর্তকের সম্মুখে কি বিরাট বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হয়, ভারতে লোহা ও স্টীলের কারখানার প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত জে. এন. টাটার জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়; তিনি এই বিরাট প্রচেষ্টার সাফল্য দেখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনিই ইহার পরিকল্পনার কারণ, এবং ইহার উদ্যোগ আয়োজন করিতে কঠোর পরিশ্রম করেন। এজন্য তাঁহার প্রায় ৪½ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সুদক্ষ বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় টাটা কারখানা স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্বাচন করেন। এই স্থানের সন্নিকটেই লোহার খনি এবং কয়লা ও চুনাপাথরও ইহার নিকটে পাওয়া যায়।

তিনি ইংলণ্ড ও জার্মানীতে স্থানীয় খনিজ লোহ ও কয়লার নমুনা পরীক্ষা করান এবং জীবনের অপরাহ্নে ক্লেশ স্বীকার করিয়া জার্মানী ও আমেরিকাতে গিয়া তথাকার লোহা ও ইস্পাত শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। টাটার পরবর্তিগণ এই স্কীম কার্যে পরিণত করিবার জন্য কি করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৯০৮ সালে সাক্‌চীতে কারখানা নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় এবং ১৯১১ সালের ২রা ডিসেম্বর সর্বপ্রথম ঐ কারখানাতে লোহ তৈরি হয়। যুদ্ধের সময়ে টাটার কারখানা দেশ ও গবর্নমেণ্টের জন্য খুব কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রমাণ করেন বাহির

হইতে কোন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের আমদানি যখন বন্ধ হয়, তখন স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান সে অভাব কিরূপে পূরণ করিতে পারে।

কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র, জার্মানী ও বেলজিয়ম ভারতের বাজার সস্তা দরের ইস্পাতে ছাইয়া ফেলিল। টাটার কারখানার ইস্পাত উহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিল না। কোম্পানির অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য আমদানী ইস্পাতের উপর শুল্ক বসাইতে হইল। ইহার মধ্য হইতে প্রায় ১½ কোটি টাকা দুই বৎসরে টাটার কারখানার সাহায্যার্থে দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ, টাটার লোহা ও করোগেট টিনের জন্য প্রত্যেক দরিদ্র করদাতাকে শতকরা ১২½ টাকা অতিরিক্ত দিতে হইতেছে।(৩)

টাটার লোহার কারখানা, তাহাদের বিপুল মূলধন, যথেষ্ট প্রাকৃতিক সুবিধা, সুশিক্ষিত বিশেষজ্ঞগণ সত্ত্বেও যদি গবর্নমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে অক্ষম হয়, তবে ভারতের অন্যান্য স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

(৪) বিশেষজ্ঞের জ্ঞান বনাম ব্যবসা

কিন্তু ভারতে বিজ্ঞান ও শিল্প বিদ্যার উন্নতির পথে গুরুতর বাধা—অন্য প্রকারের। আমাদের জাতীয় চরিত্রে, বিশেষতঃ বাঙালীদের চরিত্রে শিল্প ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার অনিচ্ছা মজ্জাগত। ইউরোপ ও প্রাচীন ভারতে ধাতুশিল্প, রঞ্জনবিদ্যা প্রভৃতি সংসৃষ্ট রাসায়নিক প্রণালী, বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ জ্ঞাত হইবার বহু পূর্বেই অভিজ্ঞতাবলে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মৎপ্রণীত 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থে আমি ইহার কতকগুলি প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত দিয়াছি। ইস্পাত-নির্মাণ শিল্প ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। প্রসিদ্ধ ডামাস্কাসের ইস্পাত এই প্রণালীতেই তৈরি হয়। ভারতে প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া এই শিল্প এক ভাবেই ছিল এবং কিছুদিন পূর্বে পাশ্চাত্যদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।(৪)

---

(৩) ইহা ৪।৫ বৎসর পূর্বে লিখিত। পরবর্তী সময়ে, 'ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স' বা সাম্রাজ্য বাণিজ্য-শুল্কের নীতি অনুসারে টাটার কারখানা বৎসরে ৮০ লক্ষ টাকা বা তাহারও বেশী 'রয়ালটি' পাইতেছে।

(৪) "দিল্লীর স্তম্ভ যে লৌহ দ্বারা নির্মিত, স্যার রবার্ট হ্যাডফিলড তাঁহার কারখানায় উহা বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা করেন। এই স্তম্ভ এক হাজার বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্যার রবার্ট বলেন, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই লৌহ অতি আশ্চর্য রকমের বস্তু। ইহাতে এমন কোন বিশেষ গুণ নিশ্চয়ই ছিল, যাহার ফলে এই এক হাজার বৎসর ইহা টিকিয়া আছে, কোনরূপ মরিচা পড়ে নাই; বর্তমান যুগে যে সমস্ত লৌহ প্রস্তুত হয়, তাহা অপেক্ষা উহা শ্রেষ্ঠ।

"বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ধাতু শিল্প সম্বন্ধে প্রভূত উন্নতি হইলেও, দিল্লীর স্তম্ভের লৌহ এখনকার কারখানায় প্রস্তুত লৌহ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তিনি বৈজ্ঞানিকের দায়িত্বজ্ঞান লইয়াই এই কথা বলিয়াছেন। ধাতু শিল্পের কতকগুলি গূঢ় রহস্য লুপ্ত হইয়াছে।" (মৎপ্রণীত Makers of Modern Chemistry.)

এই স্তম্ভ সম্বন্ধে রস্কো ও শোর্লেমার তাঁহাদের রসায়ন সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

ইউরোপে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শিল্পকার্যে নিয়োজিত হইবার জন্য ধাতু শিল্পে আশ্চর্য রকমের উন্নতি হইয়াছে।

বর্তমানে 'বেসেমারের' প্রণালীতে এক এক বারে ২০ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়। প্রায় প্রত্যহ নূতন নূতন উন্নত প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে। ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন এবং ভ্যানাডিয়াম ইস্পাতের সঙ্গে মিশ্রিত করিবার ফলে কামান ও মোটরকার নির্মাণ সম্পর্কে ইস্পাত শিল্পে যুগান্তর হইয়াছে। গে-লুসাক, গ্লোভার্স টাওয়ার্স এবং 'কনট্যাক্ট' প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের পরিমাণ বহু গুণে বাড়িয়া গিয়াছে।

বর্তমান রবার শিল্পের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। টায়ার নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে রবারের চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবারের উৎপাদনের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে। কাঁচামাল হইতে 'ভাল্কানাইজ্‌ড' রবার প্রস্তুত করিতে নানাবিধ রাসায়নিক প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। জার্মানীর রংয়ের কারখানাসমূহের কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। ইহার একটি কারখানাতে ২৫০ শতেরও অধিক রাসায়নিক নিযুক্ত আছেন। আমি কিছুদিন পূর্বে (১৯২৬) ডার্মস্টাডে মার্কের কারখানা দেখিয়া আসিয়াছি। ঐ কারখানার বিরাট কার্য দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। কিন্তু গবেষণা বিভাগ দেখিয়াই আমি বেশী মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এখানে প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞগণ কেবল যে নূতন নূতন ঔষধ তৈরি করিতেছেন, তাহা নহে, তাহার ফলাফলও পরীক্ষা করিতেছেন।

আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ইউরোপের বৈদ্যুতিক কারখানাগুলির কথাও উল্লেখযোগ্য। বার্ষিক যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি তাহারা তৈরি করে, তাহার মূল্য কয়েক শত কোটি টাকার কম হইবে না। এখানেও, বর্তমান শিল্প-কারখানার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণা মিলিত হওয়াতে এরূপ বিরাট উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে।

লর্ড মেলচেট আন্তরিক বিশ্বাস করিতেন "রাসায়নিকেরা বর্তমান জগতের আর্থিক ও শিল্পসম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান করিবেন।"

"আমাদের ব্যবসায়ের প্রত্যেক অঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবকদের প্রয়োজন আছে।......সমস্ত ব্যবসায়েই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রবর্তন করিতে হইবে।" "গ্রেট ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহ দিতে হইবে এবং ঐ উপায়ে যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক তৈরি হইবে, তাহারা দেশের শিল্পোন্নতিতে সহায়তা করিবে"—লর্ড মেলচেট এই নীতির সমর্থক ছিলেন।— Journal of Chemical Society, 1931.

লর্ড মেলচেটের মন্তব্য ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্প-ব্যবসায়গুলির সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উহাদের অধিকাংশ প্রায় দুই শত বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত

"বর্তমান যুগে আমাদের বৈজ্ঞানিক কারখানার বাষ্পীয় শক্তি দ্বারা চালিত বড় বড় হাতুড়ি ও রোলার দ্বারাও এরূপ প্রকাণ্ড লৌহপিণ্ড তৈরি করা কঠিন। হিন্দুরা হাতে কাজ করিয়া কিরূপে এরূপ বিশাল লৌহপিণ্ড তৈরি করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।"

হইয়াছে এবং এগুলির জন্য সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারীর প্রয়োজন আছে। বর্তমান রং শিল্পের জন্য এরূপ বৈজ্ঞানিকের কাজ অপরিহার্য।

আধুনিক রাসায়নিক শিল্প, ধাতুশিল্প, অথবা বৈদ্যুতিক কারখানাকে জগতের বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়, সুতরাং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাহাদিগকে সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের কাজে নিযুক্ত করিতে হয়। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে—মালিকদের নিজেই বৈজ্ঞানিক হইতে হইবে। তবে বর্তমান যুগে যে সেকেলে প্রণালীতে আর কাজ চলিতে পারে না, একথা বুঝিবার মত বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা তাঁহাদের থাকা চাই এবং আধুনিকতম উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য সর্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন। অ্যানড্রু কার্নেগী, জে. এন. টাটা, লর্ড লেভারহিউলম্, এবং স্বরূপচাঁদ্ হুকুমচাঁদ ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, কেননা তাঁহারা প্রথম হইতেই বিশেষজ্ঞদেব সাহায্য লইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান কালে ব্যবসায় আরম্ভ করিবার কাজে বিশেষজ্ঞেরা সামান্য অংশই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমি প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী পিয়ারপন্ট মরগ্যানের উক্তি পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি বলেন,—

"আমি যে কোন বিশেষজ্ঞকে ২৫০ ডলার মূল্যে কার্যে নিযুক্ত করিতে পারি, এবং তাহার প্রদত্ত তথ্য হইতে ২৫০ হাজার ডলার উপার্জন করিতে পারি। কিন্তু ঐ বিশেষজ্ঞ আমাকে নিযুক্ত করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারে না।"

কলিকাতার নিকট একমাত্র বৈজ্ঞানিক ইস্পাত শিল্পের কারখানা স্যার স্বরূপ-চাঁদ হুকুমচাঁদের উৎসাহ ও বুদ্ধিকৌশলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্যার হুকুমচাঁদের কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নাই। তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী এবং তিনি বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগাইয়াছেন। তিনি কারখানা আরম্ভ করিবার পূর্বে রসায়নবিদ্যা বা বৈদ্যুতিক ধাতুশিল্পের জ্ঞানলাভের জন্য অপেক্ষা করেন নাই।

আমি শার্লোটেনবার্গে (বার্লিন) Technische Hochschule (শিল্পে মহা-বিদ্যালয়) দেখিয়াছি, জুরিচ ও ম্যান্‌চেস্টারেও ঐরূপ প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি। সুতরাং এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে লঘু করিবার চেষ্টা, আমার দ্বারা সম্ভবপর নহে; কিন্তু আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, শিল্প প্রস্তুত প্রণালীর মূলসূত্রগুলির মাত্র এইসব শিল্পবিদ্যালয়ে শেখা যায়। কিন্তু শিল্প উৎপাদনের যে কার্যকরী জ্ঞান,—কিরূপে এমন শিল্পজাত উৎপন্ন করা যায়, যাহা জগতের বাজারে প্রতিযোগিতায় বিক্রয় করা যাইতে পারে,—সে অভিজ্ঞতা কেবল শিল্প ব্যবসায়ের মধ্যে থাকিয়াই লাভ করা সম্ভবপর।

সম্প্রতি বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে ইহার একটি দৃষ্টান্ত আমি দেখিয়াছি। তাহাতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, টেক্‌নোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা কারখানায় হাতেকলমে জ্ঞান লাভ করা অধিকতর ফলপ্রদ। কিছুদিন হইল, আমাদের একটি সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির যন্ত্র বসাইতে হয়। সাধারণতঃ যন্ত্রনির্মাতা কোন ইংরাজ শিল্পীকেই যন্ত্রটি বসাইবার জন্য ডাকা হইত এবং তিনি কোন বিশেষজ্ঞকে ঐ উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিতেন।

বিশেষজ্ঞকে অনেক টাকা পারিশ্রমিক, পাথেয় এবং হোটেলের ব্যয় দিতে হইত। ১৫ বৎসর পূর্বে আমরা একজন যুবককে কারখানার কাজে নিযুক্ত করি। তিনি তখন কেবল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে 'জুনিয়র কোর্সে' শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিংএর সংস্পর্শে থাকার দরুন, আমাদের ব্যবসায়ের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার নিজের বিভাগে তিনি বিশেষরূপে দক্ষতা লাভ করেন। আমরা বিনা দ্বিধায় তাঁহার হস্তে নূতন অ্যাসিড প্ল্যাণ্ট তৈরির ভার ন্যস্ত করিলাম। যন্ত্রনির্মাতা যে প্ল্যান ও বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছিলেন, তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে তাহার তাৎপর্য বুঝিয়া লইয়াছিলেন। এই কার্যে কৌশল ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া তিনি আমাদের সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেন। যন্ত্রনির্মাতা যে প্ল্যান দাখিল করেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি ত্রুটিও তিনি প্রদর্শন করেন এবং সেগুলি যন্ত্রনির্মাতা নিজেও মানিয়া লন। ভারতবর্ষে বোধহয় ইহাই অন্যতম বড় অ্যাসিড তৈরির কল। টেক্‌নোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে, ছাত্রদের সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য কলের একটি ক্ষুদ্র নমুনা দেখানো হয়। এইভাবে প্রদর্শনীতে তাজমহলের নমুনাও দেখানো হয়। সেই তাজমহলের নমুনা দেখিয়া যেমন কেহ তাজমহল তৈরি করিতে পারে না, তেমনি ক্ষুদ্র একটি নমুনা দেখিয়া অ্যাসিড তৈরির কলও কেহ বসাইতে পারে না।

(৫) ব্যবসায়ে কলেজের গ্রাজুয়েট

তবে কি শিল্প-ব্যবসায়ে কলেজে শিক্ষিত যুবকের স্থান নাই? স্থান নিশ্চয়ই আছে, তবে তাহা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। তজ্জন্য তাহাকে ছাত্রজীবনের অদ্ভুত ধারণাসমূহ ত্যাগ করিতে হইবে এবং নূতন করিয়া শিক্ষানবিস হইয়া গোড়া হইতে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় সে তাহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করিতে পারে। কার্নেগী বলেন,—

"পূর্বে আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবকেরা অল্প বয়সেই গ্রাজুয়েট হইত। আমরা এই নিয়মের পরিবর্তন করিয়াছি। এখন যুবকেরা বেশী বয়সে গ্রাজুয়েট হইয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করে—অবশ্য তাহারা পূর্বেকার গ্রাজুয়েটদের চেয়ে অনেক বেশী বিষয় শিখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকেরা যদি তাহাদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে সমস্ত শক্তি ও সময় দিয়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চেষ্টা না করে, তবে তাহারা যেসব যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে না, অথচ অল্প-বয়সে ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা বেশী অসুবিধা ভোগ করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

"অধিকবয়স্ক গ্রাজুয়েটেরা উন্নতিশীল ব্যবসায়ে আর এক প্রকারের অসুবিধায় পতিত হয়। ঐ ব্যবসায়ে চাকরির ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলিত, যোগ্যতা অনুসারে 'প্রোমোশান' দেওয়া হয়। সুতরাং সেখানে কাজ নিতে হইলে, সর্বনিম্ন স্তরে

প্রবেশ করিতে হয়। তাহাকে গোড়া হইতেই কাজ আরম্ভ করিতে হয় এবং এই নিয়ম তাহার নিজের পক্ষে ও অন্য সকলের পক্ষেই ভাল।— The Empire of Business, pp. 206-8.

"মেধাবী গ্রাজুয়েট মেধাবী অ-গ্রাজুয়েটের চেয়ে নিশ্চয়ই যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ। সে বেশী শিক্ষা পাইয়াছে এবং অন্য সমস্ত গুণ সমান হইলে, শিক্ষা দ্বারা নিশ্চয়ই যোগ্যতা বৃদ্ধি হইবে ; দুইজন লোকের সাধারণ যোগ্যতা, কর্মশক্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি একই প্রকারের হয়, তবে তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিকতর উদার ও উচ্চাঙ্গের শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই কর্মক্ষেত্রে বেশী সুবিধার অধিকারী হইবে।" (The Empire of Business).

পরলোকগত লর্ড মেলচেটের (আলফ্রেড মণ্ড) জীবনে ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। লর্ড মেলচেট একজন কৃতী ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি দুইটি ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন, ব্যারিস্টারও হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা লাডুইগ মণ্ড একটি সুবৃহৎ অ্যালকালি কারখানার মালিক ছিলেন। লাডুইগ মণ্ডও জার্মানীর হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছিলেন এবং কোলবে ও বুনসেনের নিকট রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁহার বন্ধু জন টি. ব্রুনারের অংশীদার-রূপে ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। ব্রুনার মেসার্স হাচিন্‌সনের রাসায়নিক কারবারের কর্তা ছিলেন।

কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালে (১৯৩১) লিখিত হইয়াছে :—

"১৮৭৩—১৮৮১ সাল পর্যন্ত আট বৎসর ব্যবসায়টিকে নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্যে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল ; কেবল অংশীদার দুইজনের প্রতিভা, দৃঢ় সঙ্কল্প এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই লাভ হইয়াছিল।

"এইরূপে জীবনের ষোল বৎসর কাল ধরিয়া তরুণ আলফ্রেড মণ্ড তাঁহার চোখের সম্মুখে একটি বৃহৎ ব্যবসায়কে গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন, এবং বৈজ্ঞানিক কর্মশালার আবহাওয়ার মধ্যে তিনি বাস করিয়াছিলেন।"

ইউরোপ ও আমেরিকাতে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে কিরূপ সীমাবদ্ধ, তাহা আমি দেখাইয়াছি। আমাদের দেশে, আবার ততোধিক বিপুল বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়। সাধারণ ইউরোপীয় বা আমেরিকান্ গ্রাজুয়েটের সাহস, কর্মোৎসাহ এবং সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জয়লাভের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প আছে, কিন্তু ভারতীয় গ্রাজুয়েটদের চরিত্রে ঐসব গুণ নাই। আমাদের রাসায়নিক কারখানায় প্রায় ৬০ জন বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট আছে। তাহারা তাহাদের দৈনন্দিন নির্দিষ্ট কাজ বেশ চালাইতে পারে। কিন্তু তাহারা নিজের চেষ্টায় বা কর্মপ্রেরণায় প্রায়ই কিছু করিতে পারে না।

বর্তমানে বাংলা দেশে আমাদের একটি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত। বাঙালীকে তাহার কৃষিজাত দ্রব্য—যথা পাট, শস্য, তৈল-বীজ, প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য অবাঙালীর উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের পক্ষে ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা কঠিন। কেননা, তাহা করিতে হইলে তাহাদিগকে (বাঙালীকে) কেবল যে উচ্চাঙ্গের

বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, তাহা নহে; ব্যবসায় পরিচালনার বিশেষ ক্ষমতাও থাকা চাই এবং এই শেষোক্ত গুণটি দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালীদের চরিত্রে এখনও বিকাশ লাভ করে নাই। সে ব্যবসায় পত্তনের জন্য মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে না, সে এখনও এমন কোন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারে নাই, যাহার নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লাভ করিতে পারে। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প বিদ্যালয়গুলি অসংখ্য গ্রাজুয়েট বা ডিপ্লোমাধারী সৃষ্টি করিতেছে। শিক্ষাব্যবসায়েও যথেষ্ট লোকের ভিড়। সুতরাং শিক্ষিত যুবকদের জীবিকা সমস্যা কিরূপে সমাধান করা যায়, সেই চিন্তাই আমাদের পক্ষে গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।(৫)

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা একটা সুস্পষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারি। কোন নির্দিষ্ট কাজে বা চল্তি কারবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকেরা অনেক সময় বেশ দক্ষতা দেখাইতে পারে। কিন্তু যাহাদের ব্যবসায়বুদ্ধি আছে এবং নানা বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া স্বীয় চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়াছে, সেই শ্রেণীর লোকই কেবল কোন ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে পারে।

বর্তমান চীন সম্বন্ধে একজন চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমি অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছি। আর একজন দূরদর্শী লেখকের সারগর্ভ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমি এই অধ্যায় শেষ করিব।

"একথা সত্য যে, চীন এখনও কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে চীনে বহু ব্যবসায় ও কলকারখানার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যেখানে ঐগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই দেখা গিয়াছে যে চীনা ব্যবসায়ী ও শ্রমিকেরা আধুনিক প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। চীনারা পাশ্চাত্য শিল্পকৌশল প্রয়োগ করিতে পারে। তাহারা কারখানা, রেলপথ, ব্যবসায়ীসঙ্ঘ এবং সামরিক বিভাগ গড়িয়া তুলিতে পারে।" Scott Nearing: *Whither China?* p. 182.

দেখা যাইতেছে, এই উভয় গ্রন্থকারেরই সুচিন্তিত অভিমত এই যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের সহযোগিতা চাই। তাহারা এমন সমস্ত বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করিবে, যাহারা পাশ্চাত্য শিল্পকৌশল কাজে লাগাইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট বা শিল্পবিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারীরা এই শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ নহে।

---

(৫) ১৯৩০ সালের ২৭শে অগস্ট তারিখে, বোম্বাই শহরে শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে, আমি বলিয়াছিলাম;—"১৬ বৎসর পূর্বে মডার্ন রিভিউয়ের প্রবীণ সম্পাদক আমাকে 'ডক্টরদের ডক্টর' উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল এই যে আমি বহু বৈজ্ঞানিক 'ডক্টরের' সৃষ্টি করিয়াছি। এখন আমি হতভম্বের ন্যায় দেখিতেছি যে, বৎসরের পর বৎসর কেবল যে আমার লেবরেটরী হইতেই অসংখ্য 'ডক্টরের' সৃষ্টি হইতেছে তাহা নহে, আমার পুরাতন ছাত্রেরা—কলিকাতা, ঢাকা, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে অসংখ্য 'ডক্টর' সৃষ্টি করিতেছেন। বস্তুতঃ যদি আমার রাসায়নিক শিষ্য ও অনুশিষ্য 'ডক্টর'দের একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়, তবে তাহা সত্যই বিস্ময়কর হইবে। কিন্তু তবু রাসায়নিক শিল্প সম্বন্ধে আমরা ভারতবাসীরা শিশুর মতই অসহায়।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। আমি এখন আরও কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বিবৃত করিব। এগুলির সঙ্গেও আমি ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট। এই দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিরূপ বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইয়াছে, তাহাও আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(১) কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস্ ও তাহার ইতিহাস

কলিকাতা পটারী ওয়ার্কসের উৎপত্তি ও ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। ১৯০১ সালে জনৈক ভদ্রলোক সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত রাজমহলের মধ্যে মঙ্গলহাট নামক স্থানে পোর্সিলেন ও মৃৎ-শিল্পের উপযোগী চীনামাটি আবিষ্কার করেন। ইহার ফলে, কাসিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বৈকুণ্ঠনাথ সেন এবং হেমেন্দ্রনাথ সেন একটি প্রাইভেট কোম্পানি গঠন করেন। হেমেন্দ্রবাবু যখন কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় সুরু করেন, তখন কলিকাতাতেই কলিকাতা পটারী ওয়ার্কসের কাজ আরম্ভ হয়। একটি পুকুরের ধারে কয়েকটি কুটীর লইয়া সামান্য আকারে ইহার পত্তন হয়। কয়েকজন কুম্ভকারকে এই কার্যে নিযুক্ত করা হয়।

সেই সময়ে মৃৎ-শিল্পে বিশেষজ্ঞ কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন ভদ্রলোক মৃৎ-শিল্পের কাজ কিছু কিছু জানিতেন, তিনিই নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান চালাইবার ভার গ্রহণ করেন। নারায়ণবাবু অনেকগুলি চুল্লী নির্মাণ করেন এবং কৃষ্ণনগরের কয়েকজন কারিগরের সাহায্যে মাটির খেলনা ও পুতুল তৈরি করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না, সুতরাং তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী কোন জিনিস তিনি তৈরি করিতে পারেন নাই। এইরূপ নিষ্ফল পরীক্ষায় প্রায় ২৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

এই শিল্পের প্রধান কাঁচা মাল চীনামাটি। সেইজন্য কোম্পানির মালিকগণ পাহাড় অঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণ চীনামাটি উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে মঙ্গলহাটে যন্ত্রপাতিও বসানো হইল। ২০ অশ্বশক্তি বয়লারটি পাহাড়ের উপরে লইয়া যাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে ইঞ্জিন ও বয়লার বসানো হইল এবং প্রচুর পরিমাণে চীনামাটি তৈরির ব্যবস্থা হইল। ইতিপূর্বে শ্রীযুত সত্যসুন্দর দেবকে জাপানে পাঠানো হয়। তিনি টোকিও এবং

কিংটোর শিল্পবিদ্যালয়ে মৃৎ-শিল্প শিক্ষা করিয়া ১৯০৬ সালের আরম্ভে দেশে ফিরেন। তাঁহার উপরেই কাজের ভার দেওয়া হয়।

তিনি কিছুকাল কাজ করেন। তখন দেখা গেল যে, ব্যবসায়টির ভবিষ্যৎ প্রসারের আশা আছে, কিন্তু জায়গাটি তাহার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সুতরাং মালিকেরা স্থির করেন যে ব্যবসায় বাড়াইতে হইবে এবং আরও বেশী পরিমাণ পোর্সিলেনের দ্রব্য তৈরি করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বেলেঘাটা রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ৪৫নং ট্যাংরা রোডে তিন একর জমি ইজারা লওয়া হয়। এইস্থানে প্রয়োজনীয় কলকব্জা বসানো এবং কারখানাগৃহ নির্মিত হয়। চুল্লী তৈরি হইলে ১৯০৭ সালে উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু সুদক্ষ কারিগর না থাকাতে কাজের কোন উন্নতি দেখা যায় না। জাপান হইতে দুইজন ভাল কারিগর আনিবার জন্য শ্রীযুত দেবকে জাপানে পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল যে, জাপানী কারিগরেরা এখানকার লোকদের কাজ শিখাইয়া যাইবে। ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানী কারিগরেরা এদেশে আসে এবং এক বৎসর সন্তোষ-জনকভাবে কাজ করে। তারপর তাহাদের দেশে পাঠানো হয়। এই কারিগরদের বেতন, যাওয়া-আসার খরচ ইত্যাদি বাবত মালিকদিগকে প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়। ব্যবসায়ে ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল এবং মালিকেরা আরও মূলধন দিতে লাগিলেন।

কিন্তু বাজারে সস্তা জাপানী ও জার্মান মাল আমদানি হওয়ার দরুন, তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশী মাল চালানো কঠিন হইয়া উঠিল। সুতরাং ১৯১৩ সালে শ্রীযুত দেবকে আধুনিকতম পোর্সিলেন ও মৃৎ-শিল্প প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য জার্মানীতে প্রেরণ করা সমীচীন মনে হইল। এরূপও স্থির হইল যে, শ্রীযুত দেব উন্নত ধরনের কলকব্জা ক্রয় করিবেন এবং ইংলণ্ড ও ইউরোপে বিবিধ মৃৎ-শিল্পের কারখানাও দেখিয়া আসিবেন। শ্রীযুত দেব এদেশে প্রাপ্তব্য কাঁচা মালের নমুনা সঙ্গে লইয়াছিলেন। তিনি ইউরোপের কয়েকটি লেবরেটরী ও কারখানাতে এই দেশীয় কাঁচা মাল পোর্সিলেন ও মৃৎ-শিল্প নির্মাণের পক্ষে কতদূর উপযোগী, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তিনি প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও উন্নত ধরনের চুল্লী তৈরির জন্য মালমসলার অর্ডার দিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সমস্ত জিনিস মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই এদেশে পৌঁছিয়াছিল। জার্মান ড্রেসডেন মডেলের নূতন চুল্লীও নির্মিত হইল। সমস্ত প্রয়োজনীয় কলকব্জা বসানো হইল,—যে জমির উপর কারখানা স্থাপিত, মালিকেরা তাহা ক্রয় করিলেন এবং পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ হইল।

১৯০৬ হইতে ১৯১৬ পর্যন্ত দশ বৎসরের বিবরণীতে দেখা যায় যে, ২,০২,৯৫২৲ টাকা মূল্যের জিনিস উৎপন্ন হইয়াছিল। এবং তন্মধ্যে ১,৯২,৮২৭৲ টাকা মূল্যের জিনিস বিক্রয় হইয়াছিল,—ঐ সময় পর্যন্ত মালিকেরা ব্যবসায়ের জন্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৯১৬—১৭ সালের জন্য যে বাজেট প্রস্তুত হয়, তাহাতে ম্যানেজার মিঃ দেব আরও কাজ বাড়াইবার প্রস্তাব করেন এবং

তদনুদ্দেশ্যে ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে আরও ২½ লক্ষ টাকা দিবার জন্য মালিকদিগকে অনুরোধ করেন। কিন্তু মালিকেরা কতকটা নৈরাশ্য বোধ করিতেছিলেন। তাঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও দীর্ঘকালের মধ্যে কোন ফল পান নাই। সুতরাং তাঁহারা ব্যবসায়টিকে লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করিতে মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একটি ইউরোপীয় কোম্পানির নিকট প্রস্তাব করিলেন এবং উক্ত কোম্পানিও ঐ প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হইলেন। মিঃ এইচ. এন. সেন এবং ফার্মের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরিয়া শর্তাদি লইয়া আলোচনা চলিল, কিন্তু কোন কারণে শেষ পর্যন্ত কিছুই স্থির হইল না।

তারপর, ১৯১৯ সালের ফেব্রুআরি মাসে, কলিকাতা পটারী ওয়ার্কসের ব্যবসায়টিকে "বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেড" এই নাম দিয়া দশ লক্ষ টাকা মূলধনসহ লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করা হইল।

নূতন কোম্পানি ড্রেসডেন টাইপের আরও তিনটি চুল্লী বসাইবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহাদের আশা ছিল যে, ইহার ফলে ৪,২০,০০০ টাকা মূল্যের জিনিস উৎপন্ন হইবে। এইরূপে ৮ লক্ষ টাকার আদায়ী মূলধনে বৎসরে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা লাভ হইবে এবং কোম্পানি বৎসরে শতকরা ২০ টাকা লভ্যাংশ দিতে পারিবেন।

তদনুসারে কোম্পানি নূতন চুল্লী ও যন্ত্রপাতি বসাইতে লাগিলেন, কারখানা বড় করা হইল। কিন্তু যখন এই সমস্ত কাজ শেষ হইল, তখন দেখা গেল যে, কাজ চালাইবার মত মূলধন কিছুই অবশিষ্ট নাই। ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত কোম্পানিকে ভীষণ অর্থসঙ্কট ভোগ করিতে হয়। কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্টদের ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুনাম ছিল। তাঁহারা যেরূপ বৃহৎ আকারে আড়ম্বরের সঙ্গে ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন, যে কোন প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় ফার্মের কাজের সঙ্গে উহার তুলনা করা যাইতে পারে। মিঃ দেবের উপরই পূর্ববৎ সমস্ত কাজের ভার ছিল। তিনি কেবল কারখানা এবং শিল্প উৎপাদনের দায়িত্বই গ্রহণ করেন নাই, কোম্পানির সেক্রেটারীর কাজের ভারও তাঁহার উপরে ন্যস্ত ছিল। সুতরাং ব্যবসায়টির ভারই তাঁহার উপরে ছিল, বলিতে হইবে। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করিয়াও তিনি কোম্পানির লাভ দেখাইতে পারিলেন না। নানা প্রতিকূল অবস্থা তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য করিতেছিল।

কোম্পানির দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ম্যানেজিং এজেন্টস মেসার্স পি. এন. দত্ত অ্যান্ড কোম্পানির নানা কারণে আর্থিক দুর্গতি হইল এবং ডিরেক্টরগণ উক্ত কোম্পানির নিকট হইতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রত্যাহার করাই সমীচীন মনে করিলেন। তদনুসারে ডিরেক্টরেরা নিজেরাই কার্যপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। মূল ডিরেক্টরদের অনেকেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন বা বোর্ড হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং নূতন ডিরেক্টরদের নির্বাচিত করা হইল।

ব্যয় অত্যন্ত বেশী পড়িত, এবং মাসিক যে আয় হইত তাহাতে প্রয়োজনীয়

ব্যয়াদি নির্বাহ করাই কঠিন হইত, লাভ তো দূরের কথা। ডিরেক্টরদের মনে আশঙ্কা হইল, তাঁহারা দেখিলেন সমস্ত ব্যবসায়ের ভার একই ব্যক্তির হাতে রাখা উচিত নহে। ডিরেক্টরেরা সমস্ত বিষয় তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তদন্ত চলিল এবং কমিটির চেয়ারম্যান ডি. সি. ব্যানার্জি ডিরেক্টরদের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিলেন। কোম্পানির কার্য পরিচালনা এবং শিল্পজাত উৎপাদনে যে সমস্ত ত্রুটি ছিল, তাহা এই রিপোর্টে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কোন দেশীয় শিল্প ব্যবসায় চালাইবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রধান বাধা এই যে, সমস্ত দেশীয় শিল্পকে বাজারে আমদানী বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হয়। কেবলমাত্র ভাবানুভূতির উপর একটা শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না এবং এরূপ কখনই আশা করা যায় না যে—ভারতীয়দের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য কেবলমাত্র 'স্বদেশী' বলিয়াই অধিক মূল্য দিয়া লোকে চিরকাল কিনিতে থাকিবে। তাহারা দেখিতেছে, ঐরূপ বিদেশী দ্রব্য অনেক কম মূল্যে বাজারে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ভারতীয় শিল্পনির্মাতাকে তাহার খরচার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বাজার মূল্যে জিনিস বিক্রয় করিতে হইবে। ইহার ফলে তাহাকে লোকসান দিয়াও ব্যবসায় চালাইতে হইবে। যতদিন পর্যন্ত সে অতি কম খরচায় জিনিস বিক্রি করিয়া লাভ করিতে না পারিবে, ততদিন তাহাকে এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে থাকিতে হইবে। ভারতীয় শিল্পনির্মাতাকে বৎসরের পর বৎসর লোকসান দিয়া নিজেই বাজার তৈরি করিয়া লইতে হইবে—এই কথাটা অংশীদারগণকে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। অংশীদারগণ যদি দেখেন যে তাঁহাদের টাকা বহু বৎসর ধরিয়া ব্যবসায় পড়িয়া আছে, কোনই লাভ হইতেছে না, এবং সেজন্য তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে শিল্প সম্বন্ধে ভারতের এখনও শৈশব অবস্থা এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলি যাহা বহু শত বৎসরের চেষ্টায় সম্পন্ন করিয়াছে, ভারত বর্তমানে তাহা করিতে পারে না। এই কারণেই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর যে সব দেশীয় শিল্প ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই উঠিয়া গিয়াছে। যে সামান্য কয়েকটি আছে, সেগুলিকেও অতি কষ্টে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইতেছে। এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত কয়টি টিকিয়া থাকিবে, তাহা বলা যায় না। বিদেশী শিল্পনির্মাতারা প্রভূত মূলধন খাটাইতেছে, সুতরাং তাহাদের উৎপাদনের খরচা যতদূর সম্ভব কম। ভারতকে শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে এখন সংগ্রাম করিতে হইতেছে। যদি এদেশী শিল্পনির্মাতা উৎপাদনের ব্যয় যথাসম্ভব কম করিয়া লাভ না দেখাইতে পারে, তবে বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাহারা টিকিতে পারিবে না।

পূর্বোক্ত বিবরণ শ্রীযুত সেনের রিপোর্ট হইতে হুবহু গৃহীত। লেখক এখন ইহলোকে নাই, একথা স্মরণ করিয়া মন দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। শ্রীযুত সেন তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে আমার অনুরোধে এই বিবৃতি লিখিয়াছিলেন।

উক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, কাসিমবাজারের মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং হেমেন্দ্রনাথ সেন এই শিশু শিল্পকে প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ পোষণ করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে

মহারাজা এবং মেসার্স বি. এন. সেন এবং এইচ. এন. সেন ভ্রাতৃদ্বয়ের অংশই শতকরা ৫০ ভাগ।

এই কোম্পানি এবং আরও কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে আমি সংসৃষ্ট। এইসব কোম্পানির অংশীদারগণ আমাকে প্রায়ই লভ্যাংশ না দিবার জন্য নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখেন।(১) কিন্তু পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে পাঠকরা বুঝিতে পারিবেন, শিল্প প্রবর্তকদের পথে কি প্রবল বাধা-বিপত্তি ছিল। জাপানের জাতীয় গবর্নমেণ্ট নানা শিশু শিল্প প্রবর্তন ও ঐ গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাই এই সব প্রশ্নের সমুচিত উত্তর।

"জাপানে নূতন শিল্প প্রবর্তনের দায়িত্ব গবর্নমেণ্টই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সব স্থলে গবর্নমেণ্ট প্রত্যক্ষ ভাবে কোন নূতন শিল্প প্রচেষ্টাকে মূলধন দিয়া সাহায্য করেন নাই, সে স্থলে তাঁহারা সংরক্ষণশুল্ক অথবা বৃত্তি দ্বারা শিল্প-নির্মাতাকে সাহায্য করিয়াছেন অথবা সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহাকে ঋণ দিয়াছেন।" Allen : *Modern Japan and its Problems*, p. 103.

একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাপানের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের দায়িত্ব ১৮৭০ খৃঃ হইতে ১৮৮৩ খৃঃ পর্যন্ত মোটের উপর গবর্নমেণ্টই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে গবর্নমেণ্টই জাপানের প্রধান কারখানাগুলির মালিক ছিলেন এবং তাঁহারাই ঐগুলি পরিচালনা করিতেন, কেননা আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা বিষয়ে জাপানের লোকেরা অনভিজ্ঞ ছিল। জনসাধারণকে শিল্প ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষিত করিবার জন্য গবর্নমেণ্টকেই এইসব কারখানা স্থাপন করিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—গবর্নমেণ্ট রেলওয়ে, কয়লার খনি এবং অন্যান্য খনি, পোতশিল্পের কারখানা, বয়নশিল্পের কারখানা, সিল্কের কারখানা, তুলা, পশম প্রভৃতির বয়ন শিল্পের কারখানা, এবং কাচ ও কাগজের কারখানার মালিক ছিলেন।

---

(১) কোম্পানির জনৈক বড় অংশীদার (তাঁহার অংশের মূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা) একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ডিরেক্টর বোর্ডের জনৈক সদস্যকে লিখিয়াছেন—"L. —আমাকে অনুগ্রহপূর্বক লিখিয়াছেন, কোম্পানির জন্য আপনাদিগকে কিরূপ বিপদের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে এবং আপনারা কিরূপে তাহার সম্মুখীন হইয়াছেন। আমরা, অংশীদারেরা দূর হইতে আপনাদের কৃতকার্যের জন্য নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। আমি নিজে আপনাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। আপনারা যে শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করিবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনাকে পাইয়াছি। এমন আর একজন ব্যক্তিও নাই যাঁহার বুদ্ধি ও মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। আপনারা যদি ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল না করিতে পারেন, তবে তাহা আশ্চর্যের বিষয় হইবে।

এই ইংরাজ অংশীদার সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণের পর ব্যবসায়টির উন্নতির জন্য সমস্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করিতেছেন। অ-ব্যবসায়ী হইলেও তিনি এই শিল্পটির সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন। গত দেড় বৎসর হইল, তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ১০টা হইতে ৬টা পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিতেছেন। পটারীর ব্যবসায়টিকে সফল করিয়া তোলাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা। একজন অংশীদারের পক্ষে এরূপ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিবার দৃষ্টান্ত দুর্লভ এবং সকলেরই অনুকরণযোগ্য।

"মেইজিদের সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির পর তের বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৮—১৮৯৩ খ্রীঃ এই সময়ের প্রথমার্ধে জাপানী শিল্পের শৈশবাবস্থায় গবর্নমেণ্টই উহার পরিচালক ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের কোঠায় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমে গবর্নমেণ্ট বেসরকারী পরিচালকদের হাতে দিতে থাকেন ; ঐ সময় প্রধান প্রধান শিল্পগুলি সরকারী পরিচালনাধীনে তাঁহাদেরই সাহায্যে পুষ্ট ছিল। এইরূপে সরকারী পরিচালনার স্থলে বেসরকারী কর্তৃত্বের প্রথা প্রবর্তিত হইল। ১৮৯৪ খ্রীঃ অর্থাৎ চীন জাপান যুদ্ধের সময় পর্যন্ত শিল্প-বাণিজ্যে এই বেসরকারী কর্তৃত্ব ছিল। তারপরে ব্যাপক ভাবে দেশের শিল্পোন্নতির জন্য আয়োজন হইতে থাকে।" **Uyehara :** *Industry and Trade of Japan.*

"প্রায় সকল দেশের গবর্নমেণ্টই বৃত্তি, সংরক্ষণ শুল্ক অথবা সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ সাহায্য দ্বারা শিল্পোন্নতিতে উৎসাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যেক দেশেই অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে, সরকারী বিধি ব্যবস্থা, শিল্প নির্মাতাদের পরস্পরের সহযোগিতা এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রথা ক্রমশঃ প্রবর্তিত হইয়াছে। অবাধ বাণিজ্যের দিকে ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও গ্রেট ব্রিটেন পর্যন্ত অবস্থার চাপে পড়িয়া, এই সব নূতন প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।"— Allen : *Modern Japan and its Problems.*

জাপানে প্রিন্স ইটো গবর্নমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় বাধ্যতামূলকভাবে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং হেমেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুতে বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেডের বিশেষ ক্ষতি হইল। এই কোম্পানি যে প্রবল বিঘ্ন-বিপদের মধ্যে অশেষ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, মাথা তুলিয়া থাকিতে পারিয়াছে, সে কেবল শ্রীযুত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ উদ্যম ও স্বার্থত্যাগের ফলে। সাত বৎসর পূর্বে তিনি কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। সেই সময় হইতে তিনি কোম্পানিকে রক্ষা করিবার জন্য অক্লান্তভাবে সময় ও শক্তি ব্যয় করিয়াছেন। শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বড় অ্যাটর্নী কোম্পানির অংশীদার, তাঁহার প্রত্যেক মিনিট ও ঘণ্টার মূল্য আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি নিজের ব্যবসায়ের জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিবার পরও প্রত্যহ দুই এক ঘণ্টা বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেডের কাজকর্ম দেখেন, ছুটির দিন তিনি কোম্পানির হিসাবপত্র প্রভৃতি ভালরূপে পরীক্ষা করেন। তিনি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর এম. এ. উপাধিধারী, কিন্তু তিনি মৃৎ-শিল্প সম্বন্ধে গ্রন্থাদি ভালরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে সর্বদা আলোচনা ও পরামর্শের ফলে ঐ শিল্পের ব্যবহারিক জ্ঞানও লাভ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে একাদিক্রমে ১২ ঘণ্টা কাজ করিতে দেখিয়াছি। কোম্পানিকে আর্থিক সংকট হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঋণ করিয়া নিজের সুনাম বিপন্ন করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই।

তিনি একটি স্বদেশী শিল্পের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এই ভাবই

তাঁহারই মনে সর্বদা জাগ্রত এবং ইহারই বলে কোন অবস্থাতেই তিনি নিরাশ হন নাই। বস্তুতঃ, দেশের এই শিল্পোন্নতি প্রচেষ্টা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় কার্য এবং ইহার জন্য তিনি অক্লান্তভাবে কাজ করিয়াছেন। আমি এইসব কথা লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি, কেননা, আমি জানি যে, শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় নীরব কর্মী, সাধারণে নাম জাহির করিতে তিনি চাহেন না। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত কথা প্রকাশ করিবার অধিকার আমার নাই। তবে এই পর্যন্ত আমি বলিতে পারি যে, দেশের শিল্পোন্নতি সাধনের জন্য তিনি এপর্যন্ত ৪।৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং সেজন্য তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত নহেন। এই সুযোগে আমি আমার আর একজন বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি অন্য একটি কোম্পানির ডিরেক্টররূপে আমার সহকর্মী। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসরের কাছাকাছি এবং তিনি ধনী লোকও নহেন। পারিবারিক দায়িত্বও তাঁহার যথেষ্টই আছে,—তৎসত্ত্বেও এই কোম্পানিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রায় ৪০ হাজার টাকা দিয়া নিজে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বেশ জানেন যে, এই টাকা ফিরিয়া পাইবার আশা নাই।

(২) বেংগল এনামেল ওয়ার্কস লিমিটেড

১৯২১ সালে নারকেলডাংগায় এক ছোট কারখানা লইয়া দি বেংগল এনামেল ওয়ার্কস লিমিটেডের কাজ আরম্ভ হয়। এই শিল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে, প্রথমে খুবই বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। একজন বাঙালী ভদ্রলোককে প্রথমে কাজের ভার দিবার প্রস্তাব হয়। কোম্পানির প্রবর্তকেরা তাঁহার সংগে এই শর্ত করিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কয়েকজন বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট ভারতীয় যুবককে এই কাজে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, কেননা ইহার দ্বারা কাজের প্রসারের পক্ষে সুবিধা হইবে। কিন্তু বাঙালী ভদ্রলোকটি এই শর্ত গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না এবং কোম্পানির অত্যন্ত সংকটসময়ে কার্যত্যাগ করিলেন। কোম্পানির কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোম্পানির একজন ডিরেক্টর শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (কলিকাতার কোন কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক) এই কার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং সমস্ত বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া এনামেল শিল্প সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইংলন্ড, জার্মানী ও আমেরিকা হইতে বহু গ্রন্থ আনাইয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর হইল। কারখানায় তখন মাত্র ছোট একটি চুল্লী ছিল এবং গৃহস্থের ব্যবহার্য ছোটখাট বাসনপত্র, দরজার নম্বর-প্লেট প্রভৃতি হইত।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভ্রাতা আমার ভূতপূর্ব ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সেই সময়ে জাপানে ছিলেন। তিনি সেখানে এনামেল শিল্প শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং

জাপানের কারখানা এবং জাপানের কারখানাসমূহে লব্ধ অভিজ্ঞতাবলে ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রবাবুকে নানা মূল্যবান্ পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ইহার পর জাপানে এনামেল শিল্পের উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন এবং ১৯২৩ সালে কলিকাতায় ঐগুলি লইয়া আসেন। কলিকাতা হইতে ১৫½ মাইল দূরে পল্‌তাতে একখণ্ড প্রশস্ত জমি ক্রয় করা হয় এবং তাহার উপরে দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কারখানা নির্মিত হয়। ভট্টাচার্য ভ্রাতৃদ্বয়ের, বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মোৎসাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পরিশ্রমের ফলে দেবেন্দ্রবাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়।

যাঁহারা বাংলা দেশে শিল্প ব্যবসায়ের সঙ্গে সংসৃষ্ট আছেন, তাঁহারাই এই কার্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সিমলার সামরিক কনট্রাক্ট বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর কর্নেল ডানলপ ১৯২৭ সালে এই কোম্পানির কারখানা পরিদর্শন করেন এবং ভারতের পক্ষে এই নূতন শিল্পে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া পাঁচ বৎসরে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার বিশেষ প্রশংসা করেন।

ভারতে প্রাপ্ত কাঁচা মাল লইয়া বহু পরীক্ষার পর এখানেই এনামেলের উজ্জ্বল রং করা সম্ভব হয়। কারখানাতে যেসব এনামেলের জিনিস হইত, তাহা আমদানী ব্রিটিশ পণ্যের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না।

ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে দক্ষ কারিগরের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, উৎপন্ন জিনিসের পরিমাণও বাড়িতে লাগিল। পূর্বে যেখানে একটি ছোট চুল্লী ছিল, সেস্থলে এখন কোম্পানির চারটি বড় 'মাফ্‌ল' চুল্লী হইয়াছে। এনামেলের রং করিবার জন্যও অনেকগুলি 'স্মেলটিং' চুল্লী স্থাপিত হইয়াছে।

বাঙালী যুবকেরা যাহাতে এই এনামেল শিল্পের কাজ গ্রহণ করে এবং উহাতে লাগিয়া থাকে, সে চেষ্টায় বহু বেগ পাইতে হইয়াছে। চুল্লীতে যে প্রচণ্ড তাপের মধ্যে কাজ করিতে হয় তাহা মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রযুবকেরা সহ্য করিতে পারে না এবং এইজন্য বহু যুবক কাজ করিতে আসিয়া কিছুদিন পরেই চলিয়া যায়। অবশেষে নোয়াখালির কর্মঠ মুসলমান এবং পূর্ববঙ্গ হইতে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কাজে লইতে হয়। উহাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণীয় কয়েকজন 'অশিক্ষিত' হিন্দু যুবকও কাজ করিতে থাকে। শিক্ষিত বাঙালী যুবকরা এই শ্রেণীর পরিশ্রমের কাজ করিতে প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশই করিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষিত যুবককে এনামেল শিল্পের কাজ শিখাইবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেই একই দুঃখের কাহিনী—বাঙালী যুবকদের শিথিল প্রকৃতি এবং কঠোর পরিশ্রমে অনিচ্ছা। এখনও পরিশ্রমী দৃঢ়চিত্ত বাঙালী যুবকদিগকে এই শিল্পে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে—কেননা, অনেকেরই বিশ্বাস, এই চেষ্টার সাফল্যের উপরেই এদেশের এনামেল শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

এখানে বলা যাইতে পারে যে, শিল্পপ্রধান ইংলণ্ডেও এনামেল শিল্পের সংরক্ষণ জন্য শতকরা ২৫% শুল্কের ব্যবস্থা আছে। এদেশে এই শিশু শিল্পকে শক্তি-

শালী জার্মান ও জাপানী শিল্পের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতা করিতে হয় অথচ কোন প্রকার সরকারী বা ব্যাঙ্কের সাহায্যই সে পায় না।(২)

অবশ্য, টাটার লোহার কারখানা বা টিটাগড় কাগজের কল প্রভৃতির মত বড় বড় ব্যবসার সোরগোল করিয়া অতিরিক্ত সংরক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে ; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া লুপ্ত হইতে হইবে। আমাদের 'মা-বাপ' সরকার এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য কতদূর আগ্রহান্বিত ইহাই তাহার নিদর্শন।

(৩) বাংলার বাণিজ্যপোত—অতীত ও বর্তমান

অনেকেরই বিশ্বাস যে, বাঙালী বাণিজ্যপ্রচেষ্টা এবং সমুদ্রযাত্রার প্রতি স্বভাবতঃই বিমুখ। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, এককালে বাঙলীরা দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

"বাঙালীরা যে এককালে সমুদ্রযাত্রা এবং বাণিজ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ তাহাদের সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে। চণ্ডীমঙ্গল ও মনসা-মঙ্গল সাহিত্য বাংলাদেশে সমধিক জনপ্রিয়। ঐ সব সাহিত্যে ধনপতি, শ্রীমন্ত, চাঁদ সদাগর প্রভৃতির বাণিজ্য ব্যপদেশে সমুদ্রযাত্রার বিবরণ আছে।"(৩)

৩৯৯—৪১৪ খৃষ্টাব্দে চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্তকে বাংলার প্রধান সমুদ্রবন্দররূপে দেখিতে পান। ভারতভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময় তিনি এই তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতেই জাহাজে যাত্রা করিয়াছিলেন। মিঃ ওকাকুরাও বলেন, মুসলমান-বিজয়ের সময় পর্যন্ত বাংলার উপকূলের সাহসী নাবিকগণ সিংহল, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন এবং চীন ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতেছিল। বাংলার 'বারভূঁইঞা'দের সময়ে এবং ঢাকার মোগল রাজ-প্রতিনিধিদের আমলে শ্রীপুর, বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ হিন্দুদের প্রধান নৌবন্দর ও

---

(২) ব্রিটিশ সরকারী বেতারবার্তার ৯ই জুন, ১৯২৯ তারিখের সংবাদে প্রকাশ :—"পার্লামেন্টের কমন্সসভা গতকল্য এনামেল শিল্প সংরক্ষণের জন্য শতকরা ২৫% শুল্ক বসাইবার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।"

বোর্ড অফ্ ট্রেডের প্রেসিডেন্ট স্যার ফিলিপ কানলিফ লিস্টার বলেন যে, ১৯২২ সালে লয়েড জর্জের গবর্নমেন্ট প্রথম এই শুল্ক স্থাপন করেন। ১৯২৪ সালে এই শুল্কের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে দেখা গেল, বিদেশী পণ্যের আমদানি বাড়িয়াছে। কিন্তু ১৯২৬ সালে শিল্প সংরক্ষণ কমিটির বিবেচনায় এই আমদানি বৃদ্ধির পরিমাণ পুনরায় শুল্ক বসাইবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। কিন্তু—ঐ কমিটিই বর্তমানে শুল্ক বসাইবার দাবি গ্রাহ্য করিয়াছেন, কেননা তাঁহাদের সম্মুখে বিদেশী পণ্যের আমদানি সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য উপস্থিত করা হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে এদেশের ১৮টি এনামেলের কারখানার মধ্যে ৬টিতেই লোকসান হইবার ফলে কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছে।"

একথা সত্য যে এনামেলের উপর শতকরা ১৫% আমদানি-শুল্ক আছে। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় না, কেননা এই শিল্প সংক্রান্ত যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়, তাহার উপরেও ঐ শুল্ক বসে। টাটার ইস্পাতের পাত এই শিল্পের একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানী ইস্পাতের পাতের চেয়ে টাটার ইস্পাতের মূল্য কম নয়।

(৩) রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় : *Indian Shipping.*

বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ঐ দুই স্থান বর্তমান বাখরগঞ্জ এবং চণ্ডীকানের (সাগরদ্বীপ) দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত ছিল। শ্রীপুরের অধিপতি কেদার রায় নৌশক্তিতে খুব প্রবল ছিলেন এবং আরাকানের রাজা ১৫০ খানি রণতরীসহ যখন সন্দ্বীপ আক্রমণ করেন, তখন কেদার রায় নৌযুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। রামচন্দ্র রায় এবং তাঁহার পুত্র কীর্তিনারায়ণের নেতৃত্বে বাকলা আর একটি প্রধান নৌকেন্দ্র হইয়া উঠে। কীর্তিনারায়ণ ফিরিঙ্গীদিগকে মেঘনা নদীর মোহনার সন্নিকটস্থ উপনিবেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া ঐ স্থান দখল করেন। তৎকালে হিন্দুদের নৌশক্তির সর্বপ্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল চণ্ডীকানে। বিখ্যাত যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্য এবং তাঁহার পুত্র উদয়াদিত্য এই নৌকেন্দ্র স্থাপিত করেন।(৪)

মুসলমান শাসকদেরও শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল। মিরজুমলা একটি বৃহৎ নৌবহর লইয়া আসাম অভিযান করেন। ১৬৬৪ সালে সায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবেদার হন। তাঁহার রাজধানী ছিল ঢাকায়। মগদিগকে দমন করিবার জন্য তিনি একটি নৌবাহিনী গঠন করেন। উহাতে ৩০০টি রণতরী ছিল এবং ঐ সমস্ত রণতরী হুগলী, বালেশ্বর, মুরাং, চিলমারী, যশোর এবং কালীবাড়ীতে নির্মিত হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম আমলেও তাঁহারা বাংলার পোতশিল্প গঠনে সহায়তা করেন। এ বিষয়ে তাঁহারা বলিতে গেলে ঢাকায় মোগল রাজপ্রতিনিধিদের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিয়াছিলেন। "১৭৮১—১৮০০ খৃঃ পর্যন্ত মোট ১৭,০২০ টনের ৩৮৫ খানি জাহাজ হুগলী নদীর বন্দরেই নির্মিত হইয়াছিল। ১৮০১—১৮২১ খৃঃ পর্যন্ত হুগলী বন্দরে মোট ১০৫,৬৯৩ টনের ২৩৭ খানি জাহাজ নির্মিত হয়।

ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, পোতশিল্পের কেন্দ্র রূপে ভবিষ্যতে কলিকাতা শহর গড়িয়া উঠিবে, এরূপ সম্ভাবনা আছে। তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"কলিকাতা বন্দরে ১০,০০০ টন জাহাজ আছে। ঐ সমস্ত জাহাজ মাল বহন করিবার জন্য ভারতেই নির্মিত। কলিকাতা বন্দরে বর্তমানে যত টন জাহাজ আছে এবং বাংলা দেশে পোতশিল্পে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে (এবং ভবিষ্যতে আরও দ্রুত উন্নতি করিবে), সেই সমস্ত বিবেচনা করিয়া নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে বাংলার ব্রিটিশ বণিকদের পণ্য লণ্ডন বন্দরে চালান দিবার জন্য যত টন জাহাজের প্রয়োজন হইবে, কলিকাতা বন্দর তাহা সমস্তই যোগাইতে পারিবে।"

বোম্বাইও এবিষয়ে কলিকাতা অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল না। বরং কোন কোন দিক দিয়া উন্নত ছিল। পার্সী জাহাজনির্মাতাদের সুদক্ষ পরিচালনায় বোম্বাইয়ের সরকারী ডকইয়ার্ড তৎকালে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জনৈক পর্যটক

---

(৪) উদয়াদিত্য ও মোগল সেনাপতির মধ্যে নৌযুদ্ধের বিবরণ সতীশচন্দ্র মিত্র কৃত যশোর খুলনার ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

বোম্বাই ডকের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন,—"এই ডকইয়ার্ডটি সুপ্রশস্ত, এখানে জাহাজী মালপত্র রাখার জন্য উপযুক্ত গুদামঘর আছে। এখানকার 'ড্রাই-ডক' এমন প্রশস্ত এবং সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত যে ইউরোপে তাহার তুলনা মিলে না।"(৫)

কিন্তু কলিকাতা বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে লর্ড ওয়েলেসলির ভবিষ্যৎবাণী সফল হইল না। "লণ্ডন বন্দরে যখন ভারতের নির্মিত জাহাজ ভারতীয় পণ্য বহন করিয়া উপস্থিত হইল, সেখানকার একছত্রী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তখন একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। টেমস নদীতে যদি কোন শত্রুপক্ষের জাহাজ উপস্থিত হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় এত চাঞ্চল্য হইত না। লণ্ডন বন্দরের জাহাজ নির্মাতারা আতঙ্কসূচক চিৎকার সুরু করিয়া দিল ; তাহারা প্রচার করিতে লাগিল যে, তাহাদের ব্যবসা ধ্বংস হইবার উপক্রম এবং লণ্ডনের যত জাহাজ ব্যবসায়ীদের পরিবারবর্গ না খাইয়া মরিবে।" (Taylor : *History of India*); লর্ড ওয়েলেসলির অভিপ্রায় ছিল যে, ভারতীয় জাহাজ পণ্য বহন করিয়া ইংলণ্ডের বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং এইরূপে ব্রিটিশ জাহাজগুলির সঙ্গে সমানাধিকারে বাণিজ্য করিতে পারিবে। কিন্তু ভারতীয় জাহাজশিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার এই উদার ও সঙ্গত নীতি, ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের চিৎকারে রহিত হইল। বোর্ড অব ডিরেক্টর এবং কোম্পানির মালিকগণ বড়লাটের এই উদারনীতির তীব্র নিন্দা করিয়া কড়া প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

বর্তমান সময়েও আমরা দেখিতেছি, যখনই বাংলা কিংবা বোম্বাইয়ে স্বদেশী স্টীমার লাইন চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, তখনই একাধিপত্য-ভোগকারী শক্তিশালী ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি প্রাণপণে এই সব স্বদেশী ব্যবসায়ীকে প্রারম্ভেই গলা টিপিয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছে। কলিকাতার 'ইষ্ট বেঙ্গল রিভার স্টীমার সার্ভিস লিমিটেডের' প্রতিনিধিরূপে, ভারতীয় পোতশিল্প কমিটির সম্মুখে শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ রায় যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ তাহা হইতে কিয়দংশ উধৃত করিতেছি :—

"মূলধনের অভাব অথবা দক্ষ পরিচালনার অভাবে এই কোম্পানির উন্নতি ব্যাহত

---

(৫) ১৭৩৬ খৃঃ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিম্নলিখিত পার্সীগণ বোম্বাই সরকারী ডকইয়ার্ডে প্রধান জাহাজনির্মাতার কাজ করেন :—১৭৩৬—১৭৭৪ খৃঃ লাউজী, ১৭৭৪—১৭৮৩ খৃঃ মানিকজী ও বোমেনজী; ১৭৮৩—১৮০৫ খৃঃ ফ্রামজী ও জামসেঠজী; ১৮০৫—১৮১১ খৃঃ জামসেঠজী ও রতনজী; ১৮১১—১৮২১ খৃঃ জামসেঠজী ও নৌরজী; ১৮২১—১৮৩৭ খৃঃ—নৌরজী ও কারসেঠজী।

সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানির জাহাজ 'জলবীরের' উদ্বোধন উপলক্ষে কিছুদিন পূর্বে ডাঃ পরাঞ্জপে বলেন :—"এই উপলক্ষে যে সময়ে ভারত পোতশিল্পে প্রসিদ্ধ ছিল, সেই অতীতের গৌরব-কাহিনী স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সেই সব দিনের কথা লোকে বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু একশত বৎসর পূর্বেও ভারতের নানা স্থানে বিলাতের চেয়েও ভাল জাহাজ নির্মিত হইত। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সরকারী নৌবিভাগ বোম্বাই বন্দরে একখানি যুদ্ধজাহাজ তৈরি করিবার ফরমাইজ দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ নৌবিভাগের কর্তারা ইউরোপীয় জাহাজ নির্মাতাগণকে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বোম্বাইয়ের জাহাজনির্মাতা জামসেঠজী ওয়াদিয়ার কৃতিত্ব জানা থাকাতে তাঁহারা তাঁহাকেই প্রধান নির্মাতারূপে মনোনীত করেন। প্রায় এক শত বৎসরকাল ওয়াদিয়া বংশের নাম জাহাজ শিল্পের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পোতশিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে বোম্বাই বন্দরের নাম লুপ্ত হইল।"

হয় না। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা সকলে মিলিয়া একজোট হইয়া অবৈধভাবে এই ভারতীয় ব্যবসায়কে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়াই ইহার অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। যখন এই কোম্পানি প্রথম কাজ সুরু করে, তখন অধিকাংশ পাটের কল এই কোম্পানির জাহাজে আনীত মাল লইত এবং মালের চালানি কাগজের অগ্রিম টাকাও দিত। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে, ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি দেখিল যে এই ভারতীয় কোম্পানি জাহাজের সংখ্যা বাড়াইতেছে ও ভাল ব্যবসা করিতেছে, এবং তাহার দৃষ্টান্তে আরও নূতন নূতন ভারতীয় কোম্পানি গঠিত হইতেছে। তখন তাহারা পাটের কলের মালিকদের সঙ্গে এইরূপ চুক্তি করিল যে ভারতীয় কোম্পানির জাহাজে আনীত মাল তাহারা গ্রহণ করিতে পারিবে না।"

সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানির অভিজ্ঞতা এর চেয়েও শোচনীয়। এই কোম্পানির উপকূলে বাণিজ্যের জন্য অনেকগুলি জাহাজ আছে। এই কোম্পানির চেয়ারম্যান শ্রীযুত বালচাঁদ হীরাচাঁদ ১৯২৯ সালের ২৫শে নভেম্বর যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে অনেক স্পষ্ট কথা আছে: "এই কোম্পানির জাহাজগুলি যে পথে চলাচল করে, সেখানে বিদেশী কোম্পানিগুলি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহু জাহাজ চালাইয়া থাকে। ইহার উপর উহারা এমনভাবে মালের ভাড়া হ্রাস করিয়াছে যে কোন ভারতীয় কোম্পানির পক্ষে প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করা কঠিন।" ব্রিটিশ রাজের অধীনস্থ ভারত গবর্নমেণ্ট ইচ্ছাপূর্বকই ভারতীয় জাহাজ শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতি বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীযুত বালচাঁদ হীরাচাঁদ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন—"ভারতের জাহাজ নির্মাণের কারখানাগুলিই কেবল একে একে লুপ্ত হয় নাই, পরন্তু ভারতে যাহাতে সরকারী প্রয়োজনেও জাহাজ নির্মিত না হইতে পারে, তাহার জন্য গবর্নমেণ্ট কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার ফলে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ডকইয়ার্ড বহু বর্ষ ধরিয়া ইংলণ্ড ও ভারতের প্রয়োজনে প্রভূত কার্য করিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে ভারতীয় পোতশিল্পের ধ্বংসযজ্ঞ সমাপ্ত হইল। যেদিন লণ্ডনে ভারতে নির্মিত জাহাজ ভারতীয় পণ্য বহন করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল সেইদিন হইতেই ইংলণ্ডের জাহাজ-নির্মাতাদের মনে ঈর্ষার অনল জ্বলিয়া উঠে, এবং তাহারা ভারতীয় পোত-শিল্পের ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করিতে থাকে। এতদিনে তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে।

"এইরূপে ৫০ বৎসরের মধ্যে, ভারতের পোতশিল্প ও সমুদ্র-বাণিজ্য যাহা প্রায় সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া প্রচলিত ছিল,—তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। ভারতীয় পোতশিল্প এককালে পৃথিবীর সমুদ্র-বাণিজ্য পথে যে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন এখন আর নাই। গবর্নমেণ্ট যেভাবে ভারতীয় পোতশিল্প ধ্বংস করিয়াছেন এবং ভারতের উপকূল বাণিজ্যে ব্রিটিশ প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠায় যেভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতের আর্থিক ধ্বংস সাধন প্রচেষ্টায় শোচনীয় দৃষ্টান্ত এবং ভারতের গত ৭০ বৎসরের আর্থিক ইতিহাসে, পোতশিল্পের ব্যাপারেই ইহা সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানিগুলিকে আয়-করের দায় হইতে মুক্ত

করা, ভারতের উপকূল বাণিজ্যে তাহাদের একাধিপত্য স্থাপনের জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করা, এবং সাধারণভাবে ভারতীয় পোতশিল্পের প্রতি বিরূদ্ধ ভাব—এই সমস্ত হইতেই বুঝা যায় যে, ব্রিটিশ আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য, ভারতীয় স্বার্থের ক্ষতি করিয়া ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার পন্থা অনুসরণ করা।"

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের ফলে গবর্নমেন্ট যে ভারতীয় বাণিজ্যপোত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্টে এইরূপ প্রস্তাব করেন ঃ "যে সমস্ত জাহাজের মালিক ভারতবাসীরা এবং যাহাতে প্রধানতঃ তাঁহাদেরই স্বার্থ ও পরিচালন ক্ষমতা আছে, সেই সমস্ত জাহাজের জন্যই ভারতের উপকূলে বাণিজ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" কিন্তু এদেশের আমলাতন্ত্র (ব্যুরোক্রেসি) ব্রিটিশ বণিকদের সঙ্গে স্বার্থসূত্রে আবদ্ধ, সুতরাং তাহারা এই প্রস্তাব ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। মিঃ হাজীর 'উপকূল বাণিজ্য বিলের' ভবিষ্যৎও অন্ধকারময়।

এই শোচনীয় দৃশ্যের সঙ্গে জাপানের জাতীয় গবর্নমেন্ট জাপানী পোতশিল্প ও সমুদ্র-বাণিজ্যের জন্য কি করিয়াছেন, তাহার তুলনা করুন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপান যে কেবল বাণিজ্যপোতই গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা নহে, নৌ-বিভাগেও সে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই অপূর্ব সাফল্যের কারণ, রাষ্ট্রের সমর্থন ও প্রেরণা ; জাপানী গবর্নমেন্টই বৃত্তি দিয়া এবং ব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহণের সুবিধা করিয়া দিয়া দেশের শিল্প গঠনে সহায়তা করিয়াছেন। ১৮৫৫ খৃঃ কমোডোর পেরী যখন জাপানে উপস্থিত হইল, তখন যে নূতন বিপদের মুখে তাহাকে পড়িতে হইবে, সেজন্য সে প্রস্তুত ছিল না। প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া শোগুণদের সঙ্কীর্ণ নীতির ফলে দেশের সমুদ্র-বাণিজ্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। 'পুনরুত্থানের' আরম্ভে প্রবীণ রাজনীতিকগণ আধুনিক প্রণালীতে বাণিজ্যপোত এবং নৌ-বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অ্যালেন তাঁহার "বর্তমান জাপান ও তাহার সমস্যা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ— "সেই সময়ে (১৮৭২ খৃঃ) গবর্নমেন্ট শিল্প ও বাণিজ্য বিদ্যালয় এবং বর্তমান ব্যবহারিক শিল্প-শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আধুনিক বাণিজ্যপোতও নির্মিত হইয়াছিল এবং যে সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ী কোম্পানি জাপানের বহির্বাণিজ্যে বর্তমান যুগে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেগুলি গবর্নমেন্টের সহায়তায় ও উৎসাহে ঐ সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৯৪ সালে যে সমস্ত শিল্প গবর্নমেন্ট কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বয়ন-শিল্প এবং পো-শিল্পই প্রধান।

পরবর্তীকালে সংরক্ষণ-শুল্ক ও বৃত্তি দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে শিল্প-প্রচেষ্টায় উৎসাহ দেওয়া হয় এবং গবর্নমেন্ট যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেগুলির পরিচালনা-ভার ক্রমে ক্রমে দেশবাসীর উপর অর্পিত হয়।

"গবর্নমেন্ট যদিও কতকগুলি শিল্পের পরিচালনা-ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তথাপি এগুলিকে গবর্নমেন্ট সাহায্য করিতেন। ১৮৯৯ সালে জাপান শিল্প-সংরক্ষণ

সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য-নীতি অবলম্বন করে এবং প্রধান প্রধান শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ-শুল্ক স্বারা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করে। ১৮৯৬ সালে পোত-শিল্প ও বাণিজ্য-পোতগুলিকে সরকারী বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ১৯১০ সালে এই ব্যবস্থা কিয়ৎপরিমাণে সংশোধিত হয় বটে, কিন্তু এখনও উহা বলবৎ আছে।" গত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময়, "পৃথিবীতে বাণিজ্যপোতের সংখ্যা হ্রাস হয় এবং জাপান এই সুযোগে নিজেদের বাণিজ্যপোতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এইরূপে যে জাপানকে ২০ বৎসর পূর্বেও বিদেশী জাহাজের সাহায্যে বহির্বাণিজ্য চালাইতে হইত, সেই জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থ সমস্ত দেশে বাণিজ্যব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করে।" ৫০ বৎসর পূর্বে জাপানে কতকগুলি ছোট ছোট জাহাজ মাত্র তৈরি হইত। কিন্তু বর্তমানে জাপানের কারখানায় প্রথম শ্রেণীর সমুদ্রগামী জাহাজ, ড্রেডনট এবং রণতরী তৈরি হইতেছে।(৬) জাপানের পোত-শিল্প গঠনের পক্ষে অনেক প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি আছে। তাহার খনিতে উৎপন্ন লৌহ ও কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর, সে তাহার পিণ্ড লৌহ আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের টাটা কোম্পানি ও ইণ্ডিয়ান আয়রন ও স্টীল কোম্পানি (আসানসোল) হইতে আমদানি করে এবং তাহা হইতে নিজেদের জাহাজ তৈরির উপযোগী ইস্পাত নির্মাণ করে। এই বিষয়ে জাপানের অপেক্ষা ভারতের অবস্থা অনেক ভাল, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য এই যে, তাহার নিজের স্বার্থের সঙ্গে তাহার বিদেশী প্রভুদের স্বার্থের সংঘাত হয় এবং তজ্জন্য তাহার স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়।

জাপানের তুলনায় আমেরিকা বর্তমান জগতের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অনেক বেশী উন্নতিশীল। তৎসত্ত্বেও আমেরিকা তাহার পোত-শিল্পের প্রসারের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ সম্বন্ধে স্যার আর্কিবাল্ড্ হার্ডের মন্তব্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"নৌ-বিভাগ যে দশটি নূতন ক্রুজারের জন্য ফরমাইজ দিয়াছেন, আমেরিকার কংগ্রেস তাহা এখনও মঞ্জুর করে নাই বটে; কিন্তু কংগ্রেস এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, যাহার ফলে আমেরিকা পোত-শিল্পে আবার তাহার পূর্ব গৌরবের অধিকারী হইবে। নূতন আইনের প্রধান প্রধান ব্যবস্থাগুলি এই :—

"জাহাজ-নির্মাণ ফাণ্ডে ২৫ কোটি ডলার রাখা হইয়াছে। এই টাকা হইতে শিপিং বোর্ড কোন জাহাজের মালিককে জাহাজ নির্মাণের জন্য সামান্য সুদে ব্যয়ের তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত ঋণ দিতে পারেন। বিশ বৎসরে এই ঋণ শোধ করিতে হইবে। পুরাতন জাহাজের সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্যও এইরূপ ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

"সরকারী কর্মচারীদের সরকারী কাজের জন্য বিদেশী জাহাজের পরিবর্তে আমেরিকার জাহাজই ব্যবহার করিতে হইবে।"

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, এই নূতন আইনে আমেরিকার জাহাজ

(৬) উইহারা : Industry and Trade of Japan.

নির্মাতাদের লাভ হইবে। কেননা বাজার প্রচলিত সুদ অপেক্ষা অল্প সুদে ঋণ পাওয়ার দরুন তাহারা সস্তায় জাহাজ তৈরি করিবার এ সুযোগ ত্যাগ করিবে না। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে আমেরিকা তাহার বাণিজ্যপোতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য ৫০০ কোটি ডলার ব্যয় করিবে।

মিঃ ভি. জে. প্যাটেল সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানির একখানি নূতন জাহাজের উদ্বোধন উপলক্ষে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ—

"এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতবাসী কর্তৃক নির্মিত ও পরিচালিত, প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় জাহাজ মূল্যবান্ ভারতীয় পণ্য দূরদূরান্তরে বিদেশে বহন করিয়া লইয়া যাইত। সকলেই জানেন কতকগুলি ঘটনার সমবায়ে ভারতের সেই পোত-শিল্প ধ্বংস হইয়াছে এবং ভারতের পক্ষে এখন বাণিজ্যপোত বিষয়ে তাহার পূর্ব-গৌরব পুনরাধিকার করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতে কয়েকটি ভারতীয় জাহাজ কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছিল,—কিন্তু সেগুলির অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বর্তমানে কিছু না বলাই ভাল।"

মিঃ প্যাটেল অতঃপব সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানির ইতিহাস বিবৃত করেন এবং বিদেশী কোম্পানিরা কিরূপে ভাড়া হ্রাস করিয়া উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও বলেন। "কোম্পানি ছয়খানি আধুনিক মালবাহী জাহাজ তৈরি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু এই ইচ্ছা তাঁহাদের ত্যাগ করিতে হইল। স্টীমার তৈরির জন্য কোম্পানি অর্ডার দিতে পারিলেন না, কেননা 'ট্রেড ফ্যাসিলিটিজ কমিটি' তাঁহাদের 'গ্যারাণ্টি' দিবার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন। যাঁহারা ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে সৌহার্দ্য কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ব্যাপারটি বড়ই দুঃখদায়ক। 'ট্রেড ফ্যাসিলিটিজ কমিটি' তাঁহাদের ২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ডের ফাণ্ড হইতে বিদেশী জাহাজ কোম্পানিগুলিকে ২২½ লক্ষ পাউণ্ড দিতে পারিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ভারতের একটি জাহাজ কোম্পানির জন্য মাত্র ২½ লক্ষ পাউণ্ডও দিতে পারিলেন না, অথচ ভারত ইংলণ্ডকে গত মহাযুদ্ধে জয়লাভে অশেষ প্রকারে সহায়তা করিয়াছে।

সমুদ্রতীরবর্তী প্রত্যেক দেশের গবর্নমেণ্ট যখন নিজেদের জাতির বাণিজ্যপোত গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্বপ্রকারে সহায়তা করিতেছেন, তখন ভারতবাসীরা কি আশা করিতে পারে না যে, তাহাদের গবর্নমেণ্টও এই মহান্ শিল্পটি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সহায়তা করিবেন? ভারত গবর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত বাণিজ্যপোত কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, অন্যান্য দেশের উপকূল বাণিজ্য যেমন তাহাদের নিজেদের জাহাজের জন্যই সংরক্ষিত, ভারতের উপকূল বাণিজ্যও তেমনি ভারতীয় জাহাজের জন্যই সংরক্ষিত থাকিবে। কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্ট এই সামান্য প্রস্তাবটিও এ পর্যন্ত কার্যে পরিণত করিলেন না। সুতরাং গবর্নমেণ্টের এই ভাবগতিক দেখিয়া

এদেশের লোকেরা যে হতাশ হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সমুদ্রপথে ভারতের বিপুল বহির্বাণিজ্যের কথা আমি এস্থলে বলিতেছি না, উহার সঙ্গে ভারতীয় জাহাজের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে।

"পোতবাহী পণ্যের জন্য ভারত যে ভাড়া দেয় তাহার পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ৩½ কোটি ৪ কোটি পাউণ্ড হইবে। ইহার প্রধান অংশই বিদেশী জাহাজ কোম্পানি-গুলি পায়। ভারতবাসীরা যে এই অর্থের যতটা সম্ভব নিজেদের দেশেই রাখিয়া দেশবাসীর আর্থিক দুর্দশার কিয়ৎপরিমাণ লাঘব করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক।"

'দি মুসলমান' পত্রিকা (২১শে অক্টোবর, ১৯২৮) হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বিবৃতি হইতে এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হইবে :—

"ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ এম. এন. হাজীর 'উপকূল বাণিজ্য বিলের' যখন আলোচনা হইতেছিল, তখন রেঙ্গুনের 'বেঙ্গল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশান' ঐ বিলকে সমর্থন করিয়া তার করিয়াছিলেন। এই আইনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে গিয়া তাঁহারা কয়েকটি দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নবগঠিত স্বদেশী কোম্পানি 'বেঙ্গল বর্মা স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানি লিমিটেডের' জাহাজ চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুনের মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। কিন্তু বিদেশী জাহাজ কোম্পানিগুলি অত্যধিক ভাড়া কমাইয়া এই দেশীয় জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে অবৈধ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ১৯০৫-৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল স্টীম ন্যাভিগেশান কোং লিমিটেড বিদেশী জাহাজ কোম্পানির এইরূপে অবৈধ প্রতিযোগিতায় কিভাবে উঠিয়া যায়, তাহাও সকলেই জানেন। ভারতের উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজের জন্য সংরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। আমাদের পাঠকেরা জানেন যে, বিদেশী জাহাজ কোম্পানিগুলি বেঙ্গল বর্মা স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানিকে পরাজিত করিবার জন্য চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুনের মধ্যে তাহাদের যাত্রীভাড়ার হার ১৪৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকাতে নামাইয়াছিল,—এই নূতন স্বদেশী শিল্পকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহারা এরূপ ভয়ও দেখাইয়াছিল যে, যাত্রীভাড়া তাহারা একেবারেই তুলিয়া দিবে। আর একটি বিদেশী জাহাজ কোম্পানি বেঙ্গল বর্মা স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানির প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী আবদুল বারি চৌধুরীর সঙ্গে আর এক দিক দিয়া অবৈধ প্রতিযোগিতা করিতেছে। চৌধুরী সাহেবের লঞ্চ এতদিন যে সব নদীতে যাতায়াত করিত, ঐ বিদেশী কোম্পানি সেই সব স্থানে তাহাদের লঞ্চ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। উহার উদ্দেশ্য, বেঙ্গল বর্মা স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তার আর্থিক ক্ষতি যদি করা যায়, তবে তাহার ফলে কোম্পানিটিও ফেল পড়িয়া যাইবে।"

আমি নিজে আর একটি দেশীয় স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানির সহিত যুক্ত আছি। এই কোম্পানিটি ছোট। আমাদেরও ঠিক পূর্বোক্ত রূপ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। গত ২২ বৎসরে এই কোম্পানির প্রায় ২ লক্ষ টাকা

লোকসান হইয়াছে। এই কোম্পানির লাইনের ভাড়া ছিল এক টাকা। কিন্তু একটি শক্তিশালী ব্রিটিশ কোম্পানি আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ঐ লাইনেই স্টীমার চালাইতে লাগিল এবং ভাড়া কমাইয়া মাত্র এক আনা করিল। কিন্তু কোম্পানির ২।৩ জন ডিরেক্টর স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ বশতঃ সমস্ত ক্ষতি অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন, নতুবা কোম্পানিটি বহুদিন পূর্বেই উঠিয়া যাইত।

হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে যে, গত ২৫ বৎসরে, ২০টির অধিক ভারতীয় জাহাজ কোম্পানি, একুনে প্রায় দশ কোটি টাকা-মূলধন লইয়া ভারতের উপকূলে ব্যবসা চালাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ব্রিটিশ কোম্পানি-গুলির ভাড়া হ্রাসের প্রতিযোগিতায় কারবার গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে।

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট এই স্বদেশী শিল্পের ধ্বংস-সাধনে যথাশক্তি সহায়তা করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত বিবৃতিগুলি হইতে এবিষয়ে আরও অনেক কথা জানা যাইবে।

"কোর্টের চক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ হইয়াছিল, লর্ড ওয়েলেসলির ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদানের নীতি। এই নীতির ফলে ভারতীয় বাণিজ্যপোত গড়িয়া উঠিতেছিল এবং ভারতীয় বাণিজ্যও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাদের অদূরদর্শী সঙ্কীর্ণ নীতির দ্বারা চালিত হইয়া গবর্নর জেনারেলের এই উদার নীতির মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। এবং যদিও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন, তথাপি কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ এবং মালিকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। Meadows Taylor: *History of India.*

"ব্রিটিশ ভারত উপকূল-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতেছিল, কিন্তু সুয়েজ খাল খোলা হইলে, জাহাজী ডাকের ঠিকাদার পি. অ্যাণ্ড ও. কোম্পানিকে খালের ভিতর দিয়া স্টীমার লইয়া ইউরোপীয় সমুদ্রে চালাইতে হইল। এরূপ ব্যবস্থায় লিডেনহল স্ট্রীটের ডিরেক্টরগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহাদের জাহাজ অতঃপর ইউরোপীয় নাবিকগণ দ্বারা চালিত হইবে। ভারত হইতে চীন এবং চীন হইতে জাপান—কেবল এই সব স্থানে ভারতীয় লস্করগণ জাহাজ চালাইতে পারিবে। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে ঘোর অনিষ্ট হইল,—ব্রিটিশ নাবিকগণের দুর্বিনীত বিদ্রোহী ভাব এবং মাতলামি প্রকট হইয়া পড়িল এবং নূতন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল।..... এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে, এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইল।"—*The Imperial and Asiatic Quarterly Review and Oriental & Colonial Record,* third series—July—Oct., 1910.

স্বদেশী পোত-শিল্প

এক শতাব্দী পূর্বে গবর্নমেণ্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ঃ

"ফরোয়ার্ড" সম্পাদক মহাশয়েষু (তাঃ ২৬-৯-২৮)

মহাশয়,

বিদেশী গবর্নমেণ্টের জন্যই আমাদের দেশের পোত-শিল্প ধ্বংস হইয়াছে, এরূপ কথা বলা হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে ১৭৮৯ খৃঃ ২৯শে জানুআরি তারিখের 'কলিকাতা গেজেটে' (অতিরিক্ত পত্র) প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের নিকট বেশ কৌতূহল-প্রদ হইবে। কয়েক শ্রেণীর বোট তৈরি করা ও মেরামত করা সম্বন্ধে কেন যে নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল, বিজ্ঞপ্তিতে তাহার কারণ প্রদর্শিত হয় নাই।

"ফোর্ট উইলিয়াম,

রাজস্ব বিভাগ, ১৪ই জানুআরি, ১৭৮৯

"এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ ব্যতীত) নিম্নলিখিত রূপ আকার ও আয়তনের বোটগুলি আগামী ১লা মার্চের পর তৈরি করিতে বা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

'লুখা' (Luckha)—৪০—৫০ হাত লম্বা ও ২½—৪ হাত চওড়া,
'জেল্‌কিয়া (Zelkia)—৩০—৭০ হাত লম্বা ও ৩½—৫ হাত চওড়া।
চাঁদপুরের 'পঞ্চওয়েস' যাহাতে দশ দাঁড়ের বেশী আছে।

"যশোহর, ঢাকা, জালালপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ২৪ পরগনা, হিজলী, তমলুক, বর্ধমান ও নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটগণকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ১লা মার্চের পর তাঁহাদের এলাকার মধ্যে পূর্ববর্ণিত রূপ যে সমস্ত বোট তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, সেগুলি দখল ও বাজেয়াপ্ত করিবেন। যদি কোন জমিদার তাঁহার এলাকার মধ্যে পূর্ববর্ণিত রূপ কোন বোট তৈরি করিতে বা মেরামত করিতে দেন (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত আদেশ ব্যতীত), তবে তাহা গবর্নমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

"যদি কোন সূত্রধর, কর্মকার বা অন্য কোন প্রকার শিল্পী এইরূপ বোট নির্মাণ বা মেরামতকার্যে নিযুক্ত থাকে (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত), তবে তাহাকে একমাস পর্যন্ত ফৌজদারী জেলে অবরুদ্ধ করা হইবে অথবা ২০ ঘা পর্যন্ত বেত্রদণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে।

"সপারিষৎ গবর্নর জেনারেলের আদেশ অনুসারে।"

এই সরকারী বিজ্ঞপ্তির অর্থ সুস্পষ্ট।

বশংবদ,
জনৈক পাঠক।"

এইরূপ লোমহর্ষণ আদেশ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কোন সভ্য দেশের গবর্নমেণ্টের ইতিহাসে এরূপ নিষ্ঠুর আদেশের তুলনা নাই।

ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। "যতদিন ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ বণিকদের মধ্যে অসাধু স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন না হইবে, যতদিন গবর্নমেণ্টের নীতি পরিবর্তিত না হইবে এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে তাঁহারা ভারতের অনিষ্টসাধন হইতে বিরত না হইবেন, ততদিন ভারতীয় বাণিজ্যপোত পুনর্গঠনের কোন আশা নাই।"—আবদুল বারি চৌধুরী।

অবৈধ বিদেশী প্রতিযোগিতা এবং বিদেশী শাসকদের সহানুভূতি-শূন্য ব্যবহার ব্যতীত আমাদের স্বদেশী শিল্পের বিফলতার আর একটি কারণ, নিজেদের মধ্যেই অনিষ্টকর প্রতিযোগিতা। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি যে, যখনই কোন স্বদেশী শিল্প প্রবর্তিত হয় এবং নানা বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিতে চেষ্টা করে, তখনই আমাদের দেশের লোকেরা উহার অনুকরণ করিয়া দায়িত্বজ্ঞান-হীনভাবে রাতারাতি ঐ শ্রেণীর বহু ব্যবসা ফাঁদিয়া বসে। ফলে পরস্পর জিনিসের দর কমাইয়া পাল্লা দিতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বঙ্গীয় স্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানিকে বহু দেশীয় মোটর লঞ্চ এবং স্টীমারের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করিতে হইয়াছে। ঐ সব মোটর লঞ্চ ও স্টীমার অন্য অনেক নদীতে ব্যবসা চালাইতে পারিত এবং তাহাতে লাভও হইত ; কিন্তু তাহা তাহারা করে নাই। ফলে ঐ সব ব্যবসা ফেল পড়িয়া গিয়াছে এবং আমাদের কোম্পানিরও বহু লোকসান করিয়াছে। বাঙালীর প্রতি বিধাতার যেন চির অভিশাপ আছে, উপযুক্ত কর্মশক্তি, বুদ্ধি ও প্রেরণার অভাবে, তাহারা পুরাতন ছাড়িয়া নূতন কোন পথ অবলম্বন করিতে পারে না, এবং তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বাঙালীই বাংলার প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

চরকার বার্তা—কাটুনীর বিলাপ

গত দশ বৎসর যাবৎ আমি চরকার বার্তা প্রচার করিবার জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছি। অনেকে আমার এই নূতন বাতিক দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী যেদিন চরকার বার্তা প্রচার করেন, তখন হইতেই আমি ইহার সত্য উপলব্ধি করিয়াছি। আমি নিজে ক্ষুদ্রাকারে হইলেও একজন শিল্প ব্যবসায়ী, সুতরাং প্রথমতঃ আমি এই আদিম যুগের যন্ত্রটির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশই করিয়াছিলাম। কিন্তু বিশেষ চিন্তার পর আমি বুঝিতে পারিলাম—প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে এই চরকা কত উপকারী, অবসর সময়ে এই চরকায় কত কাজ হইতে পারে। ভারতের যে সব লক্ষ লক্ষ লোক অতি কষ্টে অনশনে অর্ধাশনে জীবন যাপন করে, তাহাদের পক্ষে এই চরকা জীবিকার্জনের একমাত্র গৌণ উপায়। চরকাকে দরিদ্রের পক্ষে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে আত্মরক্ষার উপায় বলা হইয়াছে। এ উক্তি সঙ্গত। খুলনা দুর্ভিক্ষ এবং উত্তরবঙ্গ বন্যা সম্পর্কে সেবাকার্যে কাজ করিবার সময় আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, যদি এক শতাব্দী পূর্বে চরকা পরিত্যক্ত না হইত, তবে উহা অনাহারক্লিষ্ট জনসাধারণের পক্ষে বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ হইতে পারিত। এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করিবার জন্য আমি কয়েকজন দূরদর্শী, উদারচেতা, প্রসিদ্ধ ইংরাজ মনীষীর অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। ইঁহারা মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়ের পূর্বেই চরকার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। কোলব্রুকের নামই সসম্মানে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মের প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্বে এই খ্যাতনামা শাসক এবং ততোধিক খ্যাতনামা প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদ চরকার গুণগান করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতির জন্য হেনরি টমাস কোলব্রুক একা যাহা করিয়াছেন, তাহা আর কোন ইংরাজ করিতে পারেন নাই। তিনিই প্রথমে বেদান্তের মহান্ সৌন্দর্য পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন; তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য মনীষিগণের নিকট হিন্দুর ষড়দর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন। তিনিই প্রথমে বহু প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করেন যে, পাটীগণিত ও বীজগণিতে হিন্দুরাই সর্বাগ্রে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। কোলব্রুক ১৮ বৎসর বয়সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সামান্য একজন কেরানী হইয়া ভারতে আসেন। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে সংস্কৃত ভাষায় তিনি যেরূপ পাণ্ডিত্য লাভ করেন, তাহার তুলনা বিরল।

লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অল্পকাল পরে কোলব্রুক সিভিল কর্মচারী হিসাবে বাংলার সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং বাংলার কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তৎকৃত **Husbandry of Bengal** নামক পুস্তকখানি বহু মূল্যবান্ তথ্যে পূর্ণ।

চরকাকে দরিদ্রের সহায়রূপে বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন,—"ব্রিটিশভারত যে সভ্য গবর্নমেণ্ট কর্তৃক শাসিত হইতেছে, তাঁহাদের পক্ষে এদেশের অতি দরিদ্রদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করা তুচ্ছ বিষয় নহে। বর্তমানে এই প্রদেশে সাধারণের পক্ষ হইতে দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্যের কোন ব্যবস্থা নাই। যে সব বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকেরা রুগ্‌ণ বলিয়া অথবা সামাজিক মর্যাদার জন্য কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের কাজ করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে জীবিকার্জনের একমাত্র উপায় চরকায় সূতাকাটা। পুরুষেরা যখন শারীরিক অক্ষমতা বা অন্য কোন কারণে শ্রমের কাজ না করিতে পারে,-তখনই স্ত্রীলোকেরা কেবলমাত্র এই উপায়েই পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারে। ইহা সকলের পক্ষেই সহায়স্বরূপ, এবং জীবিকার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও, দরিদ্রের দুর্দশা অনেকটা লাঘব করিতে পারে। যে সমস্ত পরিবার এককালে ধনী ছিল, দারিদ্র্যের দিনে তাহাদের দুর্দশাই সব চেয়ে বেশী মর্মান্তিক হয়। গবর্নমেণ্টের নিকট আইনতঃ তাহাদের দাবি থাকুক আর নাই থাকুক, মনুষ্যত্বের দিক হইতে তাহারা নিশ্চয়ই গবর্নমেণ্টের সহানুভূতি দাবি করিতে পারে।

"এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, দরিদ্রের পক্ষে সহায়স্বরূপ এমন একটি শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত। ইহা দ্বারা ব্যবসায়ের দিক হইতেও ইংলণ্ডের যে লাভ হইবে, তাহা প্রমাণ করা যায়। বাংলাদেশ হইতে তুলার সুতা, কাঁচা তুলা অপেক্ষা সস্তায় ইংলণ্ডে আমদানি করা যাইতে পারে। আয়র্লণ্ড হইতে বহুল পরিমাণে 'লিনেন' এবং পশমের সুতা বিনাশুল্কে ইংলণ্ডে আমদানি হয়। ইহা যদি ইংলণ্ডের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়, তবে বাংলা হইতে আমদানী সুতার উপরে কেন অতিরিক্ত শুল্ক বসান হয়? ইহা ব্যতীত এই সুতা আমদানির বিরুদ্ধে আরও নানারূপ বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে।"

ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। ১৮০৮—১৮১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত উত্তর ভারতের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিয়া বুকানন হ্যামিলটন একখানি বহি লিখেন। উহা হইতে কতকগুলি তথ্য আমি উদ্ধৃত করিতেছি।—

"কৃষির পরেই সুতাকাটা ও বস্ত্র বয়ন ভারতের প্রধান জাতীয় ব্যবসা। সমস্ত কাটুনীই স্ত্রীলোক এবং জেলায় (পাটনা শহর ও বিহার জেলা) ডাঃ বুকাননের গণনা মতে তাহাদের সংখ্যা ৩,৩০,৪২৬। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কেবল বিকালে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সুতা কাটে এবং প্রত্যেকে গড়ে বার্ষিক ৭৷৮ পাই মূল্যের সুতা কাটে। সুতরাং এই সমস্ত কাটুনীদের কাটা সুতার মোট মূল্য আনুমানিক (বার্ষিক) ২৩,৬৭,২৭৭ টাকা। এইভাবে হিসাব করিলে দেখা যায়, ইহাদের সুতার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা তুলার মূল্য ১২,৮৬,২৭২ টাকা এবং কাটুনীদের মোট লাভ থাকে ১০,৮১,০০৫ টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক কাটুনীর বার্ষিক লাভ গড়ে ৩৷০ আনা। কয়েক বৎসর হইতে সূক্ষ্ম সুতার চাহিদা কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং স্ত্রীলোক কাটুনীদের বড়ই ক্ষতি হইতেছে।

"সূতাকাটা ও বস্ত্র বয়ন সাহাবাদ জেলায় প্রধান জাতীয় ব্যবসা। এই জেলায় প্রায় ১,৫৯,৫০০ জন স্ত্রীলোক সূতাকাটার কাজে নিযুক্ত আছে এবং তাহাদের উৎপন্ন সূতার মোট মূল্য বার্ষিক ১২,৫০,০০০ টাকা।"(১)

সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়নের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পূর্ণিমা জেলার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"কার্পাস বস্ত্র বয়নকারীর সংখ্যা বিস্তর এবং তাহারা গ্রামের লোকদের ব্যবহারের জন্য মোটা কাপড় বুনে। সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনিবার জন্য সাড়ে তিন হাজার তাঁত আছে। তাহাতে ৫,০৬,০০০ টাকা মূল্যের বস্ত্র উৎপন্ন হয় এবং মোট ১,৪৯,০০০ টাকা লাভ হয় অর্থাৎ প্রত্যেক তাঁতে বার্ষিক গড়ে ৮৬ শিলিং লাভ হয়। মোটা কাপড় বুনিবার জন্য ১০ হাজার তাঁত নিযুক্ত আছে এবং তাহাদের উৎপন্ন কাপড়ের মোট মূল্য ১০,৮৯,৫০০ এবং মোট ৩,২৪,০০০ টাকা লাভ হয়; অর্থাৎ প্রত্যেক তাঁতে বার্ষিক গড়ে ৬৫ শিলিং লাভ হয়।"

রমেশ দত্ত কৃত 'ভারতের আর্থিক ইতিহাস' গ্রন্থ হইতে এই সমস্ত বিবরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন—"উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত ভারতের লোকেরা নানা শিল্পকার্যে নিযুক্ত ছিল। বস্ত্র বয়ন তখনও তাহাদের প্রধান বৃত্তি ছিল। লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক সূতা কাটিয়া জীবিকার্জন করিত।"

---

(১) "সব সূতাই স্ত্রীলোকেরা কাটে এবং উহা তাহাদের অবসর সময়ের কাজ"।

"ভারতীয় মসলিন ইংলণ্ডে ১৬৬৬ সালে প্রথম আমদানি হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, ১৮০৮ সালের ১২৷৷০ লক্ষ টাকা বর্তমান কালের ৫০ লক্ষ টাকার সমান।

"সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান এদেশের শিল্পিগণকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং তাঁহারই পৃষ্ঠ-পোষকতায় ঢাকাই মসলিন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।...পরবর্তী কালেও ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি অক্ষুন্ন ছিল। এমনকি বর্তমানকালে, বয়নশিল্প ইংলণ্ডে প্রভূত উন্নতি লাভ করিলেও, ঢাকাই মসলিন এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য এবং সূক্ষ্ম বুনানি প্রভৃতি গুণের উৎকর্ষে ইহা জগতের যে কোন দেশের বয়নশিল্পজাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"পূর্বকালে ঢাকা জেলায় সর্বশ্রেণীর লোকই সূতা কাটার কাজ করিত। ১৮২৪ সাল হইতে এই শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয় এবং তাহার পর হইতে ইহা দ্রুতগতিতে লোপ পাইতেছে।

"ঢাকা জেলার প্রায় প্রত্যেক পরিবারই পূর্বকালে সূতা কাটিয়া উপার্জন করিত। কিন্তু সস্তায় বিলাতী সূতা আমদানি হওয়াতে এই প্রাচীন শিল্প প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

"এইরূপে যে সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন শিল্প এদেশে অগণিত লোকের অন্নসংস্থান করিয়াছে, তাহা ৬০ বৎসরের মধ্যেই বিদেশীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে।" Taylor : *Topography of Dacca*

মোরল্যান্ড তাঁহার India at the Death of Akbar নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"বাংলাদেশ নেংটি পরিয়া থাকিত, এ সিদ্ধান্তও যদি আমরা করি, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, বস্ত্রবয়ন শিল্প ভারতে খুবই প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ভারতের মোট উৎপন্ন বস্ত্রজাত শিল্প জগতের একটা প্রধান ব্যাপার ছিল। স্বদেশের সমস্ত অভাব তো পূরণ করিতই, তাহা ছাড়া বিদেশেও ভারতের বস্ত্র রপ্তানি হইত।"

র‍্যাল্‌ফ ফিচ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে (১৫৮৩ খৃঃ) লিখিয়াছেন :—

"বাকোলা হইতে আমি ছিরিপুরে (শ্রীপুরে) গেলাম।...এখানে প্রচুর কার্পাস-বস্ত্র উৎপন্ন হয়।

"সিনারগাঁও (সোনারগাঁও) ছিরিপুর হইতে ছয় লীগ দূরে একটি শহর। সেখানে ভারতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপন্ন হয়।

"এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র ও চাউল রপ্তানি হইয়া ভারতের সর্বত্র, সিংহল, পেগু, সুমাত্রা, মালাক্কা এবং অন্যান্য নানা স্থানে যায়।"

এইচ. এইচ. উইলসন মিল-কৃত ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের পরিশিষ্ট লিখেন। ভারতের বয়ন শিল্প কিভাবে ধ্বংস হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ক্ষোভের সঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—"পরাধীন ভারতবর্ষের উপর প্রভু ব্রিটেন যে অন্যায় করিয়াছে, ইহা তাহার একটি শোচনীয় দৃষ্টান্ত। কমিশনের সাক্ষ্যে (১৮১৩ খৃঃ) বলা হইয়াছে যে, ভারতের কার্পাস ও রেশমের বস্ত্রাদি ইংলণ্ডের ঐ শ্রেণীর বস্ত্রজাত অপেক্ষা শতকরা ৫০।৬০ টাকা কম মূল্যে বিক্রয় হইত। সুতরাং ভারতীয় আমদানী বস্ত্রের উপর শতকরা ৭০।৮০ ভাগ শুল্ক বসাইয়া অথবা ঐ গুলির আমদানি একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডের বস্ত্রজাতকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। যদি এরূপ করা না হইত, যদি এই সমস্ত অতিরিক্ত শুল্ক ও নিষেধ বিধি জারী না হইত, তবে পেইসলি ও ম্যানচেস্টারের কল-কারখানাগুলি গোড়াতেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং বাষ্পীয় শক্তির দ্বারাও তাহাদিগকে চালানো যাইত না। ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসস্তূপের উপর এগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারত যদি স্বাধীন হইত, তবে সে প্রতিশোধ লইত, ব্রিটিশ পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসাইত এবং এইরূপে নিজের শিল্পকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিত। এই আত্মরক্ষার উপায় তাহাকে অবলম্বন করিতে দেওয়া হয় নাই,—তাহাকে বিদেশীর দয়ার উপরে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ব্রিটিশ পণ্য জোর করিয়া বিনা শুল্কে তাহার উপর চাপানো হইল এবং বিদেশী শিল্প-ব্যবসায়ী অবৈধ রাজনৈতিক অস্ত্রের সাহায্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেষণ করিল,—যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বৈধ প্রতিযোগিতায় তাহার জয়লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না।"

ভারতের আর একটি শিল্পও ইংরাজ এই ভাবে ধ্বংস করিয়াছেন। ভারতের তাঁতে বোনা চট ও থলে ভারতের বাহিরে নানাদেশে চালান যাইত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দেশীয় শিল্পটির খুব প্রসার হয়। ইংলণ্ড কিরূপে এই শিল্প ধ্বংস করে, আর একটি অধ্যায়ে তাহা বিবৃতি কবিব।

বাংলা দেশে হাতে বোনা মোটা কাপড়ের শিল্প আমদানী বিদেশী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় বহু দিন পূর্বেই লুপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছে। কেন লোকে দিনের পর দিন কষ্ট করিয়া সূতা বুনিবে ও কাপড় তৈরি করিবে,—ল্যাঙ্কাশায়ার ও জাপান তো তাহাদের কলে তৈরী সূক্ষ্ম বস্ত্রজাত লইয়া, ঘরের দরজায় সর্বদাই হাজির আছে! বাংলার ঋণগ্রস্ত অনশনক্লিষ্ট কৃষকগণ, তোমরা তোমাদের দেশের ভদ্রলোকদের অনুসরণ করিয়া নিজেদের দুঃখ-কষ্ট বিস্মৃত হও! হুঁকা ছাড়িয়া সিগারেটের ধূম পান কর, পায়ে না হাঁটিয়া মোটর-বাসে চড়, চা খাইয়া ক্ষুধা নষ্ট কর—তাহা হইলেই আহারের ব্যয় আর বেশী লাগিবে না। এবং এই সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিদেশী বণিকদের পকেট ভর্তি করিয়া দাও। যখন মামলামোকদ্দমা করিতে শহরে যাইবে, তখন সিনেমা দেখিতে ও টর্চলাইট কিনিতে ভুলিও না। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, বড়দুঃখেই আমি এই সব কথা লিখিতেছি।

অর্থনীতি-বিদেরা আমাদের বলেন যে, দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যখন সস্তায়

বিদেশ হইতে আমদানি করা যায়, তখন সেইগুলি এদেশে উৎপাদন করা—পাগলামি ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই কারণে তাঁহারা আমাদের লুপ্ত স্বদেশী পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেন। বর্তমান যুগে চরকা প্রচলন করিবার চেষ্টা, আদিম যুগের কোন লুপ্ত প্রণালীকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টার মতই হাস্যকর। কিন্তু ইহার ভিতর একটা যে মিথ্যা যুক্তি আছে, তাহা আশ্চর্যরূপে তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। বাংলার অধিকাংশ স্থানে একমাত্র প্রধান ফসল আমন ধান্য এবং রোপণ ও বোনা, কাটা সমস্ত শেষ করিতে তিন মাস মাত্র সময় লাগে। বৎসরের বাকী নয় মাস কৃষকেরা আলস্যে কাটায়। বাংলায় কোন কোন অঞ্চলে ধান ও পাট ছাড়া সরিষা, মটর প্রভৃতি রবিশস্যও হয়। কিন্তু সেখানেও কৃষকদের বৎসরের মধ্যে ৫।৬ মাস কোন কাজ থাকে না। বর্তমান পৃথিবীর কঠোর জীবন-সংগ্রামে যে জাতি বৎসরের অধিকাংশ সময় স্বেচ্ছায় আলস্যে কাল হরণ করে, তাহারা বেশী দিন ধরাপৃষ্ঠে টিকিতে পারে না। ইহার পরিণাম অনশন, অর্ধাশন এবং বিপুল ঋণভার—এখনই বাংলাদেশে দেখা যাইতেছে। পদ্মা, যমুনা, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র বিধৌত পূর্ববঙ্গে বর্ষার পর পলিমাটি পড়িয়া জমি উর্বরা হয় এবং প্রচুর ধান, পাট, কলাই, মটর প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেখানেও, কৃষকেরা মোটের উপর স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন হইলেও মহাজনদের ঋণজালে আবদ্ধ।(২) বস্তুতঃ, এই সকল

---

(২) কৃষকেরা যে বিনা কাজে আলস্যে কালহরণ করে, তৎসম্বন্ধে কয়েকজন লেখক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—যথা ঃ পানাণ্ডিকর—Wealth & Welfare of the Bengal Delta, p. 150। জ্যাক বলেন,—"কৃষকদের কাজের সময়ের হিসাব করিলে দেখা যায় যে, তাহারা পাট চাষের জন্য তিন মাস কাজ করে এবং ৯ মাস বসিয়া থাকে। যদি ধান ও পাট উভয় শস্যই তাহারা উৎপাদন করে, তবে জুলাই ও অগস্ট মাসে আর অতিরিক্ত দেড়মাস মাত্র কাজ তাহাদের করিতে হয়।"

"যতদিন পর্যন্ত তাহাদের হাতে খাদ্য ও অর্থ থাকে, ততদিন তাহারা পরকুৎসা, দলাদলি, মামলামোকদ্দমা এই সব করিয়া কাল কাটায়।"—Burrows.

ইউরোপের কৃষিপ্রধান দেশসমূহের কৃষকেরা অবসর সময়ে (যে সময়ে চাষের কাজ না থাকে) কি করে, তাহার বর্ণনা আমাদের দেশের লোকের পক্ষে বেশ শিক্ষাপ্রদ হইবে। বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান স্ত্রীলোকেরা পর্দানশিন, তাহারা বাহিরে যাইয়া কাজ করিতে পারে না। কিন্তু ইউরোপের স্ত্রীলোকেরা সমস্তপ্রকার গৃহকার্য করিয়াও অন্য নানা কাজে বেশ দুপয়সা উপার্জন করে, যথা ঃ—"পরিবারের সকলেই অতি প্রত্যূষে উঠে এবং গরম কফি ও রুটি খাইয়া কাজে লাগিয়া যায়। কৃষক, তাহার প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরা এবং পুরুষ শ্রমিক প্রভৃতি ক্ষেতের কাজে যায়। এই সব ক্ষেতে গম, রাই, ওট, যব প্রভৃতি শস্য হয়। আলু, মটর, বিটমূল, শাকসবজি প্রভৃতি সর্বত্রই হয়। 'হপ' (hop) শস্য কেবল স্বচ্ছল কৃষকেরা উৎপন্ন করে।

"স্বামী যখন ক্ষেতের কাজ করে, সেই সময়ে স্ত্রী গৃহে তাহার ঝুড়িতে মাল ভর্তি করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যায়। এই ঝুড়ি প্রায় এক গজ লম্বা এবং পিঠে ঝুলানো থাকে। ঝুড়িতে শাকসবজি, ফল, গৃহে প্রস্তুত রুটি প্রভৃতি থাকে। শহরের লোকরা এগুলি খুব আগ্রহের সঙ্গে কেনে। পিঠের ঝুড়ি যখন ভর্তি হয়, তখন একটা ছোট ঝুড়ি ভর্তি করিয়া মাথার উপরে তাহারা নেয়। এই ঝুড়িতে সময় সময় ডিম থাকে, কিন্তু প্রায়ই বাজারে বিক্রির জন্য মুরগী লওয়া হয়।

"শীতের মাঝামাঝিই কৃষকদের পক্ষে সুখের সময়। এই সময়ে তাহারা ক্ষেতের কাজ করিতে পারে না, ঘরে বসিয়াই বাসনপত্র মেরামত করে, কিছু ছুতারের কাজ করে, কাস্তে, কোদাল, ছুরি, করাত প্রভৃতি ধার দেয়। স্ত্রীলোকেরা সুতাকাটা, কাপড় বোনা ও কারুসূচীর (এমব্রয়ডারীর) কাজ করে।

অঞ্চলে লোকসংখ্যা খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে, প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার পরিমাণ ৬০০ হইতে ৯০০। জমি বহু ভাগে বিভক্ত হওয়াতে ময়মনসিংহ অঞ্চল হইতে বহু বহু লোক আসামে যাইতেছে। ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি বাংলার পূর্বাঞ্চলের কৃষকেরা অধিকাংশই মুসলমান, তাহারা পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। তাহাদের মধ্যে অনেকে জাহাজে লস্করের কাজ গ্রহণ করে। এই কারণেও লোক-সংখ্যার চাপ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হয়।

জমি উর্বরা হইলেই যে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা ভাল হইবে, এমন কোন কথা নাই। বরং অনেক সময় তাহার বিপরীত দেখা যায়। এ বিষয়ে রংপুরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই অঞ্চলের জমি খুব উর্বরা, এবং ধান, পাট, তামাক, প্রভৃতি কয়েক প্রকারের শস্য এবং শাকসবজি এখানে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই জেলার অধিবাসীরা অত্যন্ত অশিক্ষিত ও অনুন্নত। অনেক সময়েই তাহারা জীবনধারণের উপযোগী সামান্য কিছু শস্য উৎপন্ন করিয়াই সন্তুষ্ট হয়। তাহারা অত্যন্ত অলস এবং বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস বসিয়া থাকে। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, রংপুরে হিন্দু রাজবংশীদের পাশাপাশি মুসলমানেরাও বাস করে। কিন্তু তাহারা একই জাতির লোক হইলেও হিন্দুদের চেয়ে বেশী কর্মঠ।

পঞ্জাব ও মীরাট জেলার কৃষকেরা সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির। তাহারা এখনও চরকা কাটে এবং তাহাদের বোনা মোটা সুতায় তাহাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য মোটা কাপড় তৈরি হয়। ১৯২৯ সালে আমি মীরাটে যাই। খাটাউলি শহরের ২০ মাইল উত্তরে একটি গ্রামে গিয়া আমি বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে দেখিলাম, প্রায় প্রত্যেক গৃহে চরকা চলিতেছে। গৃহকর্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূ একত্র বসিয়া রোদ পোহাইতে পোহাইতে চরকা কাটিতেছে, এ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু এখানেও তথাকথিত 'সভ্যতা' ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। ধুতি, পাগড়ি পরা গ্রামবাসীরা সূক্ষ্ম বিদেশী দ্রব্য কিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্থানীয় গান্ধী আশ্রমের কর্মীরা মেয়েদের

"কেবল পুরুষেরা নহে, স্ত্রীলোকেরাও আশ্চর্যরকমের ভারবহন ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে। মাথায় প্রকাণ্ড বোঝা লইয়া সোজাভাবে তাহারা পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়া যায়। বোঝা ভারী হইলে সময়ে সময়ে পিঠেও বহন করে। কোন কোন সময়ে আবার এই বোঝার উপরে ছোট শিশুকেও দেখা যায়। যাযাবর রমণীদের মত তাহারা শিশুকে সঙ্গে লইয়া চলে, চলিতে চলিতে তাহাকে স্তন্য পান করায়।

"ফ্রিউলির অধিবাসীদের মধ্যে যাযাবর প্রবৃত্তি বেশ লক্ষ্য করা যায়। এখানকার স্ত্রীলোকেরা ৩।৪ বা ৫।৬ জনে দলবদ্ধ হইয়া সমস্ত ইটালী ঘুরিয়া জিনিস বিক্রয় করে। সঙ্গে ঝুড়ির ভিতরে অথবা পিঠের সঙ্গে থলিয়ার বাঁধা অবস্থায় তাহাদের শিশু থাকে। পেয়ালা, সুতা, সেলাইয়ের বাক্স, গৃহস্থের প্রয়োজনীয় নানারূপ কাঠের বাসনপত্র এই সব তাহারা বিক্রয় করে। *এগুলি পুরুষেরা শীতকালে ঘরে বসিয়া তৈরি করে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দীর্ঘ ভ্রমণকালে কোন কোন সময়ে তাহারা মাসের পর মাস ভ্রমণ করে এবং ইটালীসীমান্তও অতিক্রম করে—কোন পুরুষ তাহাদের সঙ্গে থাকে না। এই সব কষ্টসহিষ্ণু কর্মঠ স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবেই নিজেদের ছোটখাট ব্যবসা চালায়।"—*Life of Benito Mussolini* by **Margheritta G. Sarfatti.**

মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের সর্বত্র এবং যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পঞ্জাবেও, কোন কোন শ্রেণীর কৃষক রমণীরা ক্ষেতের কাজে পুরুষদের সাহায্য করে।

হাতের তৈরী সূতা প্রভৃতি কিনিয়া তাহাদের উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু আশ্রমের অর্থসামর্থ্য বিশেষ নাই। যদি এই স্বদেশী শিল্পকে উৎসাহ দিবার জন্য উপযুক্ত সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান থাকিত, তবে খুবই কাজ হইতে পারিত। কিন্তু বাংলার ন্যায় ঐ প্রদেশেও সরকারী শিল্প বিভাগের নিকট চরকা 'নিষিদ্ধ বস্তু', কেননা এই শিল্প পুনরুজ্জীবিত হইলে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার গ্রন্থে নিছক সত্য কথাই লিখিয়াছেন— "গবর্নমেণ্ট যখন গর্ব করেন যে, ভারতে পুরাতন দেশীয় শিল্পের পরিবর্তে তাঁহারা সস্তা কার্পাস বস্ত্রজাত যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন সে কথা শুনিয়া মন বিষাদভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু ইহার ফলে ভারতের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে. সে বিষয়ে তাঁহারা অন্ধ।" মীরাটে বহু জমিদার এবং ধনী বানিয়া আছে। কিন্তু বর্তমান যুগের চিন্তাধারা তাহাদের মন স্পর্শ করে নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকে, ব্রিটিশ কমিশনার বা কালেক্টরের যে কোন বাতিকে উৎসাহ দিবার জন্য প্রচুর অর্থ দিতে পারে, নিজেদের ছেলে-মেয়ের বিবাহে মিছিল ও তামাসার জন্য ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারে; কিন্তু যাহাতে স্থায়ী উপকার হয়, এমন কোন কাজে তাহারা এক পয়সাও দিবে না। এই সমস্ত ব্যবহারের মূলে যে মনোভাব কার্য করিতেছে, তাহার কথাও কিছু বলা প্রয়োজন। বাংলাদেশে দেখা যায়, যে সমস্ত কৃষকের অবস্থা ভাল তাহারা শ্রমের কাজ করিতে ঘৃণা করে এবং ভদ্রলোকদের অনুকরণ করে। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে কৃষকেরা আমন ধান বুনিবার সময় এক মাস দেড় মাস খুবই পরিশ্রম করে, তাহার পরে কয়েক মাস বসিয়া থাকে। এমন কি, ধান কাটার সময়ে তাহারা পশ্চিমদেশীয় মজুরদের সাহায্য নেয়।

অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ও কুৎসিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিলে কষ্ট হয়। কৃষকেরা গৃহজাত মোটা কাপড় ছাড়িয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের সূক্ষ্ম বস্ত্র কিনিতেছে। ঘরের তামাক ছাড়িয়া বিদেশী সিগারেট খাইতেছে। মামলামোকদ্দমা করিতে হইলে ৪।৫ মাইল হাঁটিয়া নিকটবর্তী শহরে আর তাহারা যাইতে চাহে না, দুই আনা পয়সা খরচ করিয়া মোটরবাসে চড়ে। ইহার অর্থ এই যে, তাহারা জমির অতিরিক্ত উৎপন্ন ফসল প্রভৃতি বেচিয়া যে পয়সা পায়, তাহা আধুনিক সভ্যতার বিলাসোপকরণ প্রভৃতির জন্য ব্যয় করে। একথা সত্য যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে অথবা প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন কৃষক নিজের মোটরগাড়ীতে চড়ে, কিন্তু ঐ সমস্ত কৃষকের নিকট প্রতি মিনিটের মূল্য আছে। তাহারা মোটের উপর সুশিক্ষিত,—কৃষিকার্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করে এবং এইরূপে জমির উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু বাংলার কৃষকেরা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। একদিকে কৃষিকার্যে সেকেলে মান্ধাতার আমলের প্রণালী(৩) অবলম্বন

---

(৩) ডাঃ ভোয়েলকার বলেন,—"তাহারা যে উপযুক্ত পরিমাণে ফসল উৎপাদন করিতে পারে না, তাহার প্রধান কারণ—জলসরবরাহ এবং সারের অভাব।" এ বিষয়ে ডাঃ ভোয়েলকারের সঙ্গে আমি একমত হইলেও, আমার পূর্বোল্লিখিত কথাগুলির কোন ব্যত্যয় হয় না। সম্প্রতি সারণ,

করিয়া, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাস ভোগ করিতে গিয়া, তাহারা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়।(৪) সাগর-সঙ্গমে নিকটবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চল ব্যতীত ভারতের অন্য সর্বত্র জমির উর্বরতা হ্রাস পাইতেছে, তাহার লক্ষণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ষাট বৎসর পূর্বে আমার বাসগ্রাম ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলে রবিশস্য এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ হইত। জমি কিছুকাল পতিত রাখিতে দেওয়া তো হয়ই নাই, কোনরূপ সার দেওয়ার ব্যবস্থাও নাই। বৎসরের পর বৎসর একই জমিতে একই প্রকার শস্য উৎপাদন করা হয়। ফলে জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়, ফসলের পরিমাণ কম হয় এবং ফসলের উৎকর্ষও হ্রাস পায়। সরকারী কর্মচারী প্রভৃতির ন্যায় যাহারা কেবল বাহির হইতে দেখে, তাহারা বলে যে, দেশে আমদানী পণ্যের পরিমাণ বাড়িতেছে, অতএব বুঝা যাইতেছে যে, কৃষকদের অবস্থা পূর্বের চেয়ে ভাল হইতেছে। যাহারা অনশনে বা অর্ধাশনে থাকে, ঋণজালে জড়িত, জমিতে ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা যাহাদের হ্রাস পাইতেছে, তাহারা যদি বিদেশী পণ্যের মোহে মুগ্ধ হয়, তাহা হইলে আর্থিক হিসাবে তাহারা আত্মহত্যাই করে। 'শ্বেতাঙ্গদের শিল্পজাত' বিদেশী বস্ত্রের তথা নানারূপ বিদেশী দ্রব্যের প্রতি তাহাদের মোহের ফলে ভারতীয় কৃষকদের অবস্থা, বিষধর সর্পের (rattle-snake) মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট পক্ষীর মত হইয়া দাঁড়ায়—এই মোহ তাহাদিগকে ধ্বংসের মুখেই টানিয়া লইয়া যায়।

আধুনিক সভ্যতার জয়যাত্রার ফলে, লক্ষ লক্ষ কাটুনী, তাঁতি, ছুতার, কামার,

---

মীরাট প্রভৃতি স্থানে আমি ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। সেখানে উৎপন্ন ইক্ষুর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। যে ভাবে ইক্ষু হইতে রস নিঙড়ানো ও তাহা জ্বাল দিয়া গুড় করা হয়, তাহাও অতি আদিম অনুন্নত প্রণালীর। জাভার ইক্ষুচাষীরা যে বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া এবং উন্নত প্রণালীতে গুড় প্রস্তুত করিয়া এদেশের ইক্ষুচাষীদিগকে পরাস্ত করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

(৪) "আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানেরা যখন বন্যপ্রদেশের একমাত্র অধিবাসী ছিল, তখন তাহাদের অভাব অতি সামান্য ছিল। তাহারা নিজেরা অস্ত্র তৈরি করিত, স্রোতস্বিনীর জল ব্যতীত অন্য পানীয় খাইত না এবং পশুচর্ম দিয়া দেহ আচ্ছাদন করিত এবং ঐ পশুর মাংস খাইত।

"ইউরোপীয়েরা উত্তর আমেরিকার এই আদিম অসভ্য জাতিদের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র, মদ এবং লৌহ আমদানি করিল। তাহাদের পশুচর্মের পোশাকের পরিবর্তে কলের বস্ত্রজাত যোগাইল। এইরূপে তাহাদের রুচির পরিবর্তন হইল, কিন্তু তদনুরূপ শিল্পজ্ঞান তাহাদের ছিল না, কাজেই শ্বেতাঙ্গদের প্রস্তুত পণ্যই তাহারা ক্রয় করিতে লাগিল। কিন্তু এই সব পণ্যের পরিবর্তে বন্যজাত 'ফার' (পশুলোম) ছাড়া আর তাহাদের কিছু দিবার ছিল না। সুতরাং কেবল নিজেদের জীবন-ধারণের জন্য নয়, ইউরোপীয় পণ্য ক্রয় করিবার নিমিত্তও তাহাদিগকে বনজঙ্গল ঢুঁড়িয়া পশুহননে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এইরূপে রেড-ইণ্ডিয়ানদের অভাব বাড়িতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের স্বাভাবিক বন্যসম্পদ ক্ষয় হইতে লাগিল।

"আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী ইণ্ডিয়ানদের পরিবারের খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। দিনের পর দিন শিকার অন্বেষণ করিয়া তাহাদের ব্যর্থ হইতে হয়, এবং ইতিমধ্যে তাহাদের পরিবারবর্গ গাছের বাকল, শিকড় প্রভৃতি খাইয়া জীবনধারণ করে অথবা অনাহারে মরে। তাহাদের চারিদিকে অভাব, দৈন্য ও দুর্দশা। প্রতি বৎসর শীতকালে তাহাদের অনেকে না খাইয়া মরে।" De Tocqueville—*Democracy in America*, p. 401.

উপরে উদ্ধৃত বর্ণনায় রেড-ইণ্ডিয়ানদের জীবনের এক শতাব্দী পূর্বেকার চিত্র পাওয়া যায়। রেড-ইণ্ডিয়ানেরা এখন প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাঙালী কৃষকেরাও এইভাবে ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে।

মাঝি মাল্লা, গাড়োয়ান প্রভৃতি যে কিরূপে নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার অধিক বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।(৫)

১৮৮০ সালে স্যার জন বার্ডউড ভারতীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের লক্ষ্য করিয়া লেখেন যে, তাঁহারা যেন কখন ভারত-জাত বস্ত্রে প্রস্তুত পোশাক ছাড়া অন্য

---

(৫) "ভারতে বিশুদ্ধতম লোহ এবং উৎকৃষ্ট ইস্পাত ছিল। তাহার নিদর্শনস্বরূপ এখন যে সব স্বম্ভ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি আছে, তাহা বর্তমান ধাতুশিল্পীদের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। দেশীয় লোহশিল্প যেভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে মন বিষাদভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। লোহার সম্প্রদায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কর্মকারেরাও ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে। কেবলমাত্র রাজারাই অস্ত্রশস্ত্র বর্মাদি তৈরি করাইবার জন্য কত লোক নিযুক্ত করিতেন। দরজার কব্জা, শিকল, তালা প্রভৃতি তৈরি করিবার কত কারখানা ছিল। প্রাচীন শিল্পগুলি লুপ্ত হইয়া যাওয়াতেই জমির উপর এই অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে। চলাচলের যানবাহনাদির কথাই দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক। স্থলপথে ও জলপথে পণ্য বহন করিবার জন্য কত অসংখ্য লোক নিযুক্ত ছিল। রথ, গাড়ী এবং নৌকা তৈরি করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক জীবন ধারণ করিত। বাষ্পচালিত যান এবং মোটরগাড়ী প্রভৃতি এখন সুদূর নিভৃত পল্লীতেও প্রবেশ করিয়াছে।"—জে. সি. রায়, কলিকাতা রিভিউ, অক্টোবর, ১৯২৭।

"পাশ্চাত্য সভ্যতা এই জাতির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও শ্রমবিভাগ রীতির উপর সহসা আক্রমণ করাতে যত কিছু আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে, সমাজের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার পুনরুদ্ধার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক হইতে আমরা ইহারই প্রমাণ পাইতেছি। একদিকে কৃষকদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতেছে এবং জমির উপব অত্যধিক চাপ পড়িতেছে, অন্যদিকে আধুনিক ধনতন্ত্র ও কলকারখানার সংগে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত শিল্পীরা আর্থিক ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে, এবং ইহার ফলে নানা রোগ ও মৃত্যুর হার বাড়িয়া যাইতেছে। বাংলার সমতল ভূমিতে ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রাচীন জলনিকাশ ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার উপর রেলওয়ে বাঁধ ও রাস্তা প্রভৃতি অবস্থা আরও সংগীন করিয়া তুলিয়াছে। আর এই সকলের ফলে যে দেশে একদিন সুখ শান্তি ও ঐশ্বর্যে পূর্ণ ছিল, তাহাই এখন দারিদ্র্য ও ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে।"—স্যার নীলরতন সরকার; এই বিখ্যাত চিকিৎসক রোগের নিদান যথার্থই নির্ণয় করিয়াছেন।

"অনেকেই এখন রেলওয়ের আশ্রয় নেয়। বাঙালী মাঝিমাল্লার মুখে শুনিয়াছি, এই কারণে তাহাদের এক বিষম ক্ষতি হইয়াছে। তাহারা বলে, পূর্বে কোন কোন ভদ্রলোক পরিবারবর্গসহ কাশী, প্রয়াগ বা অন্য কোন তীর্থস্থানে যাইতে হইলে নৌকা ভাড়া করিতেন এবং এইরূপ ভ্রমণে কয়েক সপ্তাহ, এমন কি কয়েক মাসও লাগিত। কিন্তু এখন তাঁহারা রেলগাড়ীতে উঠেন এবং গন্তব্য স্থানে যাইতে একদিন মাত্র সময় লাগে।" বেভারিজ: বাখরগঞ্জ, ১৮৭৬।

বিদেশী পণ্য ও বিলাসদ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে সরকারী আদেশের দৃষ্টান্ত।

"সাংহাই (চীন) জেলা গবর্নমেণ্ট ১লা অগস্ট তারিখে হুকুম জারী করেন যে, চীনাদিগকে কেবলমাত্র দেশজাত পণ্য ব্যবহার করিতে হইবে এবং বিদেশী বিলাসদ্রব্য ত্যাগ করিতে হইবে। হুকুমনামায় আরো লিখিত ছিল যে, চীনা শিল্পব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের মূল্য হ্রাস করিতে হইবে এবং প্রস্তুতপ্রণালীর উন্নতি করিতে হইবে।"—*The China Weekly Review*, **Aug. 9, 1930.**

জাতীয় গঠনকার্যে নিযুক্ত চীনা ছাত্রেরা দেশজাত বস্ত্রাদি পরিতে বাধ্য।

"ন্যান্‌কিংএর শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর হইতে ১৬ই মে তারিখে দেশের সমস্ত সরকারী বিদ্যালয়ে এই আদেশ জারী করা হয় যে, সমস্ত ছাত্রদিগকে বস্ত্রনির্মিত ইউনিফরম বা উর্দি পরিতে হইবে এবং ঐ সমস্ত বস্ত্র যতদূর সম্ভব দেশজাত হওয়া চাই।"—*The China Weekly Review*, **May 24, 1930.**

চীনা শ্রমিকেরা নূতন সুইডিশ দেশলাই কারখানার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়াছে।

"সাংহাইয়ের চৌকাড়ু নামক স্থানে 'সুইডিশ ম্যাচ ট্রাস্ট' কর্তৃক একটি বড় দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব হয়। ইহার ফলে চীনা শ্রমিকদের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। 'সাংহাই জেনারেল লেবর ইউনিয়ন প্রিপারেটারি কমিটি'—তারযোগে একটি ঘোষণাপত্রে গবর্নমেণ্ট ও দেশবাসীর নিকট আবেদন করেন যে, চীনদেশে বিদেশিগণ কর্তৃক দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপন বন্ধ করা হোক এবং দেশীয় দেশলাই শিল্পকে রক্ষা করা হোক।"—*The China Weekly Review* **June 28, 1930.**

কিছু না পরেন এবং ইহা তাঁহাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও মর্যাদাবোধের অন্যতম নিদর্শন স্বরূপ হওয়া উচিত।

আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে কিয়ৎপরিমাণে কৃষকেরাও যদি ইউরোপীয়দের জীবনযাত্রা-প্রণালী অনুকরণ করে এবং তাহার ফলে বিদেশী পণ্যের প্রচুর আমদানি হইতে থাকে, তবে উহাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায় না বরং তাহার বিপরীতই বুঝায়। দেশে যে খাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহা সমগ্র লোকসংখ্যার পক্ষে যথেষ্ট নহে, তৎসত্ত্বেও বিদেশ বিলাসদ্রব্যের আমদানি বাড়িয়া চলিয়াছে! আমাদের অর্থনীতিবিদেরা, যাঁহারা কলেজের পড়ুয়া মাত্র, চরকার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কৃষকেরা বৎসরের মধ্যে ছয়মাস হইতে নয় মাসকাল যখন বসিয়া থাকে, তখন তাহারা কি করিবে, তবে তাঁহারা কোনই উত্তর দিতে পারেন না। এই আলস্য ও অকর্মণ্যতার ফলে বাংলা দেশ প্রতি বৎসর যে ত্রিশ কোটি টাকা দিতে বাধ্য হয়, তাহা পূর্বে এই দেশেরই কাটুনী ও তাঁতীরা পাইত। বাংলার এই জাতীয় শিল্প ধ্বংস হওয়াতে এই টাকাটা ল্যাঙ্কাশায়ার ও জাপানী শিল্প ব্যবসায়ীদের হস্তগত হইতেছে।

তোমার কর্ম করিবার অভ্যাস যদি নষ্ট হয়, তবে তোমার ভবিষ্যতের আর কোন আশা থাকিবে না। মনুষ্যজাতির পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। বাংলার কৃষক রমণীরা এবং ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকেরা পূর্বে যে সময়টায় সূতা কাটিতেন ও কারু-শিল্পের কাজ করিতেন, এখন সেই সময় তাঁহারা বাজে গল্পগুজব করিয়া ও দিবা-নিদ্রা দিয়া কাটান। রেনান বলিয়াছেন, কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি আলস্য প্রবেশ করে, তবে ফল অতি বিষময় হয়।

"যদি দরিদ্রদের বলা যায় যে, কোন কাজ না করিয়াই তাহারা সুখী হইতে পারিবে, তবে তাহারা মহা আনন্দিত হইয়া উঠিবে। ভিক্ষুককে যদি তুমি বল যে, জগৎ তাহারই এবং কোন কিছু না করিয়া সে গির্জায় পুণ্যবান্ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার প্রার্থনা অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে, তবে সে শীঘ্রই বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে। টাস্কানিতে মার্সিয়ানিস্টদের আন্দোলনের সময় এইরূপ ব্যাপার দেখা গিয়াছিল। লাজারেটির শিক্ষার ফলে, কৃষকগণ কর্মের অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিল, সাধারণ জীবনযাত্রার কাজ করিতেও তাহারা অনিচ্ছা প্রকাশ করিত। ফ্রান্সিস অব্ আসিসির সময়ে গ্যালিলি ও আমব্রিয়াতে লোকে কল্পনা করিত যে, দারিদ্র্য দ্বারা তাহারা স্বর্গরাজ্য জয় করিতে পারিবে। এইরূপ কল্পনা ও স্বপ্নের ফলে তাহাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় জীবনযাত্রার কাজ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় কর্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা লোকের পক্ষে সাধু সাজিবার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। তখন দৈনন্দিন কর্ম তাহার পক্ষে বিরক্তিকরই মনে হইবে।"—রেনান: মার্কাস অরেলিয়াস।

বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলগুলিতে বড় জোর ৩।৪ লক্ষ লোকের কাজ জুটিতে পারে, হুগলী তীরবর্তী পাটের কলগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। কানপুরের

মিলে হয়ত আরও ২ লক্ষ লোক কাজ পাইতে পারে। এইভাবে, ভারতের কলকারখানার কেন্দ্রস্থলগুলিতে বড় জোর ২০ লক্ষ লোক জীবিকা অর্জন করিতে পারে। কিন্তু বাকী ৩১ কোটি ৮ লক্ষ লোক কি করিবে? এই দেশে ম্যানচেস্টার, লিভারপুল, গ্লাসগো, প্রভৃতির মত কলকারখানাপূর্ণ বড় বড় শহর কবে গড়িয়া উঠিবে এবং বাংলার গ্রাম হইতে শতকরা ৭০ জন লোক ঐ সব শহরে যাইয়া বাস করিবে,—আমরা কি সেই 'শুভ দিনের' প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব? কলিকাতা ও হাওড়া ব্যতীত বাংলাদেশে আর কোন শহর নাই। মফঃস্বলের শহরগুলি, নামে মাত্র শহর। এই সব মফঃস্বল শহরে থানা আদালত প্রভৃতি থাকার জন্য পরগাছা জাতীয় এক শ্রেণীর লোক সেখানে দেখা দিয়াছে। আমার আশঙ্কা হয় প্রলয়ান্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেও, বাংলার মফঃস্বলে কলকারখানাপূর্ণ শহর গড়িয়া উঠিবে না। এইরূপ 'সুখের দিন' দেশে আনয়ন করা বাঞ্ছনীয় কি না, সে কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু আমার স্বদেশবাসিগণ, আপনারা কি কোন দিন এ বিষয়ে যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন? তবে বৃথা কেন বড় বড় কারখানা স্থাপন করিয়া বেকার সমস্যা সমাধানের লম্বাচওড়া কথা বলিতেছেন?

বস্তুতঃ, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং চিরদিন তাহাই থাকিবে। এখানকার প্রধান সমস্যা, কিরূপে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা যায় এবং গ্রামবাসী কৃষকদের স্বল্প আয় বৃদ্ধির জন্য অন্য কি আনুষঙ্গিক কাজের প্রবর্তন করা যায়। আমার দৃঢ় অভিমত, এই হিসাবে সূতা-কাটা ও কাপড় বোনা—কুটীর শিল্পরূপে বাংলার সর্বত্র প্রচলিত হইতে পারে।

চরকার কার্যকরী শক্তি কতদূর, তাহা সহজ হিসাবের দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে। কোলব্রুক এই কারণেই ১২৫ বৎসর পূর্বে চরকার গুণগান করিয়াছিলেন। ভারতের লোকসংখ্যা ৩২ কোটি। যদি গ্রামবাসী লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কিয়দংশও —দৃষ্টান্ত স্বরূপ ½ অংশ—দৈনিক ২ পয়সা করিয়া উপার্জন করে, তাহা হইলে তাহাদের মোট আয়ের পরিমাণ হইবে দৈনিক ১২½ লক্ষ টাকা অথবা বৎসরে ৪৫,৬২,৫০,০০০ টাকা। শিল্প ব্যবসায়ীরা এখন "Mass Production" বা এক-সঙ্গে প্রচুর পণ্য উৎপাদনের কথা কহিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতে আমরা একসঙ্গে বিশাল জনসমষ্টির গণনা করিয়া থাকি। এই বিশাল জনসমষ্টির আয় ব্যক্তিগত-ভাবে যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন—একসঙ্গে হিসাব করিলে কোটি কোটি টাকায় দাঁড়ায়। হিতোপদেশে আছে—'তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ'—তৃণ-রাশি একত্র করিয়া রজ্জু নির্মাণ করিলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তীও বাঁধা যায়। বর্তমান-ক্ষেত্রে ঐ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

গত ৭।৮ বৎসরে খদ্দর সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা একত্র করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে। তৎসত্ত্বেও এবিষয়ে পুনঃ পুনঃ বলা প্রয়োজন; কেননা আমাদের মধ্যে একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক আছে যাহারা কোন কিছু করিবে না, কোন নূতন সৃষ্টি করিবে না অথচ শহরে আরামচেয়ারে বসিয়া কেবল সর্বপ্রকার শুভ প্রচেষ্টার প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিবে। চরকা যে কৃষকদের

পক্ষে কেবল আশীর্বাদস্বরূপ নহে, পরন্তু দুর্ভিক্ষের সময়ে বীমার কাজ করে, তাহা গত উত্তরবঙ্গ বন্যার সময় দেখা গিয়াছে। ১৯২২—২৩ সালে বন্যা সাহায্য কার্যের সময় উত্তরবঙ্গে আত্রাই (রাজসাহী) ও তালোরার (বগুড়া) নিকট কতকগুলি কেন্দ্র এই উদ্দেশ্যে কাজ করিবার জন্য নির্বাচিত হয়। অত্যন্ত দুর্দশার সময় এই সব কেন্দ্রে প্রায় এক হাজার চরকা বিতরণ করা হয় এবং ৪।৫ মাস পরে কয়েক মণ সূতা কাটুনীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়। ঐ সূতা দিয়া ঐ সব কেন্দ্রেই খদ্দর তৈরি হয়, ফলে স্থানীয় জোলা ও তাঁতীর দুর্দশার লাঘব হয়। কলিকাতা খাদি প্রতিষ্ঠানের মারফত ঐ সমস্ত খদ্দর অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রয় হইয়া যায়। ইহা বাংলার যুবকদের স্বদেশপ্রেমের পরিচয় বটে! অবস্থা বেশ আশাপ্রদ বোধ হইতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে; পর বৎসর ও তার পর বৎসর, ধান ও পাটের অবস্থা ভাল হওয়াতে কৃষকেরা চরকা ত্যাগ করিতে লাগিল এবং খদ্দর উৎপাদনের পরিমাণও কমিয়া গেল। সেই সময় হইতে খাদি প্রতিষ্ঠান প্রতিবৎসর ৪।৫ হাজার টাকা লোকসান দিয়া কোন প্রকারে টিঁকিয়া আছে। যাহা হউক, আমরা এই প্রচেষ্টা ত্যাগ করি নাই, কেননা কয়েকটি স্থানে অনাথা বিধবারা ও তাহাদের কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি চরকার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া উহা অবলম্বন করিয়া আছে। ফলে যে স্থলে প্রথম অবস্থায় ৮।১০ নম্বরের সূতা হইত, সে স্থলে এখন ৩০।৪০ নম্বরের সূতা হইতেছে। কাটুনীরা পূর্বেকার মত দক্ষতা লাভ করাতে সূতার মূল্য হ্রাস করিতে পারা গিয়াছে। যাহারা পুরা সময়ে সূতা কাটে তাহারা দৈনিক দুই আনা রোজগার করে, আংশিক সময়ে সূতা কাটিলে এক আনা উপার্জন করিতে পারে। ১৯৩১ সালে পাটের মূল্য অসম্ভব রকমে হ্রাস হওয়াতে, আমরা বহু কাটুনীর নিকট হইতে আবেদন পাইয়াছি। জগদ্ব্যাপী মন্দার পরে, পুনর্বার বন্যা হওয়াতে দুর্দশা চরমে উঠে এবং চারিদিকে "চরকা দাও, চরকা দাও" রব উঠে। কলিকাতার বিভিন্ন সেবা-সমিতি চাউল প্রভৃতি বিতরণ করিয়া যে সাহায্য করিতেছে, তাহাতে দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলের দুঃখ অতি সামান্যই লাঘব হইতেছে। তাহার উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ হওয়াতে অর্থ-সাহায্যও অতি সামান্য পাওয়া যাইতেছে। যদি চরকা প্রচলিত থাকিত, তবে ৭ বৎসর বয়সের ঊর্ধ্বে বালকবালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রত্যেক কার্যক্ষম কাটুনী গড়ে এক আনা করিয়া উপার্জন করিতে পারিত, এবং উহার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির চাউল, তেল, লবণ, ডাল প্রভৃতির সংস্থান হইত। কাহারও নিকট অর্থের অফুরন্ত ভাণ্ডার নাই,—ভাণ্ডার শূন্য হইয়া আসিলে সাহায্যকার্যও থামিয়া যায় এবং দুর্গতদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহা ছাড়া, প্রথম প্রথম সাহায্য বিতরণের প্রয়োজন থাকিলেও, উহার একটা অনিষ্ট-কর দিকও আছে। উহার ফলে সাহায্যদাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই নৈতিক অধঃপতন হয়। কিন্তু গ্রহীতা যদি সাহায্যের পরিবর্তে কোন একটি কাজ করিয়া দিতে পারে, তবে তাহার আত্মসম্মান বজায় থাকে। সূতার একটা বাজার-মূল্যও আছে, সুতরাং সূতা বিক্রয়ের পয়সা কাটুনীদের ভরণপোষণের কাজেই লাগে এবং এইরূপে কর্মচক্র আবর্তিত হইতে থাকে।

কলিকাতার রাস্তায় দুই তিন টন এমন কি চার পাঁচ টন ভারবাহী মোটরলরী চলে। কয়েক বৎসর হইতে কয়েক সহস্র মনুষ্য-বাহিত যানেরও আমদানি হইয়াছে। এগুলিতে পাঁচ, দশ, পনর, কুড়ি মণ পর্যন্ত মাল বহন করা হয়। ছোট যানগুলি একজন কি দুইজন লোকে টানে, বড় গুলির সম্মুখে দুই জন টানে, পিছনে দুই জন ঠেলে। এখানে দেখা যাইতেছে, মানুষ কেবল গরু বা মহিষের গাড়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেছে না, মোটরচালিত যানের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করিতেছে। প্রকৃত কথা এই যে, এই সমস্ত কঠোর পরিশ্রমী লোক বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে আসে, ঐ দুই প্রদেশে লোকসংখ্যা বেশী হওয়াতে, উহাদের পক্ষে জীবিকার্জন করা কঠিন। সুতরাং মানুষ শ্রমিক যে যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না, ভারত ও চীনে এই নিয়ম খাটে না। এই দুই দেশেরঅর্ধাশন-ক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ লোক এমন কম মজুরিতে কাজ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত যে, শিল্প-বাণিজ্য-সমৃদ্ধ অন্য কোন দেশে, তাহা অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক শতাব্দী বা ততোধিক পূর্বেকার সংবাদপত্র ঘাঁটিয়া যে সমস্ত মূল্যবান্ তথ্য প্রকাশ করিতেছেন, সেজন্য তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ। পুরাতন 'সমাচার দর্পণ' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত পত্রখানি হইতে বুঝা যাইবে চরকার জন্য কোলব্রুক সাহেবের বিলাপের কারণ কি এবং বিদেশী সুতা ভারতের কি বিষম আর্থিক ক্ষতি করিয়াছে।

"চরকা আমার ভাতার পুত
চরকা আমার নাতি—"

১৮২৮ সালে 'সমাচার দর্পণে' কোন সুতা কাটুনী স্ত্রীলোক নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন ঃ—(৬)

(৫ই জানুআরি ১৮২৮। ২২ পৌষ ১২৩৪)

চরকাকাটুনীর দরখাস্ত।—শ্রীযুত সমাচার পত্রকার মহাশয়।

আমি স্ত্রীলোক অনেক দুঃখ পাইয়া এক পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি আপনারা দয়া করিয়া আপনারদিগের আপন ২ সমাচারপত্রে প্রকাশ করিবেন শুনিয়াছি ইহা প্রকাশ হইলে দুঃখ নিবারণকর্তারদিগের কর্ণগোচর হইতে পারিবেক তাহা হইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক অতএব আপনারা আমার এই দরখাস্ত-পত্র দুঃখিনী স্ত্রীর লেখা জানিয়া হেয়জ্ঞান করিবেন না।

আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার দুঃখের কথা তাবৎ লিখিত হইলে অনেক কথা লিখিতে হয় কিন্তু কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি কেবল তিন কন্যাসন্তান হইয়াছিল। বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর ঐ তিনটি কন্যা প্রতিপালনের কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই তিনি নানা ব্যবসায়ে

(৬) দরিদ্র স্ত্রীলোকটি এই ধারণা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, বিলাতী আমদানী সুতা তথাকার লোকের হাতে কাটা। তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, ঐ সব সুতা বাষ্পশক্তি-চালিত কলে তৈরী।

কালযাপন করিতেন আমার গায়ে যে অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম শেষে অন্নাভাবে কএক প্রাণী মারা পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল তখন বিধাতা আমাকে এমত বুদ্ধি দিলেন যে যাহাতে আমারদিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ আসনা ও চরকায় সুতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম প্রাতঃকালে গৃহকর্ম অর্থাৎ পাটঝাটি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম বেলা দুইপ্রহর পর্যন্ত কাটনা কাটিতাম প্রায় এক তোলা সুতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম স্নান করিয়া রন্ধন করিয়া শ্বশুর-শাশুড়ী আর তিন কন্যাকে ভোজন করাইয়া পরে আমি কিছু খাইয়া সরু টেকো লইয়া আসনা সুতা কাটিতাম তাহাও প্রায় এক তোলা আন্দাজ কাটিয়া উঠিতাম এই প্রকারে সুতা কাটিয়া তাঁতীরা বাটিতে আসিয়া টাকায় তিন তোলার দরে চরকার সুতা আর দেড় তোলার দরে সরু আসনা সুতা লইয়া যাইত এবং যত টাকা আগামি চাহিতাম তৎক্ষণাৎ দিত ইহাতে আমারদিগের অন্নবস্ত্রের কোন উদ্বেগ ছিল না পরে ক্রমে ২ ঐ কর্মে বড়ই নিপুণ হইলাম কএক বৎসরের মধ্যে আমার হাতে সাত গণ্ডা টাকা হইল এক কন্যার বিবাহ দিলাম ঐ প্রকার তিন কন্যার বিবাহ দিলাম তাহাতে কুটুম্বতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অন্যথা হইল না রাঁড়ের মেয়্যা বলিয়া কেহ ঘৃণা করিতে পারে নাই কেননা ঘটক কুলীনকে যাহা দিতে হয় সকলি করিয়াছি তৎপরে শ্বশুরের কাল হইল তাঁহার শ্রাদ্ধে এগার গণ্ডা টাকা খরচ করি তাহা তাঁতীরা আমাকে কর্জ দিয়াছিল দেড় বৎসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম কেবল চরকার প্রসাদাৎ এতপর্যন্ত হইয়াছিল এক্ষণে তিন বৎসরাবধি দুই শুশুড়ী বধুরে অন্নাভাব হইয়াছে সুতা কিনিতে তাঁতী বাটীতে আসা দূরে থাকুক হাটে পাঠাইলে পূর্বাপেক্ষা সিকি দরেও লয় না ইহার কারণ কি কিছু বুঝিতে পারি না অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি অনেকে কহে যে বিলাতী সুতার আমদানি হইতেছে সেই সকল সুতা তাঁতীরা কিনিয়া কাপড় বুনে। আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে আমার যেমন সুতা এমন কখনও বিলাতী সুতা হইবেক না পরে বিলাতী সুতা আনাইয়া দেখিলাম আমার সুতা হইতে ভাল বটে তাহার দর শুনিলাম ৩।৪ টাকা করিয়া সের আমি কপালে ঘা মারিয়া কহিলাম হা বিধাতা আমা হইতেও দুঃখিনী আর আছে পূর্বে জানিতাম বিলাতে তাবৎ লোক বড় মানুষ বাঙ্গালি সব কাঙ্গালী এক্ষণে বুঝিলাম আমা হইতেও সেখানে কাঙ্গালিনী আছে কেননা তাহারা যে দুঃখ করিয়া এই সুতা প্রস্তুত করিয়াছে সে দুঃখ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি এমত দুঃখের সামগ্রী সেখানকার হাটেবাজারে বিক্রয় হইল না একারণ এ দেশে পাঠাইয়াছেন এখানেও যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল না তাহা না হইয়া কেবল আমাদিগের সর্বনাশ হইয়াছে সে সুতায় যত বস্ত্রাদি হয় তাহা লোক দুই মাসও ভালরূপে ব্যবহার করিতে পারে না গলিয়া যায় অতএব সেখানকার কাটুনীদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা করিলে এদেশে সুতা পাঠান উচিত কি অনুচিত জানিতে পারিবেন। কোন দুঃখিনী সুতা কাটুনীর দরখাস্ত।—সং চং।

শান্তিপুর

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বর্তমান সভ্যতা—ধনতন্ত্রবাদ—যান্ত্রিকতা এবং বেকার সমস্যা

(১) পণ্যের অতি উৎপাদন এবং তাহার পরিণাম—বেকার সমস্যা

ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে সম্প্রতি যে শোচনীয় বেকার সমস্যার বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, পাশ্চাত্য দেশসমূহে কিরূপ আর্থিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

সকলেই জানেন, পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দা চারিদিকে কি অনিষ্টকর ফল প্রসব করিতেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশে বেকার সমস্যা অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতেও বেকার সমস্যার অন্ত নাই, কিন্তু এখানে হতভাগ্য বেকারদের সংখ্যা নির্ণয়ের কোন চেষ্টা হয় নাই। শুনা যায়, আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। 'টাইমসে'র নিউইয়র্কের সংবাদদাতা বলেন, "বহু স্থানে মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সহস্র সহস্র কেরানী মজুরের কাজ করিতেছে বা ঐ কাজ পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।...... এরূপ বহু পরিবার তাহাদের সন্তানদের সমস্ত দিন বিছানাতেই শোয়াইয়া রাখিতেছে। কেননা ঘর গরম করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ইন্ধন সংগ্রহের ক্ষমতা তাহাদের নাই।"

"এর চেয়েও শোচনীয় কাহিনী আছে। একটি সংবাদে আছে যে, শহরের কর্তারা সমস্ত জঞ্জালাধার তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, পাছে লোকে রাত্রিতে ঐ সমস্ত স্থান হইতে ক্ষুধার জ্বালায় পচা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া খায় এবং তাহার ফলে তাহাদের দেহ বিষাক্ত হয়! একটি লোক একটুকরা রুটি চুরি করিয়া ধরা পড়ে। এই ঘৃণা ও অপমানের ফলে শেষে সে আত্মহত্যা করে। দুর্ভিক্ষ বা বন্যা প্রভৃতির সময়ে আমাদের দেশেও এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। চরম দুর্দশায় পড়িয়া এদেশের লোক স্ত্রী পুত্র কন্যা বিক্রয় করিয়াছে, আত্মহত্যা পর্যন্ত করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমেরিকার মত ঐশ্বর্যশালী দেশেও এরূপ দুরবস্থা হইতে পারে। শুনা যায়, এই সব বেকারদের অভাব মোচন করিবার জন্য ২২ লক্ষ পাউণ্ডের প্রয়োজন। আমেরিকার কোটিপতিদের পক্ষে এই টাকা সংগ্রহ করা কঠিন নহে। আমেরিকায় এত লক্ষপতি, কোটিপতি থাকিতেও, সে দেশে এরূপ হৃদয়বিদারক ব্যাপার কেন ঘটিতেছে?" (স্থানীয় কোন সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত—তাং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩০)

সৌভাগ্যক্রমে এক দল নূতন অর্থনীতিবিদের উদ্ভব হইয়াছে। ইঁহারা সমস্যাটি গভীরতর ভাবে দেখিয়া জগদ্ব্যাপী বেকার সমস্যার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়াছেন।

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে (১৯২৮) কলিকাতা স্টেটস্‌ম্যানে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয় :—

"পাশ্চাত্য দেশসমূহে শিল্প-বাণিজ্যের যে সঙ্গীন অবস্থা হইয়াছে, তাহার প্রতিকারের একমাত্র পথ উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস করা। কিন্তু ইহার ফলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। দুইটি শিল্পের কথাই ধরা যাক, আমেরিকা ছয় মাসে যে পরিমাণে বুট ও জুতা তৈরি করে তাহাতে তাহার এক বৎসর চলে, এবং সতের সপ্তাহে এক বৎসরের উপযোগী কাচ তৈরি করে। কাজেই প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল হয়; তাহাকে কম মূল্যে অন্য দেশে চালান করিতে হইবে, অথবা কারখানার কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ল্যাঙ্কাশায়ার ও ইয়র্কশায়ারেরও এইরূপ দুর্দশা। প্রত্যেক দেশেই কারখানা স্থাপিত হইতেছে এবং যন্ত্র-শক্তিতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বহু গুণে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তদনুপাতে জিনিস বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই। জগতের জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্রই রহিয়া গিয়াছে, সুতরাং উৎপন্ন মাল কাটিতেছে না। বিশেষতঃ এশিয়া ও আফ্রিকায় পাশ্চাত্যের তুলনায় আর্থিক উন্নতি কমই হইয়াছে, সুতরাং এই দুই মহাদেশে লোকসংখ্যা খুব বেশী হইলেও, সে তুলনায় পণ্য দ্রব্যাদি সামান্যই বিক্রয় হয়। সেখানকার লোক সমূহের অভাবও সামান্য।" আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। হেন্‌রি ফোর্ডের কারখানা হইতে ১৯২০-২১ সনে ১২½ লক্ষ মোটরগাড়ী তৈরি হইয়াছে, (১) মাসে গড়ে ত্রিশ দিন কাজের সময় ধরিলে প্রত্যহ ৪ হাজার মোটরগাড়ী ফোর্ডের কারখানা হইতে তৈরি হইত। পরে হেন্‌রি ফোর্ড তাঁহার প্রতিবেশীদের পরাস্ত করিবার জন্য প্রত্যহ গড়ে ৬ হাজার মোটরগাড়ী তৈরি করিতে থাকেন। অন্যান্য কারখানার মালিকেরাও তাঁহার সঙ্গে উন্মত্তের মত পাল্লা দিতে থাকে। ফলে সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হইল। জগদ্বাসীরা কি ক্রমাগত মোটরগাড়ী কিনিতে পারে? বর্তমানে জগদ্ব্যাপী যে আর্থিক দুর্দশা হইয়াছে, তাহার একটা প্রধান কারণ এই অতি-উৎপাদন।"

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে উপরোক্ত কথাগুলি লিখিত হয়। পুস্তক মুদ্রণের পূর্বে স্থানীয় একখানি সংবাদপত্রে আমি নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিলাম (১১-৩-৩২) :—

"হেন্‌রি ফোর্ডের ব্যবসায়ের মূল নীতি এই যে, কলের দ্বারা কাজে শ্রমিক-সংখ্যার হ্রাস হয় না, বরং তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদের মজুরিও বাড়ে। তিনি আরও বলেন যে, শ্রমিকদের যত বেশী মজুরি দেওয়া যায়, ততই ব্যবসায়ের উন্নতি হয়। কিন্তু গত দুই বৎসরের ঘটনাবলীর ফলে তাঁহার সেই মূল নীতি রক্ষা করা কঠিন হইয়াছে। আমরা শুনিতেছি যে, তাঁহার কৃষিক্ষেত্রে তিনি কল বর্জন করিয়া সনাতন প্রণালীতে কাজ করাইতেছেন, যাহাতে অধিকসংখ্যক লোক কাজ পাইতে পারে। বেশী মজুরি অতীতের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তিনিও ঘটনা-চক্রে বাধ্য হইয়া অন্য সকলের মত শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করিতেছেন।"

(১) Henry Ford : *My Life and Work.*

(২) কলের দ্বারা মানুষ কর্মচ্যুত হইয়াছে

জগতে আবার সঙ্গীন বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহা কতকটা নূতন ও অপ্রত্যাশিত রকমের। আর্থিক মন্দা, পণ্য উৎপাদন হ্রাস এবং কারখানা বন্ধ করার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নাই। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি ইভান্স ক্লার্ক, 'নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রে এই কথাই লিখিয়াছেন। মিঃ ক্লার্ক বলেন, মানুষের কাজ এখন কলে করিতেছে, কাজেই অনেক লোক কাজ পাইতেছে না এবং তাহারই ফলে শ্রমিকদের বর্তমান দুর্দশা। তিনি বলেন, "আর্থিক কৃচ্ছ্রতার সময়েই বেকার সমস্যা দেখা গিয়াছে। যখন ব্যবসা ভাল চলে না, তখনই কারখানা হইতে শ্রমিকদের ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যবসার অবস্থা ভাল হইলেই আবার লোক নিযুক্ত করা হয়।

"কিন্তু বর্তমানের বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। আর্থিক মন্দার সময়ে যেরূপ হয়, ব্যবসায়ের বাজারে সেরূপ কোন অবনতির লক্ষণ দেখা যায় নাই। 'ইউনাইটেড স্টেট্স্ স্টীল করপোরেশান' এইমাসে গত বৎসরের তুলনায় বরং বেশী কাজ করিতেছে।

"বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৭ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে।

"আরও একটি কারণ ভিতর হইতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এতদিন ইহাকে আমরা লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে শক্তি সংগ্রহ করিয়া ইহা একটি প্রধান জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। যন্ত্র আমাদের শিল্পক্ষেত্রের সর্বত্র যেরূপ দখল করিয়াছে তাহার ফলে মানুষ কর্মহীন বেকার হইয়া পড়িতেছে। এই দিক দিয়া চিন্তা করিলেই কেবল বর্তমান সমস্যার মূল আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

"এতাবৎকাল পর্যন্ত যন্ত্র কার্যক্ষেত্রের বিস্তার করিয়া এবং আনুষঙ্গিক নানা শিল্পের সৃষ্টি করিয়া, মানুষকে কাজ যোগাইয়াছে। কিন্তু চিরদিনই এইরূপ সুখচর অবস্থা থাকিতে পারে না, বর্তমানের দুর্দশাই তাহার প্রমাণ।

"তিন দিক হইতে জিনিসটির বিচার করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, বর্তমানে কি বেকার সমস্যা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে? আমেরিকায় বহুসংখ্যক কলকারখানা বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলেই কি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে? যদি পণ্য উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস না হইয়া থাকে, তবে ধরিয়া লইতে হইবে বর্তমান বেকার সমস্যার মূলে যন্ত্রের প্রভাব রহিয়াছে।

* * *

"তারপর পণ্য উৎপাদনের কথা। কারখানাতে পণ্য উৎপাদন হ্রাস হওয়াতেই কাজের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে, সাধারণতঃ এরূপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু অবস্থা ইহার বিপরীত। ১৯২৭ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলকারখানাগুলি এত অধিক পণ্য উৎপাদন করিয়াছে, গত বৎসর ব্যতীত আর কখনও এমন হয় নাই।

একদিকে পণ্য উৎপাদন যেমন বাড়িয়াছে, অন্যদিকে তেমন ১৯১৯ সাল হইতে উৎপাদনকারী শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া আসিতেছে।

*　　　*　　　*

"গৃহনির্মাণ শিল্পে এই শ্রমিকসংখ্যা-হ্রাসের কৌশল বেশী পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে; পরিখা খনন, ভারী বস্তু উত্তোলন, বালুতি-বহন প্রভৃতি অনেক কাজই এখন যন্ত্র-সাহায্যে হইতেছে। এই শিল্প সম্পূর্ণরূপেই যন্ত্রশিল্প হইয়া উঠিয়াছে।

*　　　*　　　*

"কয়লার খনির কাজেও যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যেই আমেরিকার শতকরা ৭১ ভাগ কয়লার কাজ কলের দ্বারা হইতেছে। ১৮৯০ সালে যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হইত, বর্তমানে তাহা অপেক্ষা প্রায় অর্ধেক শ্রম খাটাইয়া কয়লার কোম্পানিগুলি ঐক্য বৎসরের উপযোগী কয়লা খনি হইতে তুলিতেছে। ইস্পাত কোম্পানিগুলি ১৯০৪ সালের তুলনায় বর্তমানে ঠিক সেই পরিমাণ শ্রমিক খাটাইয়া তিন গুণ বেশী পিণ্ডলোহ তৈরি করিতেছে।

"হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আমেরিকার কৃষিফার্মসমূহে ৪৫ হাজার শস্য সংগ্রহ ও পেষণের যন্ত্র একলক্ষ ত্রিশ হাজার শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিয়াছে। ইহারা উচ্চ হারে মজুরি পাইত।

"যন্ত্রের দ্বারা যে কত লোক কর্মচ্যুত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। যন্ত্রের দ্বারা যে সমস্ত লোক কর্মচ্যুত হইতেছে, তাহাদের কতকাংশকে ঐ ব্যবসায়েরই বিভিন্ন বিভাগে কাজ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু কলের প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্যবসায়ের কার্যক্ষেত্রও তদনুপাতে বাড়ে, তবেই এরূপ সম্ভব হইতে পারে। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, ১৯২৯ সালের তুলনায় বর্তমানে ব্যবসায়ের অবস্থা তত বেশী খারাপ না হইলেও, বেকার সমস্যা কেন এমন অধিকতর ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।"(২)

দুর্দশা এখন চরমে উঠিয়াছে। সম্প্রতি একদল বেকার প্রেসিডেন্ট হুভারের নিকট দরবার করিতে গিয়াছিল। তাহাদের আবেদন হইতেই প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইবে।

"আমাদের এই দেশে ভূমি উর্বরা, প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইতেছে, গোলায় শস্য ধরে না, ভাণ্ডার পণ্যভারে পূর্ণ। তোষাখানায় প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ সঞ্চিত, কলকারখানা ও ফার্মে অতিরিক্ত উৎপন্ন পণ্য, বিক্রয় হইতে না পারিয়া, চারিদিকের বাণিজ্যপ্রবাহ

---

(২) "কলকারখানা করিয়া শিল্প গঠনের ঝোঁক আমাদের দেশের বহু নেতা ও কর্মীর মধ্যে দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের সাবধান হওয়া উচিত। জনৈক মনীষী বলিয়াছেন—'শিল্পপ্রধান দেশের অর্ধেক লোক যন্ত্রযোগে শ্রম বাঁচাইবার কৌশল আবিষ্কারের জন্য মাথা ঘামাইতেছে, আর অপরার্ধ বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা করিতেছে।'—অধুনাতন হিসাবে ইংলণ্ডের বেকার সংখ্যা ২০ লক্ষ। মিঃ টমাসের মতে জার্মানীর বেকারসংখ্যা ৩০ লক্ষ, ইটালীর ৫ লক্ষ এবং যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার বেকারসংখ্যা ৩০ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ।"—মাদ্রাজ স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন উপলক্ষে আমার বক্তৃতা, ১৫ই জুলাই, ১৯৩০।